তারীখুল খুলাফা

(খলীফাগণের ইতিবৃত্ত)

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ.)

হাফেজ ফজলুল হক শাহ

তারীখুল খুলাফা

(খলীফাদের ইতিবৃত্ত)

মূল : আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ:)

অনুবাদ : হাফেজ ফজলুল হক শাহ

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তারীখুল খুলাফা	:	আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ:)
অনুবাদ	:	হাফেজ ফজলুল হক শাহ
প্রকাশক	:	মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৯২৩৫
প্রথম প্রকাশ	:	রমযান–১৪৩২ হিজরী আগস্ট–২০১১ ইংরেজী ভাদ্র– ১৪১৮ বাংলা
কম্পিউটার কম্পোজ	:	বিশ্বাস কম্পিউটার্স ৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুদ্রণ ও বাঁধাই	:	মদীনা প্রিন্টার্স ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য	:	২৮০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 978-9848-675-05-2

অনুবাদকের আরজ

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ:) রচিত 'তারীখুল খুলাফা' খলীফাদের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কীত একটি প্রনিধানযোগ্য গ্রন্থ। সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা:) থেকে শুরু করে ৯০০ হিজরী পর্যন্ত খলীফাদের মহোত্তম জীবনের আশ্চর্যজনক বর্ণনার এক অপূর্ব সমাহার এ বইটি। আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের উপর এটিই প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ রচনা।

বিশ্বনন্দিত ইসলামী মনীষা আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রহ:)-এর অনন্য ও অনবদ্য বইটির অনুবাদের আশা আমার অনেক দিনের। এই মহান কাজটি সমাপ্ত করতে পেরে আজ আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সমীপে কৃতজ্ঞ। এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় মদীনা পরিবারের নিকট আমার ঋণের কোনো শেষ নেই।

বইটির জটিল তত্ত্বগুলো সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সাধারণ পাঠক, আলেম সমাজ বিশেষত গবেষকদের জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। সমাজে এ গ্রন্থের আবেদন কিঞ্চিত প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করবো। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে নির্ভুল পথটি অনুসরণ করতে মোটেও কুণ্ঠিত হইনি। যতটুকু সম্ভব সুন্দর করার চেষ্টা করেছি, তথাপি কোনো বিদগ্ধ পাঠকের নজরে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ও পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ রইলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ সেবাটুকু জ াতির কাছে সমাদৃত করুন! আমীন!!

বিনীত

হাফেজ ফজলুল হক শাহ

সাং- পোরশা, পুরইল

পোঃ+ থানা- পোরশা

নওগাঁ

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَمْدًا لِلّٰهِ الَّذِىْ وَعَدَ فَوَفٰى وَاَوْعَدَ فَعَفٰى - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّرَفَاءِ وَمَسُوْدِ الْخُلَفَاءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَهْلِ الْكِرَامِ الْوَفَاءِ - اَمَّابَعْدُ

আমি এ গ্রন্থে খুলাফাদের ইতিবৃত্ত তথা আমিরুল মুমিনীনদের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর পুণ্য ধন্য খিলাফত থেকে আমার যুগের খলীফা পর্যন্ত সকল খুলাফায়ে ইসলামের বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাঁদের শাসনামলের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী, ওলামা ও আইম্মায়ে কেরামদের তত্ত্বে সমৃদ্ধশালী এ ভাণ্ডারটি ব্যাপক চাহিদার কারণে প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি অনেক বিষয়ে কলম চালিয়েছি, এ বিষয়েও অনেক গ্রন্থাদি প্রণিত হয়েছে– যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। তবে সেগুলো বিশদ বিবরণ ও অসংখ্য তত্ত্বের ভারে ন্যুব্জ। ফলে জাতির অফুরন্ত আগ্রহ মেটানোর প্রয়োজনে অতি সংক্ষেপে বইটি রচনা করেছি।

যারা ফিতনা ফাসাদের মাধ্যমে খিলাফত দাবী করেছে এ গ্রন্থে তাদের বিবরণ পেশ করিনি। অনেক উলবী, আব্বাসী, উবায়দীদের নাম আমি বাদ দিয়েছি, অথচ তারা খিলাফতের দাবী করেছিল। কারণ তাদের নেতৃত্ব বৈধ ছিল না। তারা কুরাইশও নয়, আওয়ামরা তাদের ফাতেমী বলত। তাদের দাদা ছিল অগ্নিপূজক। তারা ইসলাম বহির্ভূত লোক ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবী-রাসূলদের গালি দিত। তারা মদ্যপান, যিনা এবং নিজেকে সিজদা করা বৈধ ঘোষণা করেছিল। তাদের কাছে শীআ মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। যাহাবী বলেন, তাতারীদের চেয়েও উবায়দীদের ফিতনা ছিল জঘন্য। অতএব তারা খলীফা নয়। তাদের খিলাফত, ইমামত এবং বাইআত বৈধ ছিল না।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

	বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
☆	আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ	৪৩৩
☆	আল-ওয়াছিক বিল্লাহ উমর	৪৩৬
☆	আল-মুসতাসিম বিল্লাহ যাকারিয়া	৪৩৬
☆	আল-মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল	৪৩৬
☆	আল-মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ	৪৩৮
☆	আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী	৪৩৯
☆	আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা	৪৪০
☆	আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুহাসিন	৪৪১
☆	আল-মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ	৪৪২
☆	স্পেনের উমাইয়্যা রাজত্ব	৪৪৪
☆	পাশ্চাত্যের উবায়দিয়া রাজত্ব	৪৪৫
☆	বনূ তাবাতাবাদের শাসন ব্যবস্থা	৪৪৬
☆	তবরিস্তানের রাজত্বের বিবরণ	৪৪৭
☆	ফায়দা	৪৪৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক খলীফা মনোনীত না করার রহস্য

বাযযার (র.) তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত হুযাইফা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেছেন, সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আপনি আমাদের জন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে তোমাদের জন্য খলীফা মনোনীত করি, আর তোমরা আমার খলীফার অবাধ্য হও তবে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবে। এটি হাকেম 'মুসতাদরাক' গ্রন্থেও রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি দূর্বল।

ইমাম বোখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.) একটি হাদীস বয়ান করেছেন, হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতক যখন বর্শা দ্বারা আঘাত করে তখন লোকেরা আরয করল, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যান। তিনি উত্তর দিলেন, যিনি আমার চেয়ে মহান অর্থাৎ, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তিনি খলীফা মনোনীত করেছেন। তবে আমি তোমাদের খলীফা মনোনীত না করে চলে যাচ্ছি, কারণ তিনি এভাবেই চলে গেছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সা.)।

দালায়েলুন নবুওয়ত গ্রন্থে আমর বিন সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বাইহাকী এবং ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) জামাল যুদ্ধ জয়ের পর ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, হে জনতা! রসূলুল্লাহ (সা.) খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেননি; বরং আমরা নিজেরাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে খলীফা মনোনীত করেছিলাম। তিনি খুব ভালো ভাবেই খিলাফতের কাজ করেছেন এবং নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অতঃপর নিজের কাছে মঙ্গল এবং সঙ্গত মনে করে হযরত উমর (রা.) কে এ কাজের জন্য মনোনীত করে যান। তিনিও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের ভিত্তিকে শক্ত স্থানে স্থাপন করেছেন। অতঃপর অনেকেই দুনিয়ার মোহে পড়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই ফায়সালা করেছেন।

হাকেম (র.) সমুতাদরাক গ্রন্থে এবং বাইহাকী দালায়েল গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, লোকেরা হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করবেন কী? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন খলীফা মনোনীত করে যাননি, তখন আমি তা কিভাবে করব! আমার পর তোমরা খলীফা নির্বাচিত করে নিবে, যেমন নবী (সা.)-এর পর খলীফা মনোনীত হয়েছিল। যাহাবী বলেন, শিয়াদের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, রসূলে খোদা (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ হাযীল বিন

শারজীল বলেন, এটা কি করে সম্ভব যে, রসূলে আকরাম (সা.) হযরত আলীর খিলাফতের জন্য প্রতিশ্রুতি নিবেন আর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হাবেন! হযরত আবু বকর চেয়েছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) যদি কারো জন্য খিলাফতের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, তবে তিনি তাঁর অধীনস্থ হবেন। (বাইহাকী)।

ইবনে সা'দ (র.) তিনি হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, নবী আকরাম (সা.)-এর মৃত্যুর পর আমরা চিন্তা করে বের করলাম যে, নবীজী (সা.) তাঁর অনুপস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে ইমাম বানিয়েছেন। সুতরাং নবীজী (সা.) যাঁকে আমাদের দ্বীনের জন্য গ্রহণ করেছেন, তিনি দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সাফীনা (রা.)-এর এ রেওয়ায়েত লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে বলেছেন, আমার পর এঁরা খলীফা হবেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) নিজেরাই বলেছেন, নবী আকরাম (সা.) কাউকে খলীফা মনোনীত করেননি।

ইমাম হাব্বান উপরোক্ত হাদীসটি আবুল আলী ও কতিপয় বর্ণনাকারীর থেকে এভাবে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, নবীয়ে আকরাম (সা.) মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় তিনি প্রথম পাথরখানা স্বহস্তে স্থাপনের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে বললেন, তোমার পাথর আমার পাথরের পার্শ্বে রাখ। অতঃপর হযরত উমরকে হযরত আবু বকরের পাথরের পার্শ্বে পাথর রাখতে বললেন। অতঃপর হযরত উসমানকে হযরত উমরের পাথরের পার্শ্বে পাথর রাখতে বললেন। এরপর ইরশাদ করেন, আমার পর এরাই হবেন খলীফা।

আবু যর (রা.) বলেন, উক্ত হাদীসের সনদে কোনো ক্রটি নেই। উপরন্ত হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে এমনটাই উল্লেখ করেছেন। বাইহাকী দালাইল গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীস এবং হযরত উমর ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কথার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ও দাবী হলো, নবী করীম (সা.) মৃত্যুর সময় খিলাফত বিষয়ক কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেননি এবং মৃত্যুর পূর্বে যে সকল ইশারা তিনি করেছিলেন, আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতের উপর আমল করবে।

হাকেম (র.) আরবায ইবনে সারিয়া (র.)-এর রেওয়ায়েতে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পর আবু বকর এবং উমর (রা.)-এর

আনুগত্য করবে। এছাড়াও অপর দু'টি হাদীস যা দ্বারা খিলাফতের ইশারা বের হয়।

খিলাফত কুরাইশদের জন্য

আবু দাউদ তায়ালাসী স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে আবু বারযাহ'র বরাদ দিয়ে বর্ণনা করেন, খিলাফত কুরাইশদের জন্য মানানসই। তাঁরা ইনসাফপূর্ণ বিচার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং মেহেরবান। এ রেওয়ায়েতটি তাবারানীও বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রশাসন কুরাইশদের, বিচার বিভাগ আনসারদের এবং আযাদ হাবশীদের অধিকারে থাকা উচিত। এ হাদীসের সকল সনদ সহীহ।

ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে হাকেম ইবনে নাফে ও উতবা ইবনে আব্দুল্লাহ্র রেওয়ায়েত নকল করে লিখেছেন, হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, খিলাফত কুরাইশদের, বিচারকার্য আনসারদের এবং আহ্বানের দায়িত্ব হাবশীদের।

বায্যার হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, খলীফাগণ কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন। এদের মধ্যে নেককারগণ নেককারগণের আমীর, আর বদকারগণ বদকারগণের আমীর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হযরত সাফীনাহ (রা.) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর টিকবে। তারপর বাদশাহী প্রথা এসে যাবে। আসহাবে সুনান এটি রেওয়ায়েত করেছেন। ওলামাগণ বলেন, তোমাদের দ্বীন ইসলাম প্রথমে নবুওয়ত ও রহমত দ্বারা শুরু হয়। এরপর খিলাফত এবং রহমত এসে যায় এবং তারপর বাদশাহী এবং অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বলেন, জাবের বিন সামুরা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কুরাইশদের বারোজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম সবসময় জয়যুক্ত থাকবে। এটি ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'ইসলামের কাজ অটুট থাকবে' ইসলামের কাজ অব্যাহত থাকবে' এ দু'টি পদ্ধতি ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত।

ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, বারোজন শাসক অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের কাজ অব্যাহত থাকবে। তিনি রেওয়ায়েতটি

এভাবেও বর্ণনা করেছেন, বারোজন খলীফা না আসা পর্যন্ত সমাজে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কার্যকর হবে না। উপরন্তু ইসলাম শক্ত এবং সংরক্ষিত থাকবে বারোজন খলীফা পর্যন্ত। বায্যার এভাবে বর্ণনা করেছেন, [নবীজী (সা.) বলেন] আমার বারোজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত।

এ রেওয়ায়েতটি আবু দাউদ একটু বৃদ্ধি করেছেন এভাবে, নবীজী (সা.) ঘরে এলে কুরাইশরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, বারোজন খলীফার পর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর হত্যাযজ্ঞ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, উম্মাহ'র ইজমাকৃত বারোজন খলীফা পর্যন্ত এ দ্বীন সর্বদা অটুট থাকবে। এটি ইমাম আহমদের রেওয়ায়েত।

বায্যার হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কতজন খলীফা এ উম্মতকে শাসন করবে? ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, একদা আমরাও নবী আকরাম (সা.)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলদের অনুরূপ বারোজন।

কাযী আয়ায বলেন, উক্ত হাদীস এবং সমার্থ হাদীসে উল্লিখিত বারোজন খলীফা থেকে সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, এ বারোজন খলীফা খিলাফতের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইসলামের শৌর্য-বীর্য কালে আসবেন। আর তাঁদের ব্যাপারে 'উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) থাকবে। কারণ দুর্ভাবনার যুগ উমাইয়া বংশের ওয়ালীদ বিন ইয়াযিদের শাসনমাল থেকে শুরু হয়। আর তা আব্বাসিয়া খিলাফত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আব্বাসিয়াদের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বনূ উমাইয়ার মূলোচ্ছেদ হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (র.) সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কাযী আয়াযের সূত্র ধরে লিখেছেন, এ হাদীসের ব্যাপারে কাযী আয়াযের অভিমতটি অত্যন্ত চমৎকার। কারণ কতিপয় বিশুদ্ধ হাদীস এ অভিমতকে সমর্থন করে যে, সমস্ত লোক খলীফার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। এই ঐকমত্য বা ইজমার অর্থ হলো লোকেরা বাইআতের ব্যাপারে অনুগত এবং হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর যুগের মত কেউ বাইআতের ব্যাপারে বাহানা করবে না।

সিফফিনের বিবাদের সময় দু'জন প্রশাসকের আবির্ভাব ঘটে। সেদিন মুআবিয়া (রা.) খলীফা হন এবং লোকেরা ইমাম হাসান (রা.)-এর সাথে সন্ধি করার পর আমীর মুআবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্যে পৌঁছেন। অতঃপর ইয়াযিদের বিষয়েও ইজমা হয় এবং ইমাম হোসাইনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়নি; বরং তিনি পূর্বেই শহীদ হন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর মতানৈক্য দেখা দেয় এবং

ইবনে যুবাইরের হত্যার পর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ব্যাপারে ইজমা হয়। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পর তাঁর চার পুত্র ওয়ালিদ, সুলাইমান, ইয়াযিদ এবং হিশামের ব্যাপারে ইজমা হয়। সুলাইমান এবং ইয়াযিদের মধ্যবর্তীতে উমর বিন আব্দুল আযীযের বিষয়েও ইজমা হয়েছিল। এ হিসাব মোতাবেক খোলাফায়ে রাশেদা ছাড়া সাতজন খলীফা হয়। আর এতে মোট খলীফার সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো জন। বারো নম্বর খলীফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক। তাঁর চাচা হিশামের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যাপারে ইজমা হয়। চার বছর পর লোকেরা তাঁর প্রতি অনাস্থা পোষণ করে এবং তাকে হত্যা করে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সময় অতি দ্রুত পাল্টে যায়। অতঃপর কোন খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে লোকদের আর কোনো ইজমা নাই। কারণ ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর চাচাত ভাই ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তিনি (ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ) অল্প কিছুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর পিতার চাচার ছেলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইয়াযিদের পরলোক গমননের পর তাঁর ভাই ইব্রাহীম বাদশাহী হাতে নেন। কিন্তু মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান ইব্রাহীমকে হত্যা করেন। অতঃপর বনূ আব্বাসিয়ার হাতে তাঁর পতন হয় এবং তারা তাঁকে হত্যা করে।

আব্বাসিয়া বংশের প্রথম খলীফা হলেন সাফ্ফাহ। তিনি দীর্ঘ সময় রাজদণ্ড ধারণ করেছিলেন না। তার পর তাঁর ভাই মনসূর খিলাফতের দায়িত্ব নেন। তিনি দীর্ঘ সময় রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকেন। কিন্তু বনূ উমাইয়া স্পেনে সংগঠিত হওয়ার কারণে পাশ্চাত্যের ভূখণ্ড তাঁর শাসনামলে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। বনূ আব্বাসিয়া নিজেদের রাজত্বকে খিলাফত উপাধিতে ভূষিত করে। তাদের সময় অনেক ভ্রষ্টাচারের প্রবর্তণ ঘটে এবং নামেমাত্র খিলাফত থাকে। পক্ষান্তরে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে মুসলমানগণ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছিল। খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। খলীফার নির্দেশ ছাড়া কোন শহরে কিছু হতো না। স্পেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সেখানে নামমাত্র খলীফাদের দুর্বল শাসন এবং তার সাথে মিসরে উবাইদীদের খিলাফতের প্রতি আহবান এ সবই বাগদাদ থেকে খিলাফতের কর্মকাণ্ড চলে যাওয়ার ফল। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্রই খিলাফত নিয়ে বিবাদ-সে একই কারণ পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনে ছয়জন খলীফা দাবী করেছেন।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, বারোজন খলীফার পর ফিত্না ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। বস্তুত তাই হলো। অন্যায় হত্যাযজ্ঞ চলল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলো। দিন দিন

তা বৃদ্ধিও পেতে থাকল। তারা এও অপব্যাখ্যা করল যে, বারোজন খলীফা সম্পর্কে নবীজী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের আবির্ভাব কাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বারোজন খলীফা প্রাথমিক যুগে পরপর আসবেন এমন কোনো ইঙ্গিত নাই। তারা কেয়ামতের আগ দিয়েও আসতে পারেন। অতএব বারোজন খলীফা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এ উম্মতের ধ্বংস নাই। এ কথাগুলো তাঁরা নিজেদের বড় বড় মুসনাদ গ্রন্থে আবু খালিদের বরাত দিয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

বারোজন খলীফার পর বিশৃঙ্খলা ও ফিত্‌না দেখা দিবে-নবীজী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা তাঁরা এভাবে করেছে, এ ফিত্‌না দ্বারা কিয়ামতের পূর্বের ফিত্‌না ও বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। তাঁরা বারোজন খলীফাকে এভাবে গণনা করে যে, খোলাফায়ে রাশেদার চারজন, ইমাম হাসান, আমীর মুআবিয়া, যুবাইর এবং উমর বিন আব্দুল আযীয এরা আটজন। নবম খলীফা মুহতাদী। কারণ বনূ আব্বাসিয়ার খলীফা মুহতাদী বনূ উমাইয়ার খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের মত ন্যায় বিচারক ছিলেন। এরপর মাহদী।

বনূ উমাইয়ার খিলাফতকে ভীতিপ্রদ বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, ইউসুফ বিন সাদ কর্তৃক বর্ণিত, ইমাম হাসান (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট বাইআতের সময় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইমাম হাসান (রা.)-কে বলল, আপনি মুসলমানদের লজ্জিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমাকে খারাপ বলো না। কারণ নবী (সা.) এক রাতে বনূ উমাইয়াকে মিম্বরের উপর দেখে বিহবলিত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়- إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ এবং إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, আমি সম্মানিত রাতে কুরআনকে নাযিল করলাম। আর আপনি কি জানেন সম্মানিত রাত কি? সম্মানিত রাত মানে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রজনী। আপনার মৃত্যুর পর হে মুহাম্মদ (সা.)! বনূ উমাইয়া হাজার মাসের মালিক হবে। কাসেম বলেন, আমি হিসাব করেছি আমির মুআবিয়ার বাইআত থেকে হাজার মাস তাদের রাজত্ব ছিল, একটুকুও কম-বেশি হয়নি।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এটি কাসেম কর্তৃক বর্ণিত। তিন যদিও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার উস্তাদ মাজহূল। এ হাদীসখানা হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাফেজ আবুল হুজ্জাজ (র.) বলেন, হাদীসখানা মুনকার (অস্বীকারকারী)।

ইবনে কাসীরও একই অভিমত পেশ করেছেন। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আব্বাস বিন সহলের দাদার বরাত দিয়ে লিখেছেন, নবীজী (সা.) বনূ হাকাম বিন আসকে (বনূ উমাইয়াকে) স্বপ্নে দেখেন- বাদুড়ের মত এক মজলিসে নাচছে। নবীজীর কাছে এটা খুব খারাপ মনে হলো। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোন দিন মুখ খুলে হাসেননি। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ-

এ হাদীসের সনদগুলো দুর্বল। তবে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), ইয়ালা বিন মাররা (রা.) এবং হোসাইন বিন আলী (রা.)-এর হাদীসগুলো এ হাদীসের সমর্থক। এ হাদীসটি আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাফসীর এবং মাসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। উপরন্তু আসবাবুন নুযূল গ্রন্থেও এ হাদীসের কিছুটা ইশারা করা হয়েছে।

যেসব হাদীসে বনূ আব্বাসিয়া খিলাফতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে

ইমাম বায্যার সনদসহ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস লিখেছেন। হুযূর (সা.) আব্বাস (রা.) কে বলেন, তোমার লোকদের মধ্যে নবুওয়ত এবং রাজত্ব উভয়টাই রয়েছে। এ হাদীসের সনদের মধ্যে আমেরী দুর্বল। কিন্তু আবু নুয়াঈম দালায়েলুন নবুওয়ত, ইবনে আদী কামেল এবং ইবনে আসাকির স্বীয় গ্রন্থে আমেরীর হাদীসখানা কয়েকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযূর (সা.) আব্বাস (রা.)-কে বললেন, সোমবার সকালে আপনার ছেলেকে আমার নিকট নিয়ে আসবেন। আমি তার জন্য দো'আ করে দিব, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার এবং আপনার আওলাদদের ভালো করেন। আব্বাস (রা.) সকালে ছেলেকে কাপড় পরিয়ে হযরতের খেদমতে নিয়ে আসেন। তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আব্বাস এবং তার ছেলেকে প্রকাশ্য ও গোপন গোনাহর মধ্যে বেঁধ না এবং তাঁদের ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাকে এবং তার আওলাদকে রক্ষা করো।

ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে গ্রন্থে এতটুকই লিখেছেন। তবে রাযীন আল-উবায়দী এ হাদীসটির শেষাংশে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন- তার বংশে আমার খিলাফত জারি রেখ। আমার নিকট এ হাদীসখানা অত্যন্ত চমৎকার। তাবারানী ছাওবান থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি বনূ মারওয়ানকে

বারবার মিম্বরে উঠতে দেখে খারাপ ভাবলাম। যখন বনূ আব্বাসকে বার বার আসতে দেখলাম তখন আমার ভালো লাগল।

আবু নুয়াঈম আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস সনদসহ হুলীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন হুজূর (সা.) বাইরে এলে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তখন তিনি (সা.) বললেন, হে আবুল ফজল! আমি আপনাকে একটি সংবাদ দিব? তিনি বললেন, অবশ্যাই নবীজী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ আমার দ্বারা শুরু করিয়েছেন সে কাজ আপনার সন্তানদের মাধ্যমে সমাপ্ত করাবেন।

এর সূত্রগুলো দুর্বল। হযরত আলী (রা.) এ হাদীসটি যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা আরো দুর্বল।

খতীব ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী (সা.) বলেন, আপনাদের থেকেই এ কাজ আরম্ভ হয়েছে, আপনাদের দ্বারাই তা শেষ হবে। অচিরেই এ হাদীসের সনদসহ বিস্তারিত বিবরণ মুহতাদী বিল্লাহ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

খতীব আম্মার বিন ইয়াসার (রা.)-এর আরেকখানা হাদীস সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আবু নুয়াঈম হুলীয়া গ্রন্থে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, আব্বাসের বংশোদ্ভূত বাদশাহগণ আমার উম্মতের আমীর হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বীনকে জয়যুক্ত করবেন। (সনদ দুর্বল)

আবু নুয়াঈম দালায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উম্মুল ফজল আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে। ভূমিষ্ট হলে তাকে নিয়ে আমার কাছে এস। জন্মগ্রহণ করলে আমি নবজাতককে নিয়ে তাঁর পবিত্র খেদমতে হাযির হলাম। তিনি সেই পুত্রের ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিলেন। নিজের লালা মোবারক নবজাতকের মুখে দিলেন এবং নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। অতঃপর বললেন, খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি সমস্ত ঘটনা হযরত আব্বাসের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি নবী (সা.)-এর দরবারে এসে কারণ জিজ্ঞেস করলেন, হযরত নবী করীম (সা.) বললেন, আমি সত্যই বলেছি। সে খলীফাগণের পিতা। তার বংশ থেকে সাফফাহ এবং মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। হযরত ঈসা বিন মারইয়াম (আ.)-এর সাথে যিনি নামায আদায় করবেন।

দায়লিমা মুসনাদুল ফেরদৌস গ্রন্থে আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর একখানা মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অচিরেই বনূ আব্বাসিয়ার হাতে পতাকা

আসবে। যতক্ষণ তারা সত্যের চর্চা করবে তাদের হাত থেকে পতাকা যাবে না। দারে কুতনী ইফরাদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সনদসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। নবী করীম (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সম্প্রদায় ইরাকে থাকবে, কালো কাপড় পরবে এবং খোরাসানবাসী তাদের সাহায্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছেই ক্ষমতা থাকবে। এমতাবস্থায় ঈসা (আ.)-কে তাদের প্রদান করা হবে। এ হাদীস দুর্বল। তবে ইবনে জাওযী মাওযুআতের মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী কাবীরে উম্মে সালমা (রা.)-এর মারফু হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। নবী আকরাম (সা.) বলেন, আমার চাচার ছেলে এবং আমার বাবার পিতামহদের সন্তানদের মধ্যেই খিলাফত থাকবে।

আকেলী কিতাবুয যুআফায় সনদসহ আবু বকর (রা.)-এর মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বনূ উমাইয়ার এক দিনের পরিবর্তে বনূ আব্বাস দু'দিন এবং এক মাসের পরিবর্তে দু'মাস রাজত্ব করবে।

ইবনে জাওযী মাওযুআতে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন। কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে খারাপ, তাকে মুহতাম বলা হয়। বস্তুত খারাপ লোক মিথ্যা অথবা বর্ণিত হাদীসে মুহতাম নাও হতে পারে। ইবনে আদী এই বর্ণনাকারীকে দুর্বলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি এও বলেছেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই এবং হাদীসের অর্থ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা বনূ আব্বাসিয়ার যুগে শুধু স্পেন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ছিল। তাদের শাসনামল ১৩০ হিজরী থেকে ২৯০ হিজরী। এরই মধ্যে মুকতাদার খিলাফতের তখতে আরোহন করেন। তাঁর প্রশাসনিক পদ্ধতিতে ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে, পাশ্চাত্যের ভূখণ্ডগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তারপর মুসলিম সাম্রাজ্যে দারুণ অরাজকতা, আত্মকলহ এবং মতানৈক্য দেখা দেয়, যার বিবরণ সামনে পেশ করা হবে। এ হিসাব মোতাবেক বনূ আব্বাসিয়ার শাসনামল ছিল ১৬০ বছর। আর বনূ উমাইয়ার ২০ বছর। তন্মধ্যে ইবনে যুবায়েরের খিলাফতকাল নয় বছর বাদ দিলে তিরাশি বছর হলো। উমাইয়াদের যুগ, যা আব্বাসীয়দের শাসনকালের অর্ধেক সময়।

যুবায়ের বিন বাকার মুআফিকাত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত নকল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) মুআবিয়া (রা.)-কে বললেন, আপনারা যদি একদিন রাষ্ট্র চালান, তবে আমরা দু'দিন, আপনারা এক মাস চালালে আমরা দু'মাস, আপনারা এক বছর চালালে আমরা দু'বছর রাষ্ট্র চালাব।

যুবায়ের মুআফিকাতে লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কালো পতাকা

আমাদের পাশ্চাত্য থেকে শুরু হবে। তারীখে দামেশ্‌ক গ্রন্থে ইবনে আসাকির লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) তিনবার হযরত আব্বাসের জন্য এ দা'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আব্বাস এবং তাঁর সন্তানদের সাহায্য করো। অতঃপর হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বলেন, চাচা! আপনি জানেন না, আপনার বংশধরদের মধ্যে মাহদী মুওয়াফ্‌ফাক অত্যন্ত ভালো মানুষ হবেন।

ইবনে সাদ তবকাত গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত লিখেছেন, একদিন হযরত আব্বাস আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরকে একত্রিত করেন। তিনি আলী (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এজন্য তিনি তাকে বলেন, আমি তোমার সাথে একটি পরামর্শ করতে চাই, তবে প্রথমে তোমার পরামর্শ ছাড়া চূড়ান্ত ফয়সালা নিতে চাই না। তুমি নবী আকরাম (সা.)-এর খেদমতে গিয়ে আরয করো, যদি খিলাফত আমাদের জন্য না হয়, তবে আমরা আজ থেকেই তাকে কোনো পাত্তা দিব না। হযরত আলী (রা.) বললেন, হে চাচা! নিশ্চয় খিলাফত আপনার জন্যই, কারো শক্তি নেই আপনার থেকে তা কেড়ে নিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাইলামী মুসনাদুল ফেরদৌস গ্রন্থে লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বাদশাহীর জন্য যে জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি সে জাতির কপালে হস্ত সঞ্চালন করে দিয়েছেন। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মাইসারা তিনি পরিত্যক্ত। দাইলামী এই হাদীসটি তিন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। হাকেম মুসতাদরাকে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর চাদর যা সর্বশেষ খলীফা পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়েছে

সলফী তুওরিয়াতে লিখেছেন, কা'ব বিন যুবাইর (রা.) স্বরচিত কবিতা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে আবৃত্তি করলে তিনি পরনের চাদরখানা কা'বের প্রতি এ মর্মে পত্র লিখেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাদরটি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা দেননি। কা'বের মৃত্যুর পর হযরত মুআবিয়া তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে বিশ হাজার দিরহামে চাদরটি কিনে নেন। অতঃপর সে চাদরটি বনূ আব্বাসিয়ার খলীফাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

সলফী ছাড়াও অন্য লোকেরা এমনই বলেছে।

যাহাবী স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে এও লিখেছেন, খলীফাদের চাদরটি হযরত

মুআবিয়ার খরিদকৃত চাদর নয়; বরং সেটি ঐ চাদর যা রসূলুল্লাহ (সা.) তাবুক যুদ্ধে শান্তির প্রতীকস্বরূপ নিজের পত্রসহ আয়লাবাসীর প্রতি প্রেরণ করেন। অতঃপর সাফফাহ তিন'শ দিনারে চাদরখানা কিনে নেন। আমার মতে, হযরত মুআবিয়া যে চাদর ক্রয় করেছিলেন তা আব্বাসীয় যুগে চুরি হয়ে যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) যুহ্দ গ্রন্থে লিখেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) যে চাদর পরে প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করতেন তা মোতি-মুক্তা খচিত ছিল। চার হাত লম্বা, দু'হাত প্রস্থ এ চাদরটি খলীফাদের নিকট ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরিত হয়। চাদরটি অত্যধিক পুরাতন হওয়ায় তা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। খলীফাগণ দুই ঈদে চাদরটি পরতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে চাদরটি এক খলীফা থেকে অপর খলীফার হাতে চলে যেতো। বড় বড় অনুষ্ঠানে তাঁরা চাদরখানা বরকতের জন্য পরতেন।

কথিত আছে, যখন মুকতাদার ফিত্নায় আক্রান্ত হয়ে নিহত হন তখন এ চাদরটি তিনি পরে ছিলেন। তাঁর রক্তে চাদরটি অপবিত্র হয় এবং সেখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

কতিপয় ফাওয়ায়েদ ঃ

বর্ণিত আছে যে, আব্বাসীয় বংশের খলীফাগণের মধ্যে একজন শুরু করেছেন, একজন মধ্যবর্তীতে রয়েছেন এবং একজন শেষ করেছেন। মনসুর প্রবর্তনকারী, মামুন মধ্যবর্তীতে অবস্থানকারী এবং মুতাদার সর্বকনিষ্ঠ। আব্বাসীয় বংশের খলীফাদের মধ্যে সাফ্ফাহ, মাহদী এবং আমীন ছাড়া বাকী সকলেই দাসীর গর্ভজাত সন্তান। হযরত আলী বিন আবু তালিব, হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব এবং আমীন বিন রশীদ ছাড়া হাশেমী বংশীয় খলীফা হাশেমী মায়ের গর্ভজাত নন। এ রেওয়ায়েতটি সুলী বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব এবং আলী আল মুকতাফী ছাড়া কোন খলীফার নাম আলী ছিল না। আমি বলছি, অধিকাংশ খলীফার নাম একক, নকল অনেক কম। আব্দুল্লাহ, আহমদ, মুহাম্মদ এই নামগুলো অনেকের ছিল।

বাগদাদের সর্বশেষ খলীফা মুতাসিম পর্যন্ত সকলেই পৃথক উপাধি ধারণ করেছিলেন। মিসরে খলীফাগণ পূর্বের খলীফাদের উপাধি অনুসরণ করে নিজেদের উপাধি ধারণ করেন। যেমন- মুসতানসির, মুসতাকফী, ওয়াছেক, হাকেম, মুতাদাত, মুতাওয়াক্কিল, মুসতাসিম, মুসতাইন, কায়িম, মুসতানজিদ। এর মধ্য থেকে মুসতাকফী এবং মুসতানসির তিনজনের উপাধি ছিল। বাকীগুলো দু'জনের।

বনূ আব্বাসিয়ার খলীফাগণের মধ্যে কেউ বনূ উবাইদীর খলীফাদের উপাধি

গ্রহণ করেননি। কায়িম, হাকেম, তাহের এবং মুসতানসির ব্যতীত। মাহদী এবং মনসুর আগে থেকেই উবাইদীদের উপাধি ছিল। বনূ আব্বাসিয়ার মধ্যেও সে উপাধি ছিল।

কেউ কেউ বলেন, কাহের উপাধি ধারণকৃত খলীফা বা বাদশাহ সফলকাম হতে পারেন না। আমার মতে মুসতাকফী এবং মুসতাইন উপাধি ধারণকারীর একই অবস্থা। দেখুন আব্বাসীয়দের মধ্যে দু'জন খলীফার উপাধি ছিল অনুরূপ। তাঁদের পতন হয়েছে। তবে মুতাযদ অত্যন্ত সুন্দর উপাধি।

ভাতিজার স্থানে মুকতাদা এবং মুসতানসির ছাড়া আর কেউ বসেননি। মুকতাদা রাশেদের পর এবং মুসতানসির মুতাসিমের পর খলীফা হন। (যাহাবী) একই পিতার তিন পুত্র আমীন, মামুন, মুতাসিম ছাড়া হারুন রশীদের বংশে মুসতানসির, মুতায ছাড়া, মুতাওয়াক্কিলের বংশে রাযী, মুকতাদা এবং মতী ছাড়া মুকতাদার বংশে কেউ খিলাফতের তখতে বসেনি।

আব্দুল মালিকের চার সন্তান খিলাফতের তখতে বসেছেন, যার দৃষ্টান্ত খলীফাদের মধ্যে নেই। তবে এ দৃষ্টান্ত রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বিদ্যমান। আমি বলেছি এ দৃষ্টান্ত খলীফাদের মধ্যে নেই মুতাওয়াক্কিলের পাঁচ সন্তান ছিল। মুসতাইন, মুতাযদ, মুসতাকফী, কায়িম এবং মুসতানজিদ। পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) এবং বকর আল-তায়ী' বিন মতী' ছাড়া কেউ খলীফা হননি। আবু বকর আল-তায়ী'র পিতার প্যারালাইসিস হওয়ায় তিনি ছেলেকে খলীফা মনোনীত করেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যিনি পিতার জীবদ্দশায় খিলাফতের কর্ণধার হয়েছেন তিনি আবু বকর (রা.)। তিনি যুবরাজ নির্ধারিত করেছিলেন, সর্বপ্রথম বাইতুলমাল গঠন করেন এবং কুরআন শরীফকে গ্রন্থকার রূপ দেন।

যিনি সর্বপ্রথম আমিরুল মোমেনিন বলেছেন, চাবুক মারার প্রথা প্রবর্তন করেছেন, হিজরী সনের সূচনা করেছেন, ইতিহাস অধ্যয়নের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিচারালয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি হলেন হযরত উমর ফারুক (রা.)।

হযরত উসমান গনী (রা.) সর্বপ্রথম চারণভূমি নির্ধারণ করেন, জায়গীর দেন, জুমআর প্রথম আযান এবং মুআয্যিনদের ভাতা নির্ধারণ করেন, খুৎবায় কম্পন সৃষ্টি না করা এবং পুলিশ নিয়োগ দেন।

যিনি সর্বপ্রথম নিজের জীবদ্দশায় স্বীয় পুত্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দেন এবং নিজ সেবার জন্য লোক নিয়োগ করেন হযরত মুআবিয়া (রা.)।

যাঁর দরবারে সর্বপ্রথম শত্রুর কর্তিত মস্তক এসেছিল তিনি হযরত যুবায়ের

(রা.)। সর্বপ্রথম মুদ্রায় নিজের নাম অঙ্কন করেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। সবপ্রথম নিজের নাম ঘোষণা করতে নিষেধ করেছিলেন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। বনূ আব্বাসিয়ার খলীফাগণ সর্বপ্রথম নতুন নতুন উপাধি আবিষ্কার করেন।

ইবনে ফাজলুল্লাহ বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, বনূ আব্বাসিয়ার মত বনূ উমাইয়াও উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। আমার মতে কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুআবিয়া (রা.) আন-নাসিরুদ্দীনিল্লাহ, ইয়াযিন আল-মুসতানসিরি, মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ আর-রাজে ইলাল হাক, মারওয়ার আল-মুতামিন বিল্লাহ, আব্দুল মালিক আল-মুওয়াফ্ফিক আমরিল্লাহ, তার ছেলে ওয়ালিদ আল-মুনতাকসিম বিল্লাহ, উমর বিন আব্দুল আযীয আল-মাসুম বিল্লাহ, ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক আল-কাদির বি সুনাআল্লাহ এবং ইয়াযিদ নাকেস আল শাকির বিন আন'আমিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন।

যার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিভিন্ন কথা হয়েছিল তিনি সাফ্ফাহ। যিনি সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ডেকে তাদের কথা মত কাজ করতেন এবং নিজের গোলামদের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং আরবদের চেয়ে তাদের প্রাধান্য দিতেন তিনি মানসুর। মাহদী সর্বপ্রথম ভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য গ্রন্থ রচনা করান।

যিনি সর্বপ্রথম লাগামের মধ্যে অসি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেন তিনি হাদী। যিনি সর্বপ্রথম হকি খেলেছেন তিনি হারুন-অর রশীদ। যে খলীফাকে সর্বপ্রথম উপাধিসহ ডাকা হয় এবং যিনি সর্বপ্রথম উপাধিসহ নিজের নাম লিখেছেন তিনি আমীন। মুতাওয়াক্কিল সর্বপ্রথম অমুসলমান বন্দীদের পোশাক নির্দিষ্ট করেন। মুতাওয়াক্কিলকে সর্বপ্রথম তুর্কীরা শহীদ করে দেয়। এ ঘটনা নবী আকরাম (সা.)-এর একখানা হাদীসের সমর্থক, যা তাবারানী ইবনে মাসউদ থেকে নকল করে বর্ণনা করেছেন। নবী আকরাম (সা.) বলেছেন, তুর্কীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দিবে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা তাদরে অবকাশ দিবে। কারণ সর্বপ্রথম তারাই আমার উম্মতের বাদশাহী এবং খোদার নিয়ামত কেড়ে নিবে।

যিনি সর্বপ্রথম জরির পাড়যুক্ত পোশাক এবং ছোট টুপি ব্যবহার করেছেন তিনি মুসতাইন। মুতায সর্বপ্রথম ঘোড়াকে স্বর্ণের অলংকারাদি পরান। যার উপর সর্বপ্রথম অত্যাচার এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তিনি মুতামাদ। তাঁর সকল খরচ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

যিনি সর্বপ্রথম বিচলিত অবস্থায় খলীফা মনোনীত করেছিলেন, তিনি মুকতাদার।

রাযী হলেন- শেষ খলীফা যাঁকে অর্থ এবং সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তিনি কবিতা আকারে খুৎবা দিতেন। সর্বদা নামাযের ইমামতি করেন, সভাষদের নিজের সামনে বসিয়ে পরামর্শ করেন, খোলাফায়ে রাশেদীনদের চালচলন মেনে চলতেন। মুসতানসির সর্বপ্রথম ব্যবহৃত উপাধি গ্রহণ করেন, যিনি মুসতানসিনের পর খলীফা হন।

আওয়ায়েল আসকারী গ্রন্থে রয়েছে, যিনি সর্বপ্রথম মায়ের জীবদ্দশায় খলীফা তিনি হলেন হযরত উসমান গনী (রা.)। অতঃপর হাদী, রশীদ, আমীন, মুতাওয়াক্কিল, মুসতানসির, মুসতাইন, মুতায, মুতাযদ এবং মতী'। আবু বকর (রা.) এবং আল তায়ী ব্যতীত কেউ পিতার জীবদ্দশায় খিলাফতের তখতে আরোহন করেননি।

সুলী বলেন, আব্দুল মালিকের দুই পুত্র ওয়ালিদ এবং সুলাইমানের জননী ইয়াযিদ নাকেয এবং ইব্রাহীমের জননী শাহীন এবং হাদী এবং রশীদের জননী খিযরান ব্যতীত কোন নারী দু'জন খলীফা প্রসব করেন নি। তবে আমার মতে এক্ষেত্রে আব্বাস ও হামযার জননী এবং দাউদ এবং সুলাইমানের জননীকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দাউদ এবং সুলাইমান মুতাওয়াক্কিলের শেষ দু'সন্তান।

ফায়দা-১ ঃ বনূ উবাইদের চৌদ্দজন খলীফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন মাহদী, কায়িম, মনসুর, মুআয, আযীয, হাকিম, তাহের, মুসতানসির, মুসতালা, আমর, হাফিয, জাফর, কায়েম, আসেদ মিসর। তাঁদের বাদশাহীর সূচনা ২৯০ হিজরীতে এবং পতন ৫৬৭ হিজরীতে।

ফায়দা-২ ঃ যাহাবী বলেন, তাদের রাজত্ব অগ্নি উপাসক এবং ইহুদীদের রাজত্বের অনুরূপ ছিল। সুতরাং তাদের রাজত্বকে খিলাফত বলা যেতে পারে না।

ফায়দা-৩ ঃ পাশ্চাত্যে বনূ উমাইয়ার মধ্য থেকে যাঁরা খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা উবাইদীদের তুলনায় শরীয়ত, সুন্নত, ইনসাফ, দয়া, জ্ঞান, জিহাদ প্রভৃতি থেকে উত্তম। তাঁরা সংখ্যায় বেশি ছিল এবং স্পেনে একই সময়ে পাঁচজন খলীফা দাবী করেন।

অনেক প্রবীণ ওলামায়ে কেরাম খলীফাদের ইতিহাস লিখেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে লাফজুয়া নাহবী দু'খন্ডে একখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি কাহেরের যুগ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। সুলী শুধু বনূ আব্বাসিয়ার ইতিহাস সম্বলিত একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। এটি আমি দেখেছি। তিনিও কাহেরের যুগ পর্যন্ত লিখেছেন। ইবনে জাওযী শুধু আব্বাসীয়দের ইতিহাস লিখেছেন। এতে নাসিরের যুগের ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। এ বইটিও আমি

অধ্যয়ন করেছি। আবুল ফজল আহমদ বিন আবু তাহের আল মুরুযী ২৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি বড় মাপের কবি এবং সুলেখক ছিলেন। তিনিও আব্বাসীয়দের ইতিহাসনির্ভর একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এতে বনূ আব্বাসিয়ার আমীর আবূ হারুন বিন মুহাম্মদ আল আব্বাসীয়ার যুগ পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে।

ফায়দা-৪ ঃ খতীব লিখেছেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং মামুন ছাড়া কোন খলীফা কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। আমার মতে এটি ভুল; বরং বিশুদ্ধ অভিমত হলো আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। একদল ঐতিহাসিক এ অভিমতের সমর্থক। নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, আলী (রা.) নবী আকরাম (সা.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন হিফজ করেছেন।

ফায়দা-৫ ঃ ইবনুস সায়ী বলেন, খলীফা তাহেরের বাইআত গ্রহণের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাহের সাদা কাপড় পরে ছাতার নীচে উপবেসন করেছিলেন। তিনি নিজের চাদর পরে ছিলেন এবং নবী (সা.)-এর চাদরখানা কাঁধের উপর রেখেছিলেন। মন্ত্রী পরিষদ মিম্বরে এবং সেনাপতিগণ সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকদের থেকে একথা বলে তিনি বাইআত গ্রহণ করাচ্ছিলেন– আমি আপনাদের নেতা ও ইমাম, যার অনুসরণ ও আনুগত্য করা পৃথিবীর সকলের জন্য ফরয। তাঁর পবিত্র নাম শরীফ, সুন্নতে রসূল এবং আমিরুল মোমিনীনের ইজতিহাদের জন্য বাইত করছি। তিনি ছাড়া আর কোন খলীফা নাই।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফা। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন আবী কুহাফা উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব সা'দ বিন তায়ম বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালিব আল কারশী তায়মী। তাঁর বংশ পরম্পরা মুররাহ বিন কাব পর্যন্ত পৌঁছে নবীজী (সা.)-এর সাথে মিলে গেছে।

ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, আবু বকর (রা.)-এর প্রসিদ্ধ নাম ছিল আব্দুল্লাহ। এটা বিশুদ্ধতম অভিমত। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম আতীক। তবে সকল ওলামা এতে একমত নন। তাঁদের মতে এটা তাঁর উপাধি। কারণ ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়েত করেন হাদীস শরীফে রয়েছে, তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আতীক অর্থাৎ, মুক্ত।

কেউ কেউ বলেন, তিনি সৌন্দর্য এবং সুদর্শনের কারণে আতীক উপাধিতে

ভূষিত হন। কারণ আতীক অর্থ সৌন্দর্য ও কান্তিময়। কারো মতে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না বিধায় তাঁকে আতীক বলা হয়।

মুসআব বিন যুবাইর প্রমুখ লিখেছেন, মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁর উপাধি ছিল সিদ্দীক। কারণ তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে হুযূর (সা.)-এর নবুওয়তের সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বিশ্বাসের উপর অটল ছিলেন। তিনি কখনও কোন কাজে এতটুকু পিছপা হননি। ইসলামের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার শীর্ষে। সিদ্দীক উপাধি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মিরাজের ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি কাফিরদের জবাবে নিজের চিন্তা-চেতনার উপর অবিচল ছিলেন এবং নবীজী (সা.)-এর অভিমতকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হিজরত করা, নিজের পরিবারের মায়া ত্যাগ করা, গুহায় এবং গোটা রাস্তায় স্বীয় সর্দারের সেবা প্রদানকে নিজের জন্য কর্তব্য মনে করে নেয়া, বদর যুদ্ধে কথা বলা, হুদায়বিয়ার প্রান্তর থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারায় লোকদের মধ্যে যে সংশয় দেখা দেয় তা দূর করা, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই হাদীস যা শ্রবণে তিনি কেঁদে ছিলেন। হাদীসটি হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া অথবা আখেরাত দুটোর একটি বেছে নেবার অবকাশ দিয়েছেন। হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর পর খুৎবার মাধ্যমে লোকদের শান্ত রাখা, মুসলমানদেরকে যুক্তিসিদ্ধ উপদেশের কারণে খিলাফতের জন্য প্রস্তুত হওয়া, উসামা বিন যায়েদকে সসৈন্যে সিরিয়ায় প্রেরণ এবং এ সিদ্ধান্তে অটল থাকা, দুর্বল মুহূর্তে মুরতাদদের সাথে লড়াই করা এবং এ ব্যাপারে সাহাবাদের সম্মত করানো, সিরিয়া বিজয় করা, সিরিয়া নির্ধারণ করা-এ সবই তাঁর প্রকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনন্য গুণাবলীর কোনো পরিসীমা নাই, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা যেতে পারে (এটা নববীর অভিমত)। তবে আমার ইচ্ছা হলো, আমার যতটুকু জানা আছে- সে অনুযায়ী কয়েকটি অধ্যায়ে তা সবিস্তারে লিখব।

নাম ও উপাধি

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সকল উলামা একমত যে, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বিন উসমান। তবে ইবনে সাদ ইবনে সিরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন,

তাঁর নাম আতীক। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, আতীক উপাধি। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ উপাধি কখন এবং কেন হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সৌন্দর্য এবং সুদর্শনের কারণে তাকে এ উপাধি দেয়া হয়। লায়েছ বিন সাদ, আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

আবু নুয়াঈম লিখেছেন, পুণ্যময় কাজে অগ্রগতি হওয়ার কারণে তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়। কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তাঁর বংশের পূর্বপুরুষদের চরিত্রে কোনো অপবাদ না থাকার কারণে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কারো মতে তাঁর নাম আতীক রাখা হয়েছিল, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ নাম হয়।

তাবারানী কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু বকর (রা.)-এর নাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ। প্রশ্ন করা হলো, লোকেরা তো আতীক বলে। তিনি বললেন, আবু কুহাফার তিন পুত্র আতীক, মুকি এবং মুতাইন।

ইবনে মান্দা এবং ইবনে আসাকির মূসা বিন তালহা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু তালহা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলামা–কেন আবু বকরের নাম আতীক রাখা হলে? তিনি বললেন, তাঁর পিতার কোনো সন্তান জীবিত থাকত না। তাঁর জন্মের সময় তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে কাবা শরীফে গিয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ! এ নবজাতককে মৃত্যু অবধি আতীক (মুক্ত) করে আমাকে দান করো। তাবারানী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, লাবণ্যময় আকৃতির জন্য তাঁর নাম আতীক রাখা হয়। ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, পারিবারিকভাবে তাঁর নাম আব্দুল্লাহ রাখা হয়। তবে তিনি আতীক নামে অধিক প্রসিদ্ধ হয়ে যান। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, নবী (সা.) তাঁর নাম রেখেছিলেন আতীক।

আবু ইয়ালা মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে সাদ (র.) এবং হাকেম (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, একদিন আমি নিজেরঘরে ছিলাম, হুযূর (সা.) সাহাবীদের নিয়ে ঘরের বারান্দায় ছিলেন। আমাদের মধ্যে একটি পর্দার আড়াল ছিল। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে এলেন। হুযূর (সা.) বললেন, যে জাহান্নামের আগুন থেকে চিরমুক্ত ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন হযরত আবু বকরকে দেখে। পারিবারিকভাবে তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ, তবে তিনি আতীক নামে প্রসিদ্ধ হন।

তিরমিযী এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর (রা.) নবী আকরাম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেছেন। সেদিন থেকেই তাঁর নাম আতীক হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সূত্রে বাযযার এবং তাবারানী বর্ণনা করেন, সিদ্দীকে আকবরের নাম আব্দুল্লাহ ছিল। একদা নবী করীম (সা.) বলেন, তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা হয়েছে– সে দিন থেকে তাঁর নাম হয় আতীক। আর সিদ্দীক উপাধি জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই ছিল। কারণ সর্বদা তিনি সত্য বলতেন। এ রেওয়ায়েতটি মুসদীও লিপিবদ্ধ করেছেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নবী (সা.)-এর আনীত সংবাদকে সত্যায়িত করায় তাঁকে সিদ্দীক উপাধি দেয়া হয়। কাতাদা ও ইবনে ইসহাক বলেন, মিরাজের রজনীর পরদিন থেকে হযরত আবু বকর এ উপাধি প্রাপ্ত হন।

হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুশরেকরা হযরত আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি কি কিছু জানেন! আপনার বন্ধু গত রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গিয়েছিল বলে দাবী করেছেন। তিনি বললেন, তিনি কি এভাবেই বলেছেন? মুশরেকরা বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, হুযূর (সা.) সকাল-সন্ধ্যা যদি দূর আসমানের সংবাদ সরবরাহ করেন তবুও আমি তা বিশ্বাস করব। এ কারণে তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ হাদীসটি আনাস (রা.) এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

সাদ বিন মনসুর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন, মিরাজের রাতে ফেরার সময় নবী করীম (সা.) যী তোয়ানামক স্থানে পৌঁছে বলেন, হে জিবরাঈল! আমার সম্প্রদায় আমাকে সত্যায়িত করবে না। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আবু বকর আপনাকে সত্যায়িত করবেন, তিনি সিদ্দীক।

তাবারানী আওতাস এবং হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে উসায়ের হযরত আলীকে বললেন, আবু বকর সেই মহান মনীষী যাঁর নাম আব্দুল্লাহ। হযরত জিব্রাঈল এবং হুযূর (সা.) তাঁর নাম রাখেন সিদ্দীক। তিনি আমাদের নামায পড়ায়েছেন এবং তিনি হলেন রসূল আকরাম (সা.)-এর খলীফা। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মাধ্যমে আমাদের দ্বীনের কাজ করে নিয়েছেন। আর আমরা দুনিয়ার কাজ করে নেবার জন্য তাঁর প্রতি রাযী হয়েছি।

দারা কুতনী এবং হাকেম আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেন, আমি অসংখ্যবার হযরত আলীকে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সা.)-এর মুখ দিয়ে তাঁর নাম সিদ্দীক রেখেছেন।

তাবারানী হাকীম বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলী (রা.) কসম করে বললেন, হযরত আবু বকরের নাম আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে নাযিল করেছেন। হাদীসে উহুদে রয়েছে, উহুদ পাহাড় নড়ে উঠলে বলা হলো, থেমে যাও। কারণ তোমার বক্ষে সিদ্দীক এবং শহীদ রয়েছে।

হযরত সিদ্দীকে আকবরের মা তাঁর পিতার চাচাত বোন। তাঁর নাম সালমা বিনতে সখর বিন আমের বিন কা'ব। তাঁর উপাধি উম্মুল খায়ের। যোহরী বলেন, এ রেওয়ায়েতটি ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন।

জন্মগ্রহণ ও লালন-পালন

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের দু'বছর কয়েক মাস পর আবু বকর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। খলীফা বিন খাইয়াত ইয়াযিদ বিন আসাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) আবু বকরকে জিজ্ঞেস করেন, বড় কে তুমি না আমি? আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, বড় তো আপনি। তবে আমার বয়স বেশি। এ মুরসাল হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। বস্তুত এর উল্টাটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। হযরত আব্বাস (রা.)-এর সমর্থক।

হযরত আবু বকর (রা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া মক্কা থেকে বের হননি। নিজ গোত্রে তাঁকে ধনাঢ্য, ভদ্র, দয়ার্দ্র এবং সম্মানিত মনে করা হতো।

ইবনুদ দাগানা বলেন, তিনি দয়াশীল এবং সত্যবাদী। প্রতিবন্ধীদের সেবা করতেন। বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতেন এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

ইমাম নব্বী লিখেছেন, তিনি জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশ সর্দারদের অন্যতম ছিলেন। কুরাইশরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। তিনিও তাদের লেনদেনের প্রতি সচেতন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সর্বস্ব ইসলামের জন্য উজাড় করে দেন। যুবাইর ইবনে বাকার এবং ইবনে আসাকির লিখেছেন, কুরাইশদের এগারোজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যাঁকে ইসলাম এবং জাহেলিয়াত উভয় যুগে সম্মান করা হতো। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে হত্যা এবং অত্যাচারের বিচার করতেন। কারণ কুরাইশদের

কোনো বাদশাহ ছিল না, সকল কাজের দণ্ড তাঁর হাতেই ছিল। তবে প্রত্যেক গোত্র প্রধানদের এক একটি দায়িত্ব ছিল। বনূ হাশেম হাজীদের পানি পান এবং খানা খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করত। অর্থাৎ, তারা ব্যতীত হাজীদের কেউ খানাপিনা সরবরাহ করত না। যদি কেউ দিত তবে বনূ হাশেমদের গুলোই সরবরাহ করত। বনূ আব্দুদ্দার পতাকা বহন এবং মজলিসে শূরার দায়িত্ব পালন করত। অর্থাৎ, তাদের অনুমতি ছাড়া বাইতুল্লাহ শরীফে কেউ যেতে পারত না। যুদ্ধের ময়দানে তারা পতাকা বহন করত। মজলিসে শূরা কাবার দারুন নদওয়াতে বসত এবং কাবা তাদের অধীনে ছিল।

জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর সংযম

ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জাহেলিয়াত এবং ইসলাম কোনো যুগেই কবিতা আবৃত্তি করেননি। তিনি এবং উসমান (রা.) জাহেলিয়াতের যুগে মদ বর্জন করেছিলেন।

আবু নুয়াঈম হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মদ পান নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ইবনে আসাকির আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কখনও কবিতা আবৃত্তি করেন নি। ইবনে আসাকির বলেন, সাহাবীদের কে মজিলসে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কখনও ভুলে মদ পান করেছেন? তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, কখনও না। অতঃপর তিনি আবার বললেন, মদ পান করার কারণে মর্যাদা বিনষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) এ সংবাদ অবগতির পর দু'বার বললেন, আবু বকর সত্যই বলেছেন। এ হাদীসটি সনদ এবং পাঠকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গরীব।

তাঁর আকৃতি

ইবনে সাদ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর চেহারার রং উজ্জ্বল ছিল। তাঁর অবয়বে রগ দেখা যেত। দৃষ্টি সর্বদা নীচে থাকতো। কপাল বুলন্দ ছিল। আঙ্গুলের জোড়াগুলো ফাঁকা ছিল। তিনি মেহেদী ব্যবহার করতেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক ছাড়া সাদা কালো মিশ্রিত কারো দাড়ি ছিল না। এজন্য তিনি মেহেদী এবং কাসাম (লাল বর্ণের ফুলবিশেষ) দ্বারা চুলে কলব করতেন।

ইসলাম গ্রহণের বিবরণ

তিরমিযী এবং ইবনে হাব্বান আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, খিলাফত সম্বন্ধে বাক বিতণ্ডার সময় হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, খিলাফতের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার নই কি? আমি কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিনি? হযরত আলী বলেন, সর্বপ্রথম আবু বকর সিদ্দীক ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত।

যায়েদ বিন আরকাম বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামায পড়েছেন। ইবনে সাদ বলেন, আবু বকর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। শা'বী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বপ্রথম কে মুসলমান হয়েছে? তিনি বললেন, আবু বকর এবং তুমি কি হাস্‌সানের কবিতা শোননি? (কবিতার অর্থ) তুমি যখন কোন ভালো মানুষের অবদান স্মরণ করবে তখন আবু বকরের অবদান স্মরণ করো। তিনি জগত বিখ্যাত পরহেযগার, ন্যায় পরায়ণ এবং সংযমী। নিজ প্রচেষ্টায় লোকদের পবিত্র করেছেন। তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। হেরা গুহায় স্বীয় নেতার সেবাকারী। তিনি সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সত্যায়িত করেছিলেন। তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত।

ফুরাত বিন সায়েব মাইমুন বিন মিহরানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট হযরত আলী না হযরত আবু বকর কে বেশি উত্তম? এ কথা শুনে মাইমুন ক্রধান্বিত হয়ে পড়লেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, এ মুহূর্তে জীবিত আছি কিনা। কারণ এটাতো উভয়কে পরীক্ষা করার সময়। দু'জনই মহান এবং ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। অতঃপর প্রশ্ন করা হলো, কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, হযরত আবু বকর না হযরত আলী? তিনি বললেন, হযরত আবু বকর (রা.) বুহাইরা পাদ্রীর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হযরত খাদিজার বিয়ের ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন, সে সময় হযরত আলীর জন্মই হয়নি। (আবু নুয়াঈম)

অনেক সাহাবা এবং তাবেঈনের অভিমত হচ্ছে, হযরত আবু বকর সকল সাহাবার পূর্বে ঈমান এনেছেন। কেউ কউে বলেন, হযরত খাদিজা সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন। উভয় অভিমতকে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে আবু বকর, তরুণদের মধ্যে আলী, নারীদের মধ্যে খাদীজা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সুন্দর সমন্বয়টি সাধন করেছেন

ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)।

সালেম বিন জা'দ মুহাম্মদ বিন হানাফী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন? তিনি বললেন, না। প্রশ্ন করা হলো, তবে কেন তিনি এত প্রসিদ্ধতা লাভ করলেন? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল মুসলমান থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। এটি ইবনে আবী শাইবা (র.) কর্তৃক বর্ণিত।

মুহাম্মদ বিন সাদ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর প্রথম ঈমান এনেছেন? তিনি বললেন, না। তবে তাঁর ঈমান আমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ছিল। তাঁর পূর্বে পাঁচ জনেরও বেশি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটি ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত।

ইবনে কাসির (র.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, আহলে বাইত। অর্থাৎ, উম্মুল মোমিনীন খাদীজাতুল কুবরা, তাঁর গোলাম যায়েদ, যায়েদের স্ত্রী উম্মে আইমান, হযরত আলী এবং হযরত ওয়ারাকা।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, একবার আল্লাহর ঘরের নিকটে যায়েদ বিন আমরকে নিয়ে বসেছিলাম। ইত্যবসরে উমাইয়া বিন আবী সালাতের আগমন ঘটল। কুশলদী বিনিময়ের পর বললেন, তোমরা কিছু শুনেছ? যায়েদ বললেন, না তো। তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন, কবিতার সারাংশ এরূপ আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত সকল ধর্মই বিলুপ্ত হবে। অতঃপর উমাইয়া বললেন, আমরা যে নবীর অপেক্ষা করছি তিনি আমাদের মধ্য থেকে হবেন না তোমাদের মধ্য থেকে? আমি ইতোপূর্বে নবী সম্পর্কে কখনই শুনেনি। এজন্য আমি ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট গমন করলাম। তিনি আসমানী গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। তাঁর মুখ থেকে এমন জ্ঞান সুলভ কথা বের হত যা সহজে বুঝে আসত না। আমি তার কাছে বসলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি অধিকাংশ ঐশী গ্রন্থ অধ্যয়নে জেনেছি যে, সম্মানিত নবী আরবের অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি তো আরবের কুলীন বংশোদ্ভূত। সুতরাং তোমাদের বংশেই তাঁর শুভাগমন ঘটবে। আমি বললাম, তিনি কি শিক্ষা দিবেন? ওয়ারকা বললেন, তিনি অত্যাচার করতে নিষেধ করবেন। অতএব যে সময় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব হয় সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে সত্যায়ন করি। এটি ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত।

মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি যখন

ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সকলের অন্তরে কিছু না কিছু সন্দেহ এসেছে। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীককে যখন আমি ইসলামের প্রতি আহবান করলাম তখন তিনি যে কোনো চিন্তা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাইহাকী বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবুওয়তের প্রমাণপঞ্জি ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পূর্বেই অনুধাবন করেছিলেন এবং তা শোনামাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ তিনি আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। চিরসত্য হলো, প্রত্যেকেই হুযূর (সা.) থেকে পলায়ন করেছিলেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক জাহেলিয়াতের যুগেই সিদ্দীক ছিলেন, যেমন ইসলামের যুগে ছিলেন।

রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি যাকেই মুসলমান হওয়ার জন্য বলেছি, সে-ই আমার কথাকে পুনারাবৃত্তি করেছে এবং দলীল চেয়েছে। কিন্তু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) কে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারী (র.) আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি আমার বন্ধুকে ত্যাগ করবে? তিনি সেই ব্যক্তি যখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। তখন তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, সে সময় আবু বকর আমাকে সত্যায়ন করেছে।

রসূলের (সা.) সাহচর্য ও যুদ্ধসমূহ

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঈমান গ্রহণ থেকে মৃত্যু অবধি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য ত্যাগ করেননি। তবে হজ্জ এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে তিনি হুযূর (সা.)-এর অনুমতিক্রমে সহাচর্য থেকে পৃথক হয়েছেন। তিনি সকল যুদ্ধে নবী (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তোষ প্রাপ্তির জন্য নবী (সা.)-এর সাথে হিজরত করেছেন, পরিবার পরিজন ছেড়ে গারে সওরে থেকেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا - ওলামায়ে কেরাম বলেন, রণাঙ্গনে তিনি রসূলের (সা.)-কে ত্যাগ করে বিশেষত উহুদ এবং হুনায়নের যুদ্ধে যখন সকলেই রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ত্যাগ করে পালিয়েছিলেন, এ সময়ও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা পরস্পরে বলাবলি করছিল যে, ঐ দেখ হযরত আবু বকর ছাউনির নিচে নবী (সা.)-এর সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। (ইবনে আসাকির)

আবু ইয়ালা, হাকেম ও আহমদ (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ও আবু বকর (রা.) কে বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের সাহায্য হযরত জিবরাঈল (আ.) আপরজনের সাহায্য হযরত মীকাঈল (আ.) করতেছেন।

ইবনে আসকির বলেন, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) মুশরিকদের সাথে বদর যুদ্ধে গিয়েছিল। মুসলমান হওয়ার পর আব্দুর রহমান তাঁর পিতাকে বলেন, বদর যুদ্ধে কয়েকবার আপনি আমার তীরের আওতায় পড়েছিলেন। কিন্তু আমি নিজের হাতকে গুটিয়ে নিয়েছি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, যদি তুমি আমার নিশানার মধ্যে এসে যেতে তবে আমি কখনই ছাড়তাম না।

বীরত্ব

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সকল সাহাবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোক সকল! আমাকে বল কোন্ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর? লোকেরা বলল, আপনি। তিনি বললেন, আমি সর্বদা নিজের শক্তি দিয়ে লড়াই করেছি, এটা কোনো বীরত্ব নয়। তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের কথা বল। লোকেরা বলল, আমাদের জানা নেই। হযরত আলী (রা.) বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হলেন হযরত আবু বকর (রা.) বদর যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য ছাউনী তৈরি করেছিলাম। আমরা পরামর্শ করলাম সেখানে হুযূর (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য কে থাকবে। আল্লাহর কসম, আমাদের কারো সাহস হয়নি। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাউকে সেখানে ভিড়তে দেননি। যদি কেউ তাঁর প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তো তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

হযরত আলী (রা.) বলেন, একদা মক্কার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সা.) কে টানা হেঁচড়া করছিল, আর বলছিল, তুমিই এক খোদা দাবী করেছ। আল্লাহর কসম! কারো সাহস ছিল না যে, এ অবস্থায় সে মুশরিকদের মোকাবিলা করবে। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক মুশরিকদের মেরে ছত্রভঙ্গ করেন এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে টেনে

হেঁচড়ে নিয়ে যান এবং বলতে থাকেন। আফসোস, শত আফসোস, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিলে যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয়। এ পর্যন্ত বলে হযরত আলী (রা.) চাদর উঠিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, বল ফেরাউনের যুগের মুমিন শ্রেষ্ঠ না আবু বকর? লোকদের নীরব থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন, তোমরা কেন উত্তর দিলে না? আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকরের এক মুহূর্ত তাদের হাজার ঘণ্টা অপেক্ষা উত্তম। কেননা তারা নিজেদের ঈমান গোপন করে রেখেছিল, আর হযরত আবু বকর (রা.) নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন। (বায্যার)

উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমার বিন আসকে জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট কিভাবে দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, আমি দেখলাম উকবা নবী (সা.)-কে নামাযরত অবস্থায় পেছন থেকে এসে গলায় চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। ইত্যবসরে আবু বকর (রা.) সেখানে এসে উকবাকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর আওয়াজ তুলেছেন। বস্তুত তিনি আল্লাহর নিকট থেকে দলীলসহ প্রেরিত হয়েছেন। (বুখারী)

ইবনে তালীব বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে সকলেই রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। সে সংকটময় পরিস্থিতিতে যিনি হুযূর (সা.)-কে হেফাজত করার জন্য এগিয়ে আসেন, তিনি হলেন হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি (আয়েশা) বলেন, আটত্রিশ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত আবু বকর (রা.) নবীজীর নিকট আরয করলেন, আপনি ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণা দিন। তিনি বললেন, আমাদের দল এখনও যথেষ্ট ছোট। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বারবার একই কথা বলতে থাকেন। অবশেষে নবী (সা.) সত্য ধর্মের প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। ফলে লোকেরা মসজিদের চতুর্দিকে গোত্র গোত্র ভাবে এলোমেলো হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে খুতবা দেন এবং লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। মুশরিকরা তাঁকে আক্রমণ করে বসে এবং এজন্য লোকদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। (ইবনে আসাকির)

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই তিনি ইসলামকে প্রকাশ করে দিয়েছেন

এবং লোকদের আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসূলের প্রতি আহ্বান করেছেন।

দানশীলতা

সকল সাহাবার মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি দানশীল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى-

ওলামায়ে কেরাম একমত এ আয়াত তাঁর শানে নাযিল হয়েছে। (ইবনে জাওযী)

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আবু বকরের সম্পদ আমার যতটুকু উপকার করেছে আর কারো সম্পদ ততটুকু করেনি। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এবং আমার সকল সম্পদ আপনার। এটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশার অপর হাদীসটি এমনই। তবে সে হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) নিজের সম্পদের মত নিজ সম্পদ মনে করে হযরত আবু বকরের সম্পদ খরচ করেছেন। (খতীব)

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকরের নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম অথবা দিনার ছিল। তিনি এগুলো সম্পূর্ণ হুযূর (সা.)-এর জন্য ব্যয় করেছেন। (ইবনে আসাকির)

ইবনে উমর (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকরের নিকট চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল। আর হিজরতের সময় পাঁচ হাজারের বেশি ছিল না। বাকী অর্থ তিনি ইসলামের সাহায্য এবং মুসলমান গোলাম কিনে আযাদ করার পেছনে ব্যয় করেছেন। (ইবনে সাঈদ)

ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর এ রকম সাতজন গোলামকে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন যাদের মালিক তাদের উপর অত্যাচার করত। ইবনে উমর বলেন, একদা আমি হযরত (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) জুব্বা পরে, যে জুব্বায় বোতামের পরিবর্তে কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছিল? তিনি দরবারে এলেন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর সিদ্দীক কাঁটা জড়ানো জুব্বা পরে এসেছেন, আজ এ ব্যতিক্রম কেন? হুযুর (সা.) বললেন,

হে জিবরাঈল! মক্কা বিজয়ের পূর্বে আমার জন্য তার সকল সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হে আবু বকর, আমার জন্য যে দারিদ্রতা গ্রহণ করেছ, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এটি ইবনে আসাকির প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এ ধরনের দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহ অনেক রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কাঁটাযুক্ত জুব্বা পরে নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে জিবরাঈল! এটা কেমন রীতি? তিনি বললেন, আল্লাহ ফেরেশতাদের আবু বকরের অনুরূপ পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছেন। এ রেওয়ায়েতটিও অত্যন্ত দুর্বল, যদিও তা অনেক লোক বর্ণনা করেছেন। তবে এ ধরনের রেওয়ায়েতকে পরিহার করে চলাই উত্তম। এটি খতীব বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূলকে বলতে শুনলাম, আমি কিছু মাল গ্রহণ করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, এতদশ্রবণে আমি পূর্ণ অভিপ্রায় গ্রহণ করলাম যে, আবু বকরের চেয়ে আমি এবার বেশি সদকা করব। এ জন্য আমার ধন সম্পদের অর্ধেকাংশ নিয়ে হাযির হলাম। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পারিবারের জন্য কতটুকু রেখে এসেছ? আরয করলাম, যতটুকু এনেছি। ইত্যবসরে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাযির হন। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, নিজ পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই যথেষ্ট। তখন আমি বুঝলাম আমি তাঁর সমকক্ষ নই। আবু দাউদ এবং তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।

হাসান বসরী (র.) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রা.) সদকার মাল নিয়ে এসে তার পরিমাণ গোপন রেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো আমার সদকা। আল্লাহর কসম, আপনার প্রতিপালক আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আর হযরত উমর সদকার মাল এনে তার পরিমাণ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, আপনার রবের সাহায্যই যথেষ্ট। নবী করীম (সা.) বললেন, তোমাদের দু'জনের সদকার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, যতটুকু পার্থক্য উভয়ের কথার মধ্যে। আবু নুয়াঈম এটি বর্ণনা করেন, এর সনদ সুন্দর।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উপর কারো

অনুগ্রহ নেই, সকলের উপকারের প্রতিদান দিয়েছি। কিন্তু আবু বকরের দয়ার প্রতিদান এখনও বাকী রয়ে গেছে। তাঁর অনুগ্রহ এতই বিশাল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদান দিবেন। কোনো সম্পদ আমাকে ততটুকু লাভবান করতে পারেনি, যতটুকু আবু বকরের সম্পদ করেছে। (তিরমিযী)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, একদা আমার পিতাকে নিয়ে হযরত নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি বৃদ্ধকে কষ্ট দিয়ে কেন নিয়ে এলে, আমিই যেতাম। আমি বললাম, আপনাকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে তার আগমনই শ্রেয়। তিনি বললেন, আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহ তাতে তোমার পিতাকে কষ্ট দেয়া আমার জন্য সহনযোগ্য নয়। (বায্যার)

ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি আবু বকরের চেয়ে বেশি অনুগ্রহ কারো নেই। তিনি নিজের জীবন দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং নিজের মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

ইলম (জ্ঞান)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম (জ্ঞানী) এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম হযরত আবু বকরের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের উপর ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.)-এর একখানা হাদীসের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, কেউ যদি নামায এবং রোযার মধ্যে সামান্যতমও তারতম্য করে তবে আমি তার সাথে লড়াই করব। তারা আমাকে দুর্বল ভেবেছে। নবী (সা.)-এর যুগে তারা যতটুকু যাকাত আদায় করেছে, যদি তারা এর চেয়ে তিল পরিমাণ কম করে আমি তাদের মোকাবিলা করব।

শায়খ আবু ইসহাক এ হাদীস দ্বারা দলিল দেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড় আলেম। কারণ সাহাবায়ে কেরাম যখন এ মাসয়ালা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন তখন মাসয়ালাটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেদমতে এ মর্মে প্রেরণ করা হয় যে, আপনার অভিমতটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে পরিশুদ্ধ হিসেবে সাহাবাগণ গ্রহণ করবেন। ইবনে উমরকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর এর যুগে কে ফতোয়া দিতেন? তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-এর চেয়ে বড় আলেম আর কেউ ছিলেন না। আবু সাঈদ খুদরী

(রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (সা.) খুতবার মধ্যে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক নেককার বান্দাকে দুনিয়া অথবা আখেরাত উভয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন। আর সেই বান্দা আখেরাতকে পছন্দ করেছেন। এতদশ্রবণে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার পিতা মাতা তাঁর প্রতি কুরবান হোক। আমরা তাঁর কান্নায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লাম। কারণ নবী করীম (সা.) দৃশ্যত জনৈক ব্যক্তির কথা বলেছেন। আর সেই জনৈক ব্যক্তিটি যে তিনি স্বয়ং নবী (সা.) তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। কিন্তু আবু বকরের জ্ঞান ভাণ্ডারে তা ধরা পড়েছে। এ কারণে তিনি সবচেয়ে বড় আলেম ও জ্ঞানী। (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সা.) বলেন, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে আবু বকরের সম্পদ এবং সাহচর্য আমার উপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছে। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে বধূ হিসেবে গ্রহণ করি, তবে তিনি আবু বকর। ইসলামের প্রতি তাঁর সত্যিকার ভালোবাসার কথা সর্বদা আমার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। (নব্বী)

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ নবী করীম (সা.) তাঁকে নামাযের জন্য সাহাবীদের ইমাম বানিয়েছিলেন। আর হুযূর (সা.) নিজেই বলেছেন, জাতির ইমাম সেই হবে যার জ্ঞান ভাণ্ডার কুরআনের জ্ঞানে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। অধিকন্তু তিনি আরো বলেন, যে সম্প্রদায়ে আবু বকর রয়েছে সেখানে তিনি ছাড়া কেউ ইমাম হতে পারবে না। এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেন।

এরূপভাবে হাদীসের উপরও তাঁর বিরাট দখল ছিল। সাহাবাগণ হাদীস সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী থাকতেন। সবসময় নবী করীম (সা.)-এর হাদীস তাঁর সামনে পেশ করা হতো। কারণ তিনি রসূলের হাদীসের ভাণ্ডার স্মরণ রাখতেন এবং জরুরী মুহূর্তে বিষয়াদি তাঁর সমীপেই উপস্থাপন করা হতো। তিনি সর্বাধিক হাদীসের হাফেজ ছিলেন। কারণ রিসালাতের উষালগ্ন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি সবসময় সল্লাল্লাহ (সা.)-এর সাথে থাকতেন। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ছিলেন জ্ঞানবান এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে অত্যন্ত কম সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে– এ কথাটি বেদনাদায়ক এবং তা বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কম হাদীস বর্ণনা করার কারণ

নবীজীর মৃত্যুর পর তিনি খুব সামান্য ক'দিন বেঁচেছেন। যদি লম্বা সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতেন তবে তাঁর বর্ণনা সকল সাহাবার চেয়ে বেশি হতো এবং আবু বকরের সনদ ছাড়া কোনো হাদীস পাওয়া যেত না। হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আবু বকরের জন্য অন্য সাহাবীর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন হতো না। এ জন্য যে, তিনি সর্বদা রসূলের সাথে থাকতেন এবং হাদীস শুনতেন। সুতরাং তিনি নিজেই রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, হযরত আবু বকর (রা.) অন্য সাহাবীর থেকে কিছু হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, এটা কেন? তিনি নিজে যা শোনেননি তা শুনে নিয়ে বর্ণনা করেছেন।

মাইমুন বিন মেহরান (র.) বলেন, হযরত আবু বকরের নিকট কোনো বিচার আসলে এ সংক্রান্ত মাসয়ালা কুরআন শরীফে অনুসন্ধান করতেন এবং কুরআন শরীফের নির্দেশিত পথে ফায়সালা করতেন। যদি কুরআন শরীফে সমাধান না পেতেন, তবে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। যদি এ সংক্রান্ত কোনো হাদীস তাঁর স্মরণ না থাকত তবে বাইরে এসে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, আমার কাছে এ ধরনের বিচার এসেছে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি জান এ ধরনের বিচারের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সা.) কি সমাধান দিয়েছেন? তাঁর নিকট সকল সাহাবী একত্রিত হতেন এবং যদি কেউ এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন তবে এ অনুযায়ী তিনি ফায়সালা করতেন এবং খুশি হয়ে আল্লাহর শুকর আদায় করতেন আলহামদুল্লিাহ! আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি নবী করীম (সা.)-এর হাদীসকে স্মরণ রেখেছেন। যদি হাদীসেও সমাধান পাওয়া না যেত তবে তিনি বড় বড় সাহাবীদের একত্রিত করে পরামর্শ করতেন, অধিকাংশ অভিমতের উপর তিনি ফায়সালা দিতেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) ও তাই করতেন।

আবু বকর (রা.) আরবের সাধারণ এবং কুরাইশদের বিশেষ বংশ পরম্পরা সম্পর্কে দারুণভাবে জানতেন। আরব এবং কুরাইশ বংশ পরম্পরা বিশেষজ্ঞ জুবায়ের বিন মুতঈম (র.) বলেন, আমি বংশ পরম্পরার জ্ঞান আবু বকরের কাছ থেকেই নিয়েছি। তিনি আরবের এক বিশিষ্ট বংশ পরম্পরা বর্ণনাকারী। তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যাজ্ঞান ছিল আগাধ। নবী করীম (সা.)-এর যুগে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। মুহাম্মদ বিন সিরীন (র.) একজন বিশিষ্ট স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকারক। হযরত সামুরাহ

(রা.) বলেন, একদা হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবু বকর সিদ্দীকের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। (দাইলামী)

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সবচেয়ে বেশি বাকপটু এবং বাগ্মী ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর করে বক্তৃতা দিতে পারতেন। যুবাইর বিন বাকার বলেন আমি ওলামাদের নিকট থেকে শুনেছি সবচেয়ে বড় বাগ্মী ছিলেন আবু বকর (রা.) এবং আলী (রা.)। তিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আল্লাহর ভয় এবং বাগ্মীতা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হওয়ার ক্ষেত্রে সুলেহ হুদায়বিয়ার হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে হযরত উমর রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর জবাবও দেন। অতঃপর হযরত উমর হযরত আবু বকরের নিকট গিয়ে একই প্রশ্ন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হুবহু নবী (সা.)-এর উত্তরগুলো আবার প্রদান করেন। (বুখারী) এজন্য তাঁকে সর্বোত্তম জ্ঞানী বলা হয়।

ইবনে আস প্রমুখ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার হুকুম– আমি যেন আবু বকরের সাথে পরামর্শ করি। (তামামুর রাযী)

মা'আয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমাকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় মজলিসে শূরা গঠন করা হয়। এতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, উসাইদ বিন হাযীর উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন। অতঃপর হুযূর (সা.) আমার মত জানতে চাইলে হযরত আবু বকরের অনুরূপ মত ব্যক্ত করলাম। নবী (সা.) বললেন, আবু বকর ভুল করুক। এটা আল্লাহ তা'আলা চান না। হাদীসখানা তাবারানী বর্ণনা করেছেন। ইবনে উসামার বক্তব্য এ ধরনের, আসমানে আল্লাহর অভিপ্রায় এটা নয় যে, যমীনে আবু বকর ভুল করবে। এটিও তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম নব্বী হলেন, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) সাহাবীদের মধ্যে অনন্য হাফেজে কুরআন ছিলেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.)-এর যুগে আনসারদের চার সাহাবী কুরআনকে একত্রিত করেছেন। আবু দাউদ শা'বী বলেন, হযরত আবু বকরের মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ জমা হয়নি-এ কথাটি

পরিত্যাজ্য, অথবা কথাটিকে এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) যে পদ্ধতিতে কুরআনকে সন্নিবেশিত করেছেন, সেভাবে জমা করা হয়েছিল না।

তিনি সকল সাহাবা থেকে উত্তম

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সকল উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আবু বকর, অতঃপর হযরত উমর, অতঃপর হযরত উসমান, অতঃপর হযরত আলী, অতঃপর আশারায়ে মুবাশ্শারা, অতঃপর আহলে বদর, অতঃপর আহলে উহুদ অতঃপর আহলে বাইত, অতঃপর সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আবুল মানসূর বাগদাদী একটি ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমরা পরস্পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য করেছি, অতঃপর হযরত উমর (রা.), অতঃপর হযরত উসমান (রা.)। এ হাদীসটির শেষ দিকে তাবারানী এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, এ কথা রসূলুল্লাহ (সা.) শোনার পরও তা অপছন্দ করেন নি।

ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা.) থাকা অবস্থায় আমরা সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকরকে সর্বোত্তম মনে করতাম। অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা অসংখ্য সাহাবী পরস্পরের মধ্যে একথা বলতাম যে, এ উম্মতের মধ্যে নবীর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর, তারপর হযরত উমর, তারপর হযরত উসমান, তারপর আমরা নীরব হয়ে যেতাম। (ইবনে আসাকির)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকরকে "রসূলের পর লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি" বলে সম্বোধন করেন। হযরত আবু বকর তাঁকে বললেন, তুমি নিজেকে বাদ দিয়ে কেন? আমি নবী করীম (সা.) থেকে নিজে শুনেছি, উমর থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর সূর্য কখন উদিত হয় না। (তিরমিযী)

মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত

আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, নবীর পর কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, হযরত উমর (রা.)। অতঃপর হযরত উসমানের নাম নিতে গিয়ে তিনি ভয় করলেন। অতঃপর আরয করা হলো, তারপর কি আপনিই সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আমি এমনকি? আমি একজন সাধারণ মুসলমান। (বুখারী)

আহমদ (র.) বলেন, হযরত আলীর কয়েকটি মুতাওয়াতের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে নবীর পর হযরত আবু বকর (রা.) সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। রাফেযীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হোক। তারা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ফেঁসে গেছে।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর আমাদের নেতা, তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদের মধ্যে হুযূর (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। (তিরমিযী)

একবার হযরত উমর (রা.) মিম্বরে উঠে বললেন, এ উম্মতের মধ্যে নবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)। যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে, তার অপবাদকারীর গুনাহ হবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমর ফারুক (রা.) অপেক্ষা আমাকে যে প্রাধান্য দিবে আমি তাকে আশিটি চাবুকাঘাত করব। (ইবনে আসাকির)

আবু দারদা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, নবী ছাড়া কোনো ব্যক্তি এমন নেই যার উপর সূর্য উদিত ও অস্ত যায় এবং তিনি হযরত আবু বকর থেকে উত্তম।

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, নবী এবং রসূলদের পর আবু বকরের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস, কারো উপর সূর্য উদিত হয় না যে, হযরত আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। (তাবারানী) এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত। ইবনে কাসীর সে দিকেই ইশারা করেছেন।

সালমা বিন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আবু বকর নবীর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাদ বিন যেরারাহ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আপনার পর আবু বকর সর্বোত্তম ব্যক্তি। (তাবারানী) আমর বিন

আস (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! লোকদের মধ্যে আপনার প্রিয়তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আয়েশা সিদ্দীকা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা আবু বকর। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, উমর। (বুখারী, মুসলিম) ইমাম তিরমিযী বলেন, এক বর্ণনায় উমরের নাম নেই।

হাকেম আব্দুল্লাহ বিন শাকীক থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমরের শানে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারা দু'জনে পয়গম্বরগণ ব্যতীত জান্নাতে সকল মানবকুলের সর্দার হবেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও অনুরূপ অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

আম্মার বিন ইয়াসার (রা.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আবু বকর এবং উমরের উপর সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে প্রাধান্য দেয় তাহলে সে যেন আনসার এবং মুহাজিরদের প্রতি অত্যাচার করল এবং অপবাদ দিল। (তাবারানী)

যুহরী বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) হাসসান বিন ছাবিতকে বললেন, তুমি আবু বকরের শানে কোনো কবিতা রচনা করনি? তিনি বললেন, করেছি। হুযূর (সা.) বললেন, আবৃত্তি করে শোনও– আমি শুনব। তিনি আবৃত্তি করলেন (যার অর্থ) "আবু বকর নবী করীম (সা.)-এর গুহার সাথী। তিনি যখন পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তখন শত্রুরা তাঁর চারদিকে ঘুরছিল। পৃথিবীর যত প্রেম ভালবাসা তিনি নবীর প্রতি নিবেদন করেছেন। পৃথিবীতে আর কেউ তাঁকে এতটুকু ভালোবাসেননি।" এ কবিতা শ্রবণে নবী করীম (সা.) হাসলেন এবং বললেন, হাস্সান তুমি সত্যই বলেছ। তিনি এমনটাই। (ইবনে সাদ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেহেরবান আবু বকর, সবচেয়ে বেশি কঠোর উমর, অত্যন্ত লজ্জাশীল উসমান, সবচেয়ে বেশি হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত মা'আয বিন জাবাল, উত্তরাধিকার আইনবেত্তা যায়েদ বিন ছাবেত, সবচেয়ে বড় ক্বারী উবাই বিন

কা'ব, সকল উম্মতে একজন বিশ্বাসী লোক থাকেন আমার উম্মতের বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। (আহমদ, তিরমিযী)

এ হাদীসটি ইবনে উমর এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, সর্বোত্তম বিচারক হযরত আলী। (আবু ইয়ালা) শাদ্দাদ বিন আউস এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, সর্বাধিক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আবু যর (রা.)। সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী এবং মুত্তাকী আবু-দ্দারদা (রা.) এবং সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও ধৈর্যশীল হলেন, মুআবিয়া (রা.)। (দাইলামী)।

কুরআনের আয়াত দ্বারা আবু বকর (রা.)-এর প্রশংসা ও সত্যায়নের বিবরণ

আমি এ বিষয়ে কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেছি এবং একখানা প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থও লিখেছি। সেই পদ্ধতি অনুসারে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ–

মুসলিম জাতি এ বিষয়ে একমত যে, উল্লিখিত আয়াতে صَاحِب (সাহিব) শব্দের উদ্দেশ্য আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। এ ব্যাপারে স্বয়ং আবু বকর (রা.)-এর বিবরণ অচিরেই আসছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হিজরতের সফরে নবী করীম (সা.) ভরসা হারাননি। সুতরাং صَاحِب শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। (ইবনে আবী হাতেম)

ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উমাইয়া বিন খালফের নিকট থেকে হযরত বিলালকে একখানা চাদর এবং চার শত দেরহামেরম বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন তখন হযরত আবু বকরের শানে এবং উমাইয়ার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى -

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, মক্কী জীবনে আবু বকর (রা.)-এর নীতি ছিল যখন কোনো দুর্বল ও বৃদ্ধা নারী ইসলাম গ্রহণ করতেন তখন তিনি তাদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। একদিন তাঁর পিতা বললেন, হে আমার বৎস! আমি

দেখেছি তুমি দুর্বল লোকদের ক্রয় করে আযাদ করে দিচ্ছ। এর পরিবর্তে যদি শক্তিশালী এবং তরুণদের কিনে আযাদ করে দিতে তবে তারা বিপদের দিনে তোমার সাহায্য করতে পারত। তিনি বললেন, বাবা! আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার স্বীকৃতি এবং সন্তুষ্টি অর্জন, দুনিয়ায় লাভবান হওয়া আমার কামনা নয়। এ ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়–

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى الخ (ইবনে জারীর)

হযরত উরওয়া বর্ণনা করেন, মুসলমান হওয়ার পর যে সাতজন ব্যক্তির উপর অকথ্য নির্যাতনের রোলার চালানো হয় তাদেরকে কিনে আযাদ করে দেয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى – (তাবারানী)

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন– وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى– হযরত আবু বকরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (বাযযার)

হযরত আয়েশা বলেন, কসমের কাফফারা অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.) কসম ভঙ্গ করেননি। (বুখারী) হযরত আলী বলেন, وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالْحَقِّ দ্বারা মুহাম্মদ (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে। আর وَصَدَّقَ بِهٖ দ্বারা আবু বকর (রা.) উদ্দেশ্য। ইবনে আসাকির বলেন, হযরত আলীর কেরাত وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالْحَقِّ আর ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (হাকেম)

ইবনে হাতেম ইবনে শাওজিব থেকে রেওয়ায়েত করেন– وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ এ আয়াতটি হযরত আবু বকরের শানে নাযিল হয়েছে। আমার আসবাবে নুযূল গ্রন্থে এ হাদীসের সম্পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছি। ইবনে উমর (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উদ্দেশ্য। (তাবারানী, আওসাত)

হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন, اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু বকর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাকে সম্পৃক্ত না করে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য কোনো আয়াত নাযিল করেননি, শুধু এ আয়াত ছাড়া। এ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়–

هُوَالَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ

ইবনে আসাকির ইমাম যাইনুল আবেদীন বিন আলী বিন হোসাইন থেকে নকল করেছেন, আবু বকর (রা.), উমর (রা.) এবং আলী (রা.) শানে এ আয়াত নাযিল হয়।

وَنَزَعْنَامَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا থেকে وَعْدَالصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ-

পর্যন্ত হযরত আবু বকরের শানে নযিল হয়েছে। ইবনে আসাকির ইবনে উয়াইনিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানের উপর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ অসন্তোষ আবু বকরের উপর ছিল না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত প্রণিধানযোগ্য।

اَلَاتَنْصُرُوْ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ-

(ইবনে আসাকির)

আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-এর শানে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি হুযূর (সা.) বলেন, এক চারণভূমিতে জনৈক রাখাল বকরী চরাত। একদিন হঠাৎ বাঘ এসে বকরীর পালে আক্রমণ করে এবং একটি বকরী ধরে ফেলে। রাখাল বাঘকে তাড়া করে বকরীটি উদ্ধার করল বাঘ বলল, সেদিন কি হবে যেদিন তোমার বকরীর পালের সাথে তুমি থাকবে না, অথচ আমি থাকব। জনৈক ব্যক্তি মাল বোঝাইকৃত বলদকে নিয়ে যায়। বলদ আমাকে দেখে বলল, আমি বোঝা বহন করার জন্য জন্ম নেইনি, আমার জন্ম ক্ষেতে কাজ করার জন্য। উপস্থিত জনতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। তারা বললেন, বলদ কথা বলতে লাগল? হুযূর (সা.) বললেন, আমার সাথে একথার স্বীকৃতি দিয়েছেন আবু বকর এবং উমর। সে সময় সেখানে তাঁরা দু'জন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তাদের

বিশ্বাসের প্রতি ভরসা রাখার ব্যাপারে তাকীদ দিলেন।

তিরমিযী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, এমন কোনো নবী নেই যার দু'জন মন্ত্রী আকাশে এবং দু'জন যমিনে রয়েছে। আমার আকাশের দু'মন্ত্রী জিবরাঈল এবং মিকাঈল। আর যমিনের মন্ত্রীদ্বয় আবু বকর এবং উমর।

আসহাবে সুনান প্রমুখ সাঈদ বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেছেন, আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী জান্নাতী, অতঃপর তিনি বাকী আশারা মুবাশ্‌শারার নাম উল্লেখ করে বলেন, এরা জান্নাতী।

তিরমিযী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহামনীষীগণ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষেত্রের মতো। যেমন আবু বকর এবং উমর। এ রেওয়ায়েতটি তাবারানী জাবের বিন সামুরা এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) আনসার এবং মুহাজিরদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আদবের (শিষ্টাচারের) কারণে তারা নবীজীর পানে চোখে তুলে তাকাতেন না। কিন্তু আবু বকর এবং উমর হযরত (সা.)-এর পানে তাকাতেন এবং মৃদু হাসতেন। তিনিও তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন।

তিরমিযী এবং হাকেম হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নব্বীতে প্রবেশের সময় তাঁর ডানে-বামে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর ছিলেন। তিনি তাঁদের হাতে ধরে বললেন, আমি কিয়ামত দিবসে এভাবে উঠব। তাবারানী আওসাত গ্রন্থে আবু হুরায়রার বরাত দিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এবং হাকেম হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমি উঠব, তারপর আবু বকর, তারপর উমর।

তিরমিযী এবং হাকেম আব্দুল্লাহ বিন হানযালা বর্ণনা করেন, একদা নবী আকরাম (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে দেখে বললেন, এঁরা দু'জন আমার কান এবং চোখ। এ হাদীসটি তাবারানী ইবনে উমর এবং ইবনে আমার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

বায্‌যার এবং হাকিম আবু আরওয়া আদ্দুওসী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবুবকর এবং হযরত উমর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর শুকর যিনি তোমাদেরকে আমার সাহায্যকারী বানিয়েছেন। এ

হাদীসটি মুররা ইবনে আযেব (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (তাবারানী)

আবু ইয়ালা আম্মার বিন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একদা হযরত জিবরাঈল আমীন আমার কাছে আসেন। আমি উমর বিন খাত্তাবের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নূহ (আ.)-এর মত দীর্ঘ জীবন পর্যন্ত যদি উমরের গুণাবলী বর্ণনা করি তবুও তা শেষ হবে না।

আহমদ আব্দুর রহমান বিন গানাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা দু'জনে যে বিষয়ে একমত হবে আমি সে বিষয়ে দ্বিমত করব না।

বারা বিন আযেব থেকে তাবারানী বর্ণনা করেন এবং ইবনে সাদ লিখেছেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কে ফতোয়া দিতেন? তিনি বললেন, সে সময় আবু বকর এবং উমর ব্যতীত কেউ ফতোয়া দিত বলে আমার জানা নেই।

আবুল কাসিম বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, ফতোয়ার জন্য লোকেরা আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহুম-এর নিকট গমন করতেন।

তাবারানী ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবী (আ.) গণের উম্মতে বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন। আমার উম্মতের বিশেষ ব্যক্তি হযরত আবু বকর এবং উমর।

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের উপর রহম করুন। কারণ নিজ কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, মদীনা পর্যন্ত আরোহণ করায়ে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাছাড়া বিলালকে আযাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা উমরের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সত্য কথা বলেন, এ জন্য লোকেরা তাঁর ভয়ে দূরে থাকে এবং তাঁর বন্ধু নেই। আল্লাহ তা'আলা উসমানের প্রতিও রহম করুন, ফেরেশতাকুল তাঁকে দেখে লজ্জা করেন। আল্লাহ পাক আলীর উপরও রহম করুন। আল্লাহ তা'আলা আলীর সাথে রয়েছেন। (ইবনে আসাকির)

হযরত সুহাইল (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে এসে মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, হে জনতা! আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেননি। তোমরা তাকে স্মরণ রেখ। হে জনতা! আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের উপরও সন্তুষ্ট। (তাবারানী)

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ইবনে আবি হাযেম থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি

যাইনুল আবেদীন আলী বিন হোসাইন (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, রসূলের দরবারে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের মর্যাদা কতটুকু ছিল? তিনি বললেন, সে সময় হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট তাঁর যতটুকু মর্যাদা ছিল।

ইবনে সাদ বাসতাম বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে সম্বোধন করে নবী করীম (সা.) বলেন, আমার পর তোমাদের উপর কোনো ব্যক্তি প্রশাসক হতে পারবে না। ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা.) থেকে মারফূআন সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে ভালোবাসা ঈমান। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী। ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু বকর এবং উমরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ এবং তাঁদের জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা সুন্নত। হযরত আনাস (রা.) মারফূআন বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে আশাবাদী যে, তারা কালেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ থেকে যেমন পলায়ন করবে না। অর্থাৎ, উভয়ের প্রতি আমার উম্মতের অখণ্ড ভালোবাসা অটুকু থাকবে।

আবু বকর (রা.)-এর শানে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে

ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে, বক্তি এক জোড়া কোনো জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে জান্নাতের সকল দরজা থেকে তাকে আহ্বান করা হবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ পথে এসো। এ দরজা অত্যন্ত সুন্দর। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযী তাকে নামাযের দরজা থেকে, যে ব্যক্তি মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে, যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে, রোযাদারকে রোযার দরজা থেকে তার নাম ধরে ডাকা হবে। হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তিকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে কি? হুযুর (সা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি মনে করি যাদের ডাকা হবে তাদের মধ্য থেকে তুমি অন্যতম।

আবু দাউদ এবং হাকেম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের সাহচর্য এবং সম্পদ দ্বারা সবচেয়ে বেশি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন তিনি আবু বকর। যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্বের

বন্ধন অটুট। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, ইবনে মাসউদ, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ, বাররা, কাব বিন মালিক, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আনাস, উবাই বিন কা'ব, আবি ওয়াকিদুল লাইসী, আবুল মুয়ালা, আয়েশা, আবু হুরায়রা এবং ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে বর্ণিত।

আবুদ্দারদা (রা.) থেকে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত নবী করীম (সা.)-এর দরবারে বসেছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) এলেন এবং সালাম দিয়ে আরয করলেন, আমার এবং উমর বিন খাত্তাবের মধ্যে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মনমালিন্যতা দেখা দেয়। আমি তাঁর কাছেই বসেছিলাম। আমার মাঝে অনুতাপ এলো এবং আমি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর আমি আপনার নিকট এসেছি। নবী করীম (সা.) তিনবার বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন। এরপর হযরত উমর লজ্জিত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে যান। কিন্তু সেখানে তাঁকেই না পেয়ে নবী করীম (সা.)-এর দরবারে আসেন। তাঁকে দেখে নবী করীম (সা.)-এর চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হযরত উমর ফারুকের প্রতি আবু বকর সিদ্দীকের দয়া হয়। ফলে তিনি আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাঁর চেয়ে বেশি অপরাধী। নবী করীম (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন তখন তোমরা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে। কিন্তু আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছে, নিজের জীবন এবং সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছে। আজ তোমরা সেই বন্ধুকে বর্জন করছ? (এ কথাটি তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন) এ আচরণ কখনই গ্রহণীয় হতে পারে না।

ইবনে আদী ইবনে উমর (রা.) থেকে অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সে হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, আমার বন্ধুর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। যে সময় আল্লাহ তা'আলা আমাকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠালেন, তখন তোমরা সকলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, আর আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমার জন্য সাহিব (সহচর) বলে সম্বোধন না করতেন তবে আমি তাকে খলীল (বন্ধু) বলে ডাকতাম।

ইবনে আসাকির মুকতাম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আকীল বিন আবু তালিব এবং হযরত আবু বকরের মধ্যে ঝগড়া হয়। যদিও হযরত আবু বকর তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, হযরত আকীলের আত্মীয়তা হুযূর (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য তিনি নীরব হয়ে যান। হযরত আকীল নবীজীর দরবারে এ

ব্যাপারে নালিশ করলে তিনি (সা.) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার বন্ধুকে আমার উপর ন্যস্ত কর এবং নিজেদের অবস্থান ও তাঁর শান সম্পর্কে চিন্তা করো। আল্লাহর কসম, তোমাদের সকলের দরজা অন্ধাকারাচ্ছন্ন। কিন্তু আবু বকরের দরজা আলোকময়। আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ? আর আবু বকর আমাকে সত্যায়িত করেছেন। তোমরা আমার সাথে কৃপণতা করেছ, আর আবু বকর আমার জন্য খরচ করেছেন। তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলে, আর আবু বকর আমার আনুগত্য করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজের পরিধেয় কাপড় মাটির সাথে ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, যদি আমি সবসময় সতর্ক না থাকি তবে আমার পরনের বস্ত্রের একাংশ ঝুলে যায়। নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি এ কাজ তো গর্ব করে করো না।

মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযাদার? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি। হুযূর (সা.) বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযার সাথে গিয়েছে? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে দুস্থকে অন্ন দিয়েছে? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি নবী করীম (সা. জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে রোগীর সেবা করেছ? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তির মধ্য এতগুলো বিষয় একত্রিত হয়েছে তিনি অবশ্যই জান্নাতী। হযরত আনাস এবং আব্দুর রহমান বিন আবু বকর ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেন, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

বাযযার আব্দুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামায পড়ে সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, আজ তোমাদের মধ্য থেকে কে রোযা মুখে সকাল পেয়েছ? হযরত উমর ফারুক (রা.) আরয করলেন, আমি আমার ব্যাপারে বলছি, আজ আমি রোযা নাই। হযরত আবু বকর বললেন, রাতেই রোযার নিয়ত করেছিলাম এবং আলহামদু লিল্লাহ, আমি রোযা রেখেছি।

নবী করীম (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে থেকে আজ কে রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করেছে? হযরত উমর (রা.) আরয করলেন, আমি তো এখনো মসজিদ

থেকেই বেরোইনি, রোগীর সেবা আবার কখন করলাম। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, খবর পেলাম ভাই আব্দুর রহমানের (আল্লাহর বান্দা) অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। ফলে মসজিদের আসার পথে তিনি কেমন আছেন তা দেখে এসেছি। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কি ফকীরকে কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়েছ? হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তো সবেমাত্র নামায পড়লাম, এখন পর্যন্ত কোথাও যাইনি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মসজিদে প্রবেশের সময় হঠাৎ এক ভিক্ষুক এলো। আমি সে সময় আব্দুর রহমানের (হযরত আবু বকরের ছেলে) হাতে যবের রুটির একটি টুকরো দেখলাম এবং সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে ছিলাম। নবী করীম (সা.) বললেন, আমি তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। অতঃপর নবী করীম (সা.) এও বললেন, যদ্বারা উমরও সন্তুষ্টও হন এবং হযরত উমর (রা.) বুঝ লেন, পুণ্যময় কোনো কাজে তিনি আবু বকরের সমান নন।

আবু ইয়ালা গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আমি নামায পড়ে মসজিদে দোআ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে নিয়ে মসজিদে এসে (আমাকে দেখে) বললেন, যে চাইবে সে পাবে। অতঃপর তিনি বললেন, যে সুন্দর করে কেরাত তিলওয়াত করতে চায় সে যেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কেরাত অনুসরণ করে। এরপর আমি বাড়ি এলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর আমাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আমার কাছে এলেন। পরক্ষণে হযরত উমরও এলেন। তিনি হযরত আবু বকরকে দেখে বললেন, আপনি প্রত্যেকটি ভাল কাজে এগিয়ে রয়েছেন।

রবী'আ আসলামী বর্ণনা করেন, আমার এবং হযরত আবু বকরের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কথা বলেন যা আমাকে দুঃখ দেয়। অতঃপর তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, রবীআ! তুমি কথার দ্বারা প্রতিশোধ নাও। আমি বললাম, তা হতে পারে না। তিনি বললেন, তুমি আমার প্রতিশোধ নাও, অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নালিশ করব। আমি বললাম, তবুও নয়। এরপর আবু বকর চলে গেলেন। আমার কাছে বনূ আসলাম গোত্রের কতিপয় লোক এসে বলল, ভালোই হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন অসন্তুষ্ট হবেন, আবু বকরই তো বাড়াবাড়ি করেছেন। তিনি কেন এতটা করতে গেলেন? আমি তাদের বললাম, তোমরা কি আবু বকরের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নও? তিনি ثَانِىَ اثْنَيْنِ। আয়াতের প্রতিবিম্ব এবং মুসলমানদের মধ্যে বুযুর্গ এবং বড় ব্যক্তিত্ব। তোমরা নিজেদের মঙ্গল তালাশ কর। যদি তিনি দেখেন যে, তোমরা তার বিরুদ্ধে

সাহায্য করছ তবে তিনি রাগ করবেন। তাঁর রাগ করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাগের কারণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রাগ করবেন। আর এতে করে রবী'আ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং আমি হযরত আবু বকরের পিছে পিছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হলাম। আবু বকর হযরতের দরবারে হুবহু সম্পূর্ণ ঘটনা বয়ান করলেন। নবী করীম (সা.) মস্তক তুলে আমাকে বললেন, রবী'আ! ঘটনা কী? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘটনা তাই (যা তিনি বলেছেন)। তিনি এমন কথা বলেছেন, যা আমাকে মর্মাহত করেছে। তিনি আমাকে অনুরূপ কথা বলে তার প্রতিশোধ নিতেও বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, খবরদার ঐ কথা মুখে আনবে না (অর্থাৎ আবু বকরের প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না); বরং বল, হে আবু বকর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। (আহমদ)

তিরমিযী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) আবু বকরকে বললেন, তুমি গুহায় আমার সাথী ছিলে হাউজে কাওসারেও আমার সাথী হয়ে থাকবে। আব্দুল্লাহ বিন আহমদও অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর গুহায় আমার সাথী ছিল। এ হাদীসের সনদগুলো সহীহ।

বাইহাকী হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বেহেশতে খোরাসানের উটের মত অনেক পাখি থাকবে। হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহা! সে তো অনেক ভাল হবে। তিনি (সা.) বললেন, তাকে ভক্ষণকারী তার চেয়েও ভাল হবে? তন্মধ্যে তুমি অন্যতম।

আবু ইয়ালা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মিরাজের রাতে আকাশের অনেক স্থানে আমার নামের পেছনে আবু বকরের নাম দেখেছি। এ হাদীসের সনদগুলো দুর্বল। যদিও তা ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আনাস, আবু সাঈদ এবং আবুদদরদা রাবিয়াল্লাহু আনহুম থেকে পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণিত। ইবনে আবী হাতিম এবং আবু নুয়াঈম সাঈদ বিন জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ-এ আয়াত তেলওয়াত করলে হযরত আবু বকর বললেন, এ কতই না সুন্দর কথা! রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তোমাকে এভাবে সম্বোধন করবে। ইবনে হাতেম আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! যদি আপনি

আমাকে নির্দেশ করেন তবে নিজেকে আমি বিধ্বস্ত করে ফেলব। নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি সত্যই বলেছ।

আবুল কাসেম বাগাবী ইবনে আবী মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের সাথে এক জলাশয়ে গিয়ে বললেন, সকলেই নিজ নিজ সাথী এবং বন্ধুর নিকট ফিরে যাও। এতদশ্রবণে সকলে তাই করলো। শুধু বাকী থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। অতঃপর হযরত নবী করীম (সা.) আবু বকরের নিকট গমন করলেন তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং বললেন, যদি আমি স্বীয় জীবনে কোনো বন্ধু গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম, কিন্তু তিনি আমার সাথী। (ইবনে আসাকির)। এ হাদীসটি মুরসাল ও গরীব সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আসাকির সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ভালো অভ্যাস তিন'শ ষাটটি। আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাত দিতে চাইলে এ অভ্যাসগলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) আরয করলেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি আমার মধ্যে রয়েছে কি? তিনি (সা.) বললেন, সবগুলোই রয়েছে।

ইবনে আসাকির এ হাদীসটি দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। আরেক পদ্ধতিটি হলো- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নেক অভ্যাস তিনশ ষাটটি। হযরত আবু বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর মধ্য থেকে আমার মাঝে কি কিছু আছে? তিনি (সা.) বললেন, ধন্যবাদ, সব নেক অভ্যাস তোমার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে।

ইবনে আসাকির ইয়াকুব আনাসারীর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গায়ে গায়ে মিলে বসত, এ দৃশ্য দুর্গের দেয়ালের মত লাগত। কিন্তু আবু বকরের বসার জায়গা পড়েই থাকত সেখানে কেউ বসত না। তিনি যখন আসতেন তখন সেখানে বসতেন এবং নবী করীম (সা.) তাঁর দিকে চেহারা ফিরায়ে কথা শুরু করতেন এবং সকল উপস্থিত ব্যক্তিগণ মনোযোগ সহকারে কথা শুনতেন।

ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আবু বকরের প্রতি ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার সকল উম্মতের জন্য ওয়াজিব। সহল বিন সাদ (রা.) একটি হাদীস এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

উপরন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে একটানা মারফু হাদীস বর্ণিত

হয়েছে যে, সকল লোকের হিসাব নেয়া হবে, কিন্তু আবু বকরের থেকে হিসাব নেয়া হবে না।

আবু বকর (রা.)-এর শানে সাহাবা এবং সলফে সালেহীনদের অভিমত

জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আমাদের সর্দার। (বুখারী শরীফ)।

বাইহাকী শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত উমরের অভিমত নকল করেছেন, যদি হযরত আবু বকরের ঈমান কে এক পাল্লায় আর পৃথিবীবাসীর ঈমান আরেক পাল্লায় তুলে দেয়া হয় তবে আবু বকরের ঈমানের পাল্লা বেশি ভারী হবে।

ইবনে আবী হাইছামা এবং আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়াইদুয যুইদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) প্রত্যেকটি অভিমতই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, হায়, আমি যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বুকের একটি পশম হতাম! এ হাদীসটি মিসদাদ স্বরচিত মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা হলো, হযরত আবু বকর (রা.) এর জন্য যেরূপ জান্নাত নির্ধারিত তদ্রূপ জান্নাত যেন আমি প্রাপ্ত হই। (ইবনে আসাকির, ইবনে আবিদ দুনিয়া)।

হযরত উমর ফারুক (রা.) আরো বলেন, আবু বকর (রা.)-এর শরীর মেশ্‌কের চেয়েও অধিক সুগন্ধ। (আবু নুয়াঈম)

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আলী হযরত আবু বকরর পার্শ্ব অতিক্রম করছিলেন। সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) একখণ্ড কাপড় পরে বসেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকরকে দেখে বললেন, কোনো নেক্‌কার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার মতে এ কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তি চেয়ে তিনি বেশি প্রিয় নন।

ইবনে আসাকির আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে কয়েকবার উমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক আমার চেয়ে প্রত্যেক কাজে অগ্রগামী।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, পবিত্র সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে দেখেছি সে কাজে

হযরত আবু বকর আমার চেয়েও অগ্রগামী।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত বিধৃত রয়েছে। (হযরত আলী (রা.) বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরই আমার নিকট প্রিয়। কোনো মুমিনের অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা এবং আবু বকর ও উমরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্নতা একত্রে জমা হবে না।

আবু আমর (রা.) বলেন, কুরাইশদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি ছিলেন যারা দৃশ্যত এবং চরিত্রগতভাবে অসাধারণ এবং বিস্ময়কর সাদা মনের মানুষ। যদি তারা তোমাকে কিছু বলেন তবে সত্য বলবেন। আর তুমি যদি তাকে কিছু বল তবে তারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। তারা হলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), আবু উবাইদা বিন জাররা (রা.)এবং উসমান বিন আফফান (রা.)। ইবনে সাদ ইবরাহীম নখয়ী কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উপাধি তাঁর দয়ার্দ্রতার কারণে দেয়া হয়েছে।

ইবনে আসাকির রবী'আ বিন আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এমন এক পানির ফোঁটা যেখানে পড়বে সেটাই মহিমান্বিত হবে।

রবীতা বিন আনাস থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, আমি আবু বকর সিদ্দীকের মত পূর্ববর্তী নবীদের কোনো সাহাবীকে পাইনি।

যোহরী বলেন, আবু বকর সিদ্দীকের মর্যাদার মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ করতেন না। (ইবনে আসাকির)

যুবায়ের বিন বাকার বলেন, আমি আলেমদের থেকে শুনেছি যে, নবী করীম (সা.)-এর খতীব আবু বকর এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। আবু হুসাইন বর্ণনা করেন, আদম সন্তানদের মধ্যে নবী রাসূলের পর কোনো ব্যক্তি আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুরতাদদের প্রতি সৈন্য পাঠিয়ে হযরত আবু বকর এক নবীওয়ালা কাজ করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দাইনূরী স্বরচিত মাজালিসাত গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরকে এমন চারটি গুণ দান করেছিলেন যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। এক. তিনি সিদ্দীক। দুই. তিনি গুহায় নবীর সাথী। তিন. হিজরতের সময় নবীজীর সাথে ছিলেন এবং চার রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ইমাম এবং বাকী সকল মুসলমানকে মুকতাদী হওয়ার নির্দেশ দেন।

মাসাহাফ গ্রন্থে ইবনে আবু দাউদ লিখেছেন, হযরত আবু জাফর বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত জিবরাঈলের কথা শুনতে পেতেন, কিন্তু জিবরাঈলকে দেখতে পেতেন না।

ইবনে মুসায়্যাব বলেন, হযরত আবু বকর নবী (সা.)-এর বিশেষ মন্ত্রী ছিলেন। নবী করীম (সা.) প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের মধ্যে, গুহায়, বদর যুদ্ধের ছাউনির নিচে, এমনকি কবরেও আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে প্রাধান্য দেননি।

হাদীস, আয়াত এবং ইমামদের অভিমতে আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের প্রতি ইশারা

তিরমিযী এবং হাকেম হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার পর আবু বকর এবং উমরের অনুসরণ করবে। এ হাদীসটি তাবারানী আবুদ্দারদা থেকে এবং হাকেম ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবুল কাসেম বাগাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আমার পর বারোজন খলীফা হবেন এবং আবু বকর সিদ্দীক আমার পর সামান্য জীবিত থাকবেন। এ হাদীসের প্রথমাংশের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। এটি কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে আমি অন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের এ হাদীস যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর আগে বক্তৃতায় বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে অবকাশ দিয়েছেন....! সেই বক্তৃতায় তিনি আরো বলেছিলেন, সব দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আবু বকরের দরজা খোলা থাকবে।

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আবু বকরের জানালা ছাড়া মসজিদের সকল জানালা বন্ধ থাকবে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর দ্বারা হযরত আবু বকরের খিলাফতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কারণ তিনি এ পথেই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য আসতেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, (রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন) আবু বকরের দরজা ছাড়া সকল দরজা বন্ধ করে দাও। এ হাদীসটি ইবনে আদী, ইমাম তিরমিযী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে, যাওয়াইদুল মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে, তাবারানী মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) থেকে এবং বায্যার আনাস (রা.)

থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে জুবায়ের বিন মুতঈম থেকে বর্ণনা করেন, একদিন জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি (সা.) তাকে পুনরায় আসতে বললেন। সে আরয করল, আমি আবার এলে হযরতকে পাব না, অর্থাৎ তিনি ইন্তেকাল করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তবে আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এসো।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আপনার পর আমরা কার কাছে সদকা দিব এ বার্তা দিয়ে বনূ মুস্তালিকের লোকেরা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পাঠালে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আবু বকরের নিকট। (হাকিম)

ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে জনৈক মহিলা এসে কিছু জানতে চাইলে তিনি তাকে পরে আসতে বললেন। সে বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই এবং আপনার মৃত্যু হয়ে যায়। নবী করীম (সা.) বললেন, তুমি এসে আমাকে না পেলে আবু বকরের নিকট গমন করবে। কারণ আমার পর তিনি খলীফা হবেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আয়েশা! তোমার পিতা এবং তোমার ভাইকে আমার নিকট আসতে বল। আমি তাদের দলিল লিখে দিতে চাই। কারণ আমার আশংকা হয় যে, আমার পর কোনো আশান্বিত ব্যক্তি খিলাফতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে এবং বলতে পারে আমি খিলাফতের উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এবং মুমিনগণ আবু বকরকে ছাড়া মেনে নিবে না। (মুসিলম)

এহাদীসটি আহমদ ভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর সময় আমাকে বললেন, তোমার ভাই আব্দুর রহমানকে ডেকে আনো, আমি আবু বকরের জন্য একটি দলিল লিখে দিব, যাতে লোকেরা মতভেদ করতে না পারে। অতঃপর নিজেই বললেন, তাকে লাগবে না। আল্লাহ আবু বকরের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য রাখবেন না।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করল, নবী (সা.) যদি খলীফা নির্ধারণ করতেন তবে কাকে বানাতেন? তিনি বললেন, আবু বকরকে। সে বলল, তাঁর পর? তিনি বললেন, উমর ফারুক। সে বলল, তাঁর পর? তিনি বললেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ।

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশাআরী (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) মুমূর্ষ অবস্থায় বলেন, হে জনতা! তোমরা আবু

বকরের কাছে যাও, তিনি তোমাদের নামায পড়াবেন। হযরত আয়েশা (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু বকর অত্যন্ত নরম মনের মানুষ। তিনি আপনার স্থানে জায়নামাযে দাঁড়ালে নামায পড়াতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকেই নামায পড়াতে বল। হযরত আয়েশা আবার একই আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আবু বকরকেই বল, তিনি যেন নামায পড়ান। তুমি তো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের নবীর মতো। এরপর লোকেরা আবু বকরের নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় লোকদের নামায পড়ান। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির। এটি হযরত আয়েশা, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন যামআ, আলী বিন আবু তালিব এবং হাফসা রাযিআল্লাহু আনহুম পৃথকভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এঁদের পদ্ধতিও হাদীসে মুতাওয়াতির পদ্ধতির অনুরূপ।ঃ

আরেকভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এ জন্যই জেদ করেছিলাম যে, আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্তকে মানুষ ভালোবাসবে না। কারণ আমি বুঝে ছিলাম যিনি রসূলের স্থলবর্তী হবেন লোকেরা তাঁকে হতভাগা মনে করবে। এজন্য আমি চাইছিলাম যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকরকে ছাড়া নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন।

ইবনে যামআ (রা.) বলেন যে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের নামায পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেলেন তখনো আবু বকর (রা.) আসেননি। এজন্য হযরত উমর এগিয়ে আসেন। কিন্তু নবী করীম (সা.) বলেন, না না না (তিনবার) আবু বকরই নামায পড়াবেন।

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উমর (রা.) তাকবীরে তাহরীমা বললে নবী আকরাম (সা.) রাগন্বিত হয়ে মাথা তুলে বললেন, আবু কুহাফার ছেলে কোথায়? এ হাদীসের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের অভিমত হলো, এটি সুস্পষ্ট দলিল যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সকল সাহাবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। তিনি সবচেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার এবং ইমামতের যোগ্য।

ইমাম আশআরী বলেন, এটা প্রকাশ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর সিদ্দীককে লোকদের নামায পড়াতে নির্দেশ করেন। সেখানে মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী তিনিই ইমামতি করবেন কুরআনের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এ হাদীসের আবেদন হলো,

হযরত আবু বকর গোটা উম্মত থেকে কুরআনের জ্ঞান বেশি রাখতেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈনও উক্ত হাদীস দ্বারা এ ফলাফল বের করেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীকই খিলাফতের বেশি হকদার ছিলেন। (যারা ফলাফল বের করেছেন) তাঁদের মধ্যে উমর (রা.) এবং আলী (রা.) অন্যতম।

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনা নকল করেছেন, যখন নবী (সা.) হযরত আবু বকরকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, অসুস্থ ছিলাম না, আমার জ্ঞান ও চৈতন্য ছিল। অতঃপর আমরা নিজেদের দুনিয়ার জন্য তাঁর প্রতি রাযী হলাম, যাঁর প্রতি নবী করীম (সা.) আমাদের দ্বীনের জন্য রাযী হয়েছিলেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবী (করীম) (সা.)-এর যুগেই ইমামতি করেন এবং পরামর্শদাতা হন। আহমদ এবং আবু দাউদ সহল বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, একবার বনূ বিন আউফ গোত্রে বিবাদ ও কলহ দেখা দিলে সংবাদ পেয়ে হুযূর (সা.) যোহরের পর মিমাংসার জন্য সেখানে যান এবং যাবার সময় বলেন, হে বিলাল! নামাযের সময় হলে এবং আমি না ফিরলে আবু বকরকে নামায পড়াতে বলবে। সুতরাং যখন আসরের সময় হলো হযরত বিলাল (রা.) ইকামত দিলেন এবং তাঁর কথায় হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ান।

আবু বকর শাফেঈ গীলানিয়াত গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত হাফসা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অসুস্থ থাকাবস্থায় কি আবু বকরকে ইমাম বানিয়ে ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, না; বরং আল্লাহই তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন।

দারা কুতনী ইফরাদ গ্রন্থে, খতীব এবং ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর দরবারে তোমার ব্যাপারে তিনবার প্রশ্ন করেছি যে, তোমাকে ইমাম বানাব। কিন্তু সেখান থেকে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং আবু বকর ইমামতির নির্দেশপ্রাপ্ত হন।

হযরত হাসান (রা.) থেকে ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক রা. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে নিজেকে অধিকাংশ লোকের আবর্জনা অতিক্রম করতে দেখেছি। হুযূর (সা.) বললেন, তুমি অবশ্যই লোকদের কাজ করার সুযোগ পাবে। তিনি আরয করলেন, আমি আমার বক্ষে দু'টি চিহ্ন দেখেছি। হুযূর (সা.) বললেন, তোমার খিলাফতের সময় দু'বছর।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি একদিন

উমর ফারুকের নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর নিকট কতিপয় লোক খানা খাচ্ছিল। আমি পেছনের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবগুলো পড়েছ? সে বলল, এতে লেখা রয়েছে শেষ নবীর খলীফা হবেন সিদ্দীক।

ইবনে আসাকির কর্তৃক বর্ণিত, মুহাম্মদ বিন যুবাইয়ের বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয (রা.) আমাকে কতিপয় প্রশ্ন করার জন্য ইমাম হাসান বসরীর খেদমতে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম, হযরত আবু বকরের খেলাফত নিয়ে লোকেরা মতভেদ করেছিল। আপনি আমাকে পূর্ণাঙ্গ জবাব দিন যে, হুযূর (সা.) তাঁকে খলীফা বানিয়ে ছিলেন? তিনি রেগে বসে পড়লেন এবং বললেন, কেন এতে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে? আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে খলীফা বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কেন খলীফা বানাবেন না, তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং মুত্তাকী লোকেরা তাকে খলীফা না বানানো পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করতেন না।

ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত, আবু বকর বিন আয়াস বলেন, হাকীম রশীদ আমাকে বললেন, লোকেরা আবু বকরকে কিভাবে খলীফা বানিয়ে নিল? আমি বললাম, ইয়া আমিরুল মুমিনীন! এ কাজে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সকল মুসলমান নীরব ছিল। খলীফা হারুন রশীদ বললেন, একটু ব্যাখ্যা করে বল। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! নবী করীম (সা.) আটদিন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় হযরত বিলাল (রা.) আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে নামায পড়াবেন? তিনি বললেন, আবু বকরকে নামায পড়াতে বলো। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আটদিন পর্যন্ত নামায পড়ান এবং এ দিনগুলোতে নিয়মিত ওহী নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নীরবতার কারণে নীরব ছিলেন এবং সকল মুসলমান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীরবতার কারণে নীরব ছিলেন। হারুন রশীদের নিকট এ অভিমতটি অত্যন্ত পছন্দনীয় মনে হলো এবং বললেন– بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ

ওলামায়ে কেরামের একটি দল হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের প্রমাণ পেশ করেছেন। বাইহাকী বর্ণনা করেন, ইমাম হাসান বসরী (র.) এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ–

অর্থ হে ঈমানদারগণ! যারা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের ব্যাপারে কোনো আক্ষেপ নেই। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতি পাঠাবেন যারা

আল্লাহ তা'আলাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসবেন।

ইমাম হাসান (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! আরব যখন ধর্মত্যাগী হয় আবু বকর এবং তাঁর সাথীরাই মুরতাদদের সাথে জিহাদ করে তাদের ইসলামে ফিরিয়ে আনেন।

ইউনুস বিন বাকীর কাতাদা (রা.)-এর বরাত দিয়ে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের কতিপয় লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন আবু বকর (রা.) তাদের সাথে জিহাদ করেছিলেন। সে সময় আমরা পরস্পরে বলতাম, কুরআনের এই আয়াত, فَسَوْفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ -হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেম কুতায়বার থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

এ আয়াতে উল্লিখিত কঠোর লড়াইকারী দ্বারা বনূ হুনায়ফা গোত্র উদ্দেশ্য। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে কুতাইবা বলেন, এ আয়াতটি হযরত আবু বকরের খিলাফতের দলিল। কারণ তিনিই লোকদের তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান।

শায়খ আবুল হাসান আশআরী (র.) বলেন, আবু আব্বাস সুরাইহ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফত কুরআন শরীফের উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কারণ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ব্যতীত যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে কেউ জিহাদ করেন নি।

সুতরাং এ আয়াতটি হযরত আবু বকরের খিলাফতের জন্য দাবী রাখে এবং তাঁর আনুগত্য করা মানুষের জন্য ফরয, কারণ যে তা মান্য করবে না আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে শাস্তি দিবেন।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, কতিপয় মুফাসসিরীন রোম, শাম এবং পারস্যের যুদ্ধ দ্বারা এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। কিন্তু এ যুদ্ধগুলো প্রস্তুতি হযরত আবু বকরই গ্রহণ করেন, যদিও তা হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান গনীর যুগে এসে শেষ হয়েছে। তারা দু'জনই হযরত আবু বকরের অনুসারী ছিলেন।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, ইরশাদ হচ্ছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ-

এ আয়াতটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের দলিল। ইবনে আবী হাতেম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল হামীদ আল মাহদী থেকে বর্ণনা করেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ-

আল্লাহ তা'আলারএ বাণী দ্বারা হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের খিলাফত প্রমাণিত।

খতীব আবু বকর বিন আয়াশ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফা এবং তাঁর খিলাফত কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে, পর্যন্ত

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ থেকে اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

উল্লিখিত আয়াতে صَادِقُوْنَ শব্দ দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে صَادِقٌ বলেছেন তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আর সাহাবাগণ সর্বদা হযরত আবু বকরকে হে আল্লাহর রসূলের খলীফা বলে সম্বোধন করতেন। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ গবেষণাটি অত্যন্ত সুন্দর।

যা'ফারানী বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (র.)-এর নিকটে শুনেছি। তিনি বলেন, আবু বকরের খিলাফতের বিষয়ে ইজমা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর লোকদের মধ্যে দুনিয়ায় আবু বকরের চেয়ে ভালো মানুষ না থাকায় লোকেরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। (বাইহাকী)

আসাদুস সুন্নাহ (ফায়ায়েল গ্রন্থে মুআবিআ বিন কাররাহ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরের খিলাফত সম্বন্ধে সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করতেন না। তারা সবসময় হযরত আবু বকরকে আল্লাহর রসূলের খলীফা বলে সম্বোধন করতেন। আর সাহাবীদের ইজমা কখনো ভুল এবং বিভ্রান্তকর হতো না।

হাকেম ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে জিনিসকে সকল মুসলমান ভাল মনে করে তা আল্লাহর কাছেও ভালো। আর যা সকল মুসলমানের নিকট মন্দ তা আল্লাহর কাছেও মন্দ। সকল মুসলমান আবু বকরের খিলাফতকে ভালো মনে করত। সুতরাং তা আল্লাহ তা'আলার নিকটেও ভালো ও উত্তম।

হাকেম এবং যাহাবী লিখেছেন, হযরত আবু বকরের খিলাফতের পর একদিন আবু সুফিয়ান বিন হরব হযরত আলীর নিকট এসে এসে বললেন, লোকদের কাজ গুলো দেখুন, তারা কুরাইশদের এক নগণ্য ব্যক্তির নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে। আপনি চাইলে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য দিয়ে মদীনা ভরে দিব। হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আপনি দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের শত্রুতা করে এসেছেন, আপনি কলহ প্রিয়। আমার দৃষ্টিতে আবু বকরের খিলাফতের কোনো মন্দ বিষয় নেই। কারণ তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে দক্ষ ও হকদার।

আবু বকর (রা.)-এর নিকট বাইআত

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হজ্জ থেকে ফিরে তাঁর এক ভাষণে বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি অমুক ব্যক্তি বলেছে, উমরের মৃত্যুর পর সে অমুক ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। কেউ এ ধোঁকায় পড়ে না যে, আবু বকর সিদ্দীকের বাইআত কতিপয় লোকেরা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা সহসাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের খিলাফত সম্বন্ধে ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচিয়েছেন এবং আজ তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে আবু বকর ছাড়া লোকেরা নিজেদের খলীফা করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আবু বকর সিদ্দীকই সর্বোত্তম। ঘটনা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী, হযরত যুবাইয়ের এবং তাঁদের সাথীরা হযরত ফাতেমার গৃহে অবস্থান নেন। সকল আনসার সাহাবী আমাদের থেকে পৃথক হয়ে সাকীফা বনূ সাদাহ গোত্রে সমবেত হন। আর মুহাজির সাহাবীগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট আসেন। আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে বললাম, আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই আনসার সাহাবীদের কাছে চলুন। তিনি আমাদের সাথে যাত্রা করলেন। পথে দু'জন নেককার লোকের সাক্ষাত হয়। তাঁরা আমাদের বললেন, তোমরা আনসারদের নিকট যেয়ো না এবং মুহাজিররা পরস্পরের মধ্যে সিদ্ধান্ত স্থির করে নাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমরা সেখানে যাবই। আমরা সাকীফা বনূ সাদাহ গোত্রে গিয়ে দেখলাম তারা সকলে সেখানে সমবেত এবং তাদের মধ্যভাগে একজন চাদর পরিহিত লোক বসে আছেন। আমি বললাম, তিনি কে এবং তার কি হয়েছে? লোকেরা বলল, সাদ বিন উবাদা অসুস্থ। আমরা গিয়ে বসলে তাদের বক্তা হামদ এবং ছানার পর বলতে লাগলেন, আমরা আনসার, আল্লাহর

সৈনিক। হে মুহাজিরগণ! তোমরা কতিপয় লোক এ ইচ্ছা পোষণ কর যে, তোমরা আমাদের উচ্ছেদ করবে, বের করে দিবে এবং খিলাফতের সাথে সংযুক্ত রাখবে না। তার অভিভাষণ শেষ হলে আমি কিছু বলতে চাইলাম, কারণ এ বিষয়ে পূর্বেই আমি একটি সুন্দর বক্তব্য তৈরী করেছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) বাধা দিলেন। মূলত আমি তাঁর অধীনস্থ ছিলাম। উপরন্তু তিনি আমার চেয়ে বেশি প্রজ্ঞাবান এবং সম্মানিত ছিলেন। এ জন্য আমি নীরব হয়ে গেলাম এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে চাইলাম না। তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহর কসম, আমি যা বলার জন্য পূর্বেই বক্তব্য ঠিক করেছিলাম হযরত আবু বকর শেষ পর্যন্ত সেই বক্তব্যই শুরু করলেন; বরং তার চেয়েও উত্তমভাবে বললেন, তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে প্রশংসা করলে সত্যিই তোমরা তাই। গোটা আরব বিশ্ব অবগত যে, প্রশাসন সর্বদা কুরাইশদের জন্য, কারণ কুরাইশরা (নবীজীর) আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে আরব জাহানের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং খিলাফত সুনির্দিষ্টভাবে কুরাইশদের হক। তিনি আমার এবং আবু উবাইদার হাত ধরে বললেন, আমি খুশি হব যদি এঁদের মধ্য থেকে একজনের হাতে বাইআত করে নাও। হযরত আবু বকর (রা.) যা বললেন, তা সবই আমার মনঃপূত, কিন্তু বাইআতের জন্য আমার নাম ঘোষণা করা আমার পছন্দ হয়নি। আল্লাহর কসম, আমার গর্দান উড়িয়ে দিলেও আমি অনুতপ্ত হতাম না, তবে বিব্রত বোধ করেছিলাম এজন্য যে, আমি সে জাতির শাসনকর্তা কিভাবে হতে পারি যেখানে আবু বকর (রা.) রয়েছেন। আনসারদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আমরাও কুরাইশদের সাহায্যকারী এবং সম্মানিত লোক। ভালো হবে যদি আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং আনসারদের মধ্য থেকে একজনকে শাসক নির্ধারণ করা হয়। এ কথার প্রেক্ষিতে হট্টগোল আরম্ভ হলো। আমার সন্দেহ হলো যেন সংঘাত সৃষ্টি না হয়। আমি হযরত আবু বকরকে বললাম, আপনি হাত দিন। তিন হস্ত প্রসারিত করলেন এবং আমি সর্বপ্রথম বাইআত করলাম, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনসারগণও বাইআত করেন। আল্লাহ, আল্লাহ কী সংকটময় এবং বিস্ময়কর মুহূর্তই না ছিল সেটি। আমার ভয় হচ্ছিল যে, মুসলমানরা যেন বিভক্ত হয়ে না পড়ে। যদি তারা আলাদা বাইআত করত তবে সে ব্যক্তির নিকট আমাদের বাইআত করতে হতো। অথবা যদি আমরা বাধা দিতাম তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

নাসায়ী, হাকেম এবং আবু ইয়ালা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আনসারগণ বললেন, আমাদের এবং আপনাদের মধ্য থেকে একজন করে শাসক নির্ধারণ করা হোক। হযরত উমর বিন

খাত্তাব তাদরে কাছে গিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা জান না রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে তোমাদের নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন তোমরাই ইনসাফ কর যে, তোমাদের মধ্যে হযরত আবু বকরের চেয়ে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম! আনসারগণ বললেন, নাউযুবিল্লাহ, আমরা তাঁর চেয়ে কখনই অগ্রগামী নই।

ইবনে সাদ, হাকেম এবং বাইহাকী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর লোকেরা সাদ বিন উবাদার বাড়িতে সমবেত হন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বরক সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুকও উপস্থিত ছিলেন। জনৈক আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুহাজিরগণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) কাউকে কোথাও পাঠালে আমাদের মধ্য থেকে একজনকে তার সাথী বানিয়ে দিতেন। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত এটাই যে, একজন আমীর আপনাদের মধ্য থেকে এবং একজন আমাদের মধ্য থেকে হোক। এরপর কতিপয় আনসার সাহাবী একই ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কী একথা জান না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজিরদের মধ্য থেকে অন্যতম ছিলেন। সুতরাং তাঁর খলীফাও মুহাজিরদের থেকে হওয়া উচিত। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহায্যকারী ছিলাম, আমরা তাঁর খলীফারও সাহায্যকারী হব। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকরের হাত ধরে বললেন, ইনি তোমাদের নেতা এবং প্রশাসক। এরপর যথাক্রমে তিনি, হযরত উমর, মুহাজিরগণ, আনসারগণ বাইআত গ্রহণ করেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক মিম্বরে আরোহণ করেন এবং উপস্থিত জনতার প্রতি দৃষ্টি ফেরায়ে বললেন, যুবাইরকে দেখা যাচ্ছে না, তাকে ডেকে আনো। তিনি এলে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফুর ছেলে মেয়ে হয়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হয়ে মুসলমানদের দুর্বল করতে চাও, মুসলমানদের কোমর ভেঙে দিতে চাও? হযরত আলী (রা.) বললেন, চিন্তা করবেন না। অতঃপর তিনিও বাইআত করলেন।

ইবনে ইসহাক সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আাস বিন মালিক (রা.) বলেন, বনূ সাকীফার গৃহে বাইআতের পর দিন হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে আরোহণ করেন। তিনি অভিভাষণ প্রদানের পূর্বে হযরত উমর ফারুক (রা.) দাঁড়িয়ে হামদ এবং সালাতের পর বললেন, উপস্থিত জনতা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এমন একজনের নিকট সমবেত করেছেন যিনি সকলের মধ্যে উত্তম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহচর এবং গুহার সাথী। তোমরা দাঁড়াও এবং তাঁর নিকট বাইআত গ্রহণ করো। লোকরো আম বাইআত করলেন। এ বাইআতটি সাকীফার গৃহে বাইআত

অনুষ্ঠিত হওয়ার পরের ঘটনা। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে হামদ এবং ছানার পর বললেন, তোমরা আমাকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দিয়েছ, অথচ আমি তার যোগ্য নই। কারণ আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না। আমি জনহিতকর কাজ করলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, আর অমঙ্গলজনক কাজ করলে আমাকে সুধরিয়ে দিবে। সত্যবাদিতা আমানত আর মিথ্যাচার খেয়ানত সমতুল্য। তোমাদের মধ্য থেকে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট ঐ পর্যন্ত শক্তিশালী যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার বুঝিয়ে দিব। আর অন্যের হক আদায় না করা পর্যন্ত তোমাদের শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল হয়ে থাকবে। যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে সে জাতি অপদস্থ হয়েছে। যে সম্প্রদায়ে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তা'আলা সে সম্প্রদায়কে রোগাক্রান্ত করে দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য না করলে আমার অনুসরণ তোমাদের জন্য বৈধ নয়। নামায পড়, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন।

মূসা বিন উকবা স্বরচিত মাগাযী গ্রন্থে এবং হাকেম আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এ খুতবা প্রদান করেন যে, আল্লাহর কসম, আমি কখনো রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি, এর প্রতি আমার মোহও ছিল না। এর জন্য প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে প্রার্থনাও করিনি। মূলত আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল এ জন্য যে, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার কোনো আরাম ছিল না। আমার প্রতি এক বিশাল কাজ অর্পন করা হয়েছে, যা আমার গর্দানের বহনযোগ্যতার অতিরিক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার প্রতি আমার ভরসা ছিল। এতদশ্রবণে হযরত আলী এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমরা অনুতপ্ত হলাম, এ কারণে যে, খিলাফতের পরামর্শে কেন আমরা অংশগ্রহণ করিনি। আমরা খুব ভালো করে জানতাম যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকই সবচেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার। কারণ তিনি গুহায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথী ছিলেন। আমরা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অবগত। আমরা এও জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আবু বকরকে নামাযের ইমামতির নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনে সাদ ইবরাহীম তামিমী থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উমর হযরত আবু উবাইদা বিন জাররা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনার হাতে বাইআত করব। কারণ আমি নবী (সা.) আপনাকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলেছেন একথা চাক্ষুষ শুনেছি। আবু উবাইদা (রা.)

বললেন, আমি আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করি, কিন্তু আজ কেন মেধাহীনতার পরিচয় দিলেন। আপনি আমার নিকট বাইআত গ্রহণকরতে চাইছেন, অথচ আপনারদের মধ্যে সিদ্দীক, ছানীয়াছনাইনি এবং ফিল গার জীবিত।

ইবনে সাদ মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, হযনত আবু বকর হযরত উমরকে বলেছিলেন, হাত দাও আমি তোমার হাতে বাইআত করতে চাই। হযরত উমর বললেন, আপনি আমার চেয়ে বেশি বুযুর্গ। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তুমি আমার চেয়ে আমার বেশি শক্তিশালী। এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। অবশেষে হযরত উমর বললেন, আপনি আমার চেয়ে বেশি বুযুর্গ এবং আমার প্রতাপ আপনার জন্য থাকবে। অতঃপর তিনি বাইআত করেন।

আবদুর রহমান বিন আউফ রা. বলেন, নবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকর মদীনার অন্য কোথাও ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে আসেন এবং চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু দিয়ে বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। জীবিত অবস্থায় তিনি যেমন সুশ্রী এবং পবিত্রতম ছিলেন, মৃত্যুর পরও অনুরূপ সুদর্শন এবং পবিত্রতম রয়েছেন। কাবার রবের কসম, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেন, অতঃপর হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর আনসারদের নিকট গমন করেন। হযরত আবু বকর সেখানে গিয়ে ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে আনসারদের সম্বন্ধে কুরআন এবং হাদীসে বিধৃত সকল প্রশংসার উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি সমস্ত লোক এক বনে আর আনসারগণ অন্য বনে চলে যায় তবে আমি আনসারদের সাথেই যাব। হে সাদ! একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের সামনে বলেছিলেন, খিলাফত কুরাইশদের জন্য ভালো লোকেরা ভালো কাজের এবং মন্দ লোকের মন্দ কাজের আনুগত্য করবে। সাদ জবাবে বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। আমরা মন্ত্রী, আর আপনারা বাদশাহ। (আহমদ)

ইবনে আসাকির আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বাইআত গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক চেহারা দেখে ধারণা করলেন কিছু লোকের মাঝে অসন্তোষের ছাপ বিরাজ করছে। তাই তিনি বললেন, হে লোকসকল! কোন কাজ তোমাদের অসন্তুষ্ট করে রেখেছে। আমি কি সর্বপ্রথম মুসলমান হয়নি?.... হয়নি?... হয়নি? তিনি নিজের কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে আমি সবচেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার।

আহমদ লিখেছেন, রাফে তাঈ বর্ণনা করেন, আমার কাছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের খিলাফতের সকল ঘটনাবলী বলে শুনিয়েছেন। হযরত উমর এবং আনসার সাহাবীগণ যা বলেছেন তা ব্যক্ত করে তিনি (আবু বকর) বলেন, অতঃপর আমার নিকট লোকেরা বাইআত গ্রহণ করে এবং এ কারণে আমি খিলাফতের দায়িত্ব নিলাম যে, কোথাও যেন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় এবং চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার পর লোকরো যেন মুরতাদ না হয়ে যায়।

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে আবেদ কিতাবুল মাগাযী রাফে থেকে বর্ণনা করেন, আমি আবু বকর সিদ্দীকের নিকট আরয করলাম, আপনি আমাকে দু'জন লোকের শাসন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, অথচ আপনি নিজেই শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি তাদের নিন্দাকারী নই। উম্মতে মুহাম্মদীয়া বিভক্ত হয়ে যাবে বলে আমার আশঙ্কা ছিল।

কায়েস ইবনে আবু হাযেম বলেন, নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যুর এক মাস পর আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেদমতে বসেছিলাম। তিনি বাইয়াতের সকল ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। ইত্যবসরে নামাযের ঘোষণা দেয়া হলো। সাহাবীগণ সমবেত হলেন। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, উপস্থিতি! আমি স্বেচ্ছায় সম্মত যে, তোমরা অন্য কাউকে খলীফা বানিয়ে নাও। কারণ যদি তোমরা আমার মধ্যে নবী (সা.)-এর হুবুহ পথ খুঁজে পেতে চাও, তবে তা আমার ক্ষমতার অতীত। কেননা, নবী করীম (সা.) শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন এবং তাঁর নিকট ওহী আসত।

হাসান বসরী (র.) থেকে নকল করে ইবনে সাদ লিখেছেন, বাইআত গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও সানার পর বললেন, 'হে আল্লাহর রসূলের সাহাবীগণ! যদিও আমি খলীফা হয়েছি, কিন্তু এতে আমি খুশি নই। আল্লাহর কসম, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এ কাজের দায়িত্ব নিতে চায় তবে সে নিজ হাতে তা গ্রহণ করুক। যখন তোমরা এ গুরুভার একতাবদ্ধ হয়ে আমার উপর চাপিয়েছ তখন আমি অবিকল নবী (সা.)-এর মতো করে চালাতে পারব না, তা সম্ভবও নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ওহী নাযিল হতো। আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমি কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে সঠিক পথ অনুসরণ করতে দেখবে, আমার অনুসরণ করবে। আর চুল পরিমাণ বিচ্যুতি দেখলে সংশোধন করে দিবে। স্মরণ রেখো, শয়তান আমার সাথেও লেগে আছে। যখন আমি রাগান্বিত হবো তখন আমার থেকে পৃথক হয়ে

যাবে। কবিতার মাধ্যমে আমার প্রশংসা গাঁথা আবৃত্তি করবে না।

ইবনে সাদ এবং খতীব মালিক এবং তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর তাঁর ভাষণে হামদ ও সানা পড়ে বললেন, যদিও আমি তোমাদের নেতা, কিন্তু আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। কুরআন নাযিল হয়েছে, নবী করীম (সা.) সুন্নতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা তা খুব ভালো করে বুঝি নিয়েছি–তোমরা সে পথই অনুসরণ করবে। বুদ্ধিমান সেই যে পরহেযগার। আর পাপাসক্ত ব্যক্তি হলো সব চেয়ে বেশি বোকা। জনতার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি মিল্লাতের নিকট দুর্বল। হে উপস্থিতি! আমি সুন্নতের অনুসারী, বিদা'তী নই। ভালো কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবে। আর মন্দ কাজ করতে দেখলে সাবধান করে দিবে। আমি এতটুকুই বলতে চাই। আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের এবং তোমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, উল্লিখিত শর্তাবলী ছাড়া কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না। হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মক্কা শরীফে চরম ব্যাকুলতা এবং বিলাপের সুর উঠে। হযরত আবু কুহাফা ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, আফসোস, অনেক বড় কাজ এবং গুরুদায়িত্ব এসে গেল। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, নবীজীর স্থানে কে বসবেন? বলা হলো, আপনার ছেলে? তিনি বললেন, বনূ আব্দে মানাফ এবং বনূ মুগীরা গোত্রদ্বয় কি তা মেনে নিবে? বলা হলো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে বড় করতে চান তাকে কেউ ছোট এবং যাকে ছোট করতে চান তাকে কেউ বড় করতে পারবে না।

ওকেদী কয়েক পদ্ধতিতে আয়েশা সিদ্দীকা, ইবনে উমর, সাঈদ বিন মুসায়্যাব ইন্তেকালের দিন একাদশ হিজরীর বারো রবিউল আউয়াল সোমবারে বাইআত গ্রহণ করেন।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কখনো মিম্বরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থানে বসেননি, এভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। হযরত উমর ফারুক হযরত আবু বকর সিদ্দীকের স্থানে এবং হযরত উসমান গনী হযরত উমর ফারুকের স্থানে জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত বসেননি।

বিবিধ ঘটনাবলী

হযরত উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আরবের কতিপয় লোক মুরতাদ হয়ে বলতে লাগল, আমরা নামায পড়ব, কিন্তু যাকাত দিব না। আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি মানুষের মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করুন। তারা তো অসভ্য জাতি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমি তোমার সহযোগিতা কামনা করতাম, কিন্তু তুমি আমার ভাবনার প্রাসাদ ধ্বংস করেছ। অন্ধকার যুগে তুমি বড়ই কার্যক্ষম ব্যক্তি ছিলে। ইসলাম গ্রহণ করে তুমি অলস হয়ে গেছ। আমি তাদের মনকে কিভাবে আকৃষ্ট করব? আল্লাহ ক্ষমা করুন আমি কি তাদের জাদু করব? আফসোস, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, ওহী বন্ধ হয়েছে। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি দড়ি দিতেও অস্বীকার করে, আমার হাতে তলোয়ার থাকা পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব, হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তাকে এ কাজে এত বেশি কঠোর হস্তে দেখেছি যে, তিনি এভাবেই মানুষকে সঠিক পথে এনেছেন।

আবুল কাসেম বাগবী এবং আবু বকর শাফেঈ স্বচিত ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালে অপবিত্রতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আরবের বৃহৎ অংশ মুরতাদ হয়ে যায়। আনসারগণ পৃথক হয়ে যান। পাহাড়ও এ সমস্যাগুলো বহন করতে পারত না। কিন্তু আমার পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বিস্ময়কর ধৈর্যের সাথে সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করেছেন এবং মতভেদযুক্ত প্রতিটি মাসয়ালার সঠিক সমাধান দিয়েছেন। নবী করীম (সা.)-কে কোথায় সমাহিত করা হবে তা নিয়ে সর্বপ্রথম মতভেদ দেখা দেয়। সকলেই এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন এবং কেউ কিছু জানতেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর স্থানেই প্রত্যেক নবীকে সমাহিত করা হয়। দ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিরাস নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, নবীদের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। তাদের সকলের সম্পদ সদকা হিসেবে বিবেচিত।

উলামায়ে কেরাম বলেন, সর্বপ্রথম নবী (সা.)-এর দাফন নিয়ে মতভেদ হয়। কতিপয় সাহাবী বলেন, নবীর জন্মস্থান মক্কা শরীফে দাফন করা উচিত। কেউ বলেন, মসজিদে নব্বীতে; কেউ বলেন, জান্নাতুল বাকীতে, কেউ আবার বাইতুল মুকাদ্দাসের কথা বলেন, অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ সম্বন্ধে যে অভিমত

প্রকাশ করলেন, তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো।

ইবনে যানজুয়া বলেন, এটা হযরত আবু বকরের হাদীসই ছিল। কিন্তু সকলই মুহাজির ও আনসারকে তাঁর বিশাল জ্ঞানের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিল। বইহাকী এবং ইবনে আসাকির আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কসম, আবু বকর খলীফা না হলে পৃথিবীতে কেউ ইবাদত করত না। তিনি এভাবে তিনবার বললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা আপনি একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উসমা বিন যায়েদকে সাতশ' সৈন্যসহ রোমে প্রেরণ করেন। তিনি শুষ্ক সীমানা অতিক্রম না করতেই হুযূর (সা.) ইন্তেকাল করেন এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী আরব জনগোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে যায়। সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের নিকট আরয করলেন, আপনি উসামা বাহিনীকে ফিরিয়ে নিন। কারণ মদীনার পার্শ্ববর্তী লোকেরা মুতরাদ হয়ে গেছে। এখন আর তার প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর পয়গম্বরের বিবিদের পা নিয়ে কুকুরের দল টানা হেঁচড়া করে তবুও রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বাহিনী প্রেরণ করেছেন তা আমি ফিরিয়ে নিবো না এবং তিনি যে পতাকা উড়িয়েছেন তা নামিয়ে নিব না। সুতরাং তিনি উসামা বাহিনীকে পুনঃপ্রেরণ করলেন। উসামা পথিমধ্যে যে গোত্রের মুখোমুখী হয়েছেন সকল গোত্রই বাধা দিয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে। ফলে তারা পরস্পরে এ কথা বলেছে যে, যদি মুসলমানদের শক্তি না থাকত তবে এ মুহূর্তে তারা অন্য জাতির প্রতি সৈন্য প্রেরণ করত না অতএব দেখুন, রোমানদের মোকাবিলায় ফলাফল কি হয়েছিল। যখন এ বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করে তখন উভয় দিক থেকে আক্রমণ হয় এবং মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে নিরাপদে ফিরে এলে সকলেই ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে।

হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমূর্ষ অবস্থায় উসামা বাহিনীকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হযরত উসামা জরফ নামক স্থানে পৌঁছিলে তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়েস লোক মারফত জানালেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্তিম শয্যায় শায়িত, আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল হলে হযরত উসামা হযরত আবু বকরের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে রোম সাম্রাজ্যে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সংকটময় অবস্থা। আমার আশংকা হচ্ছে আরবের লোকেরা মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। যদি

তারা মুরতাদ হয়ে যায় তবে সর্বপ্রথম আমি তাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তারা মুরতাদ না হয় তবে আমি চলে যাব। আমার সাথে যে সব তরুণ সৈনিক এবং বড় বড় সরদারগণ ছিলেন তাদের আমি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইছি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রাণ বিপন্ন হয় এবং হিংস্র পক্ষীকুল আমার শরীরের গোশত খেয়ে ফেলে তবুও আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ সামান্যতমও সংশোধন এবং পরিমার্জন করব না। এ বলে তিনি উসামা বাহিনী পুনঃপ্রেরণ করলেন। (ইবনে আসাকির)

যাহাবী বলেন, মদীনার চারিদিকে নবীজী (সা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনেক গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাদরে নিকট সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত উমর বাধা দেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ছাগলের বাচ্চার যে যাকাত দিত তা এক বছরের জন্য দিতে অস্বীকার করলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা.) বললেন, আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে বলেছেন– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ না বলা পর্যন্ত আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করব এ কালেমা পাঠ করলে তার জান এবং মাল আমার জিম্মায়। কিন্তু যাকাত দিতে হবে, এর হিসাব আল্লাহর জিম্মায়। এবার বলুন কিভাবে যুদ্ধ হতে পারে? সিদ্দীকে আকবর বললেন, আল্লাহর কসম, নামায এবং যাকাতের মধ্যে পরিবর্তন করার জন্য আমি যুদ্ধ করব। কারণ যাকাত মালের হক এবং নবী করীম (সা.) বলেছেন, যাকাত আদায় করতে হবে। উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকরের বক্ষ খুলে দেয়া হয়েছিল। আমিও বুঝলাম তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হযরত উরওয়া রা. বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মুহাজির এবং আনসারদের নিয়ে নজদের নিকটবর্তী হয়ে মুরতাদদের পরাজিত করলে কতিপয় মন্দ চরিত্রের লোকরা নিজেদের বিবি-বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যায়। ফলে লোকেরা তার নিকট আরয করল, আপনি ফিরে যান এবং সৈনিকদের মধ্যে একজনকে সেনাপতি বানিয়ে বাহিনী প্রেরণ করুন। লোকেরা এ ব্যাপারে জোরাজুরি করলে তিনি খালিদ বিন ওলীদকে সেনাপতি বানিয়ে ফিরে এলেন। আসার সময় বললেন, তারা ইসলামে ফিরে এলে এবং যাকাত দিতে সম্মত হলে তোমাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছে মদীনায় ফিরে যেতে পারবে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, সিদ্দীকে আকবর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে জিহাদে যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আলী অশ্বের রজ্জু ধারণপূর্বক বললেন, আমি আপনাকে সে কথাই বলতে চাই যা নবী (সা.) উহুদ যুদ্ধে আপনাকে বলেছিলেন, অসি কোষবদ্ধ করুন, যাতে আকস্মিক কোনো ঘটনাই না ঘটে এবং আপনি মদীনায় ফিরে চলুন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ না করুন যদি আপনার কিছু হয় তাহলে এখানে এমন কেউ নেই যিনি ইসলামের ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখবেন। (দারে কুতনী)

খানযালা বিন আলী লাইসী বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক যখন হযরত খালিদ বিন ওলীদকে বাহিনীর আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন তখন এ নসিহত করলেন যে, তাদেরকে পাঁচটি আহকাম পালনের নির্দেশ দিবে। যদি একটি হুকুমও তারা অস্বীকার করে তবে তাদের সাথে এমনভাবে লড়াই করবে পাঁচটি আহকাম অস্বীকারকারীদের সাথে যেভাবে লড়াই করো। আর সেই পাঁচটি আহকাম হলো–

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

২. নামায পড়তে হবে।

৩. যাকাত দিতে হবে।

৪. রোযা রাখতে হবে।

৫. বাইতুল্লাহ শরীফে এসে হজ্জ আদায় করতে হবে।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ তাঁর বাহিনী নিয়ে জমাদিউল আখের মাসে রওয়ানা করেন। বনী আসাদ এবং গাতফান গোত্রের সাথে তার যুদ্ধ হয়। অনেক মুরতাদ নিহত, অনেক বন্দী এবং বাকীরা আবার মুসলমান হয়। সাহাবীদের মধ্যে আকাশা বিন মুহসিন এবং সাবেত বিন আকরাম খালেদ বিন ওলিদ (রা.) এর সাথে ছিলেন। এ বছর রমযান মাসে নবী দুহিতা জান্নাত নেত্রী হযরত ফাতেমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। যাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধারা হযরত ফাতেমা থেকেই সূচিত হয়।

যুবায়ের বিন বাকার বলেন হযরত ফাতেমার এক মাস পূর্বে হযরত উম্মে আয়মন ইন্তেকাল করেন এবং শাওয়াল মাসে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের মৃত্যু হয়। যাহোক এ বছরের শেষ দিকে হযরত খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করার জন্য ইয়ামামায় পৌঁছলে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে

যায়। অবেশেষে কয়েকটি দুর্গ বিজিত হওয়ার পর হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী মুসায়লামাকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় যাঁরা শহীদ হন তারা হলেন আবু হুযাইফা বিন উতবা, আবু হুযাইফার গোলাম সালিম, শুজা বিন ওহাব, যায়েদ বিন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ বিন সহল, মালিক বিন আমর, তোফায়েল বিন আমর দৌসী, ইয়াযিদ বিন কায়েস, আমের বিন বাকার, আব্দুল্লাহ বিন মুহরেমা, সায়িব বিন উসমান বিন মাজউন, উবাদা বিন বশর, মাআন বিন আদী, সাবিত বিন কায়েস বিন শামাস, আবু দোজানা, সামাক বিন হরব প্রমুখ।

মুসায়ালামা কায়যাবের বয়স হয়েছিল দেড় শত বছর। নবী করীম (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ চেয়েও বয়সে বড় ছিল।

দ্বাদশ হিজরীতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আলা-বিন হাযরামীকে বাহরাইনে পাঠান। সেখানেও লোকেরা ধর্ম ত্যাগ করেছিল। জাওয়াছী নামক স্থানে লড়াই হয়। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেন। ওমানেও এ ফেতনা মাথাচাড়া দেয়ার কারণে ইকরামা বিন আবু জাহেলকে তাদের দমনের জন্য পাঠানো হয়। আবু উমাইয়াকে মুহাজিরদের দলপতি করে বাহীরে এ ফেতনা দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়। যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারীকে একদল ধর্মত্যাগীকে শায়েস্ত করার জন্য আরেক দিকে পাঠানো হয়। এ বছর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামাতা আবুল আস বিন রবীআ ইন্তেকাল করেন। সআব বিন জিছামা লাইছী এবং আবু মুরছাদ গুনুভীও এ বছর পরলোকগমন করেন।

মুরতাদদের ফেতনা দমনের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদকে বসরায় প্রেরণ করেন এবং লড়াই করে আয়লা শহর বিজিত করেন। অতঃপর কিছু সন্ধি কিছু যুদ্ধ করে ইরাকের মাদায়েন শহর দখল হয়। দ্বাদশ হিজরীতে বাইতুল্লাহ যিয়ারত থেকে ফিরে এসে আমর বিন আসকে শামে প্রেরণ করেন। শামে তেরো হিজরীতে যুদ্ধ হয় এবং বিজয়ের মুকুট মুসলমানদের মাথায় প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট যখন এ সুসংবাদ পৌঁছে তখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রী। এ যুদ্ধে ইকরামা বিন আবু জাহেল এবং হিমাম বিন আসসহ অন্যান্য সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মরজুস সফর যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়। এ ঘটনায় অন্যান্যদের সাথে ফজল বিন আব্বাস (রা.) শহীদ হন।

কুরআন একত্রিত করার বিবরণ

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে দেখলাম তাঁর নিকট হযরত উমর (রা.) নীরবে বসে আছেন। হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, উমর আমাকে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক মুসলমান কারী শহীদ হয়েছেন। আমার ভয় হয় যদি এভাবে মুসলিম কারীগণ শহীদ হতে থাকেন তাহলে হাফেজদের সাথে কুরআন শরীফও উঠে যাবে। অতএব আমি কুরআনকে একত্রিত করতে চাই। আমি বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি যা নবী করীম (সা.) স্বয়ং করেননি। হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, এটা পুণ্যের কাজ, এতে কোনোই ক্ষতি নেই। তিনি বারবার অনমনীয়ভাবে একথা বলেছিলেন, অবশেষে বিষয়টি ভালোভাবে আমর বুঝে আসলো।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) নীরবে শুনছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) আবার আমাকে বললেন, তুমি তরুণ এবং বুদ্ধিমান। তোমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগও নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওহী লেখক। সুতরাং অনুসন্ধান করে তুমি কুরআন জমা করো।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, এ কাজটি আমার নিকট অত্যন্ত দুঃসাধ্য মনে হলো। আমাকে যদি পর্বত উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হতো তাহলে আমি একে তার চেয়ে হালকা মনে করতাম। আমি আরয করলাম, আপনারা দু'জন কেন এ কাজ করতে চাইছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেননি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, এ কাজে কোনোই ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম এবং আমি নিজেকে এ কাজের অনুপযোক্ত মনে করলাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর চক্ষু খুলে দিলেন এবং বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুধাবন করলাম। আমি অনুসন্ধান শুরু করলাম এবং কাগজের টুকরো, উট এবং ছাগলের রানের হাড়, গাছের পাতা, হাফেজদের মুখস্থ স্তান থেকে কুরআন সংগ্রহ করে জমা করলাম। আর সূরা তওবার দু'টি আয়াত- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ হযরত খুযাইমা বিন সাবেত (রা.) ছাড়া অন্য কারো নিকট পাইনি। কুরআন জমা করে আমি তা হযরত আবু বকরের খেদমতে পেশ করলাম, যা মৃত্যু অবধি তাঁর কাছেই ছিল। অতঃপর তা হযরত উমরের হস্তগত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) তা সংরক্ষণ করেন। আবু ইয়ালা হযরত আলীর বরাত দিয়ে বলেন, কুরআন শরীফ জমা করার সবচেয়ে বেশি সওয়াব হযরত আবু বকর

সিদ্দীকের প্রাপ্য। কারণ তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে রূপ দেন।

সর্বপ্রথম তিনি যা করেছেন

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম কুরআন জমা করেছেন এবং কুরআনকে মাসহাফ নাম দিয়েছিলেন। তাঁকে সর্বপ্রথম খলীফা বলা হয়েছে।

আহমদ আবু বকর বিন আবু মালিকা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরকে আল্লাহর খলীফা বলা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের খলীফা। আমি এতেই সন্তুষ্ট এবং এই আমার অহংকার। তিনি সর্বপ্রথম খলিফা যিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় খলীফা হন। তিনিই সর্বপ্রথম খলীফা যাঁর প্রজারা তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছিল।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমার সম্প্রদায় অবগত যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের খরচ যোগাতে সমর্থ নয়। আবার আমি খিলাফতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ফলে আমার কোনো উপার্জন নেই। সুতরাং আমার পরিবারকে আমি বাইতুল মাল থেকে খাদ্য দিব।

ইবনে সাদ আতা বিন সায়েব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বাইআতের দ্বিতীয় দিবসে কিছু চাদর নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। হযরত উমর (রা.) আরয করলেন, কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন, বাজারে। হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি এগুলোর (ব্যবসা) ছেড়ে দিন। আপনি জনগণের খলীফা। তিনি বললেন, আমার পরিবার কি খাবে? হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি চলুন, আপনার জন্য আবু উবায়দা (ভাতা) নির্ধারণ করবেন। তাঁরা হযরত আবু উবায়দার নিকট গমন করে বললেন, আমরা আপনার নিকট হযরত আবু বকর (রা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যে একজন মধ্যম মানের মুহাজিরের খোরাকী নির্ধারণ করে নিত্যদিনের খোরাকী এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক নির্ধারণ করুন। কিন্তু যখন এগুলো পুরাতন হয়ে যাবে। তখন এগুলোর পরিবর্তে নতুন কাপড় নিয়ে নিবে। তিনি হযরত আবু বকরের জন্য প্রতিদিনকার খাবার হিসেবে অর্ধেক ছাগলের গোস্ত শরীর ঢাকা উপযোগী কাপড় এবং পেট ভর্তি রুটি নির্ধারণ করলেন।

ইবনে সাদ মাইমুন থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সময় তাঁর জন্য বার্ষিক দু'হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়। ফলে তিনি বলেন, আমার পারিবারিক পরিসর বৃহৎ। এতে আমার চলবে না।

তোমাদের প্রদত্ত খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে ব্যবসা করতে বাধা দিচ্ছে- কিছু বাড়িয়ে দাও। ফলে পাঁচশ দিরহাম বৃদ্ধি করা হলো।

তাবারানী স্বরচিত মুসনাদ গ্রন্থে হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর মৃত্যুর সময় আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেন, যতক্ষণ মুসলমানদের কাজ করব যে উটনীর দুধ আমি পান করি, যে পেয়ালা এবং চাদর আমি ব্যবহার করি তা আমার জন্য বৈধ। আমার মৃত্যুর পর সেগুলো উমরকে দিয়ে দিবে। কারণ সেগুলো বাইতুল মাল থেকে নেয়া হয়েছে। তার মৃত্যুর সময় সেগলো হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উমরের নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু বকরের প্রতি রহম করুন। তিনি তাঁর এ সকল কষ্ট আমার কারণে সহ্য করেছেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়ার আবু বিন হাফস থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকর (রা.) আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেন, হে আমার কন্যা! যদিও আমি মুসলমানদের খলীফা ছিলাম, কিন্তু আমি কখনই অর্থ-সম্পদ অর্জন করিনি। খুব সাধারণভাবেই খানা-পিনা করেছি। হাবশী গোলাম, উটনী এবং পুরাতন চাদর ছাড়া বাইতুল মাল থেকে আমি আর কিছু গ্রহণ করিনি। আমার মৃত্যুর পর এগুলো উমরের নিকট পাঠিয়ে দিও।

তিনি সর্বপ্রথম বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে সাদ সহল বিন আবী খাইছামা থেকে বর্ণনা করেন, সিদ্দীকে আকবরের যুগে বাইতুল মালে কোনো পাহারাদার ছিল না। লোকেরা বলল, আপনি বাইতুল মালে কেন পাহারাদার নিয়োগ করেননি? তিনি বলনে, তালা লাগিয়ে রাখার পরও পাহারাদারের প্রয়োজন কি? বস্তুত বাইতুল মালে কিছু এলেই তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো এবং বাইতুল মাল শূন্য হয়ে থাকত। এক বছর পর বাইতুল মাল হযরত আবু বকর তার বাড়িতে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যান। যখনই মাল আসত তিনি তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনও উট, ঘোড়া, অস্ত্র কিনে আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন। একবার তিনি চাদর কিনে মদীনায় বিধবাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাহিত করে হযরত উমর কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী যাঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং উসমান বিন আফফান ছিলেন। তাঁদের নিয়ে হিসাব পরীক্ষা করার জন্য বাইতুল মালে গিয়ে দেখেন আল্লাহর নাম ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

আমার (গ্রন্থকারের) মতে উক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা রাওয়েলে আসকারীদের মতামত খণ্ডিত হয়েছে। তাদের মতে বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠাতা হযরত উমর

(রা.) তাদের এ অভিমতটি আমি তাদের এক গ্রন্থে দেখেছি। তাদের আরেক রচনায় আমি এও দেখেছি যে, হযরত আবু বকরের বাইতুল মালের সর্বপ্রথম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন হযরত আবু উবায়দা। হাকেম বলেন, হযরত আবু বকর ইসলামের প্রাথমিক যুগে আতীক উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে জাবের (রা.) বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, যদি বাহরাইন থেকে মালে গনীমত আসে তবে আমি তোমাকে এই এই দিব। তাঁর ইন্তেকালের পর বাহরাইন থেকে মালে গনীমত এলে সিদ্দীকে আকবর ঘোষণা দিলেন যে, এমন কেউ আছ যে নবীজীর কাছে কিছু পাবে, অথবা তিনি তোমাদের কাউকে কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? আমি উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, এখান থেকে গ্রহণ করো। আমি গ্রহণ করলাম, যা গণনা করে পাঁচশত মুদ্রা হলো, কিন্তু তিনি আমাকে দেড় হাজার মুদ্রা দিলেন।

দয়া ও নম্রতা

ইবনে আসাকির উনাইসা থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর খিলাফতের পূর্বে তিন বছর এবং খিলাফতের পর এক বছর আমার সঙ্গে ছিলেন। যখন পাড়ার মেয়েরা ছাগল নিয়ে আসতেন তখন তিনি দুধ দোহন করে দিতেন।

হযরত মাইমুনা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকরের নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি বললেন, সকল মুসলমানের প্রতিও। (আহমদ)

ইবনে আসাকির আবু সালিম গিফারী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) জনৈক পঙ্গু ও অন্ধ বৃদ্ধার সেবা করতেন। সে মদীনার পার্শ্বে বসবাস করত। তিনি তাঁকে খাওয়াতেন। একদা তিনি তাঁর কাছে গেলে বৃদ্ধা বলল, আপনি আসার পূর্বে কে যেন এসে প্রতিদিন আমার সেবা করে যান। তিনি আশ্চর্য হন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর বেরিয়ে আসেন। সে সময় তিনি খলীফা। তাঁকে দেখে হযরত উমর বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি ছাড়া সেই ব্যক্তি কেউ হতে পারেন না।

আবু নুয়াঈম প্রমুখ আব্দুর রহমান আসবাহানী থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর মিম্বরে আরোহণ করেছিলেন। ইত্যবসরে ইমাম হাসান বিন আলী এসে পড়লেন। সে সময় তিনি কিশোর। বললেন, এ মিম্বর আমার বাবার,

আপনি নেমে যান। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ, এ মিম্বর তোমার বাবার। এই বলে তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলিনি। তিনি বললেন, তুমি সত্যই বলেছ, আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবী করীম (সা.) সেখানে হযরত আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন। এরপরের বছর নবী করীম (সা.) হজ্জ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হলে তিনি সর্বপ্রথম হযরত উমরকে হজ্জ করার জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) খলীফা হলে তিনি সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফকে হজ্জের জন্য প্রেরণ করেন। আর হযরত উমর (রা.) পরের বছর থেকে মৃত্যু অবধি প্রতিবার হজ্জ করেছেন। হযরত উসমান খলীফা হয়েও তিনি সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফকেই হজ্জ করার জন্য পাঠান।

অসুস্থতা, মৃত্যু, উপদেশ এবং উমরকে খলীফা নির্ধারণ

সাঈফ এবং হাকেম (রহ.) ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সিদ্দীকে আকবরের মৃত্যুর কারণ ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁর জীবন বিপন্ন হয় এবং সর্বদা দুর্বল হতে থাকেন। অবশেষে তিনি পরপারে যাত্রা করেন। ইবনে সাদ (রহ.) এবং হাকেম (রহ.) ইবনে শিহাব থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে লিখেছেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট হাদিয়ার গোশত আসে। তিনি হারেছ বিন কিলদাহর সাথে তা আহার করেন। হঠাৎ হারেছ বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি আহার করবেন না। আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় এতে বিষ মিশানো আছে। আপনি দেখে নিবেন আমরা উভয়ে একই বছর একই দিনে ইন্তেকাল করব। হযরত আবু বকর খানা থেকে হাত সংকুচিত করলেন। সেদিন থেকে তারা দু'জনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে এক বছর পর উভয়ে এক দিনেই পরলোক গমন করেন।

শা'বী বলেন, এ দুনিয়ায় আমরা আর কি আশা করতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর উভয়েকে বিষ খাওয়ানো হয়।

ওকেদী এবং হাকেম (রহ.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণনা করেন,

হযরত আবু বকরের অসুস্থতা এভাবে শুরু হয়েছিল যে, তিনি জমাদিউল আখের মাসের ৭ তারিখ সোমবারে গোসল করেন। সেদিন ঠাণ্ডা পড়েছিল। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। পনেরো দিন অসুস্থ থাকার কারণে তিনি বাইরে এসে নামায পড়তে পারেননি। অবশেষে ১৩ হিজরীর জমাউদিউল আখের মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে সাদ এবং ইবনে আবিদ দুনিয়া আবুস সফর থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমরা কোন ডাক্তার দেখাই! তিনি বললেন, আমাকে ডাক্তার দেখেছে। তারা বললেন, ডাক্তার কি বলেছেন? তিনি বললেন, বলেছেন اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا اُرِيْدُ (অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি যা চাই তাই করি)।

ওকেদী ভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি আব্দুর রহমান বিন আউফকে ডেকে বললেন, তুমি উমর ফারুককে কেমন মনে করো? আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বললেন, তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানী। তিনি বললেন, এরপরও তোমার কোনো মতামত থাকলে বল। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বললেন, আমার মতে এরচেয়েও তিনি বেশি উত্তম। অতঃপর তিনি হযরত উসমানকে ডেকে একই প্রশ্ন করলেন এবং জবাবে হযরত উসমান (রা.) বললেন, তিনি আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী। তিনি বললেন, তবুও তোমার মতামত পেশ করো। হযরত উসমান (রা. বললেন, তাঁর আভ্যন্তরীণ রূপ বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী। আমাদের মধ্যে তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) এবং উসাইদ বিন হুযায়ের (রা.)-এর সাথেও এ নিয়ে পরামর্শ করেন। উসাইদ (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, আপনার পর হযরত ওমরই সে ব্যক্তি যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্বীয় সন্তুষ্টি মনে করেন এবং আল্লাহ যে কাজে অসন্তুষ্ট তিনিও সে কাজে অসন্তুষ্ট হন। তাঁর ভেতরটা বাইরের চেয়েও উত্তম। এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে দক্ষ ও প্রভাপান্বিত আর কেউ নেই। তারপর অন্যান্য সাহাবাগণ এলেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, আপনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল কঠোর মেযাজের এক ব্যক্তিকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর দরবারে এর কি জবাব দিবেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা আমকে ভীতগ্রস্ত করে ফেললে। তবে আমাকে প্রশ্ন করলে বলব, হে আল্লাহ! আমি মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করেছি। আমি যা বলছি তিনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ।

এরপর তিনি হযরত উসমানকে ডেকে বললেন, লিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ ওসীয়তনামা আবু বকর বিন আবু কুহাফা দুনিয়ার অন্তিম মুহূর্তে এবং পরপারে যাত্রার প্রাক্কালে লিপিবদ্ধ করায়েছেন, যখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস স্থাপন, দুশ্চরিত্ররা চরিত্রবান এবং মিথ্যুকরা সত্যবাদী হয়ে যেতে চায়। হে জনতা! আমি তোমাদের জন্য আমার পর উমরকে খলীফা নির্বাচন করলাম। তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। আমি আল্লাহতাআলা, তাঁর রাসূল, দ্বীন ইসলাম, নিজের এবং তোমাদের সেবায় ত্রুটি করিনি। আমার বিশ্বাস উমর ইনসাফ করবে। যদি এমন হয় তবে আমার অভিব্যক্তি এ অভিমত উপযুক্ত বলে গৃহীত হবে। আর যদি তিনি পরিবর্তন হয়ে যান তাহলে প্রত্যেক লোকের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি তোমাদের নিকট থেকে মঙ্গলময় কাজের আশাবাদী। আমি অদৃশ্যের বার্তা বাহক নই। অত্যাচারী অচিরেই জেনে যাবে যে, সে কোথায় শায়িত হয়েছে। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

এরপর ওসীয়তনামা ভাঁজ করে হযরত উসমানকে দিলেন। তিনি তা নিয়ে চলে এলেন। লোকেরা স্বেচ্ছায় হযরত উমরের নিকট বাইআত করলেন। এরপর হযরত আবু বকর হযরত উমরকে নির্জনে ডেকে যা বলার তা বললেন। হযরত উমর চলে আসার পর হযরত আবু বকর আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, আমি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য এ কাজ করেছি। আমি ফিতনাকে ভয় পেয়ে যা কিছু করলাম তুমি সে ব্যাপারে অবগত। আমি এ সম্বন্ধে ইজতেহাদ (গবেষণা) করেছি এবং আমার মতে, মুসলমানদের জন্য এমন খলীফা নির্বাচন করেছি যিনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রতাবশালী এবং সৎ কাজ প্রত্যাশী। আমি তোমার হুকুমে নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে তোমরই সান্নিধ্যে উপস্থিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনিই স্বীয় বান্দাদের মালিক। বাগডোর আপনারই হাতে। হে আল্লাহ! মুসলিম শাসকদের যোগ্যতা দাও, উমরকে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করো এবং প্রজা সাধারণের উত্তম জীবনযাপন করার তাওফিক দাও।

ইবনে সাদ এবং হাকেম (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বুদ্ধিমানদের মধ্যে তিনজন অধিক বুদ্ধিমান। প্রথমজন হযরত আবু বকর সিদ্দীক। তিনি হযরত উমরকে খলীফা নির্বাচন করেছেন। দ্বিতীয়জন মূসা (আ.)-এর স্ত্রী। তিনি বলেছিলেন اسْتَأْجِرْهُ। (তাকে ভৃত্য বানিয়ে নাও)। তৃতীয় জন আযীযে মিসর। তিনি ইউসুফ (আ.)-এর অনুকূলে অভিমত পেশ করে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন- أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ। (তাকে সুন্দর ভালো স্থানে রাখ)।

ইবনে আসাকির ইয়াসার বিন হামযা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু

বকরের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! আমি তোমাদের জন্য একজনকে খলীফা মনোনীত করেছি, এতে কি তোমরা রাজি আছ? জনতার দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমরা সম্পূর্ণভাবে রাজি। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে হযরত আলী বললেন, যদি সেই ব্যক্তি উমর হন তবে আমরা রাজি আছি। তিনি বললেন, না তিনি উমর-ই।

আহমদ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুর সময় জিজ্ঞেস করেন, আজ কি বার? লোকেরা বলল মঙ্গলবার। তিনি বললেন, যদি আজ রাতে আমার মৃত্যু হয় তবে সমাহিত করতে কালকের অপেক্ষা করবে না। নবী (সা.)-এর কাছে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি ততই মঙ্গল।

ইমাম মালেক (রহ.) আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বাগানের বিশ ওস্‌ক (এক উটের বোঝা সমপরিমাণ এক ওস্‌ক) খেজুর দিয়ে তিনি মৃত্যুর সময় বললেন, মা! আল্লাহর কসম, আমি সর্ব অবস্থায় তোমাকে খুশী দেখতে চাই। তোমার চেয়ে বেশি ধনী আমি কাউকে পছন্দ করি না। তোমার দুস্থতা আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি তোমাকে যে খেজুর দিলাম তা যদি গ্রহণ করো তবে ভালো। অন্যথায় আমার মৃত্যুর পর তা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। তোমার অপর দু'বোন এবং ভাই রয়েছে। তাদেরকে কুরআনের বণ্টন নীতি অনুযায়ী ভাগ দেবে। আমি বলাম, বাবা, তাই হবে। যদি এর চেয়েও বেশি সম্পদ তার নিকট থাকত তিনি আমাদের দিয়ে যেতেন। আসমা নামে আমার এক বোন ছিল, কিন্তু তিনি দু'বোনের কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন, তোমার সৎ মা হাবীবা বিনতে খারিজা গর্ভবতী, আমার মনে হয় তার পেটে কন্যা সন্তান রয়েছে।

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে সাদও বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে এতটুকু বৃদ্ধি করেন যে, হযরত আবু বকর হযরত আয়েশাকে বলেন, খারিজার কন্যা গর্ভবতী। আমার ধারণা তার গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি তার ব্যাপারেও তোমাকে ওসীয়ত করছি। তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মে হাবীবা বিনতে খরিজার গর্ভ থেকে উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে সাদ এটাও বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক তার সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন, যেভাবে মুসলমানদের সম্পদ এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয়।

ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, সিদ্দীকে আকবর বলেন, এক. পঞ্চমাংশের চেয়ে আমার নিকট পছন্দনীয় হলো এ. চতুর্থাংশ, যা এক তৃতীয়াংশের চেয়ে উত্তম। সাঈদ বিন মানসুর স্বরচিত সুনান গ্রন্থে যাহ্‌হাক থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু

বকর এবং হযরত আলী এক. পঞ্চামাংশের ওসীয়ত করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ায়িদুয যুহ্দ আল্লাহর গ্রন্থে আয়েশা সিদ্দীকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন. কসম. তিনি এক দেরহামও রেখে যাননি। সবকিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন।

ইবনে সাদ্ প্রমুখ লিখেছেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, সিদ্দীকে আকবরের যন্ত্রণা তীব্র হলে আমি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম, (অর্থ) আপনার বয়সের শপথ, মৃত্যুর হেচকি যখন এসে গেছে এবং অন্তর সংকুচিত হয়ে গেছে তখনও কোনো সম্পদ দিয়ে গেলেন না। তিনি চাদর থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, এ কথা বলো না; বরং বলো- وَجَاءَتْ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ- দেখ আমার এ দু'টি কাপড় ধুয়ে আমাকে কাফন পরাবে। কারণ নতুন কাপড় মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত ব্যক্তির বেশি প্রয়োজন।

আবু ইয়ালা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, অন্তিম মুহূর্তে আমি হযরত আবু বকরের নিকট গিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করলাম, (অর্থ) যার অশ্রু সর্বদা প্রবাহিত হয় তার অশ্রু যখন থেমে যায় না। তিনি বললেন, এ কথা বলো না; বরং বলো وَجَاءَتْ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ ذَالِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ অতঃপর তিনি বললেন , মনে হয় আমি এ রাতেই ইন্তেকাল করব। তিনি মঙ্গলবার রাতে ইন্তেকাল করেন এবং সকাল হওয়ার আগেই তাঁকে দাফন করা হয়।

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ায়িদুল যুহাদ গ্রন্থে বাকার বিন আব্দুল্লাহ মাযানী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরের ইন্তেকালের সময় হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর শিয়রে বসে এ কবিতা পড়েন, (অর্থ) প্রত্যেক আরোহীর একটি মঞ্জিল রয়েছে, আর প্রত্যেক কাপড় পরিধানকারীর একটি করে হলেও কাপড় রয়েছে। তিনি বিষয়টিও বুঝতে পেরে বললেন, এভাবে নয় মা! বরং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَجَاءَتْ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ-
আহমদ হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এ কবিতা পাঠ করেন, (অর্থ) সেই শ্বেত অবয়বে মেঘের বর্ষণ শুরু হয়েছে। তিনি ছিলেন এতিমদের আশ্রয় এবং বিধবাদের সহায়। তিনি এ কবিতা শুনে বললেন, এ পঙক্তি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য।

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ারিদুয যুহাদ গ্রন্থে উবাদা বিন কায়েস থেকে

রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবু বকর মৃত্যুর সময় বলেন, হে আয়েশা! আমার ব্যবহৃত দু'টি কাপড় পরিষ্কার করে আমার কাফন পরাবে। আমি তোমার বাবা। তোমাকে বলে যাচ্ছি যে, যদি আমাকে নতুন কাপড়ে কাফন দেয়া হয় তবে নিষেধ করবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ইবনে আবু মালীকাহ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর ওসীয়ত করেন যে, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে আমীস তাকে গোসল দিবেন এবং আব্দুর রহমান বিন আবু বকর গোসলের কাজে মাকে সাহায্য করবেন।

ইবনে সাদ ইবনে সাঈদ বিন মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবেরর মধ্যবর্তী স্থানে হযরত আবু বকরের জানাযা পড়ান এবং তিনি চার তাকবীল বলেন।

উরওয়া এবং কাসিম বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের কবর যেন নবী (সা.)-এর কবরের বরাবর হয় এজন্য তিনি হযরত আয়েশাকে ওসীয়ত করেন। ইন্তেকালের পর তাঁর কবর এমনভাবে খনন করা হয় যে, তাঁর মস্তক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাঁধের বরাবর ছিল। আর উভয়ের কবর ছিল একই বরাবর।

হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর, হযরত তালহা, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর হযরত সিদ্দীকে আকবরকে কবরে নামান। এ রেওয়ায়েতটি কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকরকে রাতেই সমাহিত করা হয়। ইবনে মুসায়্যাব বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরকে রাতেই সমাহিত করা হয়। ইবনে মুসায়্যাব বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরের ইন্তেকালে মক্কায় কান্নার রোল পড়লে তাঁর পিতা আবু কুহাফা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? লোকেরা বলল, আপনার ছেলের ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এটা কি ধরনের কষ্ট? অতঃপর বললেন, তার স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছেন? বলা হলো, হযরত উমর। তিনি বললেন, মরহুমের সহচর অতি উত্তম।

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হযরত আবু কুহাফা শরীয়তের ফারায়েজ সূত্রে হযরত আবু বকরের যে পরিত্যক্ত সম্পদ পান তা তিনি নাতিদের নিকট ফিরিয়ে দেন। তিনি হযরত আবু বকরের ছয় মাস কয়েকদিন পর ১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে ৯৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, পিতার জীবদ্দশায় আবু বকর ছাড়া কেউ খিলাফত পরিচালনা করেন নি। আর কোনো খলীফার পিতা আবু কুহাফা ছাড়া খলীফার পরিত্যক্ত সম্পদ পাননি।

হাকেম ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দু'বছর সাত মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তারীখে ইবনে আসাকির গ্রন্থে আসমাআয়ী সূত্রে বর্ণিত, খাফফাফ বিন মাযবাহ আসলামী হযরত আবু বকরের মৃত্যুতে এ শোক গাঁথা রচনা করেন, (অর্থ) কোন জীবন্ত প্রাণী অমর নয়। পৃথিবী ধ্বংসশীল। মানুষ এ বিশ্বচরাচরের তিমিরে আচ্ছন্ন। মানুষ চেষ্টা করলে মুক্তি পাবে। যদিও তারা সংগ্রাম করে, কিন্তু তারা শয়তানের ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত। চোখের প্লাবন থেমে গেছে। প্রাণিকুল আজ বিপন্ন, বয়সের কারণে মৃত্যু, আকস্মিক নিহত অথবা অসুস্থতার কারণে মৃত্যু- সব মৃত্যুই মানুষকে পীড়া দেয়। তিনি ছিলেন প্রশান্তির মেঘমালা, তিনি সর্বদা শুষ্ক প্রান্তরে বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পরতেন। কসম আল্লাহর, আবাল বৃদ্ধবণিতা সবাই তার যুগে সুখ ভোগ করেছে।

সিদ্দীকে আকবর কর্তৃক যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে

ইমাম নূদী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর রসূলে আকরাম (সা.) থেকে ১৪২ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। এত কম সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করার কারণ হলো, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর অল্প ক'দিন জীবিত ছিলেন এবং সে যুগে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিল না। হাদীস শ্রবণ, সংরক্ষণ এবং হিফজ করার প্রক্রিয়া তাঁদের পরবর্তী তাবেঈ যুগে ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

আমি (গ্রন্থকার) পূর্বেই হযরত উমরের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছি যে, বাইআতের সময় উমর ফারুক (রা.) বলেছেন, হযরত আবু বকর আনসারদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি এ বিষয়ের প্রকাশ্য দলিল যে, কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানে তিনিই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং পণ্ডিত।

হযরত আবু বকর থেকে যে সকল সাহাবী (২৮ জন) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন, উমর, উসমান, আলী, ইবনে আউফ, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, ইবনে উমর, ইবনে যুবাইর, ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়েদ বিন সাবেত, বারা বিন আযেব, আবু হুরায়রা, উকবা বিন হারেস, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর, যায়েদ বিন আরকাম, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল, উকবা বিন আমের জুহানী, ইমরান বিন হাসীন, আবু বারযা আসলামী, আবু সাঈদ খুদরী, আবু মূসা আশআরী, আবু তোফায়েল লাইছী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, বিলাল, আয়েশা সিদ্দীকা এবং আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুম। আর আসলাম এবং ওয়াসেত আল বাজ্জালীসহ তাবেঈনের একটি বিরাট জামাত তাঁর থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সূত্রসহ আমি হযরত আবু বকর কর্তৃক হাদীসগুলো নিম্নে তুলে ধরলাম,

১। হিজরত সংক্রান্ত হাদীস। (বুখারী, মুসলিম)

২। পানি সংক্রান্ত হাদীস অর্থাৎ, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং জলপ্রাণী মৃত ভক্ষণ জায়েয। (দারা কুতনী)

৩। মিসওয়াক মুখকে পরিষ্কার করে এবং তা ব্যবহার করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। (আহমদ)

৪। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাগলের ঝুঁটি খেয়ে নামায পড়েছেন এবং অযূ করেননি। (বায্যার, আবু ইআলা)

৫। কেউ যেন হালাল খাদ্য খেয়ে অযূ না করে। (বায্যার)

৬। নবী (সা.) নামাযরত অবস্থায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। (আবু ইয়ালা, বায্যার)

৭। যিনি আমার পরে নামায পড়াবেন তিনি একই কাপড় পরিধান করবেন। (আবু ইয়ালা)

৮। যে ব্যক্তি কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে চায়, সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতের অনুসরণ করে। (আহমদ)

৯। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা আমি নামাযে পড়ব। তিনি বললেন, পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

(বুখারী, মুসলিম)

১০। যিনি সকালের নামায পড়বেন আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দিবেন। তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে অনুমান করো না। যে অনুমানের ভিত্তিতে সে নামাযীকে হত্যা করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (ইবনে মাজা)

১১। উম্মতের পেছনে নামায না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে মৃত্যু দেন না। (বায্যার)

১২। যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর ভালোভাবে অযূ করে দু'রাকাত নামায পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। (আহমদ, আসহাবে সুনানে আরবাআ, ইবনে হিব্বান)

১৩। মৃত্যুর স্থানেই প্রত্যেক নবীকে সমাহিত করা হয়। (তিরমিযী)।

১৪। ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। কারণ তারা নবীদের কবরগুলোকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে। (আবু ইয়ালা)

১৫। মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়। (আবু ইয়ালা)

১৬। খেজুরের টুকরো সমপরিমাণ দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ নাও। কারণ সে দান বাঁকাকে সোজা, মৃত্যুকে সহজ এবং ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে। (আবু ইয়ালা)

১৭। ফারায়েজ এবং সদকার হাদীস। (বুখারী, মুসলিম)

১৮। একদা হযরত আবু বকর উটের উপর সওয়ার হলে চাবুক খানা পড়ে যায়। তিনি উট বসিয়ে সেখান থেকে নেমে চাবুকটি কুড়ালেন। লোকেরা বলল, আমাদের কেন নির্দেশ করলেন না? তিনি বললেন, আমার প্রিয়তম নবীজি (সা.) লোকদের নিকট চাইতে আমাকে নিষেধ করেছেন। (আহমদ)

১৯। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন হজ্জ উত্তম? তিন বললেন, যেখানে জোরে জোরে এবং বেশি বেশি তাকবীর বলা হয় এবং অনেক কুরবানী দেয়া হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২০। আসমা বিনতে আমীসের গর্ভে মুহাম্মদ বিন আবু বকর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নেফাস অবস্থায় গোসল করে হজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (বায্যার, তাবারানী)

২১। হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেবার সময় তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। (দারা কুতনী)

২২। রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা বারাআত-এর বিধান মক্কায় পাঠিয়ে নির্দেশ করেন যে, এ বছর থেকে মুশরিকরা আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গ হয়েও তাওয়াফ করবেন না। (আহমদ)

২৩। আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর জান্নাতের একটি অংশ। (আবু ইয়ালা)

২৪। আবুল হাইছামের বাড়ি তালাক সংক্রান্ত হাদীস। (আবু ইয়ালা)

২৫। চান্দী এবং স্বর্ণ এগুলো সমান সমান। যে লেনদেনে কমেবেশি করবে সে জাহান্নামী। (আবু ইয়ালা)

২৬। যে মুমিনের সাথে প্রতারণা এবং কষ্ট দিবে সে অভিশপ্ত জাহান্নামী। (তিরমিযী)

২৭। কৃপণ, উচ্চাভিলাসী এবং অধীনস্তদের নিকট গর্বকারী জালেম বাদশা জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ স্বীয় মনিবের প্রতি আনুগত্যশীল গোলাম জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমদ)

২৮। গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে তাকে আযাদ করেছে। (যিয়াউল মুকাদ্দাসী)

২৯। নবীদের সম্পদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। তাঁদের সকল পরিত্যক্ত সম্পদ সদকা হিসেবে বিবেচিত। (বুখারী)

৩০। নবীদের ওয়ারেস হলেন নবীর স্থলাভিষিক্ত খলীফা। (আবু দাউদ)

৩১। বংশপরিচয় অস্বীকার করা কুফুরী। (বায্যার)

৩২। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার বাবার জন্য। হযরত আবু বকর বলেন, এ থেকে উদ্দেশ্য হলো খোরপোষ দেয়া। (বায়হাকী)

৩৩। যার পা আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে ধুলায় ধূসরিত হবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (বায্যার)

৩৪। আমাকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

৩৫। খালিদ বিন ওলীদের প্রশংসায় বলেন, তিনি আল্লাহর তলোয়ার। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাফির এবং মুনাফিকদের উপর বিজয়ী করেছেন। (আহমদ)

৩৬। উমরের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয় না। (তিরমিযী)

৩৭। মুসলিম সরকার মুসলমানদের প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিলে তার উপর অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার কোনো নফল ও ফরয (ইবাদত) কবুল করবেন না। (আহমদ)

৩৮। মাআযকে সঙ্গেসার (অপরাধের কারণে পাথর নিক্ষেপ হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীস। (আহমদ)

৩৯। ইসতেগফার করার পর তার প্রতি জেদ করবে না। যদিও সে একই কাজ (অপরাধ) দিনে সত্তর বার করে। (তিরমিযী)

৪০। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লড়াই-এর পরামর্শ সংক্রান্ত হাদীস। (তাবারানী)

৪১। وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ-এ আয়াত সংক্রান্ত হাদীস। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৪২। তোমরা এ আয়াত তিলাওয়াত করো, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ- (আহমদ, আইম্মায়ে আরবা, ইবনে হাব্বান)

৪৩। হিজরতের ঐ হাদীস যেখানে গুহায় সিদ্দীকে আকবরের ভীতি দূরীভূত করার জন্য তাদের দু'জনের সাথে আল্লাহ আছেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

৪৪। اَللّٰهُمَّ طَعْنًا وَطَاعُوْنًا - সংক্রান্ত হাদীস। (আবু ইয়ালা)

৪৫। সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (দারা কুতনী)

৪৬। আমার উম্মতের মধ্যে পিঁপড়ার গতির চেয়েও গোপনে শিরক বিস্তার লাভ করবে। (আবু ইয়ালা)

৪৭। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যে দু'আ সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করব। (আল-হাইছাম বিন কালীব, তিরমিযী)

৪৮। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং ইসতেগফার কর। কারণ ইবলিস বলেছে, আমি গুনাহকে ধ্বংস করি, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং ইসতেগফার আমাকে ধ্বংস করে। (আবু ইয়ালা)

৪৯। لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ - এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিচু স্বরে কথা বলব। (বায্যার)

৫০। كل مبسر لما خلق له -সংক্রান্ত হাদীস। (আহমদ)

৫১। যে জ্ঞাতসারে আমাকে মন্দ বলবে এবং আমার কোনো আদেশ অমান্য করবে সে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিবে। (আবু ইয়ালা)

৫২। مَا نَجَاتَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ -সংক্রান্ত হাদীস। (আহমদ)

৫৩। নবী (সা.) আমাকে বলেন, তুমি বলে দাও, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব। আমি রওয়ানা করলাম, পথিমধ্যে উমরের সাথে দেখা...। (আবু ইয়ালা) এ হাদীসটি আবু হুরায়রার বর্ণনা দ্বারা সংরক্ষিত, আবু বকরের দ্বারা নয়।

৫৪। আমার উম্মতের মধ্যে মোর্জীয়া এবং কাদরিয়া এ দু'টি গ্রুপ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (দারে কুতনী)

৫৫। আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। (আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

৫৬। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক কাজের সময় এ দুআ পড়তেন, হে আল্লাহ, আমার জন্য এ কাজ পছন্দনীয় এবং উত্তম করে দিও। (তিরমিযী)

৫৭। اللَّهُمَّ فارج اللهم। দু'আ। (বায্যার, হাকেম)

৫৮। হারাম পন্থায় প্রতিপালিত শরীর অপেক্ষা আগুন শ্রেয়। অপর রেওয়ায়েতে রয়েছে, অবৈধ পথে লালিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু ইয়ালা)

৫৯ শরীরের প্রত্যেক অংশ তোমাদের কর্কশ কথার প্রতিবাদ করবে। (আবু ইয়ালা)

৬০। মধ্যবর্তী শাবানের রাতে আল্লাহ তা'আলা নিচে অবতরণ করেন। সে রাতে কাফির এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করা হয়। (দারা কুতনী)

৬১। প্রাচ্যের খোরাসান থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সূচলা মুখের একদল মানুষ তার অনুগামী হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৬২। আমার প্রতি আল্লাহর এতটুকু মেহেরবানী যে, আমি সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারব। (আহমদ)

৬৩। কিয়ামত দিবসে রাসূলের সুপারিশ সংক্রান্ত হাদীস। (আহমদ)

৬৪। লোকেরা যদি এক দিকে যায়, আর আনসারগণ অন্য দিকে, তবে আমি আনসারদের সাথে থাকব। (আহমদ)

৬৫। কুরাইশগণ এ উম্মতের নেতা। চরিত্রবানরা চরিত্রবানদের এবং মন্দ লোকেরা মন্দ কাজের অনুসারী। (আহমদ)

৬৬। ওমান সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সেখানে এক আরব গোত্র রয়েছে। আমার দূত সেখানে গেলে ওমানবাসী তীর ছুঁড়বে। (আহমদ, আবু ইয়ালা)

৬৭। একদা নবী (সা.) হযরত আবু বকরকে নিয়ে এমন স্থানে গেলেন যেখানে হযরত ইমাম হাসান ছেলেদের সঙ্গে খেলছিলেন। তিনি তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, এর সঙ্গে আলীর চেহারার মিল রয়েছে। (বুখারী) ইবনে কাসীর হাকেমের সূত্র ধরে বলেন, এ হাদীসটি মারফু।

৬৮। উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস। (তায়ালাসী, তাবারানী)

৬৯। পঞ্চমবারে চোরকে হত্যা করবে। (আবু ইয়ালা, দাইলামী)

৭০। রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে আইমানের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। (মুসলিম)

৭১। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম। তিনি হাত দিয়ে কি যেন

সরাচ্ছিলেন। আমরা সেখানে কিছু দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করছেন? তিনি বললেন, দুনিয়া সরাচ্ছি। (বায্‌যার) ইবনে কাসীর অপর হাদীসের মাধ্যমে এ রেওয়ায়েতটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

৭২। একজন বাকী থাকা পর্যন্ত রদবাসীকে হত্যা কর। (তাবারানী)

৭৩। কোন স্থানে বাড়ি তৈরির পূর্বে সেখানের আবাসন, প্রতিবেশি এবং রাস্তা-ঘাট দেখে নিবে।

৭৪। আমার নিকট অসংখ্যাবার দরুদ প্রেরণ করো। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কোনো ব্যক্তি দরুদ পাঠালে সেই ফেরেশতা আমাকে বলে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরুদ পাঠিয়েছেন। (দাইলামী)

৭৫। এক জুমা অপর জুমার কাফফারা...! (আকীলী)

৭৬। আমার উম্মতের জন্য জাহান্নামের উষ্ণতা হবে হাম্মাম খানার উষ্ণতার মতো। (তাবারানী)

৭৭। মিথ্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ মিথ্যাচার ঈমান ধ্বংস করে দেয়। (ইবনে লা-ল)

৭৮। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। (দারা কুতনী)

৭৯। দীন আল্লাহ তা'আলার এক মহান ঝাণ্ডা। এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে তা উত্তোলন করবে। (দাইলামী)

৮০। সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস। (দাইলামী)

৮১। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ পৃথিবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ছায়া এবং বর্শা। প্রতিদিন রাতে তিনি সত্তর সিদ্দীকের সওয়াব প্রাপ্ত হন। আকীলী, ইবনে হিব্বান)

৮২। মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, অবলা নারীর সেবা করলে কি ধরনের সওয়াব পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, আমি তাকে আমার ছায়া দান করব। (ইবনে শাহীন, দাইলামী)

৮৩। হে আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করো। (তাবারানী)

৮৪। প্রাণী শিকার করবে না, বৃক্ষের প্রশাখা এবং মূল কাটবে না, কারণ তারা তাসবীহ পড়ে।

৮৫। আমি নবী হয়ে প্রেরিত না হলে উমর নবী হতেন। (দাইলামী)

৮৬। কাপড়ের ব্যবসা করবে। (আবু ইয়ালা)

৮৭। যে ব্যক্তি নেতা থাকার পরও অন্যের জন্য বিদ্রোহ করবে তার প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা এবং মানবকুলের অভিশাপ, তাকে হত্যা করো। (দাইলামী)

৮৮। যে আমার থেকে জ্ঞান অর্জন করবে অথবা হাদীস লিখবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞান ও হাদীস সংরক্ষিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সওয়াব পেতেই থাকবেন। (হাকেম)

৮৯। যে নাঙ্গা পায়ে আল্লাহর পথে বের হবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে স্বীকৃত পন্থায় তাকে প্রশ্ন করবেন না। (তাবারানী)

৯০। যে ব্যক্তি জান্নাত এবং আল্লাহর (আরশের) ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন মুসলমানদের উপর কঠোরতা না করে বরং রহম করে। (ইবনে লাল ইবনে, হিব্বান, আবুশ শায়েখ)

৯১। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুটির উদ্দেশ্যে কারো প্রয়োজনে মিটাবে, ঐ দিন তার থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে এ সেদিন পূর্ণ প্রতিদিন দিবেন। (দাইলামী)

৯২। যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিবে সে জাতি শাস্তি ভোগ করবে। (তাবারানী)

৯৩। মিথ্যা অপবাদ দানকারী জান্নাতে যাবে না। (দাইলামী)

৯৪। কোনো মুসলমানকে অবজ্ঞা করো না। একজন অতি সাধারণ মুসলমানও আল্লাহর কাছে অনেক মর্যাদাবান। (দাইলামী)

৯৫। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার রহমতের আশা করলে আমার সৃষ্টির উপর রহম করো। (আবুশ শায়েখ, ইবনে হাব্বান, দাইলামী)

৯৬। টাখনুর নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করো না। (আবু নুয়াঈম)

৯৭। আমার আবু বকর (রা.) এবং আলী ইনসাফের পাল্লা বরাবর।

৯৮। শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে অলসতা করো না। তোমরা তাকে দেখ না, কিন্তু সে তোমাদের ব্যাপারে অমনোযোগী নয়। (দাইলামী)

৯৯। যে শুধু আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করবেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। (তাবারানী)

১০০। যে তরকারীর মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাবে সে যেন মসজিদে না আসে। (তাবারানী)

১০১। নবী (সা.) নামাযের শুরু, রুকু যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (বাইহাকী)

১০২। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু জাহেলকে একটি উট হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছেন। (ইসমাঈলী)

১০৩। আলীর প্রতি তাকানো ইবাদত। (ইবনে আসাকির)

১০৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে অসিয়ত করেছেন, তাদের ভালো মানুষদের গ্রহণ করো এবং মন্দদের ক্ষমা করে দাও। (বাযযার ও তাবারানী)

কুরআন শরীফের তাফসীর

আবুল কাসিম বাগাবী আবু মালীকা থেকে বর্ণনা করেন, সিদ্দীকে আকবরকে কোনো আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি কোন ভূখণ্ডে এবং কোন আকাশের নিচে বসবাস করব, যদি আমি কিতাবুল্লাহর বিপরীতে কোনো কিছু করি।

আবু উবাইদা ইবরাহীম তাহমী থেকে নকল করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীককে- فاكهة وابا এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কুরআনের যে অর্থ আমার জানা নেই যদি বর্ণনা করি তবে কোন্ যমীন আমাকে ধারণ করবে এবং কোন আকাশ তার নিচে আমাকে বসতে দিবে।

বাইহাকী প্রমুখ লিখেছেন, একদা আবু বকর সিদ্দীককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি এর অর্থ যা করেছি তা আমার অভিমত। যদি তা যথার্থ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার করুণা মনে করবে। আর যদি সঠিক না হয় তবে আমার এ অভিমত শয়তানের কাজ মনে করবে। আমার মতে এর উদ্দেশ্য কালালাহ ঐ সমস্ত সন্তানাদি যাদের মাতা-পিতা নাই। হযরত উমর (রা.) খলীফা হওয়ার সময় বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যে বিষয়ে কথা বলেছেন, সে বিষয়ের উপর কথা বলতে আমার লজ্জা লাগে। আমি তাঁর অভিমতকে প্রাধান্য দেই।

আবু নুয়াঈম হুলীয়া গ্রন্থে আসওয়াদ বিন হিলাল (রা.) থেকে নকল করেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন-

(১) إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

(২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ-

এ দু'টি আয়াত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা দৃঢ়পদ ছিলেন, কোন গুনাহ করেননি এবং ঈমানকে গুনাহর সাথে

একীভূত করেননি। তিনি বললেন, তোমরা একে অপাত্র মনে করেছ। এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে নিজেদের প্রতিপালক বলেছেন। অতঃপর এর উপরই মজবুত ছিলেন, অপর প্রতিপালকের প্রতি আসক্ত হননি এবং ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেননি। ইবনে জারীর আমের বিন সাদ বাজালী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ-এর তাফসীরে বলেন, زِيَادَةٌ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার মুখ। ইবনে জারীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে নকল করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا-

এ আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি (এ কথা) বলবে এবং বিশ্বাস নিয়ে ইহধাম ত্যাগ করবে সে ঠিক বলে বিবেচিত।

অভিমত বিচার, অভিভাষণ এবং প্রার্থনা

আলকায়ী সুন্নাহ গ্রন্থে ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ভাগ্যে আছে বলেই তো মানুষ যিনা করে নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আল্লাহ তা'আলা যিনা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন আবার সে কারণে শাস্তিও দিবেন। তিনি বললেন, সত্যই তো। আল্লাহর কসম, আমার নিকট এ সময় কেউ থাকলে আমি তাকে নির্দেশ করতাম, সে তোমার নাক কেটে নিত।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর রচনায় হযরত যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এক অভিভাষণে বলেন, উপস্থিতি! আল্লাহকে লজ্জা করো। আল্লাহর কসম, আমি যখন কোনো খোলা প্রান্তরে পায়খানা করতে যাই, তখন আল্লাহ তা'আলার থেকে লজ্জায় আমি আমার মাথা ঢেকে নেই।

আব্দুর রাজ্জাক তাঁর রচনায় উমর বিন দিনার থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহকে লজ্জা করো। আল্লাহর কসম, আমি পায়খানায় গিয়ে আল্লাহর লজ্জায় আমার কোমর পায়খানার দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিতাম।

আবু দাউদ সুনান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ আল-সানাবাহী থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকরের পেছনে মাগরিবের নামায পড়লাম। তিনি প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ছোট্ট দু'টি সূরা পড়লেন এবং তৃতীয় রাকাতে-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا- পড়লেন।

ইবনে আবী খাইসামা এবং ইবনে আসাকির ইবনে আয়নিয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক কোনো এক মৃত ব্যক্তির সমবেদনা জানাতে গিয়ে বলেন, সান্ত্বনায় কোনো ক্ষতি নেই, আর ক্রন্দন করলে কোনো লাভ হবে না। মৃত্যু পূর্বে যন্ত্রণাদায়ক এবং পরে শাস্তিদায়ক। নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালে (জাতির অবস্থার কথা) স্মরণ করো। (সে তুলনায়) তোমাদের বেদনা ক্ষীণ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধিকহারে পুরস্কৃত করবেন।

ইবনে আবী শায়বা এবং দারা কুতনী সালিম বিন উবায়দা সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে বলেছেন, আস, আজ পুনরায় আমার সাথে ইবাদত করো, যাতে ভোর হয়ে যায়।

আবু কেলায়া আবু সফর থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক অধিকাংশ সময় বলতেন, আমার দরজা বন্ধ করো যাতে ভোর পর্যন্ত আমি ইবাদতে লিপ্ত থাকি। বাইহাকী এবং আবু বকর বিন যিয়াদ নিশাপুরী কিতাবুয যিয়াদাত গ্রন্থে হুযায়ফা বিন উসাইদ থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা যেন সুন্নত মনে না করে সেজন্য হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর চাশতের নামায পড়তেন না।

আবু দাউদ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, পানির মৃত মাছ ভক্ষণ জায়েয। ইমাম শাফেঈ (রহ.) 'আআম' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় মাকরূহ মনে করতেন।

বুখারী শরীফে ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দাদাকে বাবার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করতেন।

ইবনে আবী শায়বা স্বীয় রচনায় বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক দাদাকে বাবার অবর্তমানে বাবা হিসেবে এবং নাতিকে ছেলের অনুপস্থিতিতে ছেলে বলে গণ্য করতেন। কাসিম (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বাবাকে অস্বীকার করলে তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তার মাথায় শয়তান ভর করে আছে। ইবনে আবী মালেক বলেন, তিনি জানাযার নামায পড়ানোর সময় বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দার পরিবার, সম্পদ এবং সম্প্রদায় তাকে তোমার কেউ সোপর্দ করেছে। তাঁর গুনাহ যদিও বেশি হয়ে থাকে কিন্তু তোমার রহমত ও অনুগ্রহ এর চেয়ে অনেক বেশি তুমি দয়াবান।

সাঈদ বিন মানসুর স্বরচিত সুনান গ্রন্থে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আসেম বিন উমর বিন খাত্তাব তার মায়ের সাথে ঝগড়া করলে হযরত আবু বকর মিমাংসা করার পর আসেমকে সম্বোধন করে বললেন, আসেম! খুব ভালো

করে জেনে নাও যে, তোমার মায়ের শরীরের ঘাম এবং গন্ধ তোমার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম।

বাইহাকী কায়েস বিন আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকরের খেদমতে উপস্থি হয়ে আরয করল, আমার বাবা আমার সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে অসহায় করে দিতে চান। হযরত আবু বকর (রা.) তার বাবাকে বললেন, যতটকু তোমার প্রয়োজন তোমার ছেলের কাছ থেকে ততটুকু নিবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেননি যে, তোমার সম্পদ তোমার বাবার। তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি তাই বলেছেন। তবে এর অর্থ এটা নয়; বরং তাঁর কথার উদ্দেশ্য ছিল এ থেকে ব্যয় করা।

আমর বিন শোয়াইবের দাদা বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর (রা.) গোলামের কেসাস হিসেবে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না। (আহমদ)

বুখারী শরীফে ইবনে মালিকার দাদা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে দংশন করতে গিয়ে তার দু'টি দাঁত ভেঙে গেলে হযরত আবু বকর (রা.) এ ক্ষেত্রে দিয়ত এবং কেসাস কোনোটাই জারি করেননি।

ইবনে আবী শায়বা এবং বাইহাকী ইকরামা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক কান কর্তনের কেসাস হিসেবে পনেরোটি উট গ্রহণ করতেন। অতঃপর বলতেন, কান কাটা ক্ষতটি চুল এবং পাগড়ির মধ্যে ঢেকে রেখ।

বাইহাকী প্রমুখ আবু ইমরান জুনী থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে সিপাহসালার করে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রাক্কালে বলেন, আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিব, এর উপর অটুট থাকবে। নারী, শিশু, পঙ্গু এবং বৃদ্ধাদের হত্যা করবে না। ফলজ বৃক্ষ কাটবে না। বস্তী উচ্ছেদ করবে না। ছাগল এবং উট হত্যা করবে না, তবে খেলে কোনো ক্ষতি নেই। ফসলের ক্ষেত ধ্বংস এবং জ্বালিয়ে দিবে না। আর অপচয় ও কৃপণ থেকে বেঁচে থাকবে।

আহমদ আবু দাউদ এবং নাসাঈ আবু বারযা আসলামী থেকে নকল করে লিখেছেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জনৈক ব্যক্তির প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! তাকে হত্যা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর এ কাজ কারো জন্যই বৈধ নয়।

সাইফ কিতাবুল ফুতুহ গ্রন্থে তার শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেন, উমাইয়া বংশের কতিপয় মুহাজির সাহাবী ইয়ামামার গভর্নরের নিকট এমন দু'জন নারীকে ধরে নিয়ে

এলেন যাদের মধ্যে একজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে, আর অপরজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইত। ইয়ামামার গভর্নর শাস্তি হিসেবে তাদের হাত কেটে দিলেন এবং দাত উপড়ে ফেললেন। হযরত আবু বকর এ মর্মে তাঁর নিকট পত্র লিখলেন, আমি সংবাদ পেয়েছি তুমি দু'জন মহিলাকেই এই এই শাস্তি দিয়েছ। তুমি যদি শাস্তি প্রদান না করতে তাহলে যে নারী রসূল আকরাম (সা.)-এর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে শাস্তি হিসেবে আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতাম। কারণ নবীগণের মর্যাদা সর্বোচ্চ। বিশেষত যদি কোনো মুসলমান এ বেয়াদবী করে তবে সে মুরতাদ। আর যদি কোনো যিম্মি করে তবে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে। যে নারী মুসলমানদের কুৎসা গায় সে মুসলমান হলে তাকে আদব এবং শরম দিতে হবে। এজন্য হাত পা কাটা উচিত নয়। আর যিম্মি হলে এ কাজ (মুসলমানদের গালমন্দ করা) শিরকের চেয়ে বেশি খারাপ নয়। শিরকের ক্ষেত্রে যেমন ধৈর্য ধারণ করো, এ ক্ষেত্রেও সবর করা আবশ্যক। নমনীয়তা প্রদর্শন করো। কেসাস ছাড়া হাত পা কাটা আমি মাকরূহ মনে করি। কারণ এ শাস্তিপ্রাপ্তরা সর্বদা লজ্জা পায়।

মালিক এবং দারা কুতনী সুফিয়া বিনতে আবু উবায়দা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক জনৈক অবিবাহিত যুবতির সাথে যিনা করে এবং সে তা স্বীকার করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বেত্রাঘাত করেন এবং ফিদাক অঞ্চলে নির্বাসন দেন।

আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনে আতিব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট এক চোরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো। চুরির অপরাধে এর হাত পা ইতঃপূর্বে একবার কেটে ফেলা হয়েছিল। তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি তোমার প্রতি ঐ দণ্ড আরোপ করছি, যা নবী (সা.) আদেশ করে গেছেন। তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী।

মালেক (রহ.) কাসিম বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, ডান হাত এবং ডান পা কর্তিত ইয়ামেনের এক বাসিন্দা সিদ্দীকে আকবরের বাড়িতে এসে অভিযোগ করল, ইয়ামেনের প্রশাসক আমার প্রতি নির্যাতন চালিয়েছে। সে সারারাত নামায আদায় করে। সিদ্দীকে আকবর তার দীর্ঘ নামায দেখে আফসোস করে। এমতাবস্থায় জানা গেল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সম্মানিত স্ত্রী আসমা বিনতে আমিসের অলংকার হারিয়ে গেছে। ইয়ামেন থেকে আগত লোকটি সর্বদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং অন্যান্য লোকদের সাথেই অবস্থান করছিল এবং সে তার মেজবান অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের জন্য এ বলে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ, এ বাড়িওয়ালার সাথে যে এ আচরণ করেছে তাকে তুমি শাস্তি দাও।

অনুসন্ধানে সে অলংকার এক স্বর্ণকারের নিকট পাওয়া গেল। আর ইয়ামেন থেকে আগত লোকটি তা সরবরাহ করেছে। জনৈক ব্যক্তির সাক্ষীর প্রেক্ষিতে সে তার অপরাধ স্বীকার করলে তিনি তার বাম হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, এ চুরি সম্বন্ধে তার দুআ আমাকে সন্দিহান করেছিল।

দারা কুতনী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, পাঁচ দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরির দায়ে তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

আবু সালিম থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফতের যুগে ইয়ামেন থেকে কতিপয় লোক এসে কুরআন শরীফ শ্রবণে খুব কান্নাকাটি করলে তিনি বললেন, আমাদেরও এ অবস্থা ছিল, তবে পরবর্তীতে মন শক্ত হয়ে গেছে। আবু নুয়াঈম মন শক্ত হওয়ার অর্থ আল্লাহ তা'আলার মারেফাত দ্বারা মন শক্ত ও শান্ত হয়ে যাওয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবু উবায়দ গারীব গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মারা গেছে সে ভাগ্যবান। সে তো ঝ গড়া থেকে পবিত্র ছিল।

আইম্মায়ে আরবাআ এবং মালেক (রহ.) কাবিসা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকরের খেদমতে জনৈক মৃত ব্যক্তির দাদী তার মৃত নাতির পরিত্যক্ত সম্পদের ফারায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তার ভাগ চাইল। তিনি বললেন, তোমার অংশ প্রাপ্ত সম্পর্কে কুরআনে কিছু নেই। আর এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো ফায়সালাও আমার জানা নেই। তুমি এসো, আমি লোকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা বিন শো'বা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সামনে দাদীকে ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন। তিনি বললেন, তোমার মত কারো এ কথা স্মরণ আছে কি? মুহাম্মদ বিন মাসলামা দাঁড়িয়ে তাঁর কথার প্রতি সমর্থন জানালে তিনি তাকে ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন।

মালিক এবং দারা কুতনী কাসিম থেকে বর্ণনা করেন, মৃত ব্যক্তির দাদী এবং নানী তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে মিরাস প্রার্থনা করলে তিনি নানীকে অংশ দিলেন।

বদরী সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন সহল আনসারী আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি মৃত ব্যক্তির সম্পদ (দাদী এবং নানীর মধ্যে) বণ্টন করেছেন। কিন্তু তার ওয়ারেশরা যদি তাদের না চেনে? (এরপরও) তিনি তাদের অংশ দিয়েছেন।

আব্দুর রাযযাক আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা

স্বামীর থেকে তালাক নিয়ে আব্দুর রহমান বিন যুবাইরের সাথেও তার কোনো এক গোপন বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় তাঁর থেকেও তালাক নিয়ে পূর্বের স্বামীকে বিয়ে করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করলে তোমার তালাক বৈধ নয়। এ হাদীস সহীহ বুখারী শরীফেও রয়েছে। তবে আব্দুর রায্যাক এটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সে মহিলা নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে দু'বার উপস্থিত হয়ে বলল, আবদুর রহমান আমার সঙ্গে সহবাস করেছে। এরপরও তিনি (সা.) তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এ বলে দু'আ করলেন হে আল্লাহ! এ নারী বিচ্ছিন্ন স্বামীর মিলন প্রত্যাশায় তার কাছে ফিরে যেতে চায়। দ্বিতীয় বিয়ে তার পূর্ণ করো না। এ মহিলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুকের খিলাফতও কালেও একই আবেদন নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁরা দু'জনই তার আবদেন প্রত্যাখ্যান করেন।

বাইহাকী উকবা বিন আমের থেকে বর্ণনা করেন, আমর বিন আস এবং শারজীল বিন হাসানা উকবাকে দূত বানিয়ে তাঁর হাতে সিরিয়ার (লোকের) মাথার খুলি হযরত আবু বকরের নিকট পাঠান। দূত এসে পৌঁছলে তিনি এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন। উকবা বললেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা। তারাও তো আমাদের সাথে এরূপ আচরণই করছে। তিনি বললেন, আমর বিন আস এবং শারজীল কি তাহলে পারস্য এবং রোমানদের অনুসরণ করছে? কাউকে হত্যা না করে অগ্রসর হও। অনুসরণের জন্য কোরআন এবং হাদীসই যথেষ্ট।

বুখারী শরীফে কায়েস বিন আবু হাযেম থেকে বর্ণিত, যয়নব নাম্নী জনৈক মহিলা কোনো কথা বলত না। হযরত আবু বকর তাকে কথা বলতে বললেও সে কথা বলল না। লোকেরা বলল, সে নিরবতার সাথে হজ্জ আদায় করেছে। তিনি তাকে বললেন, কথা বল, তোমার এ আচরণ জাহেলিয়াতের কাজ। ইসলামে এ ধরনের বৈরাগ্য জীবনযাপন নাজায়েয। একথা শুনে সে কথা বলতে লাগল এবং জি জ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মুহাজির। মহিলা বলল, আপনি কোন মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, তুমি তো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে। আমি আবু বকর। সে বলল, জাহেলিয়াতের পর আল্লাহ তা'আলা এ দীন পাঠিয়েছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি আমাদেরকে এর উপর প্রতিষ্ঠিত করবে? তিনি বললেন, তোমাদের ইমামগণ কর্তৃক। সে বলল, ইমাম কে? তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের কোন নেতা নেই, যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন? সে বলল, হ্যাঁ রয়েছেন। তিনি বললেন, তিনিই ইমাম।

ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু

বকরের এক গোলাম ছিল। সে শ্রমিকের কাজ করত এবং তিনি তার জন্য বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। উভয়ে একত্রে খানা খেতেন। একদিন গোলাম কিছু জিনিস আনল আর হযরত আবু বকর তা থেকে কিছুটা খেয়ে ফেললেন। গোলাম বলল, আপনি জানেন এ জিনিস কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে? তিনি পুরো বিষয় জানতে চাইলে সে বলল, জাহেলিয়াতের যুগে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। আর আপনি অবগত আছেন যে, সত্য ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। আমি এক ব্যক্তিকে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রতারিত করেছিলাম। আজ সেই বদলা হিসেবে আমাকে এ জিনিস দিয়েছে, যা আপনি আহার করেছেন। এতদশ্রবণে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বমি করে ফেলে দিলেন।

আহমদ যোহদ গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেন, ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ছাড়া আমি কাউকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য আহারের পর বমি করতে শুনেনি। অতঃপর তিনি উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

নাসাঈ আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর ফারুক (রা.) দেখলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বলছিলেন, এ আমাকে খারাপ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

আবু উবায়দ গারীব গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আব্দুর রহমান বিন আউফকে নিজ আত্মীয়ের সাথে লড়াই করতে দেখে বললেন, আত্মীয়-পরিজনের সাথে লড়াই করো না। এ লড়াই বিবাদকে জিয়ে রাখে। ফলে লোকেরা তোমার সমালেচনা করবে।

ইবনে আসাকির মূসা বিন উকবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর অভিভাষণে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর তারীফ করছি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি এবং মৃত্যুর পর তাঁর নিকট মর্যাদা কামনা করছি। আমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং কোনো কাজে তাঁর কোনোই অংশিদার নাই। আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং প্রদীপমালার উজ্জ্বল রশ্মি করে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি জীবিত লোকদের ভীতি প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত। আর যারা বক্রতা দেখাবে তারা পথভ্রষ্ট।

হে লোকসকল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহকে ভয় করার ওসীয়ত করছি। আল্লাহ তা'আলা হিদায়েতের যে পথ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন সে পথে তোমরা

অটল থাকবে। কালেমায়ে ইখলাসের পর হিদায়েতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নেতার আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং সেই নেতা যিনি সত্যের আদেশ এবং অসত্যের প্রতি বাধা প্রদান করেন তাঁর আনুগত্য করলে কল্যাণ লাভ করবে এবং তাঁর প্রতি যে হক ছিল তাও আদায় হবে। নফসের আনুগত্য করবে না। আত্মার ভোগমুক্ত ব্যক্তি কল্যাণকামিতার নাগাল পাবে। অহংকার করবে না। ভেবে দেখ অহংকারী ব্যক্তি সে তো মাটি থেকে সৃষ্ট এবং একদিন সে মাটির সাথেই মিশে যাবে। আজ যে জীবিতকাল বদদু'আ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। সবসময় নিজের অন্তরকে মৃত মনে করবে। অটুট এবং দৃঢ়তা অভিপ্রায় পোষণ করবে। কারণ পোকতা ইরাদা নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। (মন্দ কাজ) পরহেয করবে। (মন্দ কাজ) বর্জণ করা অনেক লাভজনক। আমল করবে। কারণ আমল কবুল করা হয়। যে কাজ আল্লাহর আযাবের প্রতি ঠেলে দেয় সে কাজ বাদ দাও। আর যে কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে কাজ সর্বদা করবে। বোঝ এবং বুঝাও। ভয় করো এবং ভয় দেখাও। কোন কাজ করলে ধ্বংস অবধারিত, আর কোন কাজ করলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাদের নিজের নফস সম্পর্কে ওসীয়ত করতে কুন্ঠিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সাহায্যকারী। তাঁর সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি কারো নেই। নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করবে, আল্লাহর আনুগত্য করবে, নিজ অংশ সংরক্ষণ করবে এবং হিংসা পরায়ণ হয়ো না। ফরয ইবাদতে কমতি থাকার কারণে নফল ইবাদত বেশি বেশি করবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিজেদের ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ যারা গত হয়েছে তারা যা করে গেছে তাই তাদের প্রাপ্য।

সৃষ্টজীব এবং তার জাতের মধ্যে আল্লাহর কোনো শরীক নেই, কোনো বংশ পরম্পরাও নেই। তিনি নিজ মেহেরবানীতে মাখলুককে ক্ষমা করেন। মাখলুক ইবাদত ও আনুগত্য থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত তিন মাখলুকের উপর মসীবত চাপিয়ে দেন না। যে ভালো কাজের ফলাফল জাহান্নামে সেটি কোনো ভালো কাজ নয়। আর যে মন্দ কাজের পরিণাম জান্নাত তা কোনো মন্দ কাজ নয়। আমি এটাই বলতে চাই। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের এবং নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর নবী (সা.)-এর প্রতি সালাত ও সালাম এবং তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

হাকেম এবং বাইহাকী আব্দুল্লাহ বিন হাকীম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আমাদের সামনে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি হামদ এবং সানার পর বলেন, আমি তোমাদের ওসীয়ত করছি– আল্লাহকে ভয় করো, প্রশংসিত পরিবারের গুণকীর্তন করো এবং তোমাদের প্রবল বাসনাকে ভয়ের সাথে মিলিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বংশের প্রশংসা করেছেন এভাবে–

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ–

অর্থাৎ, নিশ্চয় এ সকল লোক উত্তম কাজে তাড়াতাড়ি করে এবং আমাকে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে ডাকে এবং ভয় করে। আল্লাহর বান্দাগণ! মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরগুলো নিজের অধিকারের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের থেকে নশ্বর দুনিয়াকে অবিনশ্বর আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তোমাদের নিকট আল্লাহর যে পাক কালাম রয়েছে তার দীপ্তি কখনই নিভে যাবে না এবং এর রহস্যও কখনোই নিঃশেষ হবে না। তোমরা ঐশী কিতাবের আলোয় আলোকিত হও, এ কিতাবের নসীহত গ্রহণ করো এবং যেদিন কোনো আলো থাকবে না সেদিন এ কিতাবরে আলো প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদ্বয়কে নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ, এ সম্পর্কিত জ্ঞান তোমাদের অগোচরে রয়েছে। যদি তোমরা এ সম্পর্কে জানতে তবে মৃত্যুর সময় তোমরা নেক আমল করতে, আর এমনটা আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত তোমরা পাবে না। মৃত্যুর প্রাক্কালে কিছু ভালো আমলের চেষ্টা কর, যাতে মন্দ কাজ হতে নিরাপদ থাকতে পারো। তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি ছিল মৃত্যুর সময় এলে তারা শিরক করেছে এবং আল্লাহকে ভুলে গেছে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করেছি। তোমরা তাদের মতো হয়ো না। সুতরাং তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। ক্ষমা প্রাপ্তির চেষ্টা করো। মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী। ভীতি ছড়ানোর জন্য মৃত্যু ধেয়ে আসছে। হে মুসলমান! ক্ষমা তোমাদের জন্যই।

ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং আবু নুয়াঈম হুলীয়ার ইয়াইয়া বিন কাসীর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) এক ভাষণে বলেন, উজ্জ্বল চেহারার সেই তরুণরা কোথায়, যাদের যৌবন দর্শনে লোক পেরেশান থাকতো। রাজা-বাদশারা

কোথায়, যারা শহর এবং দুর্গ নির্মাণ করেছে। যারা লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তারা কোথায়। তাদের প্রতাপ আজ খর্ব হয়েছে। যুগের আবর্তে তারা আজ অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে। (সুতরাং) সর্বদা ভালো আমল করো এবং নেক কাজের প্রতি ধাবিত হও।

আহমদ যোহ্‌দে সালমান থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত সালমান হযরত আবু বকরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, হে মুসলমান! আল্লাহকে ভয় করো এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, অচিরেই প্রত্যেক গোপন কথা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং লোকেরা জেনে নিবে প্রত্যেক জিনিসে তোমার অংশ কতটুকু তুমি কি খেয়েছ আর কি রেখেছ। মনে রেখ, যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নিরাপত্তা আল্লাহর যিম্মায়। আর যার যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে কে আঘাত করতে পারে। আর আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিন আরো বললেন, একে একে নেককার বান্দাদের উঠিয়ে নেয়া হবে। অবশেষে আটার বোঝার মতো অসমর্থ কতিপয় লোক থেমে যাবে, যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোনোই সম্পর্ক থাকবে না।

সাঈদ বিন মানসুর মুআবিআ বিন কাররাহ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অধিকাংশ সময় এ দুআ করতেন, হে বিশ্ব প্রতিপালক। আমার শেষ বয়সটা সুন্দর করে দাও। নেক আমলে থাকা অবস্থায় যেন আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আপনার সাথে সাক্ষাতের দিনটা যেন সকল দিন অপেক্ষা উত্তম হয়।

আহমদ যোহ্‌দ গ্রন্থে হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় এ প্রার্থনা করতেন, হে আমার রব! আমি সেই জিনিসের প্রার্থনা করছি যা আমাকে নিরাপত্তা দিবে। হে আমার রব! আমাকে তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের বুলন্দ মর্তবা দান করো।

আরফাজ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলতেন, যে আল্লাহর ভয় নিয়ে চলাফেরা করে সে যেন খোদার ভয়ে কাঁদে। অন্যথায় সে যেন কাঁদার ভান করে।

আযরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন জাফরান ও স্বর্ণের সংমিশ্রণে রক্তিম বর্ণ মেয়েদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

মুসলিম বিন ইয়াসার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুসলমানগণ প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান পাবেন। এমনকি সামান্যতম দুঃখ, জুতার ফিতা ছিড়ে যাওয়া এবং সম্পদ কম হওয়ারও।

মাইমুন বিন মিহরান কর্তৃক বর্ণিত, একটি পাখি শিকার করে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি পাখিটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে বললেন, আল্লাহর তাসবীহ ছেড়ে দেবার কারণে প্রাণীকে মেরে জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়। বুখারী আদব অধ্যায়ে এবং আব্দুল্লাহ বিন আহমদ যাওয়ায়িদুন যোহদ গ্রন্থে যানাবাহি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এক ভাই অপর ভাইয়ের জন্য যদি দু'আ করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে, আব্দুল্লাহ যাওয়াযিদুয যোহ্দ গ্রন্থে উবাইদ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেন, লবীদ শায়ের হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে কবিতার এ পঙক্তিটি আবৃত্তি করল, স্মরণ রেখ, আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেকটি বস্তু বাতেল। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। কবি আবার দ্বিতীয় পঙক্তিটি আবৃত্তি করল, সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল। তিনি বললেন, তুমি অসত্য বলছ। আল্লাহর নিকট এই এই নেয়ামতসমূহ রয়েছে, যা কখনোই ধ্বংস হবে না। কবি লাবীদ চলে গেলে তিনি বললেন, কবি হেকমত তথা সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা বলে থাকেন।

হযরত আবু বকরের যেসব বাণী আল্লাহর ভয় সম্পর্কিত

আবু আহমদ হাকেম মাআয বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এক বাগানে ঢুকে গাছের ছায়ায় একটি পাখি দেখে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, হে পাখি তুমি বড়ই ভাগ্যবান। গাছের ফল খাচ্ছ, গাছের ছায়ায় থাকছ, তোমার কোনো হিসাব নেই। হায়, আবু বকর যদি তোমার মতো হতো।

ইবনে আসাকির বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেন, প্রশংসা করার সময় তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার নফস সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি অবগত। আর আমি নিজের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি। হে আল্লাহ! তারা আমার ভালো কাজ সম্পর্কে যে ধারণা করে আমাকে অনুরূপ করে দিন। আর আমার যে গুনাহ সম্পর্কে তারা অবগত নয়, তা ক্ষমা করুন।

আহমদ যোহদ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি যদি মুমীনের একটি পশমও হতাম, তবে তা আমার কাছে অধিক প্রিয় হতো।

আহমদ যোহদ গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে যুবাইর নামাযের সময় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন শুকনো একটি কাঠের টুকরো। হযরত আবু বকরের অবস্থাও ছিল একই।

হাসান বলেন, হযরত আবু বকর বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি গাছ হতাম আমাকে কেটে ফেলত, আমি কেটে যেতাম-এটাই আমার জন্য প্রিয় ছিল। কাতাদা বলেন, এ বর্ণনা আমার জানা যে, হযরত আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত, আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবু বকর জনৈক মহিলার মৃত্যুর সময় বারবার তার বালিশের দিকে দেখছিলেন। মহিলার মৃত্যুর পর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার বালিশের নিচে পাঁচ অথবা ছয় দিনার দেখায়ে হাতে হাত মেরে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন–পড়ে বললেন, হে অমুক, আমি চাইনি তোমার এ অবস্থা হোক। ছাবিত বানানী বলেন, তিনি সর্বদা এ কবিতা পাঠ করতেন, তুমি মানুষের সংবাদ বহন করছ, কখন তোমার খবর তারা বহন করবে তা কি জান।

ইবনে সাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেন, নবী আকরাম (সা.)-এর পর সিদ্দীকে আকবরের খিলাফত কালে লোকেরা অসঙ্গত কথা বলতে ভয় করতো না। তারপর ফারুকে আযমের সময় লোকেরা তাই করতো। বিচারের সময় কুরআন ও হাদীস থেকে রায় দিতে না পারলে তিনি রায় ঘোষণার সময় বলতেন, আমি এ রায় ঘোষণার ব্যাপারে ইজতেহাদ (বুদ্ধি বৃত্তিক গবেষণা) করেছি। যদি তা সঠিক হয় তবে মনে করবে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি তা সঠিক না হয়, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার

সাঈদ বিন মানসুর সাঈদ বিন মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) একবার স্বপ্নে দেখেন তাঁর ঘরে তিনটি চাঁদ উদিত হযেছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেবার জন্য হযরত আবু বকরকে একথা বললে তিনি বলেন, এ স্বপ্ন সত্য হলে তোমার ঘরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন মনীষীর দাফন হবে। নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি বলেন, হে আয়েশা! তোমার স্বপ্নেদৃষ্ট তিন চন্দ্রের মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সাঈদ বিন মানসুর উমর বিন শারজীল থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছিলেন আমি একদল কালো ছাগলের পশ্চাৎপদ অনুসরণ করছি। অতঃপর দেখলাম সাদা ছাগলের পালের পেছনে পেছনে চলছি। আর এক সময় সাদা ছাগলের দল কালো ছাগলের ভিড়ে হারিয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। সাদা ছাগল আরবের মুসলমান, আর কালো ছাগলের দল অনরাব মুসলমান। ভবিষ্যতে আরবের মুসলমানদের তুলনায় অনারব মুসলমানদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাবে। নবী (সা.)

বললেন, সত্য বলেছ। সকালে ফেরেশতা এসে আমাকে এমন ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন।

ইবনে আবী লায়লা সাঈদ বিন মানসুর থেকে বর্ণনা করেন, নবী আকরাম (সা.) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি একটি কূপের পানি সিঞ্চন করছেন, আর তার পেছনে কৃষ্ণকায় ছাগলের পাল এসে দাঁড়ায়। আর এর পেছনে এমন একদল ছাগল আসে যাদের লালবর্ণের পশুগুলো সাদার উপর প্রাধান্য পায়। হযরত আবু বকর এ প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইবনে সাদ মুহাম্মদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করেন, এ উম্মতের মধ্যে নবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) স্বপ্নের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার।

ইবনে সাদ ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা একই সোপানে আরোহণ করতে গিয়ে আমি তোমার চেয়ে দেড় সিঁড়ি এগিয়ে গেলাম। এতদশ্রবণে আবু বকর সিদ্দীক বললেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় রহমত এবং মাগফেরাতের মাধ্যমে পূর্বেই আহবান জানাবেন। আর আমি আপনার দেড় বছর পর ইন্তেকাল করব।

আব্দুর রায্যাক স্বীয় রচনায় আবু কিলাবার বরাত দিয়ে লিখেছেন, জনৈক ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীককে বলল, আমি স্বপ্নে নিজেকে রক্ত পেশাব করতে দেখছি। তিনি বললেন, মনে হয় তুমি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হও। আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করো এবং এমনটা করো না।

ফায়দা ঃ বাইহাকী দালায়েল গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার বিন আস (রা.)-কে দলপতি বানিয়ে এক যুদ্ধে পাঠালেন। এ দলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন। রণাঙ্গণে পৌঁছে হযরত আমর বিন আস আগুন জ্বালাতে নিষেধ করলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সমর বিদ্যায় অধিক দক্ষ যুদ্ধ ভেবে তাঁকে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁকে অনুসরণ করো।

বাইহাকী অন্য বরাত দিয়ে লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি (কখনো) কোনো জাতির নেতা হিসেবে এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে থাকি, যদিও তার চেয়েও উত্তম এবং সমর বিদ্যায় অধিকতর দক্ষ ব্যক্তি রয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খলীফা বিন খাইয়্যাত, আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনে আসাকির ইয়াজিদ বিন আসাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে জিজ্ঞেস

করেন, আমি না তুমি বৃদ্ধ? তিনি বললেন, বয়সে আমি বড় হলেও আপনি বৃদ্ধ। এ রেওয়ায়েতটি মুরসাল এবং গরীব। যদি একে সহীহ মনে করা হয় তবে এতে করে হযরত আবু বকরের বুদ্ধিমত্তা এবং রসূলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রমাণিত হয়।

কথিত আছে, হযরত আব্বাস (রা.) একই প্রশ্নের ভিত্তিতে এ জবাবই দিয়েছিলেন। সাঈদ বিন ইয়াবু'-এর বরাতে তাবারানী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাঈদ বিন ইয়াবু'কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বড় কে? তিনি বললেন, আপনি বড়, যদিও পৃথিবীতে আমিই আগে এসেছি।

আবু নাঈম লিখেছেন, আবু বকর সিদ্দীককে বলা হলো, আপনি কেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের কাজের প্রতি নির্দেশ করেন না? তিনি বললেন, আহলে বদরের মর্যাদা সম্পর্কে আমি অবগত রয়েছি, বিধায় তাদেরকে বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত করে রাখা মাকরূহ মনে করি।

আহমদ 'যহদ' গ্রন্থে ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, একদা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) লোকদের মধ্যে সমানভাগে কিছু ভাগ করে দিচ্ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন, আপনি আহলে বদর এবং সাধারণ জনতাকে এক সমান করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, পৃথিবীতে এতটুকুই যথেষ্ট, যদিও তারা মর্যাদা এবং সম্মানের দিক থেকে অনেক বেশি।

নবম পরিচ্ছেদ

আবু বকর বিন হাফস থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) গরমে রোযা রাখতেন এবং শীতে ইফতার করতেন। ইবনে সাদ হাইয়্যান, সানীআ কর্তৃক বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মোহরে نِعْمَ الْقَادِرُ اللّٰهُ লিখা ছিল।

তাবারানী মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণনা করেন, একই বংশের চার পুরুষ নবী আকরাম (সা.) কে দেখেনি। কিন্তু আবু কুহাফা, তাঁর ছেলে আবু বকর, তাঁর ছেলে আঃ রহমান এবং তাঁর ছেলে আবু আতীক-এর নাম ছিল মুহাম্মদ এঁরা সকলেই নবী আকরাম (সা.) কে দেখেছেন।

ইবনে মিন্দা এবং ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকরের পিতা ছাড়া কোনো মুহাজিরীনের পিতা ইসলাম গ্রহণ করেননি।

ইবনে সাদ এবং বাযযার সুন্দর সনদের মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, সুহাইল বিন আমর এবং আমর বিন বাইযার বয়স ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাইহাকী দালায়েল গ্রন্থে আসমা বিনতে আবু বকরের বরাত দিয়ে লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর হযরত আবু বকরের বোন বাইরে কোথাও বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে একদল অশ্বারোহীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এদের মধ্যে কেউ একজন তার গলায় চান্দীর হারখানা খুলে নেয়। নবী করীম (সা.) মসজিদে এলে হযরত আবু বকর দাঁড়িয়ে দু'বার তার বোনের হারখানা ফেরত চাইলে কেউ কোনো সাড়া দিল না। অতঃপর তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি তোমার হারের আশা ছেড়ে দাও এবং ধৈর্য্য ধারণ করো। আল্লাহর কসম! বর্তমান আমানতদারী কমে গেছে।

হাফেজ যাহাবীর কোনো এক রচনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)

উমর বিন খাত্তাব বিন নফীল বিন আবদুল উয্যা বিন রুবাহ বিন কুরাত বিন যরাহ বিন আদী বিন কা'ব বিন লুবী আমিরুল মোমিনীন আবু হাফস আল-কুরাইশী আল-ফারুক নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ২৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। যাহাবী এবং ইমাম নববী লিখেছেন, হস্তি বাহিনীর ঘটনার ১৩ বছর পর তার জন্ম। তিনি কুরাইশদের উঁচু বংশের লোক ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে তিনি দূতের দায়িত্ব পালন করেন। কুরাইশদের মধ্যে বা অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতেন। অথবা নিজেদের মধ্যে বংশের গৌরব প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বাগ্রে তিনিই সে কাজের জন্য মনোনীত হতেন। তিনি ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলার পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি আশারায়ে মুবাশশারা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে রসূল (সা.)-এর শ্বশুর হওয়ার গৌরব অর্জনকারী এবং সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে বিজ্ঞ আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর থেকে ৫৩৯টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ হলেন-উসমান বিন আফফান, আলী বিন আবু তালিব, তলহা ইবেন আউফ, ইবনে মাসউদ, আবু যর, আমর বিন আবসাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আবসাহ, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আবু হুরায়রা, আনাস, আমর বিন আস, আবু মূসা আশআরী, বারা ইবনে আযেব, আবু সাঈদ খুদরী, সাদ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আর মধ্যে বলেন– হে আল্লাহ! উমর বিন খাত্তাব অথবা আবু

জাহেল বিন হিশাম যাকে ইচ্ছে মুসলমান করে ইসলামকে বিজয় দান করুন। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ইবনে মাসউদ এবং আনাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। হাকীম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) এ দু'আ করেন, হে আল্লাহ! উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে জয়যুক্ত করুন। এ বর্ণনায় অন্য কারো নাম নেই। এ রেওয়ায়েতটি তিরমিযী 'আওসাত' গ্রন্থে আবু বকর সিদ্দীক থেকে এবং করীরা গ্রন্থে সাওবান থেকে বর্ণনা করেন। আহমদ হযরত উমর থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলকে বন্দী করার জন্য মসজিদে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি কোরআন শরীফের কোনো এক সূরা তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআনের মহিমান্বিত ও সুষমাসিক্ত বাণী শ্রবণে মনে মনে বললাম, কুরাইশদের কথাই সঠিক, সত্যিই তিনি এক অনন্য কবি। কিন্তু যখন তিনি-

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّاتُؤْمِنُوْنَ-

এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন তখন ইসলাম আমার অন্তরকে নাড়া দিল এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হলো।

ইবনে আবু শায়বা হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ এভাবে পেশ করেন যে, আমার বোন ঘরে এলে আমি কাবা শরীফে গিয়ে দেখলাম নবী আকরাম (সা.) স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন। তিন আওফী কাপড় পরেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বাইতুল্লাহ চত্বরে ফিরে এসে নামায পড়লেন এবং পুনরায় ফিরে গেলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর নিকট এমন কথা শুনলাম যে পূর্বে শ্রবণ করিনি। যাবার সময় আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, উমর। তিনি বললেন, উমর কখনো আমার পিছু ছাড়ে না। একথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অতঃপর কালেমা পাঠ করলাম। তিনি বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখবে। আমি বললাম, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্যই তা প্রকাশ করব, যেমন শিরকের প্রকাশ ঘটিয়েছি।

ইবনে সাদ, আবু ইয়ালা, হাকীম এবং বাইহাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমরকে পথিমধ্যে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দেখে বনু যহরা বংশীয় জনৈক ব্যক্তি বললেন, কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? হযরত উমর বললেন, মুহাম্মদকে হত্যা করতে। তিনি বললেন, এ কাজ করলে বনী হাশিম ও বনী আব্দুল মোত্তালিব কি তোমাকে ছেড়ে দিবে ভেবেছ? হযরত উমর বললেন, মনে হয় তুমি বিধর্মী (মুসলমান) হয়ে গেছ? তিনি বললেন, এর চেয়েও আশ্চর্যের

কথা হলো তোমার ভগ্নি ও ভগ্নিপতি উভয়ে তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত উমর ভগ্নিপতির বাড়িতে গেলেন। হযরত খাব্বাব তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য আগেই সেখানে এসেছিলেন। তাঁর পদধ্বনি শুনে হযরত খাব্বাব আত্মগোপন করলেন এবং তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত থামিয়ে দিলেন। সে সময় তাঁরা সূরা 'ত্বহা' পাঠ করছিলেন। ঘরে ঢুকে হযরত উমর বললেন, তোমরা কি পড়ছিলে? তাঁর বোন বললেন, কিছু না। আমরা কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, মনে হয় তোমরা বিধর্মী (মুসলমান) হয়ে গেছ। তাঁর বোন রাগত স্বরে বললেন, যেহেতু তোমার ধর্মে সত্যের কোনো স্থান নেই সেজন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হযরত উমর বললেন, তোমাদের গ্রন্থটি দাও আমি পড়ব। তাঁর বোন বললেন, তুমি অপবিত্র হয়ে পবিত্র গ্রন্থখানা স্পর্শ করতে পারো না। তুমি গোসল অথবা অযূ করে এসো। তিনি অযূ করলেন এবং তা নিয়ে পাঠ করলেন– যেখানে সূরা 'ত্বহা' লিখা ছিল। হযরত উমর–

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ–

এ আয়াত পর্যন্ত পাঠ শেষে বললেন, আমাকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে নিয়ে চল। হযরত খাব্বাব হযরত উমরকে নিয়ে নবীজীর খিদমতে যাত্রা করেন। হযরত অবস্থানরত বাড়ির দরজায় হযরত হামযা, হযরত তলহা প্রমুখ সাহাবাগণ দরজায় বসাছিলেন। হযরত উমরকে আসতে দেখে হযরত হামযা বললেন, উমর আসছেন। যদি তাঁর উদ্দেশ্য ভালো হয় তবে তিনি আমার হাত থেকে রক্ষা পাবেন অন্যথায় আমি তাঁকে হত্যা করব। এ অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমরের জামার প্রান্ত এবং তলোয়ার ধরে বললেন, হে উমর এ বিশৃঙ্খলা কি ওলীদ বিন মুগীরার মতো অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে? হযরত উমর এই বলে মুসলমান হয়ে গেলেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ اللّٰهُ وانك عبد الله ورسوله–

বাযযার, তিরমিযী এবং আবু নাঈম হুলয়া গ্রন্থে এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত আসলাম বর্ণনা করেন, হযরত উমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবেচেয়ে বড় প্রাণের দুশমন ছিলাম। একদা গ্রীষ্মকালে আমি মক্কার অলি-গলিতে ঘুরে ফিরছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে উমর আশ্চর্য, তুমি নিজেকে কি মনে করো? তোমার ঘরে একি হচ্ছে? আমি বললাম, কি হচ্ছে? সে বলল, তোমার বোন মুসলমান হয়েছে। আমি রাগান্বিত হয়ে বোনের দরজায় গিয়ে আওয়াজ দিলাম।

ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কে? বললাম, আমি উমর। সকলেই ভীত হয়ে পড়ল এবং যা পড়ছিল তা পড়ে রইল। আমার বোন দরজা খুলল। আমি বললাম, হে প্রাণের দুশমন! তুমি ধর্মত্যাগ করেছ? এ কথা বলে আমার হাতে যা ছিল তা দিয়ে বোনের মাথায় আঘাত করলাম। তার মাথা থেকে রক্ত বের হলো। সে বলল, আমি ধর্মত্যাগ করেছি এবং আমার যা বুঝে এসেছে তাই করেছি। আমি ভেতরে গিয়ে বসলাম এবং একটি কিতাব দেখতে পেয়ে বললাম, এটা কি? নিয়ে এসো। আমার বোন বলল, তুমি একে স্পর্শ করার উপযুক্ত নও। কারণ তুমি অপবিত্র, আর পবিত্র লোকেরাই একে ছুঁতে পারে। বারবার চাওয়ার পর সে তা এনে দিল। আমি খুলে দেখলাম সেখানে প্রথম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা রয়েছে। আমি আল্লাহর নাম দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এবং আমার হাত থেকে কিতাবখানা পড়ে গেল। আমি উঠিয়ে পড়তে লাগলাম, সেখানে লেখা ছিল سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। আমি আবার কাঁপতে আরম্ভ করলাম। বারবার যখন اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এ আয়াতখানা পড়ছিলাম তখন আমি পাঠ করলাম- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অতঃপর সকলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ধ্বনি দিয়ে বলল, তোমাকে স্বাগতম। গত সোমবারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ বলে দু'আ করেন, হে আল্লাহ আবু জাহেল বিন হিশাম অথবা উমর বিন খাত্তাব এদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছে তার মাধ্যমে তোমার দ্বীনকে বিজয় দান করো।

সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা পাহাড়ের নিচে অবস্থান করছিলেন। লোকেরা আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। আমি দরজায় টোকা দিলে আওয়াজ এলো, কে? বললাম, উমর। যেহেতু লোকেরা আমার শত্রুতা সম্পর্কে জানত তাই কেউ দরজা খোলার সাহস পেল না। অবশেষে রসূল (সা.)-এর নির্দেশে দু'জন দরজা খুলে আমার বাহু ধরে হযরতের সামনে নিয়ে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি আমার পোশাকের প্রান্ত ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, মুসলমান হয়ে যাও। হে আল্লাহ! তাকে হিদায়েত দাও। আমি কালেমায়ে শাহাদাত পড়লাম। মুসলমানগণ উচ্চ কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিলে মক্কার অলি-গলি প্রকম্পিত হয়ে পড়ল। কারো সহাস ছিল না মুসলমান হওয়ার জন্য কেউ আমাকে বাধা দিতে পারে। অথচ সে সময় মুসলমানদের উপর চালানো হতো অবর্ণনীয় অত্যাচার যা আমার পছন্দ হতো না। সুতরাং কুরাইশদের মধ্যে অভিজাত হিসেবে গণ্য আমার মামা আবু জাহেলের দরজায় গিয়ে আঘাত করলে ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কে? বললাম, উমর, আমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছি। সে বেরিয়ে

এসে বলল, এমনটা করতে নেই। অতঃপর সে দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর আমি আরেক জনের কাছে গেলাম। সেখানেও এই ঘটনা ঘটল।

ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা অন্যান্য মুসলমানের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। কিন্তু আমার প্রতি চোখ তুলে তাকাতে সাহস করতো না। একজন বলল, তুমি কি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, লোকেরা কাবার পাদদেশে সমবেত হলে তুমি তাদের সম্মুখে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারো। তখন তারাই তা সর্বত্র প্রচার করবে। আমি যথাসময়ে কাবা ঘরে এসে তাই করলাম। তারা জোরে আওয়াজ দিয়ে বলল, হে লোক সকল! উমর বিন খাত্তাব আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। এ কথা শুনে মুশরিকরা মারমুখী হয়ে আমার প্রতি ধেয়ে আসে। আমার মামা আবু জাহেল হট্টগোলের কারণ জানতে চাইলে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাকে বলা হলো। সে ছাদে উঠে আমার নিরাপত্তার ঘোষণা দিলে লোকেরা সরে যায়। অপর মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলবে আর আমি মুসলমান হয়েও নিরাপত্তা লাভ করে তাদের অত্যাচার অবলোকন করবো তা হতেই পারে না। আমি আবু জাহেলের কাছে গিয়ে বললাম, আমি তোমার নিরাপত্তার অধীনে থাকতে চাই না। অতঃপর আবার মারপিট আরম্ভ হয়।

আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ফারুক উপাধি কিভাবে হলো? তিনি বললেন, হযরত হামযা আমার তিন দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদিন আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম আবু জাহেল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গালি দেওয়ায় হযরত হামযা এসে তার পিঠে তীর দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে কোমর পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

সে সময় নবী আকরাম (সা.) হযরত আরকাম বিন আবী আরকামের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। হযরত হামযা সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনার তৃতীয় দিনে মাখযুমী গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করলে? সে বলল, আমি করলাম তাতে কী? আমার চেয়ে বড়রা যখন তা করছে। আমি বললাম, তারা কে? সে বলল, আপনার বোন এবং ভগ্নিপতি। বোনের বাড়ি গেলাম। প্রবেশের সময় তারা কিছু পড়ছিল বলে আমরা মনে হলো। প্রবেশান্তে কিছু বাক্য বিনিময়ের পর আমার ভগ্নিপতিকে আঘাত করলাম এবং আঘাতস্থল থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো। অতঃপর আমার বোন বলল, আমরা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ

করেছি। আমি তার প্রবাহিত রক্ত দেখে লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম এবং বললাম, তোমাদের পঠিত কিতাবখানা আমাকে একটু দেখাও। আমার বোন বলল, কিতাবটি পবিত্র লোকেরা স্পর্শ করে। আমি গোসল করলে সে তা আমার হাতে দিল। প্রথমেই লিখা ছিল- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আমি বললাম, এ নামটি অত্যন্ত পবিত্রতম। অতঃপর লিখা রয়েছে- طٰهٰ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى اِلٰى لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى- এর প্রতি আমার অন্তর শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ল। আমি বললাম, কুরাইশরা কি তবে এর থেকেই দূরে সরে গেছে? আমি তৎক্ষণাত মুসলমান হয়ে দারুল আরকামের দিকে রওয়ানা হলাম। আমাকে আসতে দেখে হযরত হামযা কি যেন বললেন। লোকেরা বলল, উমরের উদ্দেশ্য ভালো হলে কথা নেই, অন্যথায় আমরা তাকে হত্যা করব। এ কথা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বাইরে এলে আমি কালেমা শাহাদাত পড়লাম। উপস্থিত লোকেরা এত জোরে তাকবীর ধ্বনি দিল যার আওয়াজ সকল মক্কাবাসীর কানে পৌঁছে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, আমরা কি হকের উপর নেই? তিনি বললেন, কেন নেই? অবশেষে আমরা হকের উপর রয়েছি। আমি বললাম, তাহলে গোপনে কেন? অবশেষে আমরা দু'কাতার বিভক্ত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। এক কাতার ছিলেন হযরত হামযা এবং অন্য কাতারে ছিলাম আমি নিজে। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে আমাদের দু'জনকে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলো। সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ফারুক উপাধি দেন। কারণ ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হয়েছে।

ইবনে সাদ এবং যাকওয়ান বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত উমরের নাম ফারুক কে রেখেছেন? তিনি বললেন, নবী আকরাম (সা.)। ইবনে মাজা এবং হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত উমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের ফলে হযরত জিবরাঈল (আ.) আকাশের ফেরেশতাদের খুশি হওয়ার সংবাদ এলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে পেশ করেন।

বাযযার এবং হাকেম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের দিন কাফেররা বলেছিল, আজ মুসলমানরা আমাদের বদলা নিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- । বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ বলেন, হযরত উমর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সম্মানিত হয়েছি।

ইবনে সাদ এবং তাবারানী ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল গোটা ইসলামের বিজয়, তার হিজরত হলো সাহায্য এবং অবস্থান ছিল বরকতময়। বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে নামায পড়ার সাহস আমাদের ছিল না, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সাথে এমন ঝগড়া বিবাদ করেন যার ফলে বাইতুল্লাহ শরীফে আমাদের নামায পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইবনে সাদ এবং হাকেম হযরত হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর মুসলমান হওয়ায় ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং তিনি শহীদ হওয়ার ফলে সে গৌরব রবি নেতিয়ে পড়ে। তাবারানী গ্রন্থে ইবনে আব্বাস বলেন, সর্বপ্রথম হযরত উমর ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটান, এ হাদীসের সূত্রগুলো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

ইবনে সাদ সহীব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু হয়। আমরা কাবার পাদদেশে বসা তাওয়াফ করা, মুশরিকদের বদলা নেওয়া এবং তাদের উত্তর দেয়ার উপযুক্ত হলাম। ইবনে সাদ উমরের আযাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষের যিলহজ্জ মাসে ২৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উমর ছাড়া অন্য কারো নাম বলতে পারবো না যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। হিজরতের সময় তিনি গলায় তলোয়ার এবং কাঁধে কামান ঝুলিয়ে হাতে কয়েকটি তীর নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে যান, সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বসে ছিল। তিনি সাত বার তাওয়াফ করে মাকামে ইবরীমে দু'রাকাত নামায পড়েন। অতঃপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট এসে পৃথক পৃথকভাবে বললেন, তোমাদের মুখ কালো হোক। যে মাকে ছেলে হারা, সন্তানকে এতিম, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় সে যেন আমার সাথে লড়াই করে, কিন্তু তার ছায়া মাড়ানোর সাহসটুকুও কারো ছিল না।

হযরত বারা বলেন, আমাদের নিকট সর্বপ্রথম মুসআব বিন উমায়ের তারপর ইবেন উম্মে মাকতুম, অতঃপর বিশজন আরোহীর একটি কাফেলা নিয়ে হযরত উমর হিজরত করেন। আমরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হযরত পেছনে আসছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নিয়ে মদীনায় এলেন।

ইমাম নব্বী বলেন, হযরত উমর সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধেও অটল ছিলেন।

হযরত উমরের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি স্বপ্নে জান্নাতে এক মহিলাকে প্রাসাদ চূড়ায় বসে অযূ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার প্রাসাদ? ফেরেশতাগণ বললেন, উমর বিন খাত্তাবের। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে উমর! আমি তোমার মর্যদার দিকে লক্ষ্য রেখে সে প্রাসাদে প্রবেশ করিনি। একথা শুনে হযরত উমর কেঁদে ফেললেন।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি স্বপ্নে দুধ পান করার সময় এর স্বাদ এবং গন্ধ আমার নাকে এলে অবশিষ্ট দুধ হযরত উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ আরয করলেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, ইলম।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) স্বপ্নে আমার সামনে কিছু লোক পেশ করা হলো– যাদের পোশাক বক্ষদেশ এবং আর কিছু লোকের পোশাক তারো বেশি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আর উমরের পোশাক যমীন পর্যন্ত ঘেঁষে ছিল। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে পোশাকটি কি ছিল। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, দ্বীন।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে উমর! সে সত্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যে পথে তুমি চল শয়তান সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে। বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে মুহাদ্দিস ছিল। আর আমার উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন উমর বিন খাত্তাব।

ইমাম তিরমিযী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত উমরের মুখে ও অন্তরে সত্যের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। ইবনে উমর বলেন, লোকদের অভিমত ভিন্নতর হলে হযরত উমর যে রায় দিতেন সে মোতাবিক কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো।

ইমাম তিরমিযী এবং হাকেম উকবা বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার পর যদি কেউ নবী হতেন তবে তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব। এ রেওয়ায়েতটি তাবারানী আবু সাঈদ খুদরী এবং আসমা বিন মালিক থেকে এবং ইবনে আসাকির ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, উমরকে দেখে শয়তান পালিয়ে যেতে দেখেছি। ইবনে মাজা এবং হাকেম উবাই বিন কাব থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত উমরের সাথে মোসাফাহ করবেন, সালাম দিবেন এবং হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ইবনে মাজা এবং হযরত আবু যর থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, উমরের মুখে ও অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সর্বদা সত্য বলতেন।

ইবনে মানী'আ মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) থেকে নকল করে লিখেছেন, মুহাম্মাদ (সা.)-এর সহচরদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই যে, হযরত উমরের যবান ছিল প্রশান্তময়। বায্যার ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হযরত উমর হলেন জান্নাতীদের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপ।

বায্যার কাদাম বিন মাজউন এবং তিনি তাঁর চাচা উসমান বিন মাজউন থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমরের পানে ইশারা করে বলেন, যতক্ষণ তিনি তোমাদের মাঝে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ফেতনার দরজা শক্তভাবে বন্ধ থাকবে।

তাবারানী আওসাদ গ্রন্থে ইবেন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, একদা জিবরাঈল (আ.) নবী আকরাম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, উমরকে সালাম জানাবেন এবং তাকে এ সুসংবাদ দিবেন যে, তার ক্রোধ হলো বিজয়, আর সন্তুষ্টি হলো দর্শন।

ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, শয়তানরা হযরত উমরকে দেখে ভয় পেতো। ইমাম আহমদ এ হাদীসটি বুরাইদার সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায়।

ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আসমানের সকল ফেরেশতা উমরকে সম্মান এবং পৃথিবীর সকল শয়তান তাকে ভয় করে।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতে অবস্থানকারী (হাজীদের-

অনুবাদক) নিয়ে সাধারণত এবং হযরত উমরকে নিয়ে বিশেষত গর্ব করেন। এ ধরনের আরেকটি বৃহৎ হাদীসটি হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

তাবারানী এবং দাইলামী ফজল বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, উমর যেখানেই থাক হক তার সাথেই থাকবে। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ইবনে উমর এবং আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, একটি কূপে বালতি নামানো দেখে আমি কয়েক বালতি উত্তোলন করলাম। আমার পর আবু বকর বালতি নিলেন এবং এক অথবা দুই বালতি উত্তোলন করলেন, কিন্তু তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন। অতঃপর উমর বালতি ধারণ করলেন এবং এমনভাবে তা উত্তলন করলেন, যা আমি একজন যুবককেও এভাবে উত্তোলন করতে দেখিনি। আর তখন চতুর্দিক থেকে তৃষ্ণার্থরা এসে পিপাসা নিবারণ করে।

ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, ওলামাগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, এটা হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুকের খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত। আর হযরত উমরের খিলাফতকালে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান এবং ইসলামের ব্যাপক প্রসার হবে।

তাবারানী সদীসা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, উমর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে শয়তান তার মুখোমুখি হলে সে মুখ ফিরিয়ে উলটে পড়তো। তাবারানী উবাই বিন কাব থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে বলেন, উমরের ইন্তেকালে ইসলাম রোদন করবে।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে উমরের সাথে শত্রুতা করবে সে আমার সাথে শত্রুতা করল। আর যে উমরকে ভালোবাসবে সে যেন আমাকে ভালোবাসল। আল্লাহ তা'আলা আরাফাতে অবস্থানরত (হাজীদের-অনুবাদক) নিয়ে সাধারণত এবং হযরত উমরকে নিয়ে বিশেষত গর্ব করেন। সকল নবীর উম্মতের মধ্যে একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। আর আমার উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন উমর। সাহাবাগণ আরয করলেন, কে মুহাদ্দিস হতে পারে? নবী করীম (সা.) বলেন, যার ভাষায় ফেরেশতাগণ কথা বলেন। এর সূত্রগুলো বিশুদ্ধ।

হযরত উমর সম্পর্কে সাহাবা এবং সলফে সালেহিনদের অভিমত ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমার নিকট হযরত উমরের চেয়ে প্রিয়তম আর কেউ নেই। (ইবনে আসাকির)

হযরত আবু বকরকে মৃত্যু শয্যায় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, হযরত উমরকে খলীফা নির্ধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে কি উত্তর দিবেন? তিনি বললেন, বলব লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করেছি। (ইবনে সাদ)

হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমরা সৎ লোকদের আলোচনায় হযরত উমরকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুল না। কারণ বেশিদিন গত হয়নি তার যবান ছিল প্রশান্তময়। (তাবারানী-আওসাত)

ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আমরা কাউকে হযরত উমরের চেয়ে অধিক মেধাবী এবং দানশীল আর কাউকে পাইনি। (ইবনে সাদ)

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত উমরের জ্ঞান পাল্লার এক দিকে আর পৃথিবীর সকল জ্ঞান পাল্লার অপর দিকে তুলে দিলে হযরত উমরের জ্ঞানের পাল্লা ভারি হবে। কারণ জ্ঞানের দশমাংসের নবমাংশ হযরত উমরকে দেয়া হয়েছে। (তাবারানী, হাকিম)

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, পৃথিবীর ইলম হযরত উমরের কোলে লুকিয়ে ছিল। তিনি আরো বলেন, হযরত উমর আল্লাহর পথে নিরাপত্তার কোনো পরোয়া করতেন না। হযরত মুআবিয়া বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে দুনিয়া ধরা দেয়নি, তিনি এর কামনাও করতেন না। আর হযরত উমরের নিকট দুনিয়া এলেও তিনি তা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন, কিন্তু আমরা দুনিয়াকে পেটের মধ্যে নিয়ে ফেলেছি।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইন্তেকালের পর তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর হযরত আলী এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর এ কাপড় পরিহিত ব্যক্তির চেয়ে কারো আমল বেশি পছন্দনীয় ছিল না। (হাকেম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, পুণ্যবান লোকদের আলোচনার সময় অবশ্যই হযরত উমরের নাম নিবে। কারণ তিনি আমাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম এবং আল্লাহর দ্বীনের সবচেয়ে বড় ফকীহ। (তাবারানী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসকে হযরত আবু বকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি আপাদমস্তক কল্যাণকর, অতঃপর হযরত উমর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সচেতন পক্ষির ন্যায়, চারণ ক্ষেত্রের প্রতিটি স্থানে যার মনে থাকত এ কথা যে, পাতান জালে পা দিলে ফেঁসে যাব। আবার হযরত আলী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, দৃঢ়সংকল্প, সামুদ্রিক জ্ঞান, সাহসিকতা এবং বীরত্ব তাঁর মধ্যে ঢুকে দেয়া হয়েছে। (তাওরিয়াত)

তাবারানী উমায়ের বিন রাবী'আ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব হযরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করেন, পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে কিভাবে আমার বিবরণ এসেছে? কাব বললেন, আপনার সম্পর্কে লিখা রয়েছে- قرنا من حديد হযরত উমর বললেন, এর অর্থ কি? কাব বললেন, তিনি এমন এক শক্তিশালী শাসনকর্তা যিনি আল্লাহর পথে কারো নিন্দার কোন পরোয়া করেন না। হযরত উমর বললেন, আর কি লিখা রয়েছে? কা'ব বললেন, আপনার পর যিনি খলীফা হবেন গোটা সম্প্রদায় মিলে তাঁকে শহীদ করে দিবে। হযরত উমর বললেন, আর কি লেখা রয়েছে? কা'ব বললেন, অতঃপর চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মাধ্যমে হযরত উমরের মর্যাদা অনুধাবন করা যেতে পারে। এক. হযরত উমর বদর যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করার অভিমত পেশ করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ দুই. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুণ্যাত্মা বিবিগণের পর্দার ব্যাপারে হযরত উমর নিজের মতামত তুলে ধরলে হযরত যয়নব বললেন, হে উমর বিন খাত্তাব! আপনি আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, অথচ আমাদের ঘরেই ওহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত উমরের অভিমতের সাথে সঙ্গতি রেখে পর্দার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا তিন. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ দু'আর বরকতে হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন। চার. তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে সর্বপ্রথম বাইয়াত গ্রহণ করেন। (আহমদ, বায্যার, তাবারানী)

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম হযরত উমরের খিলাফতকালে শয়তান অবরুদ্ধ ছিল। তাঁর (ইন্তেকালের-অনুবাদক) পর শয়তান মুক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। (ইবনে আসাকির)

দশম পরিচ্ছেদ

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আলীকে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের চেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার মনে করবে, সে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, সকল মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের ত্রুটি চিহ্নিত করবে।

হযরত শারীক বলেন, যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পুণ্য রয়েছে সে কখনোই এ কথা বলবে না- হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুকের চেয়ে

বেশি হযরত আলী খিলাফতের প্রাপ্য ছিলেন না।

হযরত আবু উসামা বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কি জান হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুক ইসলামের পিতা-মাতা।

হযরত জাফর সাদেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে ভালো মনে করে স্মরণ করবে না, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

হযরত উমরের অভিমতের সাথে কুরআনের ঐকমত্য ঃ

ইবনে মারদুয়া মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর যে রায় দিতেন অনুরূপভাবেই কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো।

ইবনে আসাকির হযরত আলীর অভিমত নকল করে লিখেছেন, কুরআন শরীফে অধিকাংশ হযরত উমরের রায় উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক মারফুআন বর্ণিত, কতিপয় বিষয়ে লোকদের মতামতের সাথে হযরত উমর ভিন্ন মত পোষণ করলে হযরত উমরের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয়াত অবতীর্ণ হতো।

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার প্রতিপালক তিন বার আমার অভিমতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। এক. ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাতে চাই।

অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

দুই. আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পুণ্যাত্মা বিবিগণের কাছে সব ধরনের লোক যাতায়াত করে। আপনি তাঁদের পর্দা করার নির্দেশ দিন। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিন. পুণ্যাত্মা বিবিগণ লজ্জা দিলে আমি বললাম-

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ-

অতঃপর আমার উল্লিখিত শব্দগুলোই হুবহু অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে তিন বিষয়ে একমত, এক. পর্দা, দুই. বদরের যুদ্ধবন্দী এবং তিন. মাকামে ইবরাহীম। এ হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় নম্বর বিষয়টির মাধমে চারটি দৃষ্টান্ত জানা গেল।

ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে চারটি বিষয়ে একমত হওয়ার কথা লিখেছেন। এক. বছর যুদ্ধবন্দী, দুই. পর্দা, তিন. মাকামে ইবরাহীম এবং চার. মদের অবৈধতা। এ হাদীসে উল্লিখিত চতুর্থ নম্বর বিষয়টির মাধ্যমে পাঁচটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

মদের অবৈধতা সম্পর্কে সুনানা এবং মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে রয়েছে একদা হযরত উমর দু'আ করেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের জন্য কিছু অবতীর্ণ করুণ। অতঃপর শরাব হারাম হওয়ার বাণী নাযিল হয়।

ইবনে আবী হাতেম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা চারটি বিষয়ে আমার সাথে একমত হয়েছেন। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ তখন এমনিতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়- فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ অতঃপর হুবহু এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত উমরের ছয়টি অভিমতের সাথে একমত পোষণ করে ওহী অবতীর্ণ করেছেন বলে জানা গেল। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের সূত্রে গ্রন্থকার তাফসীরে মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মাস্‌নাফ আবু আব্দুল্লাহ শীবানী কর্তৃক প্রণীত কিতাবে ফাজাইলুল উম্মাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, হযরত উমরের সাথে তাঁর প্রতিপালক একুশ জায়গায় একমত হন। এর মধ্যে ছয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম. আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের জানাযার জন্য সমবেত হতে বললে আমি হযরতের সামনে গিয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! উবাই বিন কাব কঠোর শত্রু ছিল। সে অমুক দিন এই এই কথা বলেছে। আল্লাহর কসম কিছুক্ষণ পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا

অষ্টম. এক ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ নবম. আরেক ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ গ্রন্থকার বলেন, অষ্টম ও নবম নম্বর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতদ্বয় সপ্তম নম্বর হাদীসের সাথে যুক্ত এইক ঘটনার ধারাবাহিকতা।

দশম. রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি বললাম- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ তখন হুবহু এ আয়াতটিই নাযিল হলো- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ তাবারানী এ রেওয়ায়েতটি ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

একাদশ. রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে বদর যুদ্ধে যাবার পরামর্শ করছিলেন তখন হযরত উমর যুদ্ধে গমনের পরামর্শ দিলে নাযিল হয়- كَمَا اَخْرَ

جَلَّ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ দ্বাদশ. হযরত আয়েশা সিদ্দীকার অপবাদের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) পরামর্শ চাইলে হযরত উমর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আয়েশার সাথে কে বিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ। হযরত উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, আপনার রব আপনাকে ত্রুটিযুক্ত জিনিস দিয়েছেন? অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

ত্রয়োদশ. ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রমযানের রাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হারাম ছিল। হযরত উমর এ বিষয়ে মন্তব্য করলে এ আয়াত নাযিল হয়– أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ এ হাদীসটি ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশ. এক ইহুদী হযরত উমরকে বলল, তোমাদের নবী যে জিবরাঈলের কথা বলেন তিনি আমাদের দুশমন! হযরত উমর বললেন–

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

অতঃপর হুবহু এ আয়াতই অবতীর্ণ হয়। এ রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর কয়েকটি সূত্রে এবং ইবনে আবী হাতেম আব্দুর রহমান ইবনে আবু ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেন।

পঞ্চদশ. রাসূলুল্লাহ (সা.) দু' ব্যক্তির বিবাদ মিমাংসা করে দিলেন একজনের তা মনঃপূত না হওয়ায় সে পুনরায় হযরত উমরের নিকট বিচার প্রার্থনা করায় তিনি তাকে হত্যা করেন। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি উমরের ব্যাপারে এমনটা ধারণা করি না যে, তিনি কোনো মুমিনকে হত্যা করতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে আবু হাতিম এবং ইবনে মারদুয়া আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। গ্রন্থকার বলেন, আমি তাফসীরে মুসনাদ গ্রন্থে এ রেওয়ায়েতের বিভিন্ন সূত্র বর্ণনা করছি।

ষষ্ঠদশ. একদিন হযরত উমর স্ব-গৃহে শুয়ে ছিলেন। তাঁর গোলাম অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তিনি এ দু'আ করেন, হে আল্লাহ! বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা হারাম করে দিন। সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সপ্তদশ. তিনি বলতেন, ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি। এ প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অষ্টদশ. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

এ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাটি ইবনে আসাকির, স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট।

উনবিংশ. اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا এ আয়াতটি মানসুখে তিলাওয়াত।

বিংশ. উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান فِى الْقَوْمِ فُلَانٌ বললে এর জবাবে হযরত উমর বলেন. لَاتُجِيْبُهُ। আর এ কথার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) একমত পোষণ করেন। এ বর্ণনাটি আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

উক্ত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যা আমরা একবিংশ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। উসমান বিন সাঈদ বিন আদ-দারমী কিতাবুর রুহ আলাল জাহীমা গ্রন্থে সালেম বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, একদা কা'ব আহবার বলেন, আসামনের বাদশাহ যমীনের বাদশাহর প্রতি আফসোস করছেন। একথা শুনে হযরত উমর বলেন, যমীনের বাদশাহর উপর নয়; বরং তার উপর যে তার নফসকে কবজায় নিয়েছে। এ কথা শ্রবনে কা'ব আহবার বললেন, আল্লাহর কসম, তৌরাত গ্রন্থে হুবহু আপনার কথাগুলোই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর হযরত উমর সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।

এছাড়াও ইবনে আদী কর্তৃক প্রণীত কামেল গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, প্রথম দিকে হযরত বিলাল আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এরপর حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলতেন। হযরত উমর বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এরপর اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বল। একথা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, উমর যেভাবে বলেছে সেভাবে বলবে। এ রেওয়াতেটির সনদ দুর্বল এবং বিশুদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী (হওয়ার কারণে সম্ভবত গ্রন্থকার তা হিসাবের মধ্যে গণ্য করেন নি– অনুবাদক)।

কারামত (অলৌকিকতা) ঃ বায়হাকী, আবু নাঈম দালাইলুন নবুওয়্যাত গ্রন্থে, লাকায়ী শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে, দারী ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে, ইবনে আরাবী কারামতে

আউলিয়া গ্রন্থে এবং খাতীব রাওয়াতু মালিক গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি বানিয়ে যুদ্ধ পাঠানোর পর একদিন খুতবা প্রদানের সময় হঠাৎ বলে উঠলেন– يَاسَارِيَةَ الْجَبَلِ অর্থাৎ, হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে। এভাবে তিনি তিন বার বললেন। কিছুদিন পর সেই রণাঙ্গণ থেকে দূত এলো। তিনি যুদ্ধের সংবাদ জানতে চাইলেন। দূত বলল, আমিরুল মুমিনীন! আমরা পরাজয়ের দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। হঠাৎ তিন বার "হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে" এ আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড়ের দিকে ছুটেছি আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুশমনদের পরাজিত করেন। ইবনে উমর বলেন, তখন সারিয়া অনারাব দেশে ছিলো, আর তিনি এখান থেকে আওয়াজ দেন। ইবনে হাজার আসকালীনী ইসাবা গ্রন্থে এর সনদগুলো সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে মারদুয়া মাইমুন বিন মেহরানের সূত্রে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, জুমআর দিন খুতবা প্রদানের সময় তিনি সহসা বলে উঠলেন–

يَاسَارِيَةَ الْجَبَلِ مَنْ إِسْتَرَعَى الذِّئْبَ ظَلَمَ–

অর্থাৎ, হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে যাও, বাঘের রক্ষকরা অত্যাচার করছে। লোকেরা এ কথা শুনে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল।

হযরত আলী বলেন, খুতবা শেষে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে সময় আমার মনে হলো মুশরিকরা আমাদের মুসলমান ভাইদের পরাজিত করে পাহাড়ের পাদদেশে অতিক্রম করছিল। এ মুহূর্তে আক্রমণ করলে তারা সকলেই নিহত এবং পরাজিত হবে হেতু আমার মুখ দিয়ে এ শব্দগুলো বেরিয়ে গেছে। এক মাস পর এক ব্যক্তি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলে সে বলল, আমরা হযরত উমরের আওয়াজ শুনে পাহাড়ের দিকে যেতেই আল্লাহ আমাদের বিজয় দেন।

আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে আমর বিন হারিসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত উমর জুমআর খুতবা দানের এক পর্যায়ে দুই অথবা তিন বার বললেন, হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। অতঃপর আবার খুতবা দিতে লাগলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে কেউ কেউ বললেন, তাকে উন্মাদনায় পেয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ হযরত উমরের সাথে বিনা সংকোচেই কথা বলতেন।

তিনি বললেন, আজ আপনি এমন কাজ করলেন যার কারণে লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্বকে ভর্ৎসনা করছে। হযরত উমর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে সময় অস্থির হয়ে পড়ছিলাম যখন দেখলাম মুসলমানরা লড়াই করছে, আর শত্রুরা

পাহাড়ের দিক থেকে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে, তখন আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আপনাতেই বলে ফেললাম, পাহাড়ের দিকে যাও। এরপর রণাঙ্গন থেকে সারিয়া পত্র নিয়ে এক দূত এলো। পত্রে লেখা ছিল জুমআর দিন দুশমনের সাথে লড়াই চলছিল। এক পর্যায়ে আমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এমন সময় ঠিক জুমআর নামাযের সময় আমরা শুনতে পেলাম "সারিয়া পাহাড়ের দিকে যাও"। এ আওয়াজ পেয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে গেলাম এবং বিজয় অর্জন করলাম। আমর বিন হারেছ বললেন, সেদিন যারা হযরত উমরকে উন্মাদনায় পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছিল তারা বলল, এ সবই উদ্ভট কথা।

আবুল কাসিম বিন বুশরান ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর জনৈক ব্যক্তিকে নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল, জামরাহ (স্ফুলিঙ্গ)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাবান নাম? সে বলল, শিহাব (অগ্নিশিখা) তিনি প্রশ্ন করলেন, গোত্রের নাম? সে বলল, হরকা (আগুন)। তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় থাক? সে বলল, হিররাহ (উত্তপ্ত পাথুরে যমীন) তিনি বললেন, হিররাহ কোথায়? সে জবাব দিল, নাতী (লেলিহান অগ্নিশিখা)। তিনি বললেন, পরিবারের খোঁজ নাও, তারা পুড়ে মরেছে। সে লোক গিয়ে দেখল সত্যিই তাই)। আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। মালিক প্রমুখ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবুশ শাইখ আল-আসমাত গ্রন্থে কায়েস ইবনে হাজ্জাজ-এর বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত উমর বিন আস কর্তৃক (মিসর-অনুবাদক) বিজিত হওয়ার পর মিসরবাসী তাঁর নিকট এসে বলল, আমাদের চাষাবাদ নীল নদের প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। নীল নদ শুষ্ক হয়ে গেলে প্রাচীন নীতি অনুযায়ী নীল নদের প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। নীল নদ শুষ্ক হয়ে গেলে প্রাচীন নীতি অনুযায়ী নীল নদের প্রবাহ বেগমান করতে হয়। হযরত আমর বিন আস বললেন, সে প্রাচীন নীতি কি? তারা বলল, চাঁদের একাদশতম রজনীতে এক অবিবাহিত যুবতির বাবাকে রাজী করে তাকে উন্নতমানের পোশাক এবং অলংকারাদি পরিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি। হযরত আমর বললেন, ইসলাম পূর্বের প্রথা রহিত করেছে। অতএব তোমরা তা করতে পারো না। কিছুদিন পর নীল নদের প্রবাহ থেমে গেলে কতিপয় মিসরবাসী হযরত আমর বিন আসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মনস্থির করলে হযরত আমার বিন আস বিষয়টি পত্র মারফত আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে অবহিত করলেন। কয়েকদিন পর আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) জবাবে এ পত্র

লিখলেন– তুমি সুন্দর পত্র দিয়েছ, এসব প্রথা উৎখাতের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। এ পত্রের সাথে যুক্ত একখানা মোড়ানো কাগজের টুকরো দিলাম যা নীল নদে ফেলে দিবে। এ পত্র হযরত আমর বিন আসের হস্তগগত হলে তিনি সেই মোড়ানো কাগজটি খুলেন। তাতে লিখা ছিল– আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন উমরের পক্ষ হতে নীল নদের অবগতির জন্য প্রশ্ন করছি, তুমি যদি নিজের শক্তিতে প্রবাহিত হও তবে তুমি আর কখনই প্রবাহিত হওয়ো না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা প্রবাহিত করেন তাহলে সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিধর প্রতিপালকের নিকট আমার আবেদন, তেমাকে প্রবাহিত করুন।

হযরত আমর বিন আস (রা.) কাগজের টুকরোটি শুকতারা উদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে নীল নদে ফেলে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মিসরবাসী দেখল আল্লাহ তা'আলা এক রাতে নীল নদে ষোলো হাত পানির তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আর সেদিন থেকে আল্লাহ তা'আলা মিসরবাসীর এই প্রথা বন্ধ করে দেন।

ইবনে আসাকির তারেক বিন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমরকে সত্য মিথ্যার মিশ্রণে কিছু কথা বলছিলেন। হযরত উমর কখনো তাকে থামতে বলেন, আবার কখনো বলতে বলেন, অবশেষে সে বলল, আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্য। তবে যে সব কথার প্রেক্ষিতে আমাকে থামতে বলেন তা ছিল মিথ্যা। হযরত হাসান বলেন, কথার মধ্যে মিশ্রিত মিথ্যা অংশটুকু হযরত উমর চিহ্নিত করতে পারতেন।

বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে আবু হুদাবা হামসী থেকে বর্ণনা করেন, ইরাকবাসী তাদের গর্ভনরকে পাথর মারার সংবাদ পেয়ে হযরত উমর ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সেদিন তাঁর নামায ভুল হওয়ায় নামায পড়ে এ দু'আ করলেন– হে আল্লাহ! তারা নামায গড়মিল করেছে, তাদের প্রতিটি কাজ গড়মিল করে দিন। তাদের প্রতি বনূ ছাকীফ গোত্রের এক ছোকড়াকে চাপিয়ে দিন, যে জাহেলিয়াতের যুগের অত্যাচারের মত তাদেরকে শাসন করবে এবং সে তাদের ভালো কাজ গ্রহণ করবে না এবং খারাপ কাজের শাস্তি ক্ষমা করবে না। গ্রন্থকার বলেন, ছোকড়া বলতে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফীকে বুঝিয়েছেন। ইবনে লাহী'আ বলেন, সে ছোকড়ার তখন জন্মই হয়নি।

অভ্যাস : ইবনে সাদ আখলিফ বিন কায়েসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমরা আমিরুল মুমিনীন হযরত উমরের দরজায় বসা ছিলাম। এমন সময়এক বাঁদীকে

পার হতে দেখে আমরা বললাম, এ আমিরুল মুমিনীনের বাঁদী। আমিরুল মুমিনীন বললেন, এ আমিরুল মুমিনীনের বাঁদী নয়। তার জন্য বাঁদী রাখা বৈধ নয়। আমরা আরয করলাম, তাহলে কি রাখা বৈধ? তিনি বললেন, হজ্জ এবং উমরাহর জন্য শীত ও গরমের দু'টি কাপড় এবং নিজ পরিবারের খাওয়ার খরচ ছাড়া উমরের কাছে আর কিছু রাখা বৈধ নয়। এটা অতিসাধারণ এক কুরাইশের জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত। রাবী বলেন, এরপর থেকে আমাদের অবস্থাও ছিল তাই।

হাযিমা বিন ছাবিত বলেন, তিনি এ শর্তে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাতেন যে, তুর্কী অশ্বে আরোহণ করবে না, উন্নত খাবার খাবে না, পাতলা কাপড় পরবে না এবং প্রয়োজনে যারা আসবে তাদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখবে না। এমনটা করলে শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইকরামা বিন খালিদ বলেন, হযরত হাফসা, হযরত আব্দুল্লাহ প্রমুখ হযরত উমরকে বললেন, আপনি উন্নতমানের আহার্য গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলার কাজ করার ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করতে পারবেন। তিনি বললেন, এটাকি তোমাদের সকলের অভিমত? তাঁরা সকলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, তোমাদের সুচিন্তিত অভিমত? তাঁরা সকলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, তোমাদের সুচিন্তিত মতামতে আমি ধন্য। তবে এ শাহী পথেই আমার দুই বন্ধুকে (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)–অনুবাদক) পেয়েছি। আল্লাহ না করুন যদি এ শাহী পথ বর্জন করি তাহলে আর আমি দুই বন্ধুর মর্যাদা অর্জন করতে পারব না। কথিত আছে, এক সামান্য দুর্ভিক্ষের বছর থেকে তিনি ঘি এবং তৈল জাতীয় খাবার খাওয়া ছেড়ে দেন।

ইবনে আবী মালীকা বলেন, উকবা বিন ফিরকদ হযরত উমরকে ভালো খাবার খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, আফসোস! আমি এ অল্প দিনের জিন্দেগীর পুণ্যগুলো কি সব খেয়ে ফেলব?

হযরত হাসান বলেন, একদা হযরত উমর তাঁর ছেলে হযরত আসেমের নিকট এসে তাকে গোশত খেতে দেখে বললেন, তুমি কি খাচ্ছ? হযরত আসেম বললেন, আজ গোশত খেতে আমার মন চেয়েছিল। হযরত উমর বললেন, তোমার মন যা চাইবে তাই কি খেতে হবে? যে সবসময় নিজের মনমতো খায় পরকালে তাকে চোর হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে।

আসলাম বলেন, একদা হযরত উমর (রা.) বললেন, আমার মন মাছ খেতে চাইছে। তার গোলাম ইরফা নামক উটে চড়ে চার মাইল দূরে মাছ আনতে যায়।

ঝোলা ভর্তি সে মাছ কেনে। ফেরার পথে উট হাঁকিয়ে দ্রুত আসতে গিয়ে উট ঘর্মসিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, মাছ রাখ আগে উট দেখব। তিনি উটের কাছে গেলেন এবং উটের কানের নিচে বিন্দু বিন্দু জমানো ঘাম দেখে বললেন, তুমি একে গোসল করাওনি। আমার ইচ্ছার কারণে এ পশুকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছ। আল্লাহর কসম! আমি এ মাছ স্পর্শই করব না।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, হযরত উমর খলীফা থাকাকালে তিনি চামড়ার তালিযুক্ত ফাটা কাপড় পরে পথ দিয়ে বাজারে গিয়ে লোকদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে সাবধান করতেন। কোনো বোঝা দেখলে তিনি তা নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে বাড়িতে পৌছে দিতেন। হযরত আনাস বলেন, হযরত উমরের জামার পেছনে চারটি তালি দেখেছি। আবু উসমান নাহদী বলেন, হযরত উমরের পায়জামায় চামড়ার পট্টি লাগা দেখেছি।

আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবীআ বলেন, আমি হযরত উমরের সাথে হজ্জ করেছি। সফরের সময় পথিমধ্যে তিনি কোন তাঁবু গাড়তেন না; বরং গাছের ডালে কম্বল অথবা কাপড় টানিয়ে তার ছায়ায় বসতেন।

আব্দুল্লাহ বিন ঈসা বলেন, কান্নার পানি প্রবাহিত হতে হতে হযরত উমরের চেহারায় কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। কখনও তিনি ওযীফার আয়াত পড়তে পড়তে পড়ে যেতেন। মানুষ অসুস্থ ভেবে দেখতে আসত।

হযরত আনাস বলেন, আমি এক বাগানে গেলাম। দেয়ালের এ প্রান্ত থেকেই ওপ্রান্তে অবস্থানরত হযরত উমরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি বলেছেন, হে উমর! কোথায় তুমি, আর কোথায় আমিরুল মুমিনীনের মর্যাদা ও সম্মান। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, অন্যথায় তিনি শাস্তি দিবেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমার বিন রবীআ বলেন, আমি হযরত উমরকে দেখলাম তিনি মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড উঠিয়ে বললেন, হায়! আমি যদি এ তৃণখণ্ড হতাম, তাহলে আমি মাতৃগর্ভে আসতাম না এবং আমি আর আমি হতাম না।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হাফস বলেন, একদা হযরত উমর পানির মশক পিঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা তাঁর এ আচরণে বিস্মিত হলে তিনি বললেন, আমার মধ্যে গর্ব ও অহংকার এসেছে। ফলে তা খর্ব করছি।

মুহাম্মদ বিন সিরীন বলেন, হযরত উমরের শ্বশুর এসে বাইতুল মাল থেকে কিছু চাইলে তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, আপনি কি চান যে, আমি আল্লাহর নিকট প্রতারক বাদশাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকি! অতঃপর তিনি নিজ তহবিল

থেকে দশ হাজার দেরহাম প্রদান করেন।

নাখ'য়ী বলেন, হযরত উমর নিজ শাসনামলেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। হযরত আনাস বলেন, হযরত উমর দুর্ভিক্ষের বছর থেকে ঘি খাওয়া ছেড়ে দেন। একদা তিনি মাখন এবং তৈল জাতীয় খাবার খেলে তার পেটে পীড়া দেখা দেয়। সে সময় তিন আঙুল উঁচিয়ে বললেন, দুর্ভিক্ষের বছর থেকে আমার ঘরে তেমন কিছু নেই।

সুফয়ান আয়না বলেন, হযরত উমর বলেন, যে আমার ত্রুটি চিহ্নিত করে দেয় সে ব্যক্তি আমার প্রিয়। আসলাম বলেন, আমি হযরত উমরকে ঘোড়ার কান ধরে লাফ দিয়ে অশ্বারোহণ করতে দেখেছি। ইবনে উমর বলেন, আমি হযরত উমরকে রাগ করতে দেখেনি। আল্লাহর যিকির, আল্লাহর ভয় এবং কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া তাঁর রাগ যেতো না।

হযরত বিলাল হযরত আসলামকে হযরত উমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি উমরকে কেমন দেখেছেন? তিনি বললেন, হযরত উমর একজন খাঁটি মানব। কিন্তু রেগে গেলে তাঁকে থামানো মুশকিল হয়ে পড়তো। হযরত বিলাল বললেন, সে সময় আপনি কেন কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন না? তিলাওয়াত করলে তাঁর রাগ চলে যায়।

আহওয়াজ বিন হাকীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমরের সামনে ঘি দিয়ে রান্না করা গোশত দেয়া হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বলেন, এ দু'টি (ঘি এবং গোশত-অনুবাদক) পৃথক পৃথক খাবার। এ দু'টিকে একত্রে রান্না করার প্রয়োজন ছিল না। এ পর্যন্ত উল্লিখিত ঘটনাগুলো ইবনে সাদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে সাদ হাসান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, একজন আমীরকে অন্য আমীরের স্থানে পরিবর্তনের মাধ্যমে লোকদের সংশোধনের পথকে সহজ মনে করি।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

ইবনে সাদ এবং হাকেম হযরত যর থেকে বর্ণনা করেন, আমি মদীনাবাসীর সাথে ঈদগাহে যাবার সময় হযরত উমরকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। তিনি তখন বৃদ্ধ এবং বাম হাতে বেশি কাজ করতেন। তিনি ছিলেন গোধূম বর্ণের। মাথার চুল শিরস্ত্রাণ পরার কারণে ঝরে যায়। লম্বা পদযুগল এবং সবার চেয়ে উঁচু

ছিলেন। সবার মাঝে দাঁড়ালেন মনে হতো তিনি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করেছেন। ওকেদী বলেন, যারা হযরত উমরকে গোধূম বর্ণের বলেছেন তারা দুর্ভিক্ষের বছর থেকে দেখেছেন। তিনি তৈল জাতীয় খাবার খেয়ে পরিবর্তন হয়ে যান।

ইবনে সাদ হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি লাল সাদা মিশ্রিত বর্ণের অধিকারী ছিলেন। প্রলম্বিত পদযুগল, ঝরা চুল এবং বৃদ্ধতার ছাপ তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হতো। উবায়েদ বিন উমায়ের বলেন, সকলের চেয়ে তাঁকে উঁচু মনে হতো। আসমা বিন আকওয়া বলেন, তিনি বাম হাতে সকল কাজ করতেন। ইবনে আসাকির আবু দুজা আতা রদ্দী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর লম্বা পদ যুগল এবং মোটা তাজা ছিলেন। তাঁর অনেক চুল ঝরে যায়। তিনি লালিমাযুক্ত বড় বড় গোঁফের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে আসাকির স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমরের মা হলেন, হানতামা বিনতে হিশাম বিন মুগীরা। অর্থাৎ তার মা আবু জাহেলের বোন, আর আবু জাহেল তার মামা।

খিলাফত ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জীবদ্দশায় হযরত উমর খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত হন ১৩ হিজরীর জামাদিউল উখরা মাসে।

যহরী বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যেদিন ইন্তেকাল করেন ১৩ হিজরীর জমাদিউল উখরা মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবারের হযরত উমর খলীফা মনোনীত হন। (হাকিম)

তাঁর যুগে ইসলামের বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়। ১৪ হিজরীতে দামশক সন্ধি ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে হামস ও বাআলাবাক্কা সন্ধির মাধমে, বসরা ও ইলা প্রভাব বিস্তার করে বিজয় হয়। ১৪ হিজরীতে তিনি তারাবীর নামাযের জন্য লোকদের সমবেতন করেন। (আসকারী)

১৫ হিজরীতে উরওয়ান প্রভাবের মাধ্যমে এবং তবরীয়া সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়। এ বছরেই ইয়ারমুক এবং কাদেসিয়ার ঘটনা ঘটে। (ইবনে জারীর) এ বছর হযরত সাদ কুফা নগরী উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। এ বছর থেকে হযরত উমর ভাতা, বৃত্তি ও প্রশাসনিক কাজের জন্য দফতরের প্রবর্তন করেন।

১৬ হিজরীতে আহওয়ায এবং মাদায়েণ মুসলমানদের করতলগত হয়। হযরত সাদ কিসরার রাজ প্রসাদে জুমআর নামায পড়েন, এটা ছিল ইরাকের মাটিতে

সর্বপ্রথম জুমআর নামায। এটা ৬ হিজরীর সফর মাসের ঘটনা। এ বছর জালুলার ঘটনা ঘটে এবং ইয়াযুজারদ বিন কিসরা পরাজিত হয়ে রায়ের দিকে পালিয়ে যায়। তাকরীতও মুজাহিদদের হস্তগত হয়। হযরত উমরের আগমনে বাইতুল মুকাদ্দাসেও বিজিত হয়। তিনি জাবায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ অভিভাষণ প্রদান করেন। এ বছরেই কানসিরীন এবং সুরুজ যুদ্ধের মাধ্যমে এবং হলব, ইনতাকীয়া, মিনজা ও কারকিসা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়। ১৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত আলীর পরামর্শে হযরত উমর ঐতিহাসিক হিজরতের হিসাব থেকে হিজরী বর্ষের প্রবর্তন করেন।

১৭ হিজরীতে তিনি মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন। হিজাজে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত উমর হযরত আব্বাসকে সাথে নিয়ে ইসতেসকার নামায আদায় করেন। ইবনে সাদ নিয়ারুল আসলামা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাদর মোবারক পরে ইসতেসকার নামায পড়েন। হযরত ইবনে উমর বলেন, তিনি হযরত আব্বাসের হাত ধরে উর্ধ্বে তুলে দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমরা সহায়হীন বান্দা আপনার রাসূলে মাকবুল (সা.)-এর চাচাকে ওসীলা করে আরয করছি, শুষ্কতা উঠিয়ে নিন এবং রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। এ দু'আ করে ফিরে না আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এ বছর আহওয়ায সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়।

১৮ হিজরীতে নিশাপুরের কিয়দংশ সন্ধির মাধ্যমে এবং হালওয়ান, বাস্‌সী, সামসাত, হারান, নাসীবীন, মৌসূল, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং জাযিরায়ে আরবের অধিকাংশ অঞ্চল লড়াই-এর মাধ্যমে ইসলামের ছায়াতলে আসে। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে জাযিরায়ে আরবের অধিকাংশ অঞ্চল সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়।

১৯ হিজরীতে কিসারিয়া এবং ২০ হিজরীতে মিসর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে আসে। কারো কারো মতে ইস্কান্দারিয়া ছাড়া গোটা রাজ্য সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়। আলী বিন রাববাহ বলেন, গোটা পশ্চিমাঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। এ বছর তসতর বিজয় হয়, রোম সম্রাট পরলোকগমন করেন, হযরত উমর খায়বর এবং নাজরান থেকে ইহুদীদের বের করে দেন এবং খায়বর ও ওয়াদিউল কুরা বণ্টন করেন।

২১ হিজরীতে ইস্কান্দারিয়া এবং নিহাঅন্দ যুদ্ধ করে অর্জনের পর অনারব বিশ্বে আর কোনো অবাধ্যের দল রইল না। ২২ হিজরীতে আযার বাইজান যুদ্ধ অথবা

সন্ধির মাধ্যমে, দিনুর, মাসবাদন, এবং হামদান যুদ্ধ করে জয় হয়। এ বছর আবলাসুল আরব, আসকার এবং কুমশ হস্তগত হয়।

২৩ হিজরীতে কারমানে সাজিসতান, কামরানের পাহাড়ি অঞ্চল, আসবাহান এবং এর পার্শ্ববর্তী জনপদ বিজিত হয়। এ বছরের শেষ দিকে হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হযরত উমর শহীদ হন।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেন, হযরত উমর মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর উট থেকে নেমে আসমানের দিকে হাত তুলে এ দু'আ করেন– হে আল্লাহ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। শক্তি হ্রাস পেয়েছে। ইচ্ছাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এরপর আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়ব এবং আমার বিবেক লোপ পাবে। অতএব আমাকে আপনার নিকট আহবান করুন। অতঃপর যিলহজ্জ মাস শেষ না হতেই তিনি শহীদ হন। (হাকেম)

আবু সালিহুস সামান বলেন, হযরত কা'ব বিন আহবার হযরত উমরকে বলেন, আমি তৌরাতে দেখেছি আপনি শহীদ হবেন। হযরত উমর বললেন, এ কি করে হয়। আমি আরবে থাকব অথচ শহীদ হয়ে যাব?

আসলাম বলেন, হযরত উমর দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে, আপনার হাবীবের শহরে শাহাদত অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন। (বুখারী)

মাদান বি আবী তালহা বলেন, হযরত উমর তার এক ভাষণে বলেন, আমি স্বপ্নে যা দেখলাম তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। এ পর্যায়ে উম্মতের লোকেরা আমাকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করার কথা বলছে। স্মরণ রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীণ এবং খিলাফতকে নিশ্চিহ্ন করবেন না। মৃত্যু আমার সঙ্গী হলেও দ্বীন এবং খিলাফত আমার সাথী নয়। আমার পর ছয়জন যাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাতে যাবার সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁদের পরামর্শক্রমে খলীফা নির্বাচন করবে। (হাকেম)

যহরী বলেন, হযরত উমরের নীতি ছিল তিনি মদীনা শরীফে কোনো যুবককে ঢুকতে দিতেন না। একবার কুফার শানসকর্তা হযরত মুগীরা বিন শো'বা খলীফা উমরের নিকট পত্র লিখলেন, যে, আমার নিকট একজন দক্ষ কারিগর যুবক রয়েছে। সে উন্নতমানের নকশা তৈরি করতে পারে। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিব। হযরত উমর অনুমতি দিলেন। কুফায় হযরত মুগীরা সে যুবকের উপর মাসিক একশ দেরহাম কর নির্ধারণ করে রেখেছিল। সে মদীনায় এসে সে ব্যাপারে হযরত উমরের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে তিনি বললেন, এ

কর তো বেশি কিছু নয়। এ কথা শুনে সে যুবক ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁতে দাঁত পিষে প্রস্থান করল। দু'তিন দিন পর হযরত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, আমি শুনলাম তুমি নাকি বলেছ আমি চাইল এমন এক চাক্কি তৈরি করবে যা বাতাসে উড়বে? সে বলল, আমি আপনার জন্য এমন এক চাক্কি তৈরি করব যা চিরদিন মানুষ স্মরণ রাখবে। সে চলে গেলে তিনি বললেন, এ যুবক আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গেল। একদিন সে হীরা কাটা দু'ধারাবিশিষ্ট একটি খঞ্জর জামার নিচে লুকিয়ে মসজিদের এক কোণে এসে বসে। আর এদিকে হযরত উমর নামাযের জন্য লোকদের জাগিয়ে দিচ্ছিলেন। তার নিকটবর্তী হলে সে তাঁর শরীরে খঞ্জর দ্বারা তিনবার আঘাত করে। (ইবনে সাদ)

আমার বিন মাইমুন আনসারী বলেন, হযরত মুগীরার গোলাম আবু যুযুয়াহ–এর দু'ধারবিশিষ্ট খঞ্জরের আঘাতে হযরত উমর শহীদ এবং তাঁর সাথে ছিলেন এমন বারোজন আহত হন, যাদের মধ্যে ছয়জন মারা যান।

আবু রাফে বলেন, হযরত মুগীরার গোলাম আবু যুযুয়াহ চাক্কি তৈরি করত। তিনি তার নিকট থেকে দৈনিক চার দিরহাম রাজস্ব আদায় করতেন। সে হযরত উমরের কাছে এলে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে বলল, আমিরুল মুমিনীন! মুগীরা আমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করেছেন। আপনি তাঁকে সাবধান করুন। তিনি বললেন, তুমি তোমার মনিবের সাথে ভালো আচরণ করবে। হযরত উমরের ইচ্ছে ছিল তিনি এর ব্যাপারে হযরত মুগীরার নিকট সুপারিশ করবেন। কিন্তু এ কথা তার পছন্দ না হওয়ায় সে রাগত স্বরে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি ছাড়া সকলেই সুবিচার পেয়েছে। সে খলীফাকে হত্যা করার ইচ্ছায় বিষ মিশ্রিত খঞ্জর নিজের কাছে রাখতে লাগল। হযরত উমর ফজর নামাযের সময় যখন কাতার সোজা করার কথা বলছিলেন ঠিক তখন আবু যুযুয়াহ হযরত উমরের সামনে এসে গলা ধরে পিঠের উঁচু অংশে উপর্যুপরি দু'টি আঘাত করে। তিনি পড়ে গেলে সে অন্যদের উপর আঘাত করলে তেরোজন আহত হয়, যাদের মধ্যে ছয়জন নিহত হন। তখন সূর্যোদয়ের সময় সমাগত প্রায়। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ ছোট সূরা দিয়ে নামায শেষ করলেন। হযরত উমরকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকে দুধ পান করানো হলে ক্ষতস্থান দিয়ে তা বেরিয়ে এল। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কোনো ক্ষতি নেই, আপনি চিন্তা করবেন না। তিনি বললেন, যদি হত্যার মধ্যে খারাপিও থাকে তবুও আমি নিহত হবো। লোকেরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যখন আমি দুনিয়া থেকে চলে যাব দুনিয়ার কোনো ভোগ বিলাস আমাকে প্রতারিতও করবে না, আনন্দও দিবে না

তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য আমাকে সঙ্গ দিবে এবং এর সওয়াব পাবো। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বলেন, যদি আমার নিকট দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকতো তাহলে কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে আমি তা উৎসর্গ করতাম। অতঃপর তিনি আবার বললেন, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তলহা, হযরত যুবাইর, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত সাদের মধ্যে থেকে যাঁর ব্যাপারে অধিকাংশ রায় হয় তাঁকে খলীফা নির্ধারণ করবে। তারপর তিনি সহীব (রা.) কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ছয়জন তিনজনের উপর দায়িত্ব অর্পন করেন। (হাকেম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে যুবক ছিল অগ্নি উপাসক। আমর বিন মাইমুন বলেন, হযরত উমর বললেন, আমার মৃত্য এমন লোকের হাতে হচ্ছে, যে ইসলামের দাবী করে না। অতঃপর তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে বললেন আমার কর্জ হিসাব করো। হিসাব করে প্রায় ৮৬ হাজার দিরহামের কথা বলা হলে তিনি বললেন, যদি এ কর্জ উমর পরিবারের সম্পদ থেকে পরিশোধ হলে আদায় করবে। না হলে বনূ আদীর নিকট চাইবে। তবুও শোধ না হলে কুরাইশদের কাছ থেকে নিবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বলবে, দুই বন্ধুর নিকট সমাহিত হওয়ার জন্য উমর অনুমতি চাইছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর কাছে গেলে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি এ জায়গাটি নিজের জন্য সংরক্ষণ করছিলাম। কিন্তু আজ এ মুহূর্তে আমি উমরের আবেদনকে প্রাধান্য দিচ্ছি। হযরত আব্দুল্লাহ এসে বললেন, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করলেন। লোকেরা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কিছু বলার থাকলে ওসীয়ত করুন। আপনি কাউকে খলীফা নির্ধারণ করে যান। তিনি বললেন, ছয়জন ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের হকদার মনে করি না। তিনি ছয়জনের নাম বললেন। আমার ছেলে আব্দুল্লাহর সাথে খিলাফতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সাদ জীবিত থাকলে তিনিই হতেন খিলাফতের হকদার। তিনি যেহেতু নেই তোমরা যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করবে। আমি সাদকে কোনো খেয়ানতের কারণে বঞ্চিত করিনি।

অতঃপর তিনি বললেন, আমার পর যে খলীফা হবে তাঁকে ওসীয়ত করছি, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবেন। মুহাজির, আনসার এবং সকল জনসাধারণের সাথে ভালো আচরণ করবেন। এভাবে তিনি অনেক নসীহত করার পর মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আমরা জানাযা নিয়ে গেলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হযরত আয়েশাকে সালাম

দিয়ে বললেন, আপনি দাফন করার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলে আমরা তাঁকে তাঁর দুই বন্ধুর পার্শ্বে দাফন করলাম। তাঁকে সমাহিত করার পর লোকেরা খলীফা নির্বাচনের জন্যে সমবেত হল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, পরামর্শ করার জন্য প্রথমে তিনজনকে বেছে নেয়া যায়। সুতরাং (পরামর্শ করার জন্য অনুবাদক) হযরত যুবাইর হযরত আলীকে, হযরত সাদ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে এবং হযরত তলহা হযরত উসমানকে মনোনীত করায় তারা তিনজন পৃথক হয়ে যান। সেখানে গিয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন, আমি খলীফা হতে চাই না। সুতরাং আপনাদের মধ্যে থেকে কারো আশা থাকলে দেখে পুনরায় তিনি বললেন, মনোনীত করার দায়িত্ব আপনারা আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন। আমি সর্বশ্রেষ্ঠকে মনোনীত করব। তাঁরা সম্মতি দিলে তিনি হযরত আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তম ও নিকটতম। এজন্য আপনি খিলাফতের হকদার। যদি আমি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন। হযরত আলী সম্মতি দিলেন। তিনি হযরত উসমানকে আলাদা ডেকে তাঁরও সম্মতি নিলেন। এ ব্যাপারে উভয়ে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে তিনি হযরত উসমানের হাতে বাইআত নিলেন। অতঃপর হযরত আলী বাইআত গ্রহণ করেন।

ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত আবু উবাদা বিন জাররাহ বেঁচে থাকলে আমি তাঁকে খলীফা মনোনীত করতাম্।র এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত লোক থাকেন। আর আমার বিশ্বস্ত লোক হলেন আবু উবাদা বিন জাররাহ। তারপর মা'আজ বিন জাবাল জীবিত থাকলে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করতাম। আর তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলতাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, মা'আ জ বিন জাবাল কিয়ামত দিবসে ওলামাদের সামনে বড়ই মর্যাদার সাথে আবির্ভূত হবেন।

ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন, আবু রাফে' বলেন, মৃত্যুর সময় খিলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আমার সাথীদের মধ্যে ব্যাপক লোভ দেখতে পাচ্ছি। সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা অথবা আবু উবাদা বিন জাররাহ জীবিত থাকলে তাঁদের সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের বলে যেতাম।

হযরত উমর (রা.) যিলহজ্জ মাসের ২৬ তারিখ বুধবারে আহত হন এবং মুহাররম মাসে রবিবারে রাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর বয়স নিয়ে মতের ভিন্নতা রয়েছে। ৬৩, ৬৬, ৬১, ৬০, ৫৯, ৫৪ অথবা ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ওয়াকেদীর মতে তাঁর বয়স ৬০ বছর। হযরত সহীব জানাযার নামায পড়ান। তাহযীব গ্রন্থে রয়েছে, তাঁর আংটিতে খোদাই করে লিখে ছিল–

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا .

তাবারানী তারেক বিন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে আয়মান বলেন, হযরত উমর শহীদ হওয়ার পর থেকে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্দুর রহমান বিন ইয়াসার বলেন, হযরত উমরের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

প্রথম প্রবর্তিত বিষয়সমূহ ঃ আসকারী বলেন, সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনীন বলে হযরত উমরকে সম্বোধন করা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী বর্ষ, বাইতুল মাল, তারাবীহ, মদ পানকারীকে আশি চাবুক মারার বিধান, নিকাহে মোতা হারাম, বাঁদীর সন্তানদের ব্যবসা করা নিষিদ্ধ, জানাযার নামাযে চার তাকবীর দেওয়া, দফতর প্রতিষ্ঠা করা, অনেক বিজয় লাভ করেন, ভূমির পরিমাপ করন, সামুদ্রিক পথে মিসর থেকে মদীনায় ফল-মূল আমদানী করেন, সদকার অর্থ ইসলামের কাজে ব্যবহার না করা, ফারায়েজ শাস্ত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করার আইনটি সংযুক্ত করেন, ঘোড়ার যাকাত আদায় করেন এবং হযরত আলীর ব্যাপারে ঘোষণা করেন- أَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَكَ। এবং أَيَّدَكَ اللّٰهُ। আসাকেরী বর্ণনা করেন, ইমাম নববী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি সর্বপ্রথম চাবুক মারার বিধান প্রবর্তন করেন। ইবনে সাদ বলেন, চাবুক মারার বিধান প্রবর্তনের পর থেকে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, উমরের চাবুক তোমার তলোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

নব্বী (র.) বলেন, তিনি সর্বপ্রথম শহরগুলোতে বিচারক নিয়োগ এবং কুফা, বসরা, শাম, মিসরে রাজস্ব আদায় করেন। ইবনে আসাকির ইসমাঈল বিন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব রমযান মাসে এক মসিজদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানে প্রদীপ জ্বলতে দেখে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত উমরের কবরকে আলোকিত করেছেন, আর তিনি আমাদের মসজিদ আলোকোজ্জ্বল করেছেন।

এগারোতম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ বলেন, হযরত উমর একটি গুদাম নির্মাণ করে সেখানে আটা, ছাতু, খেজুর, শুষ্ক কিসমিস ইত্যাদি মুসাফিরদের জন্য সংরক্ষণ করতেন। তিনি এ

গুদাম থেকে মক্কা মদীনার পথে যাতায়াতকারীদের সেবাদান করতেন। তিনি মসজিদে পাথরের মাঝে তৈরি করেন। হিজাজের ইহুদীদের শামে এবং নজরানের ইহুদীদের কুফায় নির্বাসন দেন। তিনিই মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে স্থাপন করেন। পূর্বে তা কাবা সংলগ্ন ছিল।

কতিপয় ঘটনাবলী : আসকারী আওয়ায়েল গ্রন্থে, তাবারানী কাবীর গ্রন্থে এবং হাকেম ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয আবু বকর বিন সুলায়মান বিন আবী হাশামাকে আমিরুল মুমিনীন শব্দদ্বয় উৎস, কারণ ও প্রবর্তণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট বন্ধক রাখা শিফায়া-এর জনৈক রমণী এ ব্যাপারে আমাকে বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ হতে খলীফাতুর রাসূল লিখা হতো। হযরত উমরের শাসনামলের প্রথম দিকেও তাই লিখা হতো। একদা হযরত উমর ইরাকের শাসনকর্তার নিকট দু'জন চালাক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠানোর সংবাদ দিলে ইরাক শাসনকর্তা খলীফার কাছে লাবীদ বিন রাবীআ এবং আদী বিন হাতেমকে পাঠালেন। তাঁরা মদীনায় এলে সর্বপ্রথম হযরত আমর বিন আসের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাঁরা তাঁকে বললেন, আমিরুল মুমিনীনের খেদমতে আমাদের পৌঁছে দিন। হযরত আমর বিন আস বললেন, আল্লাহর কসম! আপনারা চমৎকার উপাধি চয়ন করেছেন। অতঃপর তিনি হযরত উমরের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনীন! হযরত উমর বললেন, তুমি এ সম্বোধন কোথায় শিখলে? তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, সত্যিই তো আপনি আমীর, আর আমরা মুমিন। সুতরাং সেদিন থেকেই সরকারী কাগজপত্রে আমিরুল মুমিনীন সংযুক্ত হয়।

ইমাম নব্বী তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমরের এ নামটি আদী ইবনে হাতেম এবং লাবীদ বিন রাবী'আ ইরাক থেকে আসার পর চয়ন করেন। কারো মতে মুগীরা বিন শো'বা এ উপাধি দেন। অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর লোকদের বলেন, তোমরা মুমিন। লোকেরা বললেন, আপনি আমাদের আমীর। সেদিন থেকে তিান আমিরুল মুমিনীন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। ইতোপূর্বে খলীফাতু রাসূলুল্লাহ (সা.) লিখা হতো। এটা অনেক বড় উপধি হওয়ায় তা বাদ দেয়া হয়।

ইবনে আসাকির মুয়াবিয়া বিন কুররাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক 'খলীফাতু রাসূলুল্লাহ' লিখতেন। হযরত উমরের শাসনামলে লোকেরা 'খলীফাতু রাসূলুল্লাহ' লিখতে চাইলে হযরত উমর (রা.) বললেন, এটা

অনেক বড় ইবরাত। তখন লোকেরা বলল, আপনি আমাদের আমীর। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আমীর, তোমরা মুমিন। তখন থেকে আমিরুল মুমিনীন লিখা শুরু হয়। ইমাম বুখারী স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে মাসীব থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর হযরত আলীর পরামর্শ ১৬ হিজরীতে ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন।

সালফী তুয়ূরিয়াত গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর থেকে রেওয়ায়েত করেন, এক শত বিজয় গাঁথা লিখানোর ইচ্ছায় এজন্য এক মাস ইসতেখারা করেন। অতঃপর লিখানোর অভিপ্রায় পোষণের পর তিনি বললেন, পূর্ববর্তী জাতিও গ্রন্থ রচনা করে। আল্লাহর কিতাব ছেড়ে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে।

ইবনে সাদ শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর বাইআতের পর সর্বপ্রথম মিম্বরে আরোহণ করে এ দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমি কঠোর, আমাকে নরম করে দাও। হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দাও। আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানিয়ে দাও।

ইবনে সাদ এবং সাঈদ বিন মানসুর হযরত উমর থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর সম্পদের রক্ষক। আমি হত দরিদ্র। আমার কাছে কিছু থাকলে আমি বাঁচব। আমি মুখাপেক্ষী হলে কর্জ করব। যখন সম্পদ আসবে তখন তা শোধ করব।

ইবনে সাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমরের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (বাইতুল মালের) দারোগার কাছ থেকে কর্জ নিতেন। একবার দারোগা তার পাওনা চাইলেন। সে সময় হযরত উমর (রা.) ভীষণ অর্থ সংকটে থাকায় পাওনা পরিশোধ করতে পারছিলেন না। দারোগা পীড়াপীড়ি করায় তিনি কর্জ করে তা শোধ করেন।

ইবনে সাদ বারা বিন মারুর থেকে বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা হযরত উমরকে তাঁর জন্য বাইতুল মালে রক্ষিত মধুর কথা বললেন, তিনি বললেন, তোমরা অনুমিত দিলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় সে মধু আমার জন্য হারাম। লোকেরা অনুমতি দিল।

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একদা হযরত উমর উটের পেটের নিম্নদেশে সৃষ্ট ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে করতে বললেন, আমার ভীষণ ভয় করছে, আল্লাহ তা'আলা যদি কিয়ামত দিবসে এর পরিচর্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন!

ইবনে উমর (রা.) বলেন, হযরত উমর জাতিকে কোনো কাজ নিষেধ করার পূর্বে গৃহস্থ লোকদের বলতেন, তোমরা তা করলে দ্বিগুন শাস্তি পাবে।

হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে মদীনার অলিগলি চষে ফিরতেন। এক রাতে তিনি এক মহিলাকে দরজা বন্ধ করে এ কবিতা আবৃত্তি করতে শোনেন- "রাত প্রলম্বিত হয়েছে। তারকারাজি বাসর সাজিয়েছে। আমাকে জাগ্রত রেখেছে-" আমার সাথে কেউ নেই যার সাথে আমি শুতে যাব" এ তীব্র বাসনা। আল্লাহর কসম! আল্লাহর শাস্তির ভয় না থাকলে পশুদের মত আচরণ ও বিচরণ করতাম। কিন্তু আমি তাঁর পর্যবেক্ষণকে ভয় পাচ্ছি, যাঁর ফেরেশতাদ্বয় কোনো সময় গাফেল নন।' পরদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গনগুলোর সিপাহসালারদের এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, কোনো ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চার মাসের বেশি থাকতে পারবে না।

ইবনে সাদ সালমান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর সালমানকে জিজ্ঞেস করেন, আমি বাদশাহ না খলীফা? সালমান জবাবে বলেন, আপনি যদি মুসলমানদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করে অনর্থক খরচ করেন তাহলে আপনি বাদশাহ। অন্যথায় আপনি খলীফা। হযরত উমর তাঁর একথা থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন।

সুফিয়ান বিন আবীল আরজা বলেন, একদিন হযরত উমর বলেন, আমি জানি না আমি বাদশাহ না খলীফা? যদি আমি বাদশাহ হই তবে আমি হলাম সমাজের বোঝা। উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে একজন বললেন, আমিরুল মুমিনীন! খলীফা এবং বাদশাহর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। তিনি বললেন, সেটা কি? সে বলল, খলীফা তিনি যিনি অনর্থক রাজস্ব আদায় করেন না অহেতুক খরচও করেন না। আলহামদুলিল্লাহ! আপনি এমন নন। আর বাদশাহ অত্যাচারের মাধ্যমে কর আদায় করেন। এ কথা শুনে হযরত উমর নীরব হয়ে গেলেন।

ইবনে মাসউদ বলেন, একদা তিনি অশ্বে আরোহণের সময় নাজরানের ইহুদীরা তাঁর পায়ের এক দিকে কালো চিহ্ন দেখে বলল, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, এ ব্যক্তি আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন।

সাদ জারী বলেন, কা'বে আহবার হযরত উমরকে বলেন, আমি পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবগুলোতে দেখেছি, আপনি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদের এ পথে চলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনার ইন্তেকালের পর কিয়ামত পর্যন্ত এতে লোক পড়তেই থাকবে।

আবু মু'আশির বলেন, আমি আমার শিক্ষকের নিকট থেকে শুনেছি হযরত উমর বলেন, সংস্কার করা না পর্যন্ত এতটুকু কঠোরতা করা যাবে না যা অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে। আবার খুব হালকাও করা যাবে না।

ইবনে আবী শাইবা মুসান্নাফ গ্রন্থে হাকেম বিন উমাইর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর অধীনস্থ প্রশাসকদের শয়তান যেন কুফরীর দলে ভিড়াতে না পারে এমনভাবে লোকদের চাবুকাঘাত করতে নিষেধ করেন।

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থ শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, একদা রোম সম্রাট হযরত উমরের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমার দূত আপনার নিকট গিয়েছিল। ফিরে এসে সে আমাকে জানালো, আপনার কাছে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার জন্ম অন্য বৃক্ষে থেকে নয়। সে বৃক্ষের আকৃতি গাধার কানের মত। এর ফল মতির সাদৃশ্য, ফাটলে জমরুদ পাথরের ন্যায় সবুজ এবং ইয়াকুত পাথরের ন্যায় লাল বর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। ফলটি পরিপক্ক হয়ে পাক ধরলে তা এক প্রকার জেলি হয়। আর শুষ্ক হলে বিশেষ আহার্যে পরিণত হয়। আমার দূত যদি সত্য বলে তাহলে স্বর্গীয় বৃক্ষ আমার কাছেও থাকা প্রয়োজন। হযরত উমর এর জবাবে লিখেন, আপনার দূত সত্য বলেছে সে বৃক্ষ আমার কাছে রয়েছে। সে বৃক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। হযরত ঈসা (আ.)কে প্রভু জ্ঞান করবেন না। কারণ তিনি হযরত আদম (আ.)-এর মত মাটির তৈরি।

ইবনে সাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর অধীনস্থ প্রশাসকের স্ব স্ব সম্পত্তির হিসাব চেয়ে পাঠালে হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসসহ সকলেই তা প্রদান করেন। তিনি এর অর্ধেকটা রেখে বাকী অর্ধেকটা প্রশাসকদের নিকট পাঠিয়ে দেন।

শা'বী বলেন, হযরত উমর প্রশাসক নিয়োগের পূর্বে তার সম্পদের তালিকা জমা দিতেন। আবু উমামা বিন সহল বিন হানীফ লিখেছেন, তিনি কিছুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ না করায় ভীষণ অর্থ সংকটে পতিত হওয়ায় রসূলের সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শে বলেন, আমি তো খিলাফতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। নিজের রুজি রুটির ব্যবস্থা করতে পারি না। হযরত আলী বললেন, সকাল সন্ধ্যার খাবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হযরত উমর তাই করেন।

হযরত ইবনে উমর বলেন, হযরত উমর হজ্জ করতে গিয়ে ষোলো দিনার খরচ করে এসে আমাকে ডেকে বলেন, আব্দুল্লাহ আমি অনেক খরচ করে ফেলেছি।

আব্দুর রায্যাক মুসান্নাফ গ্রন্থ কাতাদা এবং শ'বী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমরের কাছে এক মহিলা এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্বামী দিনে রোযা রাখেন এবং সাত রাত নামাযে কাটিয়ে দেন। তিনি বললেন, তোমার স্বামী প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন। সেখানে কা'ব বিন সওয়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীন! এ মহিলা স্বামীর প্রশংসা করছে না; বরং অভিযোগ পেশ করেছেন। হযরত উমর বললেন, কেন এ অভিযোগ? কা'ব বললেন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে সে জন্য। হযরত উমর বললেন, এখন বিষয়টি বুঝতে পারলাম। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ইনসাফ করা দরকার। কা'ব বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন। আল্লাহ তা'আলা পুরুষের জন্য চারজন নারী বৈধ করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চতুর্থ একজন নারীর প্রাপ্য।

ইবনে জারীর বলেন, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আমাকে বলেছেন, হযরত উমর রাতে জনৈক মহিলাকে কবিতা বঙ্গানুবাদ (যা আমরা পূর্বে করেছি– অনুবাদক) আবৃত্তি করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি হযেছে? মহিলা বলল, ক'মাস পূর্বে আমার স্বামী যুদ্ধে গেছে। তার প্রেমে এ কবিতা গাঁথা আবৃত্তি করছি। তিনি বললেন, তুমি অবৈধ কাজে জড়িত নও তো? সে বলল, আল্লাহ ক্ষমা করুন। তিনি মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আগামি কল্যই তোমার স্বামীকে এনে দিচ্ছি। সকালে তিনি ঐ মহিলার স্বামীকে ডেকে আনার জন্য রণাঙ্গনে দূত পাঠান। অতঃপর তিনি তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বললেন, আমি দারুণ এক মুসিবতের মধ্যে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করো। একজন নারীর কতদিন পর্যন্ত তার স্বামীর প্রয়োজন হয় না? হযরত হাফসা লজ্জায় মাথা নিচু করেন এবং নীরব হয়ে যান। হযরত উমর বললেন, আল্লাহর কাজে লজ্জা করতে নেই। হযরত হাফসা হাতের ইশরারায় জানিয়ে দিলেন, তিন অথবা চার মাস। অতঃপর হযরত উমর যুদ্ধরত সৈনিকদের চার মাসের বেশি রণাঙ্গনে আটকে রাখতে গর্ভনরদের নিষেধ করেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি হযরত উমরকে স্ত্রীদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করার অভিযোগ জানালে তিনি বললেন, আমিও তো স্ত্রীদের ঠাট্টায় বিব্রত। এমনকি আমি কোথও গেলে তারা আমাকে বলে, আপনি অমুক গোত্রের যুবতীদের সাথে দেখা করার জন্য যাচ্ছেন। এছাড়া আপনার কোন কাজ নেই। সেখানে হযরত ইবনে মাসউদ বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কি

জানা নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত সারার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট দায়ের করলে তিনি এ উত্তর পান যে, নারীদের পেছনের বাম দিক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইকরামা বিন খালিদ বলেন, একদা হযরত উমরের মেয়ে চুলে চিরুনী এবং সুন্দর পোশাক পরে তার সামনে এলে তিনি এমন জোরে চাবুকাঘাত করেন যে, সে কাঁদতে লাগল। হযরত হাফসা এসে বললেন, তাকে কোন অপরাধের কারণে মেরেছেন? তিনি বললেন, আমি তার মধ্যে অহংকার জাগ্রত হতে দেখে তা দূর করলাম মাত্র।

সু'মার লাইছ বিন সালিম বর্ণনা করেন, হযরত উমর বলেন, তোমরা কারো নাম হাকীম এবং আবুল হাকীম রেখ না। কারণ তা স্বয়ং আল্লাহর নাম।

বায়হাকী শু'আবুল ইমাম গ্রন্থে যাহাক থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক বলতেন, আল্লাহর কসম! আমার নিকট এতটাই প্রিয় যে, আমি রাস্তার পার্শ্বে একটি বৃক্ষ হতাম, আর উট আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত, অতঃপর বিষ্টা হয়ে আমাকে ত্যাগ করত, তথাপি যদি মানুষ না হতাম। হযরত উমর বলতেন, যদি আমি গৃহপলিত পশু হতাম। আমাকে খাওয়ায়ে মোটাতাজা করত। লোকেরা আমাকে দেখতে আসত। অতঃপর কোন মেহমানের সম্মানার্থে আমাকে যবেহ করে আমার কিছু গোশত রান্না এবং কিছু গোশত কোপ্তা করে খেয়ে ফেলত তবুও যদি মানুষ না হতাম।

ইবনে আসকির আবুল বোখতারী থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমর মিম্বরে দাঁড়ি[illegible]ভভাষণ প্রদানের সময় হযরত হোসাইন বিন আলী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার বাবার মিম্বর, আমার বাবার নয়। কিন্তু বল এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছেন? হযরত আলী দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এটি আমি শিখিয়ে দেইনি। অতঃপর হযরত হোসাইনের পানে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। হযরত উমর বললেন, সত্য কথার প্রেক্ষিতে কেন আপনি তার সাথে ঝগড়া করেছেন। নিশ্চয়ই এ মিম্বর তার বাবার। (এর সূত্রগুলো বিশুদ্ধ)।

খাতীব আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান এবং সাঈদ বিন মুসায়্যাব থেকে রেওয়ায়েত করেন, একবার হযরত উমর এবং হযরত, উসমান মাসয়ালা নিয়ে ভীষণ তর্ক করেন। লোকেরা মনে করল তাদের আর বনিবনা হবে না। কিন্তু তারা সেখান থেকে যাবার পর উভয়ের মাঝে এমন সুসম্পর্ক গড়ে উঠে যে, মনে হল আর তাদের মধ্যে বিতর্ক হবে না।

ইবনে সাদ হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম যে খুতবা পাঠ করেন তাতে হামদ ও সানার পর বলেন, জেনে রেখ আমি তোমাদের সাথে একীভূত হয়েছি, তোমরাও আমার সাথে একীভূত হয়ে যাও। আমি আমার দুই বন্ধুর পর খলীফা হয়েছি। যারা উপস্থিত রয়েছ আমি তাদের সাথে রয়েছি। আর যারা অনুপস্থিত আমরা তাদের প্রাপ্যকে তাদের জন্যই সংরক্ষণ করব। যারা সৎকাজ করবে তাদের জন্য সদাচরণ, আর যারা অসৎ কাজ করবে আমরা তাদের শাস্তি দিব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন।

জবের বিন হুয়াইরিছ কর্তৃক বর্ণিত, হয়রত উমর (রা.) দফতর প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের সাথে পরমার্শে বসলে হযরত আলী (রা.) বললেন, প্রতি বছর যে পরিমাণ সম্পদ জমা হবে তা আপনার কাছে না রেখে ভাগ করে দিবেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন, সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে ভাগ করে দিলেও হিসাব সংরক্ষণ করা মুশকিল হবে। ওলীদ বিন হিশাম বিন মুগীরা বললেন, আমি সিরিয়ায় দেখেছি সেখানে রোম সম্রাট বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৈনিকদের সমবেত করেন। এ কথাটি তাঁর ভালো লাগল এবং তিনি তাই করলেন।

হযরত আকীল বিন আবু তালিব, মুখরিমা বিন নওফেল এবং জাবের বিন মুতইম কুরাইশদের বংশ পরম্পরা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখতেন। তিনি তাদেরকে এমনভাবে নসবনামা রচনার নির্দেশ দিলেন যেন নবী আকরাম (সা.)- এর নসবনামার বিবরণের সাথে সকল বংশ পরম্পরার যুক্ত হয়।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ২০ হিজরীতে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত হাসান (রা.) বলেন, হযরত উমর লোকদের ভাতা বাদেও দান করার জন্য হযরত হুযায়ফার নিকট পত্র পাঠালেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে দান করার পরও বিপুল অর্থ সম্পদ বেঁচে যাওয়ার কথা খলীফাকে জানালে তিনি বললেন, আবার দান করে দাও। এ সম্পদ উমর অথবা তার সন্তানদের নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) উম্মত জননীদের সাথে সর্বশেষ হজ্জ করেন। আরাফাত থেকে ফেরার পথে আমি শুনলাম একজন অন্যজনকে বলছে, আমিরুল মুমিনীন কোথায়? আন্যজনকে বলতে শুনলাম, সে বলছে, তিনি এখানেই আছেন। অতঃপর লোকটি উঠকে বসিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করছে "হে নেতা আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহ! ক্ষত বিক্ষত শরীরে বরকত দাও।" এ কবিতা পাঠান্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ধারণা করলাম সে জ্বিন হবে। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শহীদ হন।

আব্দুর রহমান বিন আবযা বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, এ খিলাফতের প্রথম হকদার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। অতঃপর অন্যান্যরা। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীরা তৎপূর্ব মুসলমানরা জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা খিলাফতের হকদার নন।

নাখয়ী কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার পুত্র আব্দুল্লাহকে খলীফা মনোনীত করবেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! আমি এমন লোককে খলীফা মনোনীত করার জন্য প্রর্থনা করব না, যে এখনও সুন্দর পথে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার ক্ষমতা অর্জন করেনি।

শাদ্দাদ বিন আউস হযরত কাব থেকে বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের এক বাদশাহর সাথে হযরত উমরের কার্যক্রমের অনেকটা মিল ছিল। আমরা এদের একজনের আলোচনা করলে অপরজনের স্মরণ পড়ত। বনী ইসরাঈলের সেই বাদশাহর যুগে এক নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো আপনি বাদশাহকে জানিয়ে দিন তিনি আর মাত্র তিনদিন বেঁচে থাকবেন। সুতরাং তাঁকে রাষ্ট্রনায়ক মনোনীত করতে বলুন এবং ওসীয়ত করতে চাইলে তা করুন। তৃতীয় দিবসে বাদশাহ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলে যুবক হওয়া পর্যন্ত আমার হায়াতকে বৃদ্ধি করুন। আপনি জানেন আমি আপনার আদেশ কিভাবে মান্য করেছি। কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি, আমি কোনো সময় আপনার হুকুমের অবাধ্য হইনি। আল্লাহ তাআলা নবী (আ.) কে ওহীর মাধ্যমে বাদশাহর দু'আর বিবরণ দানে জানিয়ে ছিলেন, সে সবগুলোই সত্য বলেছে। ফলে আমি তার হায়াত পনেরো বছর বৃদ্ধি করে দিলাম, যাতে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হতে পারে। হযরত কাবে আহবার হযরত উমর বর্শাঘাতে আহত হবার সময় এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত উমরও আল্লাহর নিকট এ দু'আ করলে তিনি আরো জীবিত থাকবেন, তিনি এ ঘটনা জানতে পেয়ে এ দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ না করেই উঠিয়ে নাও"।

সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেন, তাঁর মৃত্যুতে জ্বিন জাতিও বিলাপ করেছে। হাকেম হযরত মালিক বিন দিনার (রহ.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি শহীদ হওয়ার পর ইয়ামানের পাহাড়ের দিক থেকে এ কবিতার আওয়াজ ভেসে আসে- "যারা ইসলামের জন্য কাঁদে তারা কাঁদতে থাক, সে দিন বেশি দূরে নয় যখন মানুষ ধ্বংস হবে, অথচ নবীর যুগ গত হওয়া বেশি দিন হয়নি। পৃথিবী উল্টে গেছে, কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান চলে গেছেন।"

ইবনে আবীদ দুনিয়া ইয়াহইয়া বিন আবী রাশেদ বসরী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর তার ছেলেকে ওসীয়ত করেন, আমার কাফনে অনর্থক খরচ করবে না। কারণ যদি আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ভাল হই তাহলে তিনিই প্রতিদান দিবেন। আর ভাল না হলে তিনি তা ছিনিয়ে নিবেন, তাই এ অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। আমার কবর লম্বা করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে সুপ্রশস্ত কবরের অধিকারী হলে তিনি সে ব্যবস্থা করে দিবেন, অন্যথায় তিনি আমার কবর সংকুচিত করে দিবেন, এতে আমার সকল হাড়গোড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমার জানাযার সাথে কোনো নারী যেতে পারবে না। আমি যা নই তা বলে আমাকে স্মরণ করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা গায়েব জানেন। তিনি আমার সম্পর্কেও জানেন। আমাকে খুব দ্রুত সমাহিত করার ব্যবস্থা করবে।

বারোতম পরিচ্ছেদ

ইবনে আসাকির হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমরের ইন্তেকালের এক বছর পর আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁকে স্বপ্নে দেখার জন্য দু'আ করলাম। এক বছর পর স্বপ্নে হযরত উমরকে কপালের ঘাম মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, আমি হিসাব দিয়ে সবেমাত্র ছাড়া পেলাম। আল্লাহ যদি দয়াশীল না হতেন তাহলে উমর অপদস্ত হতো।

যায়েদ বিন আসলাম কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস স্বপ্নে হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি প্রতিউত্তরে প্রশ্ন করেন, আমি তোমাদের থেকে কবে পৃথক হয়েছি? তিনি উত্তর দিলেন, বারো বছর পূর্বে। তিনি বললেন, আমি হিসাব দিয়ে এই মাত্র এলাম।

ইবনে সাদ সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি এক আনসারের কাছে শুনেছি, তিনি হযরত উমরকে স্বপ্নে দেখার দু'আ করায় দশ বছর পর স্বপ্নে তাঁকে কপালের ঘাম মুছতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি করছেন? তিনি বললেন, হিসাব দিয়ে এই মাত্র এলাম। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ আমার সাথে না থাকলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

অনেক বিখ্যাত লোকেরা হযরত উমরের শোকগাঁথা রচনা করেছেন। ছোট পরিসরের কারণে আমরা তা সন্নিবেশিত করলাম না।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে নিম্নে উল্লিখিত সাহাবাগণ ইন্তেকাল করেন –

উতবা বিন গাযওয়ান, আলা বিন হাযরামী, কায়েস বিন সুকন, হযরত সিদ্দীকে আকবরের সম্মানিত পিতা আবু কুহাফা, সাদ বিন উবাদা, সোহেল বিন উমর, ইবনে উম্মে মাকতুম, আয়শ বিন আবী রাবীআ, আব্দুর রহমান, যুবায়ের বিন আওয়ামের ভাই আবী সআসআ (তিনি কুরআন শরীফ একত্রিতকরণের মহান দায়িত্ব পালন করেন), নওফেল বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু সুফিয়ান বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.) -এর সম্মানিত জননী উম্মুল মোমিনীন হযরত মারিয়া, আবু উবাদা বিন জাররাহ, মাআয বিন জাবাল, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, উবাই বিন কাব, বিলাল, উসাইদ বিন হাযীর, শরাহবীল বিন হুসনা, ফজল বিন আব্বাস, আবু জন্দল বিন সোহেল, আবু মালিক আল আশআরী, সাফওয়ান বিন মোত্তাল, বারা বিন মালিক, হযরত আনাসের ভাই, উম্মত জননী যয়নব বিনতে জাহাশ, আয়য বিন গানাম, আবুল হাইছাম বিন তাইহান, খালিদ বিন ওলীদ, জারুদ, নোমান বিন মুকররিন, কাতাদা বিন নোমান, আকরা বিন হাবেস, সওদা বিনতে যামাআ, আওয়ীম বিন সাআদাহ, গায়লান ছাকাফী, আবু মুহজিন ছাকাফী প্রমুখ। (রাদি আল্লাহু আনহুম)

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফত

তাঁর নাম উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা বিন আব্দুস শামস বিন আব্দে মান্নাফ বিন কুসসী বিন কিলাব বিন মুররা বিন কাব বিন লূয়ী বিন গালীব আল -কারশী আল-উমরী আবু উমর। কারো মতে আবু আব্দুল্লাহ আবু লায়লা।

তিনি হস্তী বাহিনীর ঘটনার ষষ্ঠ বছরে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মুসলমান হন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের আহবানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি দু'বারে, একবার হাবশায় এবং দ্বিতীয়বার মদীনা শরীফে হিজরত করেন। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত রুকাইয়্যা বদর যুদ্ধের দিন ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত রুকাইয়্যার সেবাযত্নের জন্য হযরত উসমানকে মদীনায় রেখে বদর যুদ্ধে গমন করেন। তিনি তাঁকে গনীমতের ভাগ দিয়েছিলেন। সুতরাং হযরত উসমানকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ নিয়ে দূত যখন মদীনায় আসে লোকেরা তখন হযরত রুকাইয়্যার কবরে মাটি দিচ্ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর

তিনি (সা.) আরেক কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের সাথে হযরত উসমানের বিয়ে দেন। আর হযরত উম্মে কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত উসমান ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো নবীর দু'কন্যার বিয়ে হয়নি। আর এ জন্য তাঁকে যিননূরাইন বলা হয়।

তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমান, দুস্থানে হিজরতকারী এবং আশারায়ে মুবাশশারাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন। ইবনে উবাদা বলেন, খলীফাগণের মধ্যে হযরত উসমান এবং মামুন রশীদ ছাড়া কেউ হাফেযে কুরআন নন।

ইবনে সাদ বলেন, নবী আকরাম (সা.) যাতুররিকা এবং গাতফান যুদ্ধে যাবার সময় হযরত উসমানকে মদীয়নায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান।

হযরত উসমান নবী আকরাম (সা.) থেকে ১৪৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে যায়েদ বিন খালিদ জুহানী, ইবনে যুবায়ের, সায়েব বিন ইয়াযিদ, আনাস বিন মালিক, যায়েদ বিন সাবিত, সালামা বিন আকওয়া, আবু উমামা বাহলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল, আবু কাতাদা, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এবং অসংখ্য তাবেয়ী হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

ইবনে সাদ আব্দুর রহমান বিন হাতেব থেকে বর্ণনা করেন, সকল আসহাবে রসূলের মধ্য থেকে আমি হযরত উসমানের চেয়ে সুন্দর করে হাদীস বর্ণনা করতে আর কাউকে দেখিনি। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন।

মুহাম্মদ বিন সিরীন বলেন, তিনি সবচেয়ে বেশি হজ্জের মাসয়ালা জানতেন, তাঁর পর হযরত ইবনে উমরের স্থান।

বাইহাকী সুনান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আবান জাফী থেকে বর্ণনা করেন, আমার মামা জাফী আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি জান হযরত উসমানকে কেন যিননূরাইন বলা হয়? আমার অজানার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত হযরত উসমান ছাড়া কেউ কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করেননি। এজন্য তাঁকে যিননূরাইন বলা হয়।

আবু নাঈম হাসান থেকে বর্ণনা করেন, নবীর দুই কন্যাকে বিয়ে করার কারণে তাঁর নাম যিননূরাইন।

খাইসামা ফাযাইলুস সাহাবা গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলীকে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি ফেরেশতাদের মাঝে যিননূরাইন নামে প্রসিদ্ধ এবং নবীর

দুহিতাদ্বয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

সহল বিন সাদ দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেন, জান্নাতে এক ভবন থেকে আরেক ভবনে স্থানান্তর হবার সময় দুবার আলোকিত হবার জন্য তিনি যিননূরাইন নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ণিত রয়েছে, জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর উপনাম ছিল আবু উমর। আর হযরত রুকাইয়্যার গর্ভ থেকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণের পর তার উপনাম হয় আবু আব্দুল্লাহ।

তাঁর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কারীম বিন রাবীআ বিন হাবীব বিন আব্দুস শামস। নানীর নাম উম্মে হাকীম আল বায়যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তাঁর নানী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ এক গর্ভের সন্তান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর জননী রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ফুফাতো বোন।

ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আলী এবং হযরত যায়েদ বিন হারেছার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে আসাকির বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের মাঝারি গঠন ছিল চমৎকার। সাদার সাথে ছিল লালচে বর্ণে মিশ্রিত শরীরের আকৃতি। চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। ঘন দাড়ি প্রশস্ত গ্রীবা, দৃঢ় পদ, লম্বা হাতে পশমের সমাবেশ, মাথায় কালো কেশ, অপূর্ব দন্তরাজি এবং বাবরী চুলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কেশগুচ্ছে হলদে বর্ণের কলপ করতেন।

ইবনে আসাকির আব্দুল্লাহ বিন হাযাম মাযানী থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত উসমানের চেয়ে বেশি সুন্দর কোনো পুরুষ দেখিনি।

মূসা বিন তলহা বলেন, হযরত উসমান, কান্তিময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, হযরত উসামা বিন যায়েদ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে এক বাটি গোশত দিয়ে হযরত উসমানের নিকট পাঠালেন। আমি তাঁর বাড়ি গেলাম। হযরত রুকাইয়্যা বসেছিলেন। আমি একবার হযরত রুকাইয়্যার চেহারার দিকে, আরেকবার হযরত উসমানের দিকে তাকাতে লাগলাম। অতঃপর ফিরে এলে নবীজী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছিলে? আমি বললাম, হ্যা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এত লাবণ্যময় দম্পতি তুমি আরও দেখেছ? আমি বললাম, না।

ইবনে সাদ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন হারেস আল-তাইমী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর চাচা হাকিম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা ধরে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে বেঁধে বলল, তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন

ধর্ম গ্রহণ করেছ। আল্লাহর কসম, আগের ধর্মে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ দ্বীন ত্যাগ করব না। তাঁর দৃঢ়তা দেখে অবশেষে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম স্বপরিবারে হাবশায় হিজরত করলে নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা উসমানের সাথে রয়েছেন। হযরত লূত (আ.)-এর পর উসমান (রা.) স্বপরিবারে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করলেন। (আবু ইয়ালা)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেবার সময় নবী (সা.) তাঁকে বলেন, তোমার স্বামী তোমার দাদা হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তোমার পিতা মুহাম্মাদের অনুরূপ। (ইবনে আদী)

ইবনে আসাকির ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি উসমানকে আমার পিতা ইবরাহীম (আ.) এর মতো মনে করি।

হাদীসের দৃষ্টিতে উসমান (রা.)-এর মর্যাদা : ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) ঘরে প্রবেশের সময় হুযূর (সা.) বসন সংযত করে বলেন, যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জা পায়, আমি কেন পাব না?

ইমাম বুখারী আব্দুর রহমান বিন সালাম থেকে বর্ণনা করেন, অবরুদ্ধ অবস্থায় হযরত উসমান (রা.) অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে আসহাবে নবী (সা.) -এর কসম করে বলেন, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বলেছিলেন, কে আছ যে সংকটময় মুহূর্তে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করবে সে জান্নাত পাবে। আমি তখন সাহায্য করেছিলাম। তোমরা জানো না রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বলেছিলেন, যে রুমার কূপ খনন করবে সে জান্নাতে যাবে। আমি তখন রুমার কূপ খনন করেছিলাম। সকল সাহাবা তাঁর কথাকে সত্যায়িত করেন।

ইমাম তিরমিযী (রা.) আব্দুর রহমান বিন খাবাব থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী আকরাম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি কোনো এক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সাহাবীদের তাগীদ দিচ্ছিলেন। সে সময় হযরত উসমান আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একশ'উটসহ একশ উট বোঝাই রসদের জিম্মা নিচ্ছি। হুযূর (সা.) আবার তাগাদা দিলেন। তিনি বললেন, দুইশ'উটসহ দুইশ'উট বোঝাই রসদের জিম্মা আমার। নবীজী পুনরায় তা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তিন শ'উট আমার দায়িত্বে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মিম্বর থেকে অবতরণ করতে করতে

বললেন, উসমানের নফল ইবাদতের আর প্রয়োজন নেই।

ইমাম তিরমিযী আব্দুর রহমান বিন সামূরা থেকে বর্ণনা করেন, যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনী গঠনের সময় হযরত উসমান গনী এক হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) নিয়ে এলে হুযূর (সা.) -এর জামার আঁচলে রেখে বলেন, উসমান যদি আর কোনো নফল ইবাদত না করে তথাপি কোনো ক্ষতি নেই।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বাইআতে রিদওয়ানের সময় হযরত উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বাইআত করছিলেন। সে সময় তিনি (সা.) বলেন, উসমান আল্লাহ এবং তাঁর নবীর কাজে রত আছেন। আমি তার পক্ষ থেকে স্বীয় হাতের উপর অপর হাত দ্বারা বাইআত করছি। সুতরাং এভাবে তিনি তার পক্ষ থেকে বাইআত করেন। সে দিন তাঁর একখানা হস্ত মোবারক হযরত উসমানের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছিল, যা অন্যান্য সাহাবীদের হাতের তুলনায় সে হাত কতই না উত্তম ছিল। আর এতেই হযরত উসমানের মর্যাদা প্রতিভাত হয়।

ইমাম তিরমিযী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (সা.) এক ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী করে হযরত উসমানের দিকে ইশারা করে বললেন, উসমান সে ফিতনায় মজলুমভাবে শহীদ হবে।

তিরমিযী, হাকেম এবং ইবনে মাজা মুররা বিন কাব থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকটবর্তী এক বিশৃঙ্খলার বিবরণ দানের সময় এক ব্যক্তি চাদর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে হেঁটে গেলে নবী করীম (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি সে দিন হিদায়াতের উপর অটল থাকবে। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, তিনি হলেন হযরত উসমান গনী (রা.)। তাঁর চেহারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ফিরালে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনিই কি হিদায়াতের প্রতি অবিচল থাকবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ!

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, হে উসমান! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে খিলাফত দান করেছেন সেখান থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা তোমাকে উৎখাত করতে চাইলে তুমি সরে পড়বে না; বরং আমার নিকট আসবে। এজন্য কুচক্রী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, আমি এখান থেকে বিন্দুমাত্র নড়ব না। (তিরমিযী)

হাকেম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছেন। এক রুমার কূপ খনন করে এবং দুই সৈন্যদের

সাহায্য করে। আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, নবী আকরাম (সা.) বলেন, আমার সাহাবীদের মধ্যে অভ্যাসের দিক দিয়ে উসমান আমার মত।

তাবারানী আসমাত বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করলে তিনি বলেন, আমার তৃতীয় মেয়ে থাকলে উসমানকে তার সাথেও বিয়ে দিতাম। ওহী মোতাবেক তার সাথে আমার কন্যাদ্বয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম।

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেন, আমার চল্লিশজন মেয়ে থাকলে পরপর আমি তাদেরকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।

ইবনে আসাকির যায়েদ বিন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, উসমান আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় এক ফেরেশতা আমার নিকট বসে ছিলো। তিনি আমাকে বলেন, ইনি শহীদ হবেন। স্বজাতি কর্তৃক তাঁর নিহত হবার সংবাদ পেয়ে আমি লজ্জিত হলাম।

আবু ইয়ালা ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট ফেরেশতাগণ যেভাবে লজ্জাবোধ করেন উসমানের সামনেও তাঁরা একইভাবে লজ্জিত হন।

ইবনে আসাকির হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত উসমান সম্পর্কে হযরত হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গোসল করার সময় শরীরের কাপড় নির্জন কক্ষে খুলতেও তিনি ভীষণ লজ্জাবোধ করতেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত : হযরত উমর (রা.)-এর দাফনের তৃতীয় দিবসে হযরত উসমানের নিকট বাইআত গ্রহণ করা হয়। কথিত আছে, একদিনে লোকেরা আব্দুর রহমান বিন আউফের সাথে পরামর্শ করেন এবং বুদ্ধিমানরাও তার সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করে হযরত উসমানের ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশেষে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ বায়আতের জন্য সমবেত মজলিসে এসে বসেন এবং হামদ ও সানার পর বলেন, তোমাদের লোকেরা হযরত উসমান (রা.) ব্যতীত কারো বাইআত গ্রহণে সন্তুষ্ট নন। (ইবনে আসাকির)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) হামদ এবং সানার পর হযরত আলীকে বললেন, হে আলী! আমি সকলের সাথে কথা বলে জেনেছি তাদের অভিমত হযরত উসমানকে ঘিরে। একথা বলে তিনি হযরত উসমানের হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং পূর্ববর্তী দুই খলীফার নীতি

অনুযায়ী আমি তাঁর নিকট বাইআত করছি, আপনিও বাইআত করুন। অতঃপর সকল মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ বাইআত করেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) ইন্তেকালের এক ঘন্টা পূর্বে হযরত আবু তালহা আনসারীকে বলেন, যে গৃহে আসহাবে রসূল (সা.) খলীফা নির্ধারণের জন্য তিনদিন সমবেত হবেন কেউ যেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য তুমি পঞ্চাশজনকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। (ইবনে সাদ)

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে আবু ওয়ায়েল কর্তৃক বর্ণিত, আমি হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে বললাম, হযরত আলীকে বাদ দিয়ে হযরত উসমানের নিকট কেন বাইআত করলেন? তিনি বললেন, এতে আমার কোনো ত্রুটি নেই। আমি হযরত আলীকে বলেছিলাম, আমি কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল এবং সীরাতে আবু বকর ও উমর অনুযায়ী আপনার নিকট বাইআত করব। প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, যখন করা তা সম্ভব হবে, অন্যথায় হযরত উসমানকে একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, খুব ভালো (বাইআত করুন-অনুবাদক)।

বর্ণিত রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমানকে নির্জনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার কাছে বাইআত না করলে আমাকে কার বাইআত গ্রহণের পরামর্শ দিবেন। তিনি বললেন, হযরত আলীর। হযরত আলীকে প্রশ্ন করলে হযরত উসমানের কথা বলেন। হযরত যুবায়েরকে বললাম, তিনি হযরত আলী অথবা হযরত উসমানের নাম উল্লেখ করলেন। অতঃপর হযরত সাদের অভিমত জানতে চাইলাম, তিনি হযরত উসমানকে নির্বাচন করেন। এরপর আমি সকল আসহাবে রসূল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের মতামত হযরত উসমানের পক্ষে পেলাম।

ইবনে সাদ এবং হাকিম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের বাইআতের সময় লোকেরা বলছিলেন, জীবিতদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার আনুগত্যে আমরা কোনো ত্রুটি করব না।

হযরত উসমানের খিলাফত লাভের আগের বছর ২৪ হিজরীতে রায় অঞ্চল বিজিত হলেও হাত থেকে চলে গেলে তাঁর আমলে দ্বিতীয় বার তা পদানত হয়। সে বছর গ্রীষ্মের তাপদাহে নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ জাতীয় রোগ বিশেষের প্রাদুর্ভাবে হযরত উসমান আক্রান্ত হয়ে হজ্জে যাবার প্রস্তুতি স্থগিত করেন এবং রুগ্নতার আশঙ্কায় প্রয়োজনীয় ওসীয়ত করেন। এজন্য এ বছরকে রক্তক্ষরণের বছর হিসেবে অভিহিত করা হয়। একই বছর রোমান সাম্রাজ্যের সিংহভাগ ভূখণ্ড ইসলামের পতাকাতলে আসে এবং হযরত উসমান মুগীরাকে অপসারণ করে সাদ বিন আবী

ওয়াক্কাসকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

২৫ হিজরীতে হযরত উসমান সাদকে অপসারণ করে মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্কে ভাই ওলীদ ইবনে উকবা বিন আবী মুইতকে কুফার প্রশাসক নিয়োগ করেন। তাঁর প্রতি জনতার এটাই প্রথম অভিযোগ যে, তিনি আত্মীয়তার চর্চা করছেন। কথিত আছে, ওলীদ ছিলেন মদ্যপ। একবার নেশা করে ফজরের নামাযের ইমামতি করেন এবং চার রাকাত নামায পড়ায়ে সালাম ফিরে মুক্তাদিদের বলেন, তোমরা বললে আরো বেশি পড়িয়ে দিব।

২৬ হিজরীতে কতিপয় ঘর-বাড়ি ক্রয় করে মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন। এ বছর সাবু অঞ্চল বিজিত হয়। ২৭ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া নৌপথে কবরয আক্রমণ করেন। এ বাহিনীতে উবাদা বিন সামেতের সাথে তার পত্নী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান আনসারীও ছিলেন। এ অভিযানে তাঁর স্ত্রী ঘোড়া থেকে পড়ে নিহত হন এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। হুযূর (সা.) এ যুদ্ধে হযরত উবাদার স্ত্রীর নিহত হওয়ার ব্যাপারে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ বছর আরজান এবং দারে বজর্দ করতলগত হয়। অতঃপর তিনি আমর বিন আসকে অপসারণ করে আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবী সারাহকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হয়ে আফ্রিকা আক্রমণ করে তা দখল করে সকল পর্বত ও বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ইসলামের ছায়াতলে আনেন। সেখানে প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে। ফলে প্রত্যেক মুজাহিদ এক হাজার, কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তিন হাজার দিনার ভাগে পান। অতঃপর আন্দলস হস্তগত হয়।

উল্লেখ্য, হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত উমর (রা.) কে নৌপথে কবরয আক্রমণের জন্য বারবার অনুরোধ করায় হযরত উমর (রা.) মিসর শাসনকর্তা আমর বিন আস (রা.) কে নৌযান সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবার জন্য নির্দেশ দেন। আমিরুল মোমিনীনের পত্র পেয়ে হযরত আমর বিন আস (রা.) লিখলেন, আমি এ বাহন দেখেছি। সেটি এক প্রকাণ্ড মাখলুক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখলুকরা এতে আরোহণ করে। যখন এ বাহনটি স্থির হয়ে দাঁড়ায় তখন অন্তর ফেটে যায়, আর যখন চলতে থাকে তখন বিবেক লোপ পায়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশই বেশি। এতে উপবেশনকারীরা কাষ্ঠ খণ্ডের উপর সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মত আরোহণ করেছে। এটি ছিদ্র হলে নিমজ্জিত হবে। নৌযান সম্পর্কে এ বিবরণ পাঠে আমিরুল মোমেনীন হযরত উমর (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.) কে লিখলেন,

আল্লাহর কসম! এমন বাহনে মুসলমানদের আরোহণ করতে দিব না। ইবনে জারীর বলেন, অবশেষে হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত উসমানের খিলাফতকালে নৌপথে কবরয আক্রমণ করেন এবং কবরযবাসী জিজিয়া কর দেবার জন্য সন্ধি করে।

২৯ হিজরীতে ইসতিখার, কাসা এবং এর পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলো যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। সে সময় তিনি মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেন। কারুকার্য খচিত পাথর, পাথরের স্তম্ভ এবং কাষ্ঠ নির্মিত ছাদ তৈরির মাধ্যমে মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৬০ গজ এবং প্রস্থ ১৫০ গজ হয়।

৩০ হিজরীতে জুর, নিশাপুর এবং খোরাসনের অধিকাংশ শহরগুলো কতিপয় সন্ধির মাধ্যমে বাকীগুলো লড়াই করে মুসলমানদের হস্তগত হয়। তখন চারদিক থেকে প্রচুর সম্পদ আদায় করেন, হযরত উসমান (রা.) কোষাগার নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং তিনি প্রতিদিন মন খুলে লোকদের দান করতেন। এতে কেউ এক লাখ কেউ চার লাখ দেরহাম পেতেন। ৩৫ হিজরী হযরত উসমান গনী (রা.) শাহাদাত লাভ করেন।

যহরী বলেন, হযরত উসমানের বারো বছর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর তাঁর প্রতি লোকদের কোনো অভিযোগ ছিল না। এমনকি হযরত উমর (রা.) কঠোর হওয়ার কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক জনপ্রিয়। ছয় বছর পর হযরত উসমান (রা.) অনেক নরম হয়ে পড়েন। তিনি আত্মীয় এবং প্রিয়জনদের প্রশাসক পদে নিয়োগ দিতে আরম্ভ করেন। মারওয়ান আফ্রিকার শাসনকর্তাকে একপঞ্চমাংশ যা বাইতুল মালে জমা হবে তা মাফ করে দেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা দেন। এ যুক্তির আলোকে-হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) উভয়ের জন্যই তা বৈধ ছিল, কিন্তু তারা সেটি গ্রহণ করেননি। আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলেছি। এতে করে জনতার মাঝে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। (ইবনে সাদ)

ইবনে আসাকির যহরী থেকে বর্ণনা করেন, আমি সাঈদ বিন মুসায়্যাবকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত উসমানকে কেন শহীদ করা হয়? সে সময় লোকদের অবস্থা কি ছিল? তাঁর রীতিনীতি কি ছিল? এবং সাহাবাগণ কেন তাঁর সঙ্গ দেননি? তিনি বললেন, হযরত উসমানকে মজলুমভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। হত্যাকারীরা ছিল জালেম এবং যারা তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা অপারগ ও অক্ষম ছিলেন। আমি বললাম, এর বিস্তারিত বিবরণ কি? তিনি বললেন, হযরত উসমান (রা.) নৈকট্যপ্রাপ্তদের বেশি ভালোবাসার কারণে অনেকেই তা ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি।

তাঁর বারো বছর খিলাফতের প্রথমদিকে উমাইয়্যা বংশের মধ্য থেকে আসহাবে রসূল ব্যতীত অন্যদের শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। আর সাহাবীগণ তাদের অধিকাংশ কাজের সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে অপসারণ না করে ক্ষমা করে দিতেন। ছয় বছর পর চাচার সন্তানদের প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে থাকেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহকে মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের দু'বছর পর মিসরবাসী তাঁর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনতে থাকার কারণে হযরত উসমান (রা.) মিসর শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহের প্রতি একখানা পত্র লিখেন। কিন্তু পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিষেধের কোনো তোয়াক্কা না করে যারা খলীফার নিকট অভিযোগ করতে এসেছিল, আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহ তাদের হত্যা করেন। অতঃপর মিসরবাসীর পক্ষ থেকে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মুসলিম বিশ্বের রাজধানী পবিত্র মদীনা শরীফে এসে নামাযের সময় মসজিদে নববীতে সাহাবীদের নিকট আব্দুল্লাহ বিন সারাহের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ দায়ের করে। ফলে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে এ বিষয় নিয়ে হযরত উসমানের সাথে কঠোরতার সাথে বাদানুবাদ করেন। ওদিকে হযরত আয়েশা (রা.) ঘটনাটি জানতে পেয়ে হযরত উসমানের নিকট বলে পাঠান যে, মুহাম্মাদের সাহাবীগণ আপনার নিকট এমন এক ব্যক্তির অপসারণ চাইছে, যে লোকটি হত্যার দায়ে দোষী, কিন্তু এতে আপনি কর্ণপাত করছেন না এবং তাঁকে অপসারণ করতে অসম্মতি জানাচ্ছেন। আপনার উচিত তাঁকে শাস্তি দেয়া। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী (রা.) এসে বললেন, এরা হত্যার পরিবর্তে একজন শাসনকর্তার অপসারণ চাইছে। কেন সেখানে আরেকজনকে অধিষ্ঠিত করছেন না? কেন এ কাজে ইনসাফ করছেন না? হযরত উসমান (রা.) বললেন, এরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিবে। আমি আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহকে অপসারণ করে এক পত্র লিখে দিচ্ছি। লোকেরা মিসরের নতুন শাসনকর্তা হিসেবে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে সবদিক দিয়ে যোগ্য বিবেচনা করে। হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহের অপসারণের ফরমান নিয়ে মুহাম্মদ বিন আবু বকর মিসরে যাত্রা করেন। আব্দুল্লাহর অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দল মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের সাথে ছিলেন। তারা তৃতীয় মঞ্জিলে অবস্থানের সময় জনৈক হাবশী গোলামকে উটনীর উপর আরোহণরত অবস্থায় দ্রুততার সাথে পথ চলতে দেখে ভাবলেন যে হয়ত

কারো দূত হবে অথবা পলায়নকারী। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর গতিরোধ করে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? কার অনুসন্ধানে কোথায় চলেছ? সে বলল, আমি আমিরুল মোমেনীনের গোলাম, মিসর শাসনকর্তার নিকট যাচ্ছি। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আবু বকরের প্রতি ইশারা করে বললেন, ইনি মিসর শাসনকর্তা, সে বলল, উনি আমার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নন। এ বলে সে চলে গেলে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর দু'জনকে পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? সে বিহ্বল ও হতচকিত হয়ে একবার নিজেকে আমিরুল মোমেনীন ও একবার মারওয়ানের গোলাম বলে পরিচয় দেয়। একজন তাকে চিনতে পেয়ে আমিরুল মোমেনীনের গোলাম হিসেবে সনাক্ত করলে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমিরুল মোমেনীন তোমাকে কার কাছে কেন পাঠাচ্ছেন? সে বলল, মিসর শাসনকর্তার নিকট পৌছানোর জন্য এক পত্রসহ আমাকে পাঠিয়েছে। মুহাম্মদ বললেন, তোমার কাছে পত্র রয়েছে? সে বলল, নেই। অতঃপর তালাশ করে তার কাছে পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে ছোট্ট এক মশকের মধ্যে পাওয়া গেল আমিরুল মোমেনীনের পক্ষ হতে ইবনে আবী সারাহের প্রতি লিখিত একখানা পত্র। মুহাম্মদ সকল সাথীদের একত্রিত করে মোহর খুলে পত্র পাঠ করলেন- মুহাম্মদ এবং অমুক অমুক ব্যক্তিবর্গ তোমার নিকট গিয়ে পৌছলে ফাঁদে ফেলে তাদের হত্যা করবে। যে তোমার অভিযোগ নিয়ে আসতে চাইবে তাকে বন্দী করে রাখবে। দ্বিতীয় আদেশ পাওয়া পর্যন্ত স্বপদেই তুমি বহাল থাকবে। এ পত্র পাঠান্তে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং মদীনায় ফিরে এলেন।

তারা মদীনায় এসে হযরত তালহা, হযরত আলী, হযরত সাদ, হযরত যুবায়ের প্রমুখ সাহাবীদের সমবেত করে প্রাপ্ত পত্রখানা প্রদর্শন এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এতে সকলেই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং মাসউদ, আবু যর এবং আম্মারের স্মরণ হওয়ায় সে ক্রোধের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। সেদিনের মত সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। অবশেষে লোকেরা হযরত উসমানের বাড়ি অবরোধ করে। সে সময় হযরত আলী হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত আম্মার, হযরত সাদ প্রমুখ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে হযরত উসমানের নিকট পাঠিয়ে তিনি প্রাপ্ত সেই পত্রখানা, গোলাম এবং সেই উটনীটি নিয়ে হযরত সাদ প্রমুখ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে হযরত উসমানের কাছে গিয়ে বললেন, সেকি আপনার গোলাম? হযরত উসমান বললেন, হ্যাঁ। হযরত আলী উটনীটি দেখিয়ে বললেন, এ উটনী আপনার? তিনি বললেন,

আমার। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এ পত্র আপনি লিখেছেন? তিনি বললেন, আমি খলীফা। আমি এ পত্র লিখিনি, কাউকে লিখার নির্দেশও দেইনি। এ পত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হযরত আলী বললেন, পত্রে আপনার মোহর লাগানো ছিল। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটা আমার মোহর। হযরত আলী বললেন, কি আশ্চর্যের বিষয় গোলাম, উটনী, মোহার সবই আপনার; অথচ আপনি কিছুই জানেন না? হযরত উসমান বললেন, আল্লাহর কসম, এ পত্র আমি লিখিনি, কারো হাতে তা লিখেও নেইনি এবং তা মিসর শাসনকর্তার নিকটও পাঠাইনি। অতঃপর লোকেরা বুঝল এটা মারওয়ানের কাজ এবং হযরত উসমান কর্তৃক সৃষ্ট এ কাজে লোকদের সন্দেহ হয়। মারওয়ান হযরত উসমান (রা.) -এর বাড়িতে ছিলেন। লোকেরা বলল, মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে দিন। হযরত উসমান (রা.) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় আসহাবে মুহাম্মদ (সা.) আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশরা বলেন, হযরত উসমান কখনই মিথ্যা কসম করেননি। আর কতিপয় বলেন, মারওয়ানকে আমাদের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত এবং রসূলের সাবাহীদের হত্যার আদেশ দানের কারণ তদন্ত করে না জানা পর্যন্ত সন্দেহের উপর হযরত উসমানকে কিছুতেই খারাপ ভাবা যাবে না। যদি হযরত উসমান জড়িত থাকেন তাহলে আমরা তাঁকে অপসারণ করব। আর যদি মারওয়ান লিখে থাকেন তবে আমরা তাকে শাস্তি দিব। তাঁরা মারওয়ানকে হত্যা করবেন সন্দেহে তিনি তাকে তুলে দিতে অস্বীকার করায় অবরোধ আরো কঠোর হয় এবং পানির সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত উসমান (রা.) উপর থেকে উঁকি দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে আলী রয়েছেন? লোকেরা বলল, না। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মাঝে কি সাদ আছেন? লোকেরা বলল, না। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আলীকে আমার পিপাসার কথা জানিয়ে পানি পাঠাতে বলবে? এ সংবাদ হযরত আলীর নিকট পৌছামত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে তিন মশক পানি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু অবরোধের তীব্রতার কারণে পানির মশক বহনকারী বনূ হাশিম এবং বনূ উমাইয়্যার কয়েকজন গোলাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মারওয়ানকে তুলে না দিলে হযরত উসমানকে হত্যাকরা হবে জানতে পেরে হযরত আলী (রা.) স্বীয় পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনকে কঠোরভাবে নির্দেশ দানে বলেন, নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে হযরত উসমানের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও, যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং কতিপয় সাহাবা নিজ নিজ পুত্রদের একই নির্দেশ দিয়ে হযরত উসমানকে পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়ে

দেন। তাঁরা তাঁকে ঘিরে নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করেন।

হযরত উসমানকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সামনে দুর্ভেদ্য মানব প্রাচীর দেখে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর তীর বর্ষণ আরম্ভ করেন। হযরত উসমানকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া তীরটি ইমাম হাসানকে আঘাত করে, এতে রক্ত প্রবাহিত হয়। মারওয়ানের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীরটি গিয়ে বিদ্ধ হয় মুহাম্মাদ বিন তালহার শরীরে। আরেকটি তীরের আঘাতে হযরত আলীর গোলাম কানবারের মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হয়। ইমাম হাসানের রক্ত দেখে মুহাম্মদ বিন আবু বকর দারুণ ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, ইমাম হাসানের রক্ত দেখে বনূ হাশিম প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এলে আমাদের মিশন ধুলায় লুটাবে। এজন্য মুহাম্মাদ বিন আবু বকর তার অপর দুই সাথীকে বললেন, আমরা তিনজন অন্য ঘর দিয়ে হযরত উসমানের ঘরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করব তাতে কেউ টের পাবে না। পরামর্শ অনুযায়ী মুহাম্মাদ বিন আবু বকর তার দুই সাথীসহ জনৈক আনসার সাহাবীর বাড়ি দিয়ে হযরত উসমান পর্যন্ত তারা পৌছে যায়। অথচ কেউ তা মোটেও টের পায়নি। কারণ তাঁকে রক্ষাকারী দরজাটি দ্বিতলায় অবস্থান করছিল, আর তিনি স্বস্ত্রীক ছিলেন নীচ তলায়। মুহাম্মদ বিন আবু বকর সাথীদ্বয়কে বললেন, আমি আগে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনব। তারপর তোমরা আক্রমণ করে হত্যা করবে। ছক মোতাবেক মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ঘরে ঢুকে হযরত উসমানের দাড়ি ধরলেন। হযরত উসমান বললেন, তোমার পিতা জীবিত থাকলে এ কাজের জন্য তিনি তোমাকে কি বলতেন একবার ভেবেছ? একথা শুনে তিনি পেছনে সরে আসেন। ইত্যবসরে তার সাথীদ্বয় এসে তাকে হত্যা করে যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরে যায়।

হযরত উসমানের স্ত্রী চিৎকার দিতে থাকেন। কিন্তু হট্টগোলের কারণে কেউ তাঁর আওয়াজ শুনতে পায়নি। অবশেষে তিনি উপরে গিয়ে বললেন, আমিরুল মোমেনীন শহীদ হয়ে গেছেন। তারা দৌড়ে এসে দেখলেন হযরত উসমান জবেহ হয়ে পড়ে আছেন। হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সাদ এবং মদীনবাসীসহ সংবাদ পেয়ে সকলের চৈতন্য লোপ পায়। হযরত আলী এসে পুত্রদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দরজায় থাকার পরও আমিরুল মোমেনীন কিভাবে নিহত হলেন? এ বলে পুত্রদ্বয়কে চড় দিলেন এবং মুহাম্মদ বিন তালহা ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে বকাঝকা করে বাড়ি চলে গেলেন।

অতঃপর লোকেরা দলে দলে হযরত আলীর বাড়িতে এসে বলল, এ মুহূর্তে একজন খলীফা প্রয়োজন। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন আমরা আপনার কাছে বাইআত করব। তিনি বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ খলীফা মনোনীত

করবেন। তাঁরা যাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তিনিই হবেন খলীফা। এরপর সকল বদরী সাহাবা এসে বললেন, আমরা আপনার চেয়ে খিলাফতের বেশি হকদার আর কাউকে দেখছি না। আপনি হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা বাইআত করব। অবশেষে তাঁরা বাইআত করলেন।

ওদিকে মারওয়ান এবং তার পুত্র আগেই পালিয়ে ছিলেন। হযরত আলী হযরত উসমানের স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কে হযরত উসমানকে হত্যা করেছে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের সাথে যে দুজন ছিল আমি তাদেরকে চিনি না। হযরত আলী সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হত্যা করার জন্য আমি ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার বাবার কথা বলায় আমি পেছনে সরে আসি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করতে থাকি। আল্লাহর কসম, আমি হত্যা করিনি, তাকে ঘায়েলও করিনি। হযরত উসমানের স্ত্রী বললেন, সে সত্য বলেছে, তবে সে-ই তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়েছে।

ইবনে আসাকির হযরত সুফিয়ার গোলাম কেনানা থেকে বর্ণনা করেন, জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে যে, লাল নীল মিশ্রিত চক্ষুবিশিষ্ট হিমার নামক মিসরের জনৈক ব্যক্তি হযরত উসমানকে হত্যা করে।

আহমদ মুগীরা বিন শোবা থেকে বর্ণনা করেন, অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আমি হযরত উসমানের নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আমিরুল মোমেনীন, আপনি দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়েছেন। আমি তিনটি পরামর্শ দিচ্ছি পছন্দমত একটি গ্রহণ করবেন। এক. আপনি বাইরে গিয়ে লড়াই করুন। আপনার অনেক গুণগ্রাহী রয়েছে। তাছাড়া আপনি সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তারা বাতেল। দুই. আপনি উটে চড়ে মক্কায় চলে যান। হারাম হওয়ার কারণে এরা সেখানে কোনো লড়াই করতে পারবে না। তিন. আপনি সিরিয়ায় গমন করুন, সেখানে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রয়েছেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। হযরত উসমান (রা.) বললেন, আমি বাইরে গিয়ে সংঘর্ষে জড়াব না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর খলীফা হয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট শুনেছি, কুরাইশদের মধ্যে যে হারাম শরীফে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে দুনিয়ার অর্ধেক শাস্তি তার উপর বর্তাবে এজন্য আমি মক্কা শরীফেও যাব না। সিরিয়ায় গমন করাও আমরা পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা হিজরতের পবিত্র নগরী এবং রসূলের সুষমাসিক্ত পরশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

ইবনে আসাকির আবু সুরুল ফাহমী থেকে বর্ণনা করেন, অবরোধ চলাকালীন

সময় আমি হযরত উসমানের নিকট গেলে তিনি বলেন, আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দশটি আমানত রেখেছি -

১। আমি ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি।

২। নবী (সা.) নিজ কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

৩। তাঁর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন।

৪। আমি কখনো গান গাইনি।

৫। কোন সময় খারাপ কাজের ইচ্ছে করিনি।

৬। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বাইআত করার পর থেকে ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

৭। প্রত্যেক জুমায় একজন গোলাম আযাদ করেছি। কোনো জুমায় গোলাম না পেলে পরবর্তীতে তা কাযা আদায় করেছি।

৮। জাহেলিয়াত অথবা ইসলামের যুগে কখনই যিনা করিনি।

৯। আমি কখনও চুরি করিনি।

১০। রসূলের যুগেই কুরআন হিফয করেছি।

হযরত উসমান ৩৫ হিজরীর আইয়্যামে তাশরীকের (ঈদুল আযহার তিন দিন) মধ্যভাগে শাহাদাত লাভ করেন। কারো মতে, তিনি ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ১৮ তারিখ শনিবার মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে শহীদ হন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। কারো মতে, শনিবারে কারো মতে ২০ যিলহজ্জ সোমবারে শহীদ হন। তাঁর বয়স নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮০, ৮৯, ৯০ বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, হযরত যুবায়ের তাঁর জানাযা পড়ান এবং দাফন করান। কারণ তিনি তাঁকে এ কাজের ওসীয়ত করেছিলেনে। ইবনে আসাকির এবং ইবনে আদী হযরত আনাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) জীবিত থাকা পর্যন্ত আল্লাহর তরবারী কোষবদ্ধ ছিল। তিনি শহীদ হওয়ার পর তা খাপমুক্ত হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত খাপমুক্তই থাকবে। (এ রেওয়ায়েতে উমর বিন কায়েদ মাত্র একজনই বর্ণনাকারী, এটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

ইবনে আসাকির ইয়াযিদ বিন হাবীব থেকে বর্ণনা করেন, আমি জেনেছি যারা হযরত উসমানের উপর আক্রমণ করেছে তাদের অধিকাংশই পাগল হয়ে গেছে।

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম ফিতনা হলো হযরত উসমানের শাহাদাত। আর সর্বশেষ ফিতনা দাজ্জালের আবির্ভাব। যে তার শাহাদাতে সামান্যতম খুশি হবে সে দাজ্জালের যুগ পেলে অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে,

আর না পেলে তার কবর দাজ্জালের আনুগত্য করবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত হাসান (রা.) বলেন, তিনি শহীদ হওয়ার সময় হযরত আলী (রা.) মদীনায় ছিলেন না। সংবাদ পেয়ে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি এ ঘটনায় সন্তুষ্ট নই এবং কোনোভাবেই এর সাথে সম্পৃক্ত না। (ইবনে আসাকির)

কায়েস বিন উবাদ বলেন, জঙ্গে জামালের দিন আমি হযরত আলীকে বলতে শুনেছি-হে আল্লাহ! আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে, আমি হযরত উসমানের রক্তের সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। তাঁর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়। লোকেরা আমার কাছে বাইআত করতে এলে আমি তাদের ভাল মনে করিনি, আমি তাদের বলেছি, আল্লাহর কসম, উসমানকে যারা হত্যা করেছে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বাইআত নিতে আমি লজ্জাবোধ করছি, তথাপি এরচেয়েও আমি বেশি লজ্জিত আল্লাহ তাআলার নিকট অতঃপর আমি তাদের ফিরিয়ে দিলাম। তারা আবার আসে এবং বাইআত করে। আমি হযরত উসমানের জন্য দো'আ করছি, হে আল্লাহ! উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। (হাকেম)

ইবনে আসাকির আবু খালদাহ হানাফী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী বলেন, বনু উমাইয়্যা মনে করে হযরত উসমানকে আমি হত্যা করায়েছি। আল্লাহর কসম, আমি হত্যা করিনি, হত্যাকারীকে সাহায্যও করিনি। বরং আমি নিষেধ করেছি, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

সমরাহ বলেন, ইসলাম একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। হযরত উসমানের হত্যাকারীরা একে ছিদ্র করে দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আর মদীনাবাসীর হাতে খিলাফতের দণ্ড ছিল, ঘাতকের দল তা নিক্ষেপ করায় কিয়ামত পর্যন্ত তা মদীনায় আর ফিরে আসবে না।

মুহাম্মদ বিন সিরীন বলেন, হযরত উসমানকে হত্যা করার পর থেকে ফেরেশতাগণ যুদ্ধের ময়দানে আর সাহায্য করে না। হযরত উসমানকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত চাঁদ দেখা নিয়ে কোনো মতভেদ ছিল না। আর হযরত হোসেনকে হত্যা করার পর আকাশে রক্তিম প্রভা দেখা দেয়। (এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়)।

আব্দুর রাজ্জাক তাসনীফ গ্রন্থে হামীদ বিন হিলাল থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম হযরত উসমানের নিকট গিয়ে বললেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। যারা করবে তারা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। স্মরণ রাখবে, এক নবীর পরিবর্তে সত্তর হাজার এবং একজন খলীফার পরিবর্তে পঁয়ত্রিশ হাজার প্রাণ বিসর্জনের পর উম্মতের ঐক্য ও সংহিত ফিরে আসবে।

ইবনে আসাকির আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের এমনও বৈশিষ্ট্য ছিল যা হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের মধ্যে ছিল না। এক. শহীদ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ এবং দুই. কিরাতের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করণ।

তেরোতম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ মূসা বিন তালহা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান জুমার দিন হলুদ পোশাক পরে মিম্বরে আরোহণ করতেন। মুআজ্জিন আযান দিতেন, আর তিনি লোকদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন।

আব্দুল্লাহ রুমী থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান একাই রাতে উঠে অযু করতেন। একজন বলল, সহযোগিতার জন্য খাদেমকে ডাকলে হয় না? তিনি বললেন, তার জন্যও রাত বিশ্রামের সময়। ইবনে আসাকির উমর বিন উসমান বিন আফফান থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল -

آمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى-

আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান তাঁর এক অভিভাষণে বলেন, একদা জাহজাহ খিফারী আমার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলার এক বছর পর আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন রোগ দেন যে, তার শরীর থেকে গোশত খুলে খুলে পড়ত।

আসকারী আওয়ায়েল গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম বৃত্তির প্রবর্তন, পশু চরানোর জন্য চারণভূমি নির্ধারণ, তাকবীর ধ্বনি মৃদু, মসজিদে সুগন্ধীর ব্যবস্থা, জুমার দিন দুই আযানের নিয়ম এবং মুআযযিনের বেতন নির্ধারণ করেন। (ইবনে সাদ)

তিনিই সর্বপ্রথম সম্পদ থেকে যাকাত বের করার নিয়ম চালু করেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনিই প্রথম খলীফা। তিনি পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। হযরত উমরের শাহাদতের কারণে মসজিদে নিজের জন্য মেহরাব তৈরি করেন। তাঁর যুগে ব্যাপক মতানৈক্যের কারণে পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করত। কিন্তু পূর্বে এ মতানৈক্য মাসায়েল এবং ফিকাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মতানৈক্যের জন্য একে অপরকে ভ্রান্ত মনে করত না। তিনি সর্বপ্রথম স্বপরিবারে আল্লাহর পথে হিজরত করেন।

ইবনে আসাকির হাকীম বিন উবাদা বিন হানীফ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর যুগে সম্পদের অফুরন্ততার কারণে অলস প্রকৃতির ধনীরা তীর দ্বারা কবুতর শিকারের প্রথা চালু করায় তিনি তো রোধ করার জন্য তাঁর খিলাফতের অষ্টম বর্ষে লাইছ বংশের এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।

তাঁর খিলাফতকালে সুরাকা বিন মালিক বিন জাশাম, জাব্বার বিন সখর, হাতিম বিন আবী বলতয়া, আয়স বিন যুহায়ের, আবু উসাঈদ আস সাদী, আওসে বিন সামেত, হরস্থ বিন নওফেল, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা, যায়েদ বিন হজেযা তিনি মৃত্যুর পরও কথা বলেছিলেন। কবি লাবীদ, সাঈদের পিতা মুসায়্যাব, মুআয বিন আমর বিন জুমুহ, মাবাদ বিন আব্বাস, মুতাকীব বিন আবী ফাতেমা আদাদওসী, আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির, নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী প্রমুক সাহাবা তাবেয়ী ইন্তেকাল করেন।

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)

তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে আলী বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মোত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মান্নাফ বি কুসসী বিন কিলাব বিন মুরাবা বিন কাব বিন লুয়ী বিন গালীব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নজর বিন কিনানা।

আবু তালিবের প্রকৃত নাম আব্দে মান্নাফ, আব্দুল মোত্তালিবের নাম শায়বা, হাশিমের নাম আমর, আব্দে মান্নাফের নাম মুগীরা এবং কুসসীর নাম যায়েদ।

হযরত আলী (রা.)-এর উপনাম আবুল হাসান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আবু তোরাব উপধি দেন। তাঁর সম্মানিত জননীর নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম। তিনিই প্রথম হাশিমী যুবক যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। হযরত আলী (রা.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর স্বামী। তিনি উচু মাপের জ্ঞানী। প্রসিদ্ধ বীর, দৃষ্টান্তহীন ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি, বিখ্যাত বক্তা এবং কুরআন শরীফ জমাকারী ও হাফেযে কুরআন। আবুল আসাদ দাইলী, আবু আব্দুর রহমান সালমী এবং আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা তাঁর নিকট থেকে কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন। তিনি বনু হাশিম গোত্রের প্রথম খলীফা। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি প্রাচীন। ইবনে আব্বাস, আনাস, যায়েদ বিন আরকাম, সালমান ফারসীসহ অনেক সাহাবী এ বিষয়ে একমত যে, তিনিই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কারো কারো ইজমাও রয়েছে।

আবু ইয়ালা হযরত আলী (রা.)-এর নকল করে বলেন, নবী (সা.) সোমবারে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, আর আমি মঙ্গলবারে ইসলাম গ্রহণ করি। মুসলমান হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। কারো মতে নয় বছর। কারো মতে আট বছর। কারো মতে এরচেয়েও কম। হাসান বিন যায়েদ বিন হাসান বলেন, তিনি কখনই

মূর্তিপূজা করেননি। (ইবনে সাদ)

নবী আকরাম (সা.) হিজরতের সময় মানুষের আমানতগুলো বুঝিয়ে দেবার জন্য তাঁকে মক্কা শরীফে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি তাবুক ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাবুকের যুদ্ধে তিনি (সা.) তাঁকে মদীনায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করে রণাঙ্গনে যাত্রা করেন। সকল যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব মানুষের মাঝে কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। নবী (সা.) অনেক যুদ্ধে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং তাঁকে সেনাপতি মনোনীত করেন।

সাইদ বিন মুসায়্যাব বলেন, উহুদ যুদ্ধে তাঁর শরীরে ষোলোটি আঘাত লেগেছিল। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে, খায়বর যুদ্ধে নবী (সা.) তাঁকে পতাকা তুলে দেন এবং তাঁকে সেনাপতি মনোনীত করেন।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেন উহুদ যুদ্ধে তাঁর শরীরে ষোলোটি আঘাত লেগেছিল। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে, খায়বর যুদ্ধে নবী (সা.) তাঁকে পতাকা দেন এবং খায়বর তাঁর হাতেই বিজিত হয়। তিনি স্থূল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শিরস্ত্রাণ পরার কারণে তার মাথার কেশরাজি বাতাসে উড়ত। তাঁর পদযুগল ছিল বেঁটে। ভারী পেট, প্রলম্বিত শ্বেত দাড়ি এবং মাথার মধ্যবর্তী পেছন দিকের কেশগুচ্ছের রং ছিল গোধূম বর্ণের। গোটা শরীরে ছিল পশমের সমাহার।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, খায়বর যুদ্ধে তিনি দুর্গের দরজা কাঁধে তুলে নেন, আর এ পথেই মুসলমানগণ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। খায়বর হস্তগত হওয়ার পর তিনি দরজাটি যেখানে নিক্ষেপ করেন পরবর্তীতে সেখান থেকে দরজাটি স্থানান্তর করার জন্য চল্লিশজন লোকের শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। (ইবনে আসাকির)

ইবনে ইসহাক মাগাযী গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) খায়বর যুদ্ধে দূর্গের দরজা হাতে নিয়ে তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ জয়ের পর দরজাটি দূরে নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধ শেষে আমরা আটজন মিলেও তা উঠাতে পারিনি।

ইমাম বুখারী আদব গ্রন্থে সহল বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) নিজের আবু তোরাব নামখানা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। কেউ তাঁকে এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। হবেন নাই বা কেন, এ নাম তো তাঁর সর্দার রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত। একদিন তিনি হযরত ফাতেমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মসজিদে

এসে শুয়ে পড়ায় তাঁর শরীরে মাটি লেগে যায়। ইত্যবসরে নবী করীম (সা.) মসজিদে আসেন এবং তাঁর শরীরের মাটি ঝরিয়ে দিয়ে বলেন, হে আবু তোরাব (অর্থাৎ মৃত্তিকার বাবা) উঠো।

তিনি নবী আকরাম (সা.) এর নিকট থেকে ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর নিকট থেকে তাঁর তিনপুত্র হাসান, হোসাইন, মুহাম্মদ বিন হানফীয়া, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আবু মূসা আশআরী, যায়েদ বিন আরকাম, আবু সাঈদ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবু উমামা, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবা এবং তাবেয়ীন হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলী (রা.)-এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর ফযীলত সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস রয়েছে এর চেয়ে অধিক হাদীস অন্য সাহাবীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। (হাকেম)

বুখারী এবং মুসলিমে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক বর্ণিত, তাবুক যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীকে মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এখানে শিশু ও নারীদের সাথে কি আপনি আমাকে রেখে যেতে চান? তিনি (সা.) বললেন, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (আ.) যেমন হারূন (আ.) কে রেখে গিয়েছিলেন আমিও তোমাকে তেমনি রেখে যেতে চাই। পার্থক্য শুধু আমার পর আর কোনো নবী আসবেন না। আহমদ, বাযযার প্রমুখ বিভিন্ন সাহাবী থেকে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন।

বুখারী এবং মুসলিম সহল বিন সাদ কর্তৃক বর্ণিত, খায়বর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তির হস্তে পতাকা তুলে দেয়া হবে যার হাতে খায়বর বিজিত হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁকে ভালোবাসেন এবং তিনিও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন সকল সাহাবা। এ পরম সৌভাগ্য কার প্রতি অর্পিত হয় তা দেখার জন্য সারা রাত অপেক্ষায় প্রহর গুনেন। সকালে সকল সাহাবা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থি হলেন। সকলের আশা এ সওগাত যেন আমার ভাগ্যে আসবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আলী (রা.) কোথায়? লোকেরা বললেন, চোখ ব্যথা করায় তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি (সা.) বললেন, এক্ষুনি তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তিনি এলে নবী (সা.) তাঁর চোখে মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভালো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আলীকে পতাকা দিলেন। তাবারানী বিভিন্ন সাহাবীর থেকে এ

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইনকে ডেকে তাঁদের জন্য এ দোআ করেন, হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার।

তিরমিযী শরীফে আবু সারীহা এবং যায়েদ বিন আরকাম কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরাশদ করেন, আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। আহমদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং তাবারানী বিভিন্ন সাহাবীদের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কতিপয় বর্ণনাকারী হাদীসের এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন—হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসবে তুমি তাকে ভালোবাস। আর যে আলীর বিদ্বেষাচরণ করবে তুমিও তার সাথে তাই করো।

আহমদ আবু তোফায়েল থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) জাবার ময়দানে লোকদের সমবেত করে বলেন, আমি আপনাদের নিকট কসম করে জিজ্ঞেস করতে চাই, রাসূলুল্লাহ (সা.) গদীরে খম-এ আমার ব্যাপারে কি বলেছিলেন? ত্রিশজন লোক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসবে তুমি তাকে ভালোবাস। আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে তুমিও তার সাথে শত্রুতা করো।

তিরমিযী এবং হাকেম বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমাকে চারজনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে চারজনকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। লোকেরা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের নাম বলুন। তিনি বললেন, আলী, আবু যর, মিকদাদ এবং সালমান ফারসী।

তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা হাবশী বিন জানাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আলী আমার এবং আমি আলীর।

তিরমিযী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলে হযরত আলী কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকল সাহাবী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আমি বাকী রয়েছি। তিনি (সা.) বললেন, দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জগতে তুমি আমার ভাই।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, সেই প্রতিপালকের

কসম, যিনি ফসল ফলান এবং প্রাণের জন্ম দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাছে শপথ করেছেন মুমিনরা তোমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিকরা শত্রুতা করবে।

ইমাম তিরমিযী আবু সাইদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা মুনাফিকদের হযরত আলীর শত্রুতা দ্বারা চিহ্নিত করি। তিরমিযী এবং হাকেম হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাধ করেন, আমি জ্ঞানের নগর, আর আলী সে নগরের দরজা। হাদীসটি হাসান, ইবনে জওযী, নববী প্রমুখ একে মওজু বলেছেন- আমার দীর্ঘ গবেষণায় যা সম্পূর্ণ ভুল।

হাকেম হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলাল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামানে পাঠাতে চাইলে আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইয়ামানে পাঠাতে চাইছেন, আমি তো বয়সে তরুণ এবং লেনদেন করতে জানি না। এ কথা শুনে তিনি আমার বুকে হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! এ রসানা সংযত করে দাও। আল্লাহর কসম, এরপর থেকে লেনদেন করতে আমার কোনো সংশয় হয়নি।

ইবনে সাদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আলী) বলেন, আমি এত অধিক হাদীস বর্ণনা কিভাবে করলাম লোকেরা তা জানতে চাইলে আমি বললাম, আমি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে রাসূলাল্লাহ (সা.) খুব ভালো করে বুঝিয়ে আমাকে উত্তর দিতেন। আর আমি চুপ করে থাকলে তিনি আবার বলতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেছেন, হযরত আলী আমাদের মধ্যে উত্তম বিচারক।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা পরস্পরে এ আলাপ করতাম যে, হযরত আলী মদীনা শরীফে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনে সাদ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলীর কোনো মাসয়ালা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেলে সে মাসয়ালা নিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন নেই।

সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রা.) বলেন, হযরত আলী যে বিচার করতেন না তা যেন করতে না হয় সে জন্য হযরত উমর আল্লাহর নিকট দোআ করতেন। সাঈদ বিন মুসায়্যাব বলেন, যা কিছু জানার আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে-মদীনা শরীফে হযরত আলী ব্যতীত এ কথা কেউ বলার সাহস পেতেন না।

ইবনে আসাকির ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মদীনায় হযরত

আলীর চেয়ে অধিক উত্তরাধিকারের আইন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ ছিলেন না।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, সুন্নত সম্পর্কে হযরত আলীর জ্ঞান ছিল সবচেয়ে বেশি।

মাসরূক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাদের জ্ঞান উমর, আলী, ইবনে মাসউদ এবং আব্দুল্লাহর নিকট এসে শেষ হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আয়স বিন রাবীআ বলেন, হযরত আলী (রা.) জ্ঞানের পরিপক্কতা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয়তা, ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামাতা, হাদীস থেকে নির্গত শরীয়তের আইন, যুদ্ধের ময়দানে অসীম সাহসীকতা এবং দানশীলতার কারণে উত্তম।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে দুর্বল সূত্রে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সকল মানুষ বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, আর আমি এবং আলী একই বৃক্ষের।

তাবারানী এবং ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কুরআন শরীফে উল্লিখিত - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার যে হযরত আলী আমীর এবং সম্ভ্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের কয়েক জায়গায় সাহাবীদের প্রতি নিজের ক্রোধের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে হযরত আলীর কল্যাণের বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কুরআন শরীফে হযরত আলীর শানে যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছে, ততটুকু কারো শানে হয়নি।

ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলীর শানে তিন শ'আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারানী উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাগের সময় হযরত আলী ব্যতীত তাঁর সাথে কথা বলার সাহস কারো ছিল না।

তাবারানী ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়াই ইবাদত। এর সূত্রগুলো হাসান।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আলীর মধ্যে ১৮টি বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্যান্য সাহাবীদের মাঝে ছিল না।

আবু ইয়ালা আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আলীর তিন গুণাবলীর একটি গুণও যদি আমার মধ্যে থাকত তবে

নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সেই গুণগুলো কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের কন্যা ফাতেমাকে আলীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দু'জনকে তিনি (সা.) মসজিদে রেখেছেন-মসজিদে তাঁরা যা করবেন সবই বৈধ এবং খায়বর যুদ্ধে পতাকা প্রাপ্তি।

বায়যার সাদ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীকে বলেন, এ মসজিদে তুমি এবং আমি ছাড়া কারো জন্য এমন কাজ করা বৈধ নয় যে কাজ করলে দেহের পবিত্রতার জন্য গোসল ফরয।

আহমদ এবং আবু ইয়ালা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বর যুদ্ধে থুথু লাগিয়ে দেয়ার পর থেকে আমার চোখে আর কোনো দিন ব্যথা করেনি। আবু ইয়ালা এবং বাযযার সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে আলীকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল।

তাবারানী বিশুদ্ধ সূত্রে উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে আলীকে ভালোবাসবে সে আমাকেও ভালোবাসলো এবং যে আমাকে ভালোবাসবে যে যেন আল্লাহকেও ভালোবাসলো। আর যে আলীর শত্রুতা করবে সে আমারও করবে এবং যে আমার দুশনী করবে সে যেন আল্লাহর দুশনী করলো।

আহমদ উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- যে আলীকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।

আহমদ এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীকে বলেন, তোমরা কুরআন সংরক্ষনের ব্যাপারে যত্নবান হও, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে যত্নবান ছিলাম।

বায়যার আবু ইয়ালা এবং হাকেম হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ডেকে বললেন, তোমার দৃষ্টান্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো। ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহ করেছিল যে, তারা তাঁর পবিত্র মাকে পর্যন্ত অপবাদ দিতে ছাড়েনি। আর খ্রিস্টানরা তাঁকে অতিরিক্ত ভালোবাসা দিতে গিয়ে তিনি যা নন তাও তাঁকে বানিয়ে ছেড়েছেন। মনে রেখ, মানুষকে দু'টি বিষয় ধ্বংস করে দেয়। এক. তিনি যা নন তা ভেবে ভালোবাসা এবং দুই. এ ধরনের বিপ্লব যাতে খারাপ ভাবতে ভাবতে তার ব্যাপারে অপবাদ লাগিয়ে দেয়া।

তাবারানী আওসাত এবং সগীর গ্রন্থে উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কুরআনের সাথে আলী রয়েছে এবং আলীর সাথে কুরআন রয়েছে। তারা উভয়ে আমার কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় হাউসে কাওছারে এসে মিলিত হবে।

আহমদ এবং হাকেম সহীহ সনদের মাধ্যমে আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীকে বলেন, দু'জন সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এক ছামুদ বংশের ঐ ব্যক্তি যে সালেহ (আ.)-এর উটনীর পায়ের গোড়ালী কেটে দিয়েছিল এবং দুই. যে তোমার মাথায় অসির আঘাত করবে আর রক্তে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে।

হাকেম আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক হুযূর (সা.) এর নিকট হযরত আলীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গে সঙ্গে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, আলীর ব্যাপারে কখনই কোনো অভিযোগ করবে না।

চৌদ্দতম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাদ বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের দ্বিতীয় দিবসে মদীনায় হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) ব্যতীত সকল সাহাবা সন্তুষ্টচিত্তে হযরত আলীর বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জন প্রকাশ্যে বাইআত নিলেও সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিষয়টি অবহিত করে তাঁকে নিয়ে বসরায় এসে হযরত উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবী করেন। সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রা.) ইরাক গমন করেন। এখানেই জঙ্গে জামালের মতো মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) শহীদ হন। এ যুদ্ধ উভয় পক্ষের তেরো হাজার প্রাণ কেড়ে নেয়। ৩২ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে এ ঘটনা ঘটে।

হযরত আলী (রা.) বসরায় পনেরো দিন অবস্থানের পর কুফায় গমন করলে হযরত মুআবিয়া (রা.) কুফা আক্রমণ করেন। খবর পেয়ে হযরত আলী (রা.) সামনে অগ্রসর হন। ৩৭ হিজরীর সফর মাসে কয়েক দিন স্থায়ী হয় এ অসম লড়াই। অবশেষে সিরিয়াবাসী কুরআন শরীফ উঁচু করে শান্তির আহ্বান জানালে উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য সংলাপে বসে। হযরত মুআবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আমার বিন আস (রা.) এবং হযরত আলীর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) দীর্ঘ আলোচনার পর এ মর্মে একটি প্রতিশ্রুতি পত্র প্রস্তুত করেন যে, "আগামী বছর

আরযা অঞ্চলে এসে উম্মতের সংশোধনের জন্য আলোচনা হবে।" অতঃপর সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত আলী (রা.) কুফা ফিরে এলে খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা পৃথক হয়ে হযরত আলীর খিলাফতকে অস্বীকার এবং لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম চলবে না-এ শ্লোগান দিয়ে যুদ্ধের জন্য বাহরুরা অঞ্চলে সমবেত হয়। হযরত আলী (রা.) হযরত আব্বাসকে বুঝানোর জন্য তাদের কাছে পাঠালে তাদের অনেকেই ফিরে আসে। আর বাকী খরিজীরা নাহরুয়ানে পালিয়ে যায়। সেখানে তারা পথিকদের সম্পদ লুটপাট করতে শুরু করল। হযরত আলী (রা.) সেখানে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। সেখানে যাআল সাদিয়াও নিহত হয়। এসব ৩৮ হিজরীর ঘটনা।

গত বছরের কথা অনুযায়ী ৩৮ হিজরীর শা'বান মাসে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবীগণ আরযা অঞ্চলে সংলাপ শোনার জন্য সমবেত হন। এ সংলাপে আমর বিন আস (রা.) আবু মূসা আশআরী (রা.) কে পরাজিত করেন। প্রথমে হযরত আবু মূসা আশআরী তাঁর বক্তৃতায় হযরত আলীকে বরখাস্ত করেন, আর হযরত আবু মূসা আশআরী হযরত মুআবিয়ার বিবরণ দানে তাঁর জন্য খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। সংলাপের প্রেক্ষিতে খিলাফতে হযরত আলীর অবস্থানের বার্তা নিয়ে লোকেরা তাঁর নিকট গেলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আমার খিলাফত আর মুআবিয়ার আনুগত্য?

আবদুর রহমান বিন বালহাম আল মুরাদী, বারাক বিন আব্দুল্লাহ তামিমী এবং উমর বিন বাকের তামিমী এ তিনজন খারেজী হযরত আলী (রা.), হযরত মুআবিয়া (রা.) এবং হযরত আমর বিন আস (রা.) কে হত্যা করে বিবদমান পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য একমত হয়। আব্দুর রহমান হযরত আলীকে, বারাক হযরত মুআবিয়াকে এবং উমর হযরত আমর বিন আসকে ১১ অথবা ১৭ রমযানের রাতে সকলকে শহীদ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল। কথা মোতাবেক তারা তাদের তিন শহরে যাত্রা করল। আব্দুর রহমান কুফায় পৌঁছে অন্যান্য খারেজীদের নিকট তার আগমনের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে।

প্রতিদিনের মত হযরত আলী (রা.) প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.) কে বললেন, আজ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি এবং তাঁর নিকট অভিযোগ করেছি যে, আপনার উম্মত আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং আমার সাথে বিবাদ ও বিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহর নিকট বদদোআ করো। আমি দোআ করলাম, হে আল্লাহ! এ লোকদের ভালো লোকে পরিবর্তন

করে দাও। তিনি বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে নাবাহ মুআজ্জিন এসে নামাযের জন্য 'সালাত' 'সালাত' বলে আওয়াজ দিলে হযরত আলী বাড়ির সকলকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। আগে থেকেই পথে ওৎপেতে ছিল ঘাতক আব্দুর রহমান। সুযোগ বুঝে হযরত আলী (রা.) চেহারা বরাবর তলোয়ার চালিয়ে দেয়। চারদিক থেকে লোক দৌড়ে এসে ঘাতককে ধরে ফেলে। হযরত আলী (রা.) গুরুতর আহত অবস্থায় জুমা পর্যন্ত এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন। তিনি শনিবার রাতে ইন্তেকাল করেন। হযরত হাসান, হযরত হোসাইন এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাঁকে গোসল দেন, হযরত হাসান জানাযার নামায পড়ান এবং কুফার দারুল ইমারতে তাঁকে রাতের বেলায় সমাহিত করা হয়।

কাফন-দাফন শেষে আব্দুর রহমান বিন বালহামের হাত-পা কেটে একটি বড় পাত্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং আগুন দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করা হলো তা ইবনে সাদ কর্তৃক তালখীস গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীদের আলোচনার সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি বলেন, সাহাবীদের হত্যা করার অপরাধ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মুসতাদরাক গ্রন্থে আল্লামা সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুর রহমান বিন বালহাম খারেজী সম্প্রদায়ের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিয়ের সময় মোহর হিসেবে নির্ধারিত হয় তিন হাজার দিরহাম এবং হযরত আলীর হত্যা।

আবু বকর বিন আয়স বলেন, কুফার দারুল ইমারতে হযরত আলী (রা.) কে সমাহিত করার কারণ হচ্ছে খারেজীরা যেন তাঁর অমর্যাদা করতে না পারে। শরীক বলেন, হযরত হাসান লাশ স্থানান্তর করে মদীনায় নিয়ে যান। মুহাম্মাদ বিন হাবীব বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম হযরত আলীর সমাধিস্থ লাশ স্থানান্তর করা হয়।

ইবনে আসাকির (রহ.) সাঈদ বিন আব্দুল আযীয (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্শ্বে সমাহিত করার জন্য উটে করে হযরত আলীর লাশ নিয়ে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করা হয়। পথিমধ্যে লাশ বহনকারী উটটি হারিয়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উটের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কারো মতে, অনুসন্ধানে উটটি যে শহরে পাওয়া যায় সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত আলীর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স ছিল - ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৯৭ অথবা ৯৮ বছর। তাঁর ১৯ জন দাসী-বাঁদী ছিল।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

সাঈদ বিন মানসুর (রহ.) স্বরচিত সুনান গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি আমার দুশনদের আমার নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার তৌফিক দিয়েছেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) হিজড়ার মিরাছ সম্পর্কে আমার নিকট জানতে চেয়েছিলেন, আমি লিখেছিলাম, তাদের লজ্জাস্থানের আকৃতির উপর উত্তরাধিকারের আইন প্রযোজ্য হবে। হাশেম শা'বী থেকে এ ধরনের রেওয়ায়েতই বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকির (রহ.) হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বসরা যাবার প্রাক্কালে ইবনুল কাওয়া এবং কায়েস বিন উবাদ (রা.) হযরত আলীকে বললেন, বলুন, আপনি উম্মতে মেহাম্মদীয়ার কর্ণধার হয়ে লোকদের হত্যা করতে চলেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেছেন তাঁর পর আপনি খলীফা হবেন? এ কাজের জন্য আপনার চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আর কে রয়েছেন? এমন কথা কি আপনি রসূলের নিকট থেকে শুনেছেন? হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি ভুল বলেছ। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। আমি সর্বপ্রথম তাঁকে সত্যায়িত করেছি। যদি তিনি আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতেন তবে রসূলের মিম্বরে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) কে দাঁড়াতে দিব কেন? আমার সঙ্গে কেউ না থাকলেও আমি তাঁদেরকে হত্যা করে ফেলতাম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হঠাৎ নিহত হননি আবার সহসা ইন্তেকালও করেননি। তিনি (সা.) মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। তখন নামাযের সময় হযরত আবু বকরকে ইমামতি করার নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে তিনি তাঁর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আমরা চিন্তা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীনের জন্য কাকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকরকে নামাযের ইমাম মনোনীত করেছিলেন, আর নামায হলো দ্বীনের শিকড়। অতএব আমরা তাঁর হাতে বাইআত করলাম। সঠিক কথা হচ্ছে, তিনি খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন বিধায় তাঁকে এবং তার খিলাফতকে নিয়ে কোনো মতবিরোধ হয়নি, কেউ কাউকে কষ্ট দেয়নি এবং তাঁর খিলাফতের প্রতি কেউ অসন্তুষ্টও ছিল না। এজন্য আমি তাঁর আনুগত্য করেছি, তাঁর সৈন্যদের সাথে মিলে কাফিরদের সাথে প্রাণখুলে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুর সময় তিনি হযরত উমরকে খলীফা মনোনীত করে যাওয়ায় আমরা তাঁর সাথেও হযরত আবু বকরের মতোই আচরণ করেছি। হযরত উমরের মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমার নিকটাত্মীয়তা, ইসলামে আমার

প্রাচীনত্ব, আমার আমল ইত্যাদি গুণাবলীর বিষয় চিন্তা করে আমি ভাবলাম, অবশ্যই হযরত উমর তাঁর পর আমার খিলাফত প্রাপ্তির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না। কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য খলীফা মনোনীত করতে না পারলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় হযরত উমর (রা.) খলীফা নির্বাচন না করেই ইন্তেকাল করেন। এরপর (একজন খলীফা-অনুবাদক) নির্বাচনের জন্য কুরাইশ গোত্রের ছয়জন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম অন্যতম। একজনকে মনোনীত করার জন্য আমরা ছয়জন সমবেত হলে আমি বাবলাম, এরা আমাকে পত্যাখ্যান করতে পারেন না। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) আমাদের সকলের নিকট থেকে এ শপথ নিলেন আমাদের মধ্য থেকে যাঁকে খলীফা মনোনীত করা হবে আমরা তাঁর আনুগত্য করব। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) হযরত উসমান বিন আফফানের হাত ধরে বাইআত করে নেন। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার বাইআত আমার আনুগত্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং আমার নিকট থেকে অন্যের আনুগত্যের জন্য শপথ নেয়া হয়েছে। অতএব আমরা সবাই হযরত উসমানের হাতে বাইআত গ্রহণ করি। আমি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের মতই হযরত উসমানের সাথে কাজ করেছি। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর ভাবলাম, খিলাফতের জন্য নামায পড়ানোর নির্দেশ দানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে দু'জনের ব্যাপারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং তাঁদের পর যাঁর জন্য আমার নিকট থেকে শপথ নেয়া হয়েছিল তাঁরা আজ গত হয়েছেন। এ চিন্তা করে আমি বাইআত নিতে শুরু করেছি। আমার নিকট হারামাইন শরীফাইনবাসী (মক্কা ও মদীনাবাসী-অনুবাদক) এবং ঐ দুই শহরবাসী (বসরা ও কুফাবাসী-অনুবাদক) বাইআত করেন। এ অবস্থায় খিলাফতে একজন (হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)- অনুবাদক) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয়তা, ইলম, ইসলাম গ্রহণের প্রাচীনত্ব কোনো দিক দিয়েই আমার সমকক্ষ নন। প্রত্যেক দিক থেকে আমি তাঁর চেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার।

আবু নুয়ায়েম দালায়েল গ্রন্থে জাফর বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলীর সমীপে একটি বিচার প্রার্থনা করা হয়। তিনি অভিযোগ শ্রবণের জন্য দেয়ালের নিচে বসে পড়লে জনৈক ব্যক্তি বলল, দেয়ালটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি নিজের কাজ করো। আমাকে আল্লাহ তা'আলা হিফাজত করবেন। বিচারের রায় ঘোষণা করে তিনি স্থান ত্যাগ করলে দেয়ালটি ভেঙে পড়ে।

তৌরিয়াত গ্রন্থে জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি অধিকাংশ অভিভাষণে বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে খোলাফায়ে রাশেদীনাল মাহদিয়্যীনদের মতো গ্রহণযোগ্যতা দান করো - খোলাফায়ে রাশেদীন কারা? হযরত আলী (রা.)-এর নয়ন যুগল সিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আমার বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) হলেন ইমামুল মাহদী এবং শায়খুল ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর তাঁরা কুরাইশদের পথপ্রদর্শক। যারা তাঁদের আনুগত্য করেছে তারা হিদায়াত এবং পরিত্রাণ পেয়েছেন, আর যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলেছে তারা আল্লাহর সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আব্দুর রাজ্জাক হজর আল মাদরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আলী (রা.) আমাকে বলেন, কেউ যদি আমার প্রতি অভিশাপ দেবার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেয় তাহলে তুমি কি করবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এমনটা কি হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এমনও হবে। আমি বললাম, তাহলে এ অবস্থায় আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি অভিশাপ দিবে এবং আমাকে ছেড়ে যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, কয়েক বছর পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই ইয়ামানের শাসনকর্তা মুহাম্মাদ হযরত আলীর প্রতি অভিশাপ করার নির্দেশ দিলে আমি বললাম, ইয়ামানের শাসনকর্তা হযরত আলীর উপর অভিশাপ করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব আপনারও অভিশাপ করুন, কিন্তু একজন ছাড়া কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।

তাবারানী আওসাত গ্রন্থে এবং আবু সাঈদ দালায়েল গ্রন্থে যাযান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলীর একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে তিনি বললেন, তুমি অসত্য বললে তোমাকে বদদোআ করব। সে বলল, করুন। তিনি তার জন্য বদদোআ করলেন, ফলে লোকটি স্থানচ্যুত হওয়ার আগেই অন্ধ হয়ে যায়।

যারিয়েন বিন জায়েশ বলেন, এক ভ্রমণে দু'জন লোক খানা খেতে বসে। একজনের নিকট পাঁচটি এবং অপর জনের নিকট ছিল তিনটি রুটি। ইত্যবসরে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটে। তারা আগন্তুককেও নিজেদের সাথে শরীক করে নেয়। তারা তিনজন মিলে আটটি রুটি ভাগাভাগি করে খায়। আহার্য গ্রহণ শেষে আগন্তুক বিদায়ের প্রাক্কালে আট দেরহাম দিয়ে বলল, আমি যা খেয়েছি এটা তার প্রতিদান। তারা দু'জন এ আট দেরহাম ভাগাভাগির ক্ষেত্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। পাঁচ রুটিওয়ালার বক্তব্য হলো, আমি পাঁচ দেরহাম নিব এবং তোমাকে দিব তিন দেরহাম। আর তিন রুটিওয়ালা বলল আট দেরহাম সমান করে ভাগ করতে হবে। অবশেষে এ ঘটনা খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌছায়। হযরত আলী (রা.) তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, সে যা দিতে চায় তুমি তাই গ্রহণ করো, কারণ তোমার

রুটির পরিমাণ কম ছিল। সে বলল, আল্লাহর কসম, আমার প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত আমি মানব না। হযরত আলী (রা.) বললেন, যদি বলি তুমি পাবে এক দেরহাম, আর সে পাবে অবশিষ্ট সাত দেরহাম তাহলে কি মানবে? সে বলল সুবহান আল্লাহ! এটা কি করে হতে পারে? আমাকে বুঝিয়ে দিন আমি মেনে নেব। হযরত আলী (রা.) বললেন, আটটি রুটি তিনজনে খেয়েছে। সমানভাগে আটকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় না। এজন্য আটকে তিন দিয়ে গুণ করলে আটটি রুটির চব্বিশটি টকুরা হবে। এটা বলা মুশকিল যে, কে কয় টুকরা খেয়েছে। এ কারণে ধরে নিতে হবে সকলে সমান খেয়েছে। তোমার তিনটি রুটির নয়টি টুকরার মধ্যে তুমি খেয়েছ আট টুকরা, বাকী থাকে এক টুকরা।

আর সে তার পাঁচটি রুটির পনোরোটি টুকরার মধ্যে আট টুকরো খেলে অবশিষ্ট থাকে সাত টুকরা। আগুন্তক ব্যক্তি তোমার এক টুকরা এবং তার সাত টুকরা রুটি খেয়েছে। অতএব তুমি পাবে এক দেরহাম, আর সে পাবে সাত দেরহাম। এবার লোকটি বলল, এবার মেনে নিলাম।

ইবনে আবি শায়বা (রহ.) মুসান্নিফ গ্রন্থে আতা থেকে বর্ণনা করেন, দুজন লোক একজনের চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ায় হযরত আলী (রা.) বিষয়টি তদন্ত করে বললেন, আমি মিথ্যা সাক্ষীর কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকি। অতঃপর তিনি সাক্ষীদ্বয়ের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তারা আগেই পালিয়ে গিয়েছে। ফলে তিনি চোরকে ছেড়ে দিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক হযরত আলীর বরাত দিয়ে মুসান্নিফ গ্রন্থে লিখেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, অমুক ব্যক্তি স্বপ্নে আমার মায়ের সাথে যিনা করেছে, (এজন্য আমি অমুক ব্যক্তির বিচার কামনা করছি-অনুবাদক) হযরত আলী (রা.) বললেন, সেই ব্যক্তিকে রোদে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার ছায়াকে প্রহার করো।

ইবনে আসাকির জাফার বিন মুহাম্মাদের পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, হযরত আলীর আংটিতে নকশা করা এ কথাগুলো লিখা ছিল -

نِعْمَ الْقَادِرُ اَللّٰهُ

আমর বিন উসমান বিন আফফান বলেন, তাঁর মোহরে লিখা ছিল اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ

মাদায়েনী বলেন, হযরত আলী (রা.) কুফা গমনের প্রাক্কালে আরবের জনৈক গভর্নর বললেন, ইয়া আমিরুল মোমেনীন! আপনি খিলাফতের পদকে আলোকিত করেছেন। খিলাফত আপনাকে আলোকিত করেনি। মসনদ আপনার পদপ্রার্থী ছিল। মাজমা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বাইতুল মালের সম্পদ দান করে নামায় পড়তে যাওয়ার কারণে বাইতুল মাল আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিবে তিনি মুসলমানদের সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতেন না।

আবুল কাসিম যাজ্জাজী আমালীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহ.) বলেন, একদা আমি হযরত আলীকে চিন্তামগ্ন দেখে কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি শুনেছি তোমাদের শহরে ভাষা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। এজন্য শব্দপতন রোধকল্পে আরবী সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের নীতিরীতি প্রণয়নের কথা ভাবছি। আমি বললাম, এমনটা করলে আমাদের প্রতি দারুণ করুণা করা হবে, আমরা স্থায়ীভাবে প্রাণ ফিরে পাব এবং আপনার পরও এ রীতি অটুট থাকবে। তিনদিন পর আমি পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি আমার সামনে এক ফালি কাগজ তুলে ধরলেন। এতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের পর লিখা ছিল, বাক্য তিন প্রকার। ইসিম, ফেল এবং হরফ। ইসিম বলা হয়, যে তার মুসাম্মার খবর বহন করে; ফেল বলা হয়, যে স্বীয় মুসাম্মার হরকত দেয় এবং বর্ণিত দুই গুণ শূন্যকে হরফ বলে। আমি লিখাগুলো মনোযোগসহ পড়ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আরো কিছু জানা থাকলে বিষয়টি তুমি আরেকটু সম্প্রসারিত করতে পারো। অতঃপর তিনি বললেন, আশিয়া তিন প্রকার। যাহের, মাযহার এবং তৃতীয় নম্বরটি যাহেরও না মাযহারও না। আবুল আসওয়াদ বলেন, ان-ان-ليت- لعل-كان এই হুরুফে নাসেবাগুলো লিখে কয়েকদিন পর দিয়ে তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, لكن এটাও হরফে নাসেবা, কেন এখানে তার উল্লেখ করনি? আমি বললাম, আমি এ শব্দকে হুরুফে নাসেবা মনে করি না। তিনি বলেন, না এটাও হুরুফে নাসেবা, এ শব্দটিও এগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

ইবনে আসাকির রাবিআ বিন নাজাদ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, লোক সকল! তোমরা মৌমাছির মতো হয়ে যাও। সে অতিশয় ক্ষুদ্রতম পক্ষীর মতো আকৃতি হলেও সে কিন্তু পক্ষী নয়। সে জানে না তার মধ্যে কত গুণের সমাহার রয়েছে। হে জনমণ্ডলী! তোমরা লোকদের সাথে মৌখিক এবং আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করো। কারণ কিয়ামত দিবসে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে উত্থিত হবে। তিনি আরো বলেন, আমল কবুল হওয়ার জন্য বেশি বেশি চেষ্টা করো। আর তাকওয়া ছাড়া আমল কবুল হয় না।

ইয়াহয়া বিন জাআদা বলেন, হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেছেন, হে কুরআন বহনকারীগণ! কুরআনের উপর আমল করো। যে কুরআনের উপর আমল করবে সেই আলেম। ইলম অনুযায়ী আমল করবে। অচিরেই এমন লোকের জন্ম হবে যে ইলম অর্জন করবে, কিন্তু তার ইলম গলা থেকে বের হবে না। তার অভ্যন্তররূপ বাইরের দৃশ্যের বিপরীত হবে। তার আমল তার ইলমের বিপরীত হবে। দলবদ্ধভাবে বসে নিজেরা গর্ব করবে- এ ধরনের লোকদের আমল আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছবে না। তিনি বলেন, বলদের কাজ আকর্ষণীয়, সুন্দর অভ্যাস হলো

অনন্য বন্ধু, বিবেক হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সহচর, শিষ্টাচার হলো উত্তরাধিকার এবং ভীরুতা গর্ব ও অহংকারের চেয়েও জঘন্য।

হারিছ বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, ভাগ্য কি? আমাকে বুঝিয়ে বলুন। তিনি বললেন, এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, এ পথে চলো না। সে আবার জানতে চাইল। তিনি বললেন, এটা গভীর সমুদ্র, এতে সাঁতার দিয়ো না। সে আবার প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, এটা আল্লাহর এক গোপন রহস্য, যা তোমাদের থেকে আড়াল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করো না। কিন্তু সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হে প্রশ্নকারী! বল আসমান এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা তোমার না তাঁর মর্জী মতো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? সে বলল, তাঁর। তিনি বললেন, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তোমাকে ব্যবহার করেন (এটাই ভাগ্য-অনুবাদক)

তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক দুঃখ-কষ্টের একটি সীমা রয়েছে। কারো উপর দুঃখ আসলে তা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গড়াবে। এজন্য খেয়াল করা আবশ্যক যে, কোনো মুসিবত আসলে তাকে নিরসনের চেষ্টা না করা, এমতাবস্থায় তার মুসিবত তার সময়-সীমা অতিক্রম করবে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এর অবসান হলে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে।

· জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, দানশীলতা কি? তিনি বললেন, প্রার্থনা করার পূর্বে যা প্রদান করা হয় তা হলো দানশীলতা। আর প্রার্থনার পর প্রদত্ত দানকে বলা হয় বখশিশ ও উপহার। জনৈক ব্যক্তি হযরত আলীর সমালোচনা করে। হযরত আলীর নিকট সংবাদটি পৌছে যায়। একদা সেই ব্যক্তি হযরত আলীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা করলে তিনি বলেন, তুমি যা বলেছ তা এমন নয়। তোমার অন্তরে যা আছে আমি তার চেয়েও বেশি কিছু। তিনি বলেন, আদেশ অমান্য করনের শাস্তি হলো ইবাদতে অলসতা, জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনন্দিন খাদ্যে সংকীর্ণতা এবং স্বাধে গন্ধে স্বল্পতা আসবে।

আলী বিন রাবীআ বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে অটল রাখুন। কিন্তু সে মনে মনে তাঁর শত্রুতা পোষণ করত। তিনি বললেন, আমি যেন তোমার বক্ষস্থলের উপর দৃঢ়পদ থাকতে পারি।

শা'বী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন। হযরত উমর (রা.) কবি ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) কাব্য রচনা করতেন। তবে হযরত আলী (রা.) কবিত্বের প্রতিভা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রকার। নাবীত আশজায়ী থেকে বর্ণিত তাঁর কাব্যগুলোর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো, "অন্তরে যখন নৈরাশ্যের সৃষ্টি হবে, বদান্যতা যখন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, সমাজের কুসংস্কার যখন প্রাধান্য পাবে, উদ্যোমতা যখন বাধাগ্রস্ত হয় এবং এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় হ্রাস পায় তখন

নিজেই নিজেকে বলবে, একদিন গ্রহণযোগ্য পথের সন্ধান মিলবেই। কারণ প্রতিটি ঘটনাবলীর শেষে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।"

শা'বী কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলীকে নিজের কাছে বসানোর উপযুক্ত মনে না করায় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, "অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের সহচরত্ব গ্রহণ করবে না এবং তাদের থেকে দূরে থাকবে। কারণ তারা সুসভ্য ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের ধ্বংস করে ফেলে।" মুবাররদ বলেন, হযরত আলীর তলোয়ারে তার স্বরচিত এ কবিতাটি খোদাই করে লিখা ছিল – "দুনিয়া লোভ ও লালসার মোড়কে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়। একে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলে সে তোমাকে বিষণ্ন করে তুলবে। পৃথিবীতে অনেক ঝগড়াটে লোক রয়েছে পৃথিবী যাদেরকে কোনো দিন ছেড়ে যাবে না। আর এমন হতদরিদ্র লোক রয়েছে দুনিয়া যাদেরকে সংকীর্ণতায় ভরে দিয়েছে। আকল দ্বারা রিযিক অর্জিত হয় না। রিযিক না দিলেও রুজির সন্ধান দেয়া হয়। আর যদি রুজি পেশীশক্তি দ্বারা অর্জিত হতো তাহলে পক্ষীকুল রুজি-রোজগার করে আকাশেই উড়ত।"

আরেক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন, "নিজের গোপন রহস্য কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। কারণ প্রতিটি ভালো ইচ্ছার জন্য রয়েছে উচ্চাভিলাষ। আর আমি অনেক পথভ্রষ্টকে দেখেছি যারা চামড়া যথাযথ রাখে না।"

উকবা বিন আবী সবহা বর্ণনা করেন, ইবনে বালহাম কর্তৃক হযরত আলী (রা.) গুরুতর আহত হলে খবর পেয়ে হযরত হাসান (রা.) কাঁদতে কাঁদতে এলে তিনি বললেন, বৎস! আটটি বিষয় খুব ভালো করে স্মরণ রাখবে। হযরত হাসান (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়গুলো কি? তিনি বললেন –

১। তুমি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ।

২। তুমি সবচেয়ে বড় হতদরিদ্র।

৩। তুমি সবচেয়ে বেশি কঠোর।

৪। তুমি সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী।

হযরত হাসান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আর চারটি বিষয় কি? তিনি বললেন -

১। নির্বোধ থেকে দূরে থাকবে। কারণ তার কাছ থেকে লাভের আসা করলে সে তোমার অনিষ্ট করবে।

২। মিথ্যা বর্জন করবে। কারণ মিথ্যা শত্রুকে মিত্রে এবং মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করে।

৩। কৃপণতা থেকে পলায়ন করবে। কারণ প্রয়োজনের সময় সে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

৪। অসৎ লোকদের থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ সে তোমার সর্বস্ব বিক্রয় করে দিবে।

ইবনে আসাকির (রহ.) বর্ণনা করেন, আমাদের প্রতিপালক কখন থেকে আছেন- জনৈক ইহুদীর এ প্রশ্ন শুনে ক্রোধে হযরত আলীর চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমাদের প্রতিপালক এমন সত্তা নন, যিনি পূর্বে ছিলেন না, অথচ আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এমন এক পবিত্র সত্তা যিনি সর্বদা বিরাজমান। তিনি অদৃশ্য ও নিরাকার। তাঁর কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। সকল শেষ তাঁর পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি সকল সমাপ্তির পরিসমাপ্তি। একথা শুনে ইহুদী মুসলমান হয়ে যায়।

দারাজ শুরাইহ্ কাজী থেকে বর্ণনা করেন, জঙ্গে সিফ্‌ফিনের যাত্রার সময় হযরত আলীর বর্শাখানা হারিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে কুফায় এসে এক ইহুদীর হাতে হারিয়ে যাওয়া বর্শাটি দেখে তিনি বললেন, এ বর্শাখানা আমার। আমি এটি বিক্রি করিনি এবং কাউকে দানও করেনি। তাহলে বর্শাটি তোমার হস্তগত হল কিভাবে? ইহুদী বলল, এটি আমার এবং আমার হিফাজতেই আছে। তিনি বললেন, আমি বিচারপতির নিকট এর বিচার প্রার্থনা করব। এজন্য হযরত আলী (রা.) বিচারপতি শুরাইহ্ এর নিকট গিয়ে বসলেন এবং বললেন, যদি আমার বিরোধী ইহুদী না হতো তবে আমি তাঁর মতোই আদালতে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের নিকৃষ্ট মনে করেন। অতএব তোমরাও তাদেরকে জঘন্য মনে করবে। বিচারপতি বললেন, আপনার অভিযোগ কি? তিনি বিষয়টি বললেন, বিচারপতি হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির প্রেক্ষিতে ইহুদীকে তার বক্তব্য তুলে ধরতে বললেন। ইহুদী পূর্বের কথাই পুনর্ব্যক্ত করল। বিচারপতি বললেন, আমিরুল মোমেনীন! আপনার সাক্ষী কে? তিনি স্বীয় গোলাম কিনবার এবং পুত্র হযরত হাসানকে পেশ করলেন। বিচারপতি বললেন, পিতার জন্য ছেলের সাক্ষ্য বৈধ নয়। হযরত আলী (রা.) বললেন, জান্নাতবাসীর সাক্ষ্যও কি অবৈধ? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হাসান এবং হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার। এ পর্যন্ত ন্যায় বিচারের অনুপম দৃষ্টান্ত অবলোকনে চিৎকার করে ইহুদী বলে উঠল, হে আমিরুল মোমেনীন! নিশ্চয়ই আপনি মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি। এরপরও আপনি আমাকে বিচারকের নিকট এনেছেন। বিচার চলাকালে বিচারপতিকে সাধারণ জনগণের মতোই আপনার সাথে অভিন্ন আচরণ করতে দেখে আমি বিমোহিত। আপনার ইসলাম সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা আপনার বর্শা। আমি মুসলামন হয়ে যাব।

কুরআনের তাফসীর

ইবনে সাদ কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল (আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট), আয়াতটি কোথায় এবং কার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা আমার জানা রয়েছে। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা এবং ভাষা দান করেছেন।

ইবনে সাদ প্রমুখ আবু তোফায়েলের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, কুরআন শরীফ সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আমার অবগতির বাইরে এমন কোনো আয়াত নেই। আমি বলতে পারবো আয়াতটি রাতে না দিনে, ময়দানে না পাহাড়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে আবু দাউদ মুহাম্মাদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাইআত গ্রহণে বিলম্ব করায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, তুমি কি আমার বাইআত সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে আছো? হযরত আলী (রা.) বললেন না তবে কুরআন শরীফকে জমা না করা পর্যন্ত নামায ছাড়া কোনো সময় চাদর পরব না বলে কসম করেছি। কুরআন শরীফ যে ক্রমধারায় অবতীর্ণ হয়েছে সে ধারাবাহিকতায় আপনি কুরআন শরীফের বিন্যাস করবেন বলে লোকদের ধারণা।

বিজ্ঞচিত উক্তি ও বাণী

হযরত আলী (রা.) বলেন, বেশি হুঁশিয়ারী খারাপ ধারণার জন্ম দেয়। (ইবনে হাব্বান)

তিনি বলেন, ভালোবাসা দূরের মানুষকে কাছে টেনে নেয়। আর শত্রুতা আপনকে পর করে দেয়। হাত শরীরের সবচেয়ে নিকটবর্তী অঙ্গ। তবে হাতে পচন ধরলে তা কেটে শরীর থেকে পৃথক করে দিতে হয়। (আবু নুয়াঈম)

তিনি বলেন, আমার পাঁচটি কথা স্মরণ রাখবে –

১। মানুষকে গুনাহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভয় দেখাবে না।

২। আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট কোন প্রত্যাশা করবে না।

৩। অজানা বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য লজ্জাবোধ করবে না।

৪। কোনো আলেম ব্যক্তি তার অজানা মাসয়ালা জেনে নিতে ইতস্তত করবে না। আর কেউ যদি অজ্ঞাত মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে, এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বেশি অবগত।

৫। ধৈর্য এবং বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত হলো যথাক্রমে মাথা ও শরীরের অনুরূপ। যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে তখন বিশ্বাসের মধ্যে কমতি আসবে। আর মাথা চলে

গেলে শরীরের কি মূল্য। (ইবনে মানসুর)

তিনি বলেন, ফকীহে কামেল (শরীয়তের আইন বিশেষজ্ঞ) সেই ব্যক্তি যিনি লোকদের আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, লোকদের গুনাহ করার অবকাশ দেয় না, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, লোকদের গুনাহ করার অবকাশ দেয় না, আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে যায় না এবং কুরআন শরীফের প্রতি লোকদের বিরুক্তি জন্ম দেয় না। যে জ্ঞানকে ভালোভাবে অনুধাবন করবে না সে জ্ঞানের বাতায়ন উন্মোচিত করতে পারবে না, আর যে চিন্তার জগতে বিচরণ করে না তার সামনে লেখাপড়ার তোরণ অবারিত হয় না। (আবুস সারীস)

তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়তম, যে আমাকে ঐ প্রশ্ন করবে যা আমার জানা নেই, আর সে প্রেক্ষিতে আমি বলবো, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। (ইবনে আসাকির)

তিনি বলেন, যে লোকদের সাথে ন্যায় ও সততাপূর্ণ আচরণ করতে চায় সে যেন নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা অপরের জন্যও ভালো মনে করে। (ইবনে আসাকির)

তিনি বলেন, সাতটি বিষয় শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্ট-

১। অত্যধিক ক্রোধ।

২। বেশি বেশি হাঁচি দেয়া।

৩। ঘনঘন হাই তোলন।

৪। অতিরিক্ত বমন করা।

৫। গ্রীষ্মকালে নাক দিয়ে রক্ত ক্ষরণ।

৬। অতিরিক্ত পেশাব-পায়খানা হওয়া।

৭। আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণের সময় নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়া।

তিনি বলেন, ডালিমের ভেতরের দানার সাথে যুক্ত জালীটি খেয়ে ফেলবে। কারণ তা পাকস্থলির জন্য শক্তিদায়ক। (আব্দুল্লাহ বিন আহমদ)

তিনি বলেন, এমন যুগ আসবে যখন গোলামের চেয়েও মোমেনের মর্যাদা কম হবে। (সাদ বিন মানসুর)

তিনি বলেন, তুমি আলেমকে শোনাবে অথবা শুনবে-উভয়টি সমান। (হাকেম, তারীখ)

হযরত আলীর খিলাফতকালে হুযাইফা বিন ইয়ামন, যুবায়ের বিন আওয়াম, তলহা, যায়েদ বিন সুহান, সালমান ফারসী, হিন্দ বিন আবু হালা, ওয়াইস কারনী, জনাব বিন আল আরত, আম্মার বিন ইয়াসার, সহল বিন হানীফ, তামীম দারমী, খাওয়াত বিন জাবীর, শারজীল বিন আস-সমত, আবু মায়াসারা আল বদরী,

সাফওয়ান বিন উসাল, আমর বিন আবনাস, হিশাম বিন হাকীম, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুক্তদাস আবু রাফে প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত হাসান বিন আলী (রা.)

হাসান বিন আলী বিন আবু তালিব, আবু মুহাম্মাদ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র এবং নয়নমণি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী তিনি শেষ খলীফা। ইবনে সাদ ইমরান বিন সালমান থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হাসান এবং হযরত হোসেন জান্নাতী। অন্ধকার যুগে কেউ এ দুটি নাম রাখেনি।

হযরত হাসান ৩য় হিজরীর রমযান মাসের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং তাঁর পুত্র আদাহ, আবুল হাওরা, রাবীআ বিন শিবান, শাবী প্রমুখ তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি দেখতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতোই ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর নাম হাসান রেখেছিলেন। সপ্তম দিনে আকীকা করেন এবং মাথা নেড়া করে চুলের পরিমাণ রূপা সদকা করার নির্দেশ দেন। হযরত হাসান রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পঞ্চম ব্যক্তি।

আসাকির বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এ নামের ব্যবহার ছিল না। মুফাস্‌সাল বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাসান এবং হুসাইন এ দুটি নাম পছন্দ করায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দুটি নাম নাতিদ্বয়ের জন্য নির্বাচন করেন।

ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারার সাথে অধিক মিল হযরত হাসান (রা.) ছাড়া আর কারো ছিল না। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখলাম তিনি হযরত হাসানকে কাঁধে নিয়ে বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, আপনিও ভালোবাসুন।

বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মিম্বর অলংকৃত করে উপবেশন করেছিলেন। তাঁর পার্শ্বে হযরত হাসান (রা.) বসেছিলেন। তিনি একবার লোকদের প্রতি ও একবার হযরত হাসানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছিলেন, এ আমার দৌহিত্র নেতা এবং মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবে।

ইমাম বুখারী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হাসান এবং হুসাইন আমার দুনিয়ার ফুল। তিরমিযী এবং হাকেম আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেন, হাসান এবং হুসাইন জান্নাতে যুবকদের সরদার।

ইমাম তিরমিযী উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইনকে কাঁধে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! এরা উভয়ে আমার দৌহিত্র এবং ঐশ্বর্য। আমি তাদের ভালোবাসি, আপনিও তাদের ভালোবাসুন। উপরন্তু যারা তাকে ভালোবাসে আপনিও তাদের ভালোবাসুন।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জৈনক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আহলে বাইতদের মধ্যে আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? তিনি (সা.) বললেন, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন।

হাকেম ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসানকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এ দৃশ্য দেখে এক লোক বলল, হে ছেলে! তুমি কতই না সুন্দর বাহন পেয়েছ। নবী করীম (সা.) বললেন, আরোহীও দারুণ চমৎকার। ইবনে সাদ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রা.) আহলে বাইতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুরূপ দেখতে। তিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেজদায় গেলে হযরত হাসান তাঁর পিঠে উঠে বসলেন। নিজে না নামা পর্যন্ত তিনি সেজদাতেই ছিলেন।

ইবনে সাদ আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসানের সামনে নিজের জিহ্বা বের করতেন, আর হযরত হাসান জিহবার লাল অংশ দেখে হাসতেন এবং খুশি হতেন।

হাকেম যহীর বিন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত হাসান (রা.) বক্তৃতা দানকালে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, একদিন হযরত (সা.) হযরত হাসানকে কোলে নিয়ে বলেন, যে আমাকে ভালোবাসবে সে হাসানকেও ভালোবাসবে। যারা উপস্থিত আছ তারা যারা উপস্থিত নেই তাদেরকে এ সংবাদ পৌছে দিবে। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদার সাথে এর সংযুক্তি না থাকত তবে এটি বর্ণনা করতাম না।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর অনুপম প্রশংসা ও মর্যাদার বিবরণ অনেক ও অপার। মোটকথা, তিনি সহনশীল, পদমর্যাদাশীল, শান্ত, মহৎ এবং উঁচু মাপের দানশীল। তিনি সংঘাত ও সংঘর্ষকে খারাপ মনে করতেন। তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তিনি মানুষকে এমনভাবে দান করতেন যে, একেক জনকে লাখ লাখ দেরহাম দিতেন।

হাকেম আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ভৃত্য-অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে উটের বহর নিয়ে পঁচিশ বার হজ্জ করেন।

ইবনে সাদ উমায়ের বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, আমি হযরত হাসানের কথায় যে মিষ্টতা রয়েছে তা অন্যের কথায় কোনোদিন খুঁজে পাইনি। তাঁর

আলাপচারিতার সময় মন চাইত এ কথোপকথন যেন শেষ না হয়। আমি তাঁর মুখে কোনোদিন কোনো কটু কথা শুনেনি। একবার তাঁর সাথে আমর বিন উসমানের জমি সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলে তিনি তাকে জমি ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন, কিন্তু আমর বিন উসমান তা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি বললেন, তার চেহারা ধুলাময় হবে- এটাই ছিল হযরত হাসানের মুখনিসৃত কঠোর ভাষা।

ইবনে সাদ উমায়ের বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, মারওয়ান গভর্নর হওয়ার পর প্রতি জুমআর পর প্রতি জুমআর খুতবায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলীর সমালোচনা করতেন। হযরত হাসান শুনেও এর কোনো জবাব দিতেন না। একদিন মারওয়ান তার নিকট বলে পাঠালেন যে, আলী এমন, ওমন ইত্যাদি। তিনি বার্তাবাহককে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে গালি দিয়ে তার গুনাহ লাঘব করব না। একদিন আমরা উভয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হব। যদি তিনি সত্যবাদী হন তাহলে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হব। যদি তিনি সত্যবাদী হন তাহলে আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর কথা মিথ্যা হলে তিনিই শক্তিধর প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ইবনে সাদ বাযীক বিন সাওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, একদিন মারওয়ান হযরত হাসানের সামনে তাকে গালি দেন। কিন্তু তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন। ঠিক সে সময় মারওয়ানকে ডান হাতে নাক পরিষ্কার করতে দেখে হযরত হাসান (রা.) বললেন, আফসোস, আপনার সাধারণ এ বোধটুকুও নেই যে, ডান হাত মুখের জন্য, আর বাম হাত অপবিত্রতার জন্য। একথা শুনে মারওয়ান নিশ্চুপ হয়ে যান।

ইবনে সাদ আশআস বিন সাওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, জৈনক ব্যক্তি হযরত হাসানের কাছে এসে বসলে পর তিনি তাকে বললেন, আপনি এমন মুহূর্তে এলেন যখন আমার যাবার সময় হয়েছে। যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে আমি প্রস্থান করব।

ইবনে সাদ আলী বিন যায়েদ বিন জিদআন থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান (রা.) দুবার তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। আর তিনবার অর্ধেক সম্পদ দান করেন। এমনকি দান করার সময় দুটি জুতার মধ্যে একটি এবং দুটি মুজার মধ্যে একটিও দান করেন।

ইবনে আসাকির জুয়াইরিয়া বিন আসমা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম হাসান (রা.) ইন্তেকাল করার পর মারওয়ান তাঁর জানাযায় এসে কাঁদতে আরম্ভ করায় হযরত ইমাম হুসাইন তাকে বললেন, আপনি আজ কাঁদছেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আপনি কিনা করেছেন। মারওয়ান বললেন, আপনিও জানেন আমি তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছি। কিন্তু তিনি ছিলেন ধৈর্যের দিক থেকে পাহাড়ের চেয়েও বেশি অবিচল।

ইবনে আসাকির মুবারদ থেকে বর্ণনা করেন, জৈনক ব্যক্তি তাকে বললেন, আবু যর (রা.) এ কথা বলেছেন যে, দরিদ্রতাকে প্রাচুর্যতা থেকে এবং রুগ্নতাকে সুস্থতা থেকে ভালো মনে করি। তিনি বললেন, আবু যরের উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। আর আমি বলব, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত প্রতিটি অবস্থায়ই আমার কাম্য। এতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত হয়।

হযরত ইমাম হাসানের সম্মানিত পিতা হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাত লাভের পর তিনি ছয় মাস খিলাফতের তখত অলংকৃত করেন। তাঁর নিকট কুফাবাসী বাইআত করেছিল। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রা.) লড়াই করতে এলে তিনি এ শর্তে খিলাফতের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন যে, তোমার পর খিলাফত আমার অধীনে থাকবে। হযরত মুআবিয়ার (রা.) এ শর্ত গ্রহণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সূত্রে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, আমার এ দৌহিত্র (হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (রা.) মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে সন্ধি করবেন।

তিনি রবিউল আউয়াল মাসে আবার কারো মতে ৪১ হিজরীর রবিউস সানী মাসে খিলাফতের মসনদ বর্জন করেন। বন্ধু মহল তাঁকে - غـار المؤ مـنـين (মুমিনদের মধ্যে লজ্জাশীল ব্যক্তি) বলে সম্বোধন করতো। তিনি বলেন, আর (লজ্জা) শব্দটি 'নার' (অগ্নি) শব্দ থেকে শ্রেয়। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, اَلسَّـــلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مُـــذِلُّ الْمُؤْمِـنِـيْنَ (হে মুসলমানদের অপমানকারী! আপনার প্রতি সালাম)। এ প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের অপমানকারী নই। আমি তোমাদেরকে রাজত্বের জন্য যুদ্ধ এবং হত্যার দিকে ঠেলে দেয়াকে জঘন্য কাজ মনে করি। অতঃপর তিনি কুফা ছেড়ে মদীনা শরীফে চলে আসেন এবং এখানেই বসবাস করেন।

হাকেম জাবের বিন নাযীর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন আবার খিলাফতের কামনা করছেন? তিনি বললেন, যখন আরবের লোকদের মস্তকগুলো আমার হাতের মুঠোয় ছিল, আমি চাইলে তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম, তখন আমি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খিলাফত ত্যাগ করেছি এবং লোকদের রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করানো থেকে পৃথক হয়ে গেছি। তো আজ হিজাযবাসীর বিষণ্নতা ও মুসিবতগ্রস্ততার কারণে কেন তা গ্রহণ করতে যাব?

হযরত হাসানের স্ত্রী জাআদ বিনতে আশআছ বিন কায়েসকে মদীনায় ইয়াযিদ গোপনে এ প্রস্তাব দেয় যে, ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করতে পারলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। সে ধোঁকায় পড়ে তাঁকে ভিষ খাওয়ায়। ফলে তিনি ৪৯ হিজরী কারো মতে ৫০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের পাঁচ তারিখে বিষক্রিয়ায়

আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত লাভ করেন। তিনি শহীদ হওয়ার পর ঘাতক ইয়াযিদকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলো, যে নারী ইমাম হাসানের সংসার ভেঙ্গেছে আমি তাকে নিজের জন্য কিভাবে গ্রহণ করব?

তাঁর ইন্তেকালের সময় হযরত ইমাম হুসাইন বারবার বিষ প্রয়োগকারীর নাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আমার সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আর সে যদি হত্যাকারী না হয় তাহলে কেন আমি তাকে হত্যা করাব।

ইবনে সাদ ইমরান বিন আব্দুল্লাহ বিন তলহা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন তাঁর দু'চোখের মাঝে লিখা রয়েছে - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিনি এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে পরিবারের সদস্যরা আনন্দিত হন। কিন্তু সাইদ বিন মুসায়েব (রা.) স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, স্বপ্ন যদি সত্য হয় তবে আপনি আর অল্প দিন জীবিত থাকবেন। পরবর্তীতে সেটাই ঘটেছিল।

বায়হাকী এবং ইবনে আসাকির হিশামের পিতার বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে বার্ষিক ভাতা হিসেবে এক লাখ দেরহাম দিতেন। এক বছর তিনি তা বন্ধ করে দেন। ফলে তিনি অর্থ-সংকটে পড়লে তাঁর নিকট পত্র লিখার জন্য কলম কাগজ চাইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি আর পত্র লিখলেন না। সে রাতেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি হযরত হাসান (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছো? তিনি ভালো আছি বলে অর্থনৈতিক দৈন্যতার অভিযোগ পেশ করলে নবী করীম (সা.) এ দোআ পাঠ করতে বললেন -

اللهم اقذف فى قلبى رجاءك واقطع رجائى عمن سواك حتى لا ارجوا احدا غيرك - اللهم وما ضعفت عنه قوتى وقصر عنه عملى ولم تنته اليه رغبتى ولم تبلغه مسألتى ولم يجر على لسانى مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصنى به يا رب العالمين-

হিশামের পিতা বলেন, তিনি এ দোআ পড়তে আরম্ভ করলে এক সপ্তাহের মধ্যে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) পনেরো লাখ দেরহাম তাঁর নিকটে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি বলেন, সেই প্রতিপালকের শুকর যিনি তাঁর স্মরণকারীকে ভুলে যান না এবং প্রার্থনাকারীকে নিরাশ করেন না। অতঃপর তিনি আবার হযরত মুহাম্মাদ

(সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী আকরাম (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হাসান! এখন কেমন আছ? তিনি বললেন, ভালো। আমীর মুআবিয়া পনেরো লাখ দেরহাম পাঠিয়েছেন। হুযূর (সা.) বললেন, সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করা এবং মানুষের নিকট ভিক্ষা না করার প্রতিফল এটি।

তৌরিয়াত গ্রন্থে সালীম বিন ঈসা কারী কুফী হতে বর্ণিত রয়েছে, মৃত্যুর সময় হযরত ইমাম হাসান (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বললেন, ভাই, আপনি কেন বিচলিত হবেন। আপনি তো নানা রাসূলুল্লাহ (সা.), বাবা হযরত আলী (রা.), নানী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.), মা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রা.), মামা হযরত কাসেম (রা.) এবং হযরত তাহের (রা.), চাচা হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত জাফর (রা.)-এর নিকট গমন করছেন। হযরত হাসান (রা.) বললেন, ভাই হুসাইন! আমি এমন স্থানে গমন করছি ইতোপূর্বে যেখানে যাইনি। আর আমি এমন মানুষদের দেখেছি যাদেরকে ইতোপূর্বে দেখিনি।

আব্দুল্লাহ বিভিন্ন সূত্রে কয়েকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান (রা.) মৃত্যুর প্রাক্কালে হযরত হুসাইন (রা.) কে বলেন, হুযূর (সা.)-এর পর তোমার পিতা খিলাফত কামনা করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত প্রাপ্ত হন। অতঃপর হযরত উমর (রা.) খলীফা হন। তারপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আলোচকগণ এবার হযরত আলী (রা.) কে বাদ দিবেন না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) খলীফা হয়ে যান। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) খলীফা হলে উভয় পক্ষ থেকে তলোয়ার নিষ্কোশিত হয়। এতে আমি বুঝে গেছি, আমাদের বংশে খিলাফত এবং নবুওয়াত একত্রে জমা হবে না। সুতরাং খিলাফতের জন্য কুফার নির্বোধ লোকেরা তোমাকে যেন বের না করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্শ্বে আমাকে সমাহিত করার জায়গা দানের জন্য হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট আবেদন করলে তিনি তা মঞ্জুরকরত : বলেন, আপনার মৃত্যুর সময় আমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, কিন্তু আমার মন বলছে তাঁকে পূর্বের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অন্যরা সেই জায়গা দানে বাধ দিবে। যদি তারা সেখানে আমাকে কবর দিতে বাধা দেয় তাহলে জেদাজেদি করবে না। হযরত ইমাম হাসানের ইন্তেকালের পর হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট গমন করেন এবং তিনি অনুমতি দেন, কিন্তু মারওয়ান বাধা দেয়। ফলে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এবং তাঁর সহচরবৃন্দ তলোয়ার উত্তোলন করলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইমাম হাসানের ওসীয়ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংঘাতে যেতে নিষেধ করেন। অবশেষে হযরত ইমাম হাসানকে হযরত ফাতেমার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান সখর বিন হরব বিন উমাইয়া বিন আব্দুশ শামস বিন আব্দে মানাফ বিন কুৎসী আল উমুরী আবু আঃ রহমান। পিতা আবু সুফিয়ান এবং তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় মুআল্লাফাতুল কুলুব ছিলেন, পরবর্তীতে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন। হযরত মুআবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কেরানী ছিলেন। তিনি ১৬৩টি হাদীস নবীজী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনেক সাহাবী যেমন ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, আবুদ দারদা, জারীরুল বিজলী, নো'মান বিন বশীর প্রমুখ এবং তাবেয়ীদের মধ্যে যেমন ইবনুল মুসায়েব, হুমায়েদ বিন আঃ রহমান প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সমসাময়িক যুগে বুদ্ধিমান, আলেম এবং বীরত্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মর্যাদা সম্বলিত অনেক হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফে আব্দুর রহমান বিন আবু উমাইর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমীর মুআবিয়ার ক্ষেত্রে বলেছেন, হে আল্লাহ! মুআবিয়াকে হিদায়াত প্রাপ্তকারী এবং হিদায়েতদানকারী হিসেবে বানিয়ে দাও। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আহমদ 'মুসনাদ' গ্রন্থে আরবাস বিন সারিয়া থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! মুআবিয়াকে হিসাব কিতাব শিক্ষা দাও এবং তাকে আযাব থেকে হেফাযত করো।

আবু শায়বা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং তাবারানী 'কবীর' গ্রন্থে আব্দুল মালিক বিন উমায়ের থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, আমি সে সময় থেকে খিলাফতের আশা পোষণ করে আসছি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, মুআবিয়া! তুমি বাদশাহ হলে লোকদের নিকট খুব ভালোভাবে উপস্থাপিত হবে।

হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) শারীরিক উচ্চতাসম্পন্ন এবং সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে দেখে বলতেন, এ আরবের কিসরা (পারস্য সম্রাট)। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়াকে খারাপ ভেবো না। তাঁর অন্তর্ধানে দেখবে অনেক মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মুকবিরী বলেন, আশ্চর্য লোকেরা কিসরা এবং কায়সারের আলোচনায় মগ্ন, কিন্তু তারা মুআবিয়ার কথা ভুলে গেছে। আমীর মুআবিয়ার দয়াদ্রতা ছিল উপমাহীন। তার নম্রতাওছিল উপমাহীন। ইবনে আবীদ দুনিয়া এবং আবু বকর বিন আবু আসেম তাঁর নম্রতার উপর পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইবনে আউফ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আমীর মুআবিয়াকে বলল, মুআবিয়া (রা.) তুমি সোজা হয়ে যাও, অন্যথায় আমি তোমাকে সোজা করব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে সোজা করতে পারো? সে বলল, কাষ্ঠ আঘাতে। তিনি বললেন, সে সময় ঠিকই সোজা হয়ে যাবো।

কাবিসা বিন জাবের বলেন, আমি অনেক দিন তাঁর সাহচর্যে থেকে দেখেছি তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী, ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমান দেখিনি।

হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রা.) সিরিয়ায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণের সময় আমীর মুআবিয়া (রা.) স্বীয় ভ্রাতা ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে সিরিয়ায় গমন করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর স্থানে মুআবিয়ার নাম ঘোষণা করেন। অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁকে অপরিবর্তিত রাখেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর যুগে তিনি গোটা সিরিয়ার গভর্নরের পদ অলংকৃত করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ বছর আমীর এবং বিশ বছর খলীফার তখ্ত শোভিত করেন।

কা'বে আহবার (রহ:) বলেন, এ উম্মত আমীর মুআবিয়ার চেয়ে দীর্ঘ শাসন প্রত্যক্ষ করেনি। যাহাবী (রহ:) বলেন, আমীর মুআবিয়ার খিলাফতের আগেই কাব আহবারের মৃত্যু হয়। কা'ব স্বীকার করেন, তাঁর একাধারে বিশ বছর খিলাফতকালে কোথাও' কোনো গভর্নর অথবা স্থানীয় প্রশাসক বিদ্রোহ করেননি। যেমন তাঁর পরবর্তীতে অন্য খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। আর এতে করে অনেক জনপদ তাদের হাত ছাড়া হয়েছে।

হযরত আমীর মুআবিযা (রা.) হযরত আলী (রা.) -এর উপর নিজের নাম খলীফা রাখেন। এভাবে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর উপরও প্রস্থান করেন। এজন্য হযরত ইমাম হাসান (রা.) পৃথক হয়ে যান, ফলে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) ৪১ হিজরীর রবিউস সানী অথবা জমাদিউল আউয়াল মাসে মসনদে আরোহণ করেন। একজন খলীফার ব্যাপারে উম্মতের ইজমার কারণে এ বর্ষকে 'সালে জ মাআত' নামে অভিহিত করা হয়।

৪১ হিজরীতে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) মারওয়ান বিন হাকামকে মদীনা শরীফের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ৪৩ হিজরীতে রাহাজ শহর সিজিসতান থেকে দাওয়ান বারাকা থেকে এবং কূমী শহর সুদান থেকে বিজয় লাভ করে। এ বছর তিনি স্বীয় ভ্রাতা যিয়াদকে নিজের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করলে সর্বপ্রথম বিবাদের সূচনা হয়, যা নবী (সা.)-এর নির্দেশের বৈপরিত্য সৃষ্টি করে। ৪৫ হিজরীতে কায়কাহন এবং ৫০ হিজরীতে কুহিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়। সে বছরেই

আমীর মুআবিয়া নিজের ছেলে ইয়াযিদের জন্য পরবর্তী খলীফা হিসেবে সিরিয়াবাসীর নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম সেই ব্যক্তি বেঁচে থাকা অবস্থায় নিজের ছেলের জন্য বাইআত গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আমীর মুআবিয়া (রা.) মদীনাবাসীর নিকট থেকে ইয়াযিদের জন্য বাইআত গ্রহণ করতে মারওয়ানের প্রতি লিখিত ফরমান পাঠালেন। সুতরাং মারওয়ান খুতবার মধ্যে বললেন, খলীফার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে আমি তাঁর ছেলে ইয়াযিদের জন্য আপনাদের নিকট থেকে আবু বকর এবং উমরের রীতিনীতি অনুযায়ী বাইআত নিব। সঙ্গে সঙ্গে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) প্রতিবাদ করে বললেন, না না; বরং তা কেসরা ও কায়সারের রীতিনীতি। কারণ আবু বকর এবং উমর (রা.) নিজের সন্তানাদি এবং পরিবার-পরিজনের জন্য কখনো কারও নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করেননি।

৫১ হিজরীতে হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) হজ্জ পালন করেন এবং ইয়াযিদের জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। তিনি ইবনে উমর (রা.) কে ডেকে বললেন, একদিন তুমি আমার নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিলে, কিন্তু আজ আমার খিলাফত সম্পর্কে জনসাধারণ্যে সংশয়ের বীজ বপন করছ। ইবনে উমর (রা.) হামদ এবং সানার পর বললেন, আপনার আগের খলীফাবৃন্দের পুত্র সন্তান ছিল, যাঁদের থেকে আপনার ছেলে কোনো দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ নয়। তথাপি পূর্ববর্তী খলীফাবৃন্দ নিজ সন্তানদের কখনও ক্ষমতার উত্তরাধিকার করেননি; বরং তারা বিষয়টি জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করেছেন। আপনিও সেভাবে ইজমা করুন আমি ইজমাকারীদের একজন। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, আমি মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছি, অথচ আমি তা করিনি। এ বলে তিনি চলে গেলেন।

অতঃপর তিনি ইবনে আবু বকর (রা:) কে ডেকে একই বিষয় উত্থাপন করলে ইবনে আবু বকর (রা.) মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আপনি কি মনে করেছেন এ কাজের জন্য আমরা আপনাকে প্রতিনিধি বানিয়েছি? আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজের জন্য আপনাকে নেতা মনোনীত করিনি। আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজের জন্য আপনাকে নেতা মনোনীত করিনি। আল্লাহর কসম! আমরা চাই এ বিষয়টি সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শূরার (কমিটি) নিকট ন্যস্ত করতে, অন্যথায় আমরা প্রতারিত হয়ে বিষয়টি খারাপ করে দিব। এ বলে তিনিও প্রস্থান করলেন।

ইবনে আবু বকর (রা.) গমনকালে আমীর মুআবিয়া (রা.) প্রথমে এ বলে

দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ! এ লোকের অনিষ্ট থেকে তুমি যেভাবেই হোক আমাকে রক্ষা করো।" অতঃপর আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তুমি কাজের মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করে এ সংবাদ সিরিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়ো না। তারা যেন তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে কিছু না করতে পারে। আমি চাই তোমরা ইয়াযিদের জন্য বাইআত করেছ - এ খবর সিরিয়ায় পৌছে দিতে।

এরপর হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) কে ডেকে বললেন, হে যুবায়েরের ছেলে! তুমি তো খেঁকশিয়ালের মত এক ক্ষেত থেকে বের হয়ে আরেক ক্ষেতে গিয়ে লুকাও। তুমি ওদের কানে (ইবনে উমর (রা.) এবং ইবনে আবু বকর (রা.)) কোন বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছ, যা তাঁদেরকে বাইআত গ্রহণে বিরত রেখেছে। ইবনে যুবায়ের (রা.) বললেন, আপনি খিলাফত সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হলে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। আমরা আপনার ছেলের হাতেই বাইআত গ্রহণ করবো। আপনিই বলুন আমরা আপনার বাইআত না আপনার ছেলের বাইআতের আনুগত্য করবো? একই যুগে দুই বাদশাহর বাইআত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

তারপর হযরত আমীর মুআবিয়া মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও নাতের পর : বললেন, আমি অপরিপক্ক লোকদের বলতে শুনেছি, ইবনে উমর (রা.) ইবনে আবু বকর (রা.) এবং ইবনে যুবায়ের (রা.) কখনো ইয়াযিদের বাইআত গ্রহণ করবে না। বস্তুত, তারা ইয়াযিদের ইতাআত ও বাইআত সবই করেছে। এ কথা শুনে সিরিয়াবাসী বলল, আল্লাহর কসম! তারা আমাদের সামনে বাইআত গ্রহণ না করলে আমরাও বাইআত করবো না। আর তারা বাইআত করতে অস্বীকার করলে আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিব। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, সুবহান আল্লাহ, আল্লাহর কসম! ইতোপূর্বে তোমাদের মুখে কুরাইশদের শানে দৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি আর কখনো শুনিনি। এ বলে তিনি নিচে নেমে এলেন। অতঃপর লোকেরা ইবনে উমর, ইবনে আবু বকর এবং ইবনে যুবায়ের (রা.) কর্তৃক ইয়াযিদের বাইআত গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করছিল; অথচ তারা তার বাইইতের বিষয়টি সবসময় প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমীর মুআবিয়া (রা.) হজ্জ শেষে সিরিয়ায় ফিরে যান।

ইবনে মানকাদর বলেন, ইয়াযিদের বাইআত গ্রহণের সময় ইবনে উমর (রা.) বলেছিলেন, সে যদি ভালো মানুষ হন তবে তার প্রতি সন্তুষ্ট, অন্যথায় বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করবো।

খারায়েতী 'হাওয়াতিফ' গ্রন্থে হুমায়েদ বিন ওহাবের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমীর মুআবিয়ার মা হিন্দা বিনতে উতবা বিন রবীআর প্রথমে ফাকা বিন মুগীরার সাথে বিয়ে হয়। ফাকার একটি বৈঠকখানা ছিল, এখানে অবাধে লোক যাতায়াত করতো। একদিন হিন্দা এবং ফাকা বৈঠকখানায় বসে ছিল। কিছুক্ষণ পর কোনো এক কাজে ফাকা উঠে যায়। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বৈঠকখানায় এসে একাকী নারীর উপস্থিতি দেখে প্রস্থানে উদ্যোত হয়। ঠিক এ মুহূর্তে ফাকা এসে বৈঠকখানা থেকে অপরিচিত লোক বের হতে দেখে হিন্দাকে আক্রমণ করে জানতে চায় ওর সাথে তার কি সম্পর্ক। হিন্দা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে ফাকা বলল, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

সংবাদটি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নিয়ে মানুষের মাঝে ব্যাপক কানাঘুষা আরম্ভ হয়। ফলে হিন্দার বাবা উতবা মেয়েকে বলল, আলোচনা সমালোচনায় লোকেরা কান ভারি করে ফেলেছে। তুমি আমাকে সত্য করে বল, যদি তোমার স্বামী সঠিক হয় তবে লোক নিয়োগ করে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে ইয়ামানের কোনো এক যাদুকরের কাছে বিষয়টি পেশ করবো। অতঃপর হিন্দা নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য জাহেলি যুগে যত কসম ছিল সব কসম করতে শুরু করল। এতে করে উতবার বিশ্বাস হয় যে, হিন্দা সতী। আর ফাকা তার মেয়ের প্রতি অপবাদ দিয়েছে। এজন্য উতবা নিজ গোত্রীয় লোকদের নিয়ে ইয়ামানে গমন করে। এদিকে ফাকাও বনু মাখযুম এবং উকবা বিন আব্দে মান্নাফ গোত্রের লোকদের নিয়ে ইয়ামানে যাত্রা করে। ইয়ামানের কাছাকাছি গিয়ে হিন্দার চেহারা ফেকাশে হয়ে গেলে উতবা বলল, এটাই প্রমাণ করে যে, তুমি অপরাধী। হিন্দা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বলল, আপনি আমাকে এমন লোকের নিকট নিয়ে যাচ্ছেন যার কথা সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। যদি সে আমাকে কুলটা বলে দেয় তবে আমি আর আরবে মুখ দেখাতে পারবো না। উতবা বলল, তোমার বিষয় উত্থাপন করার পূর্বে আমি তার পরীক্ষা নিবো। উত্তীর্ণ হলে তবেই তোমার বিষয়টি পেশ করবো, অন্যাথায় নয়।

উতবা ঘোড়ার কানে গমের একটি দানা দিয়ে কানের ছিদ্র বন্ধ করে দিল। ইয়ামানে পৌছার পর পশু যবেহ করে সম্মানের সাথে যাদুকরকে খাওয়ানোর পর উতবা বলল, আমি একটি গোপন বিষয় নিয়ে এসেছি, এরপূর্বে বলুন, আমি কি করেছি? সে ঘোড়ার কানে গম দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বলার পর

উতবা বলল, আপনি সঠিক বলেছেন। অতঃপর হিন্দার ব্যাপারে জানতে চাইলে সে অন্য এক রমণীর কাছে গিয়ে তার মাথার চুল ধরে বলল, দাঁড়িয়ে যা। এভাবে তিনবার করার পর হিন্দার নিকট এসে তার মাথায় হাত রেখে বলল, তুমি সতী ও পবিত্রা রমণী। তুমি যিনা করনি। মুআবিয়া নামে তোমার গর্ভে এক বাদশাহ জন্মগ্রহণ করবেন।

একথা শ্রবণে ফাকা হিন্দার হাত চেপে ধরে, কিন্তু সে তা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তুমি চলে যাও। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো আমার গর্ভের সম্ভাব্য বাদশাহ যেন তোমার ঔরস থেকে না হয়। এরপর হিন্দার সাথে আবু সুফিয়ানের বিয়ে হয় এবং আমীর মুআবিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) ৬০ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। বাবে জাবীয়া এবং বাবে সগীরের মধ্যবর্তীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কথিত আছে, তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কেশ এবং নখ ছিল। মৃত্যুর সময় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন সেগুলো যেন তাঁর চোখে এবং মুখে দিয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আমীর মুআবিয়ার জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র

ইবনে আবি শাইবা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে সাঈদ বিন জুমহানের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমি সাফীনাকে বললাম, বনূ উমাইয়া বলছে, খিলাফত তাদের বংশীয়। তিনি বললেন, সে সঠিক বলেনি। তিনি বাদশাহ, কঠোর বাদশাহ। আর সর্বপ্রথম বাদশাহ হলেন আমীর মুআবিয়া (রা.)।

বায়হাকী এবং ইবনে আসাকির ইবরাহীম বিন সুওয়াইদুল আরমানীর বরাত দিয়ে বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো, খলীফা কে কে? তিনি বললেন, আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আমি বললাম, আর মুআবিয়া? তিনি বললেন, হযরত আলীর যুগে খিলাফতের যোগ্য হযরত আলী (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সালাফী 'তৌরিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হযরত আলীর অনেক শত্রু ছিল। তারা সর্বদা তাঁর ভুল ত্রুটির অনুসন্ধান করতো। তাঁর কোনো দোষ-ত্রুটি না পেয়ে তার এমন লোকের কাছে

সমবেত হয়, যে আগে থেকেই হযরত আলীর ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করতো।

ইবনে আসাকির আব্দুল মালিক বিন উমায়ের (রহ:) থেকে বর্ণনা করেন, একদা জারিয়া বিন কুদামা সাদী আমীর মুআবিযার নিকট গেলে তিনি বললেন, তুমি কে? জারীয়া বললেন, আমি জারীয়া বিন কুদামা। তিনি বললেন, তুমি কি সৃষ্টি করতে চাও? তুমি তো মূল্যহীন মধুওয়ালা মাছি। জারীয়া বললেন, আপনি এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, সেই মাছির হুল অত্যন্ত শক্ত এবং মজবুত।

ফজল বিন সুওয়ায়েদ বলেন, জারীয়া বিন কুদামা হযরত আমীর মুআবিয়ার দরবারে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের (হযরত আলী) পক্ষ হতে এমন অগ্নি প্রজ্বলিত হবে, যা আরবের সকল জনপদকে ভস্মীভূত করে ফেলবে এবং রক্তের নদী প্রবাহিত করে দিবে। জারীয়া বললেন, হে মুআবিয়া! আপনি হযরত আলীর পিছু ছেড়ে দিন। আমরা যেদিন থেকে তাঁকে ভালোবেসেছি সেদিন থেকে আর তাঁকে অসন্তুষ্ট করিনি। যেদিন থেকে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছি সেদিন থেকে তাঁকে ধোঁকা দেইনি। হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, জারীয়া! তোমার ব্যাপারে দুঃখ হয়। তুমি তোমার বংশের বোঝা। যে তোমার নাম জারীয়া (বাঁদী) রেখেছে সে সার্থক। জারীয়া বললেন, হে মুআবিয়া! আপনিই সমাজের বোঝা। যে আপনার নাম মুআবিয়া (ঘেউ ঘেউকারী) রেখেছে সে ধন্য। তিনি বললেন, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। জারীয়া বললেন, আপনি তলোয়ারের শক্তি দিয়েও আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারেননি। আমরা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে আপনি জেঁকে বসেছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে আমরাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। শর্ত ভঙ্গ করলে আমরা বিকল্প পথ খুঁজবো। আমাদের সাথে অনেক সাহায্যকারী রয়েছে যাদের বর্ম খুব মজবুত এবং লোহার চেয়েও পরিপক্ক। আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমরা বিদ্রোহ করবো। অতঃপর আমাদের বিদ্রোহের স্বাদ আস্বাদন করবেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার মতো আর কাউকে যেন সৃষ্টি না করেন। আবু তোফায়েল আমের বিন ওয়াতালা সাহাবী বলেন, একদিন আমি হযরত মুআবিয়ার কাছে গেলে তিনি বললেন, তুমি কি উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের একজন? আমি বললাম, না, আমি উপস্থিত ছিলাম, তবে সাহায্য করিনি। তিনি বললেন, কে সাহায্য করতে তোমাকে নিবৃত্ত করেছে? আমি বললাম, মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে কেউ নয়। তিনি বললেন, লোকেরা সে প্রতিশোধ নেবার অধিকার সংরক্ষণ করে। আমি বললাম,

হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কেন সেদিন তাঁকে সাহায্য করেননি? অথচ সিরিয়াবাসী আপনার সাথে ছিল। তিনি বললেন, আমি তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি। আমি তার কথা শুনে হাসলাম এবং বললাম, হযরত উসমান (রা.) এবং আপনার দৃষ্টান্ত এ রকম যেরূপ কবি, বলেন, "এমনটা যেন না হয়ে যে, মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ করবে। আর জীবিত থাকা অবস্থায় আমার যা পাওনা ছিল তা বুঝিয়ে দিয়ো না।"

শা'বী (রা.) বলেন, আমীর মুআবিয়া (রা.) সর্বপ্রথম বসে খুতবা পাঠের প্রবর্তন করেন। কারণ সে সময় তিনি অনেক মোটা এবং পেট বড় হয়েছিল। (ইবনে আবী শায়বা) যহরী বলেন, তিনি ঈদের খুতবা নামাযের পূর্বে পাঠ করার নিয়ম চালু করেন। (আব্দুর রাজ্জাক) সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রা.) বলেন, তাঁর যুগে ঈদের নামাযের আযান দেয়ার মতো বিদআত কাজটি করা হতো। (ইবনে আবী শায়বা) তিনি এত বলেন যে, হযরত মুআবিয়া (রা.) নামাযের তাকবীর কম করে বলতেন।

আল্লামা আসকারী 'আওয়ায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি প্রথম ডাক বিভাগের প্রবর্তন করেন। তাঁর সাথে জনগণ প্রথম গোস্তাখী করে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
اَلصَّلٰوةُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

এ পদ্ধতিতে সালামের রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি সর্বপ্রথম দাপ্তরিক কাজে আব্দুল্লাহ বিন আউস গাসসানীর তত্ত্বাবধানে لكل عمل ثواب খোদিত মোহর ব্যবহার করেন। আব্বাসীয়া বংশের সকল খলীফা এ মোহর ব্যবহার করেছেন। আমীর মুআবিয়ার ফরমানে এক লক্ষ দেরহামের স্থানে জনৈক কর্মচারী কর্তৃক দুই লক্ষ লিখিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মোহরের প্রবর্তন করা হয়। তিনি জামে মসজিদের মেহরাব তৈরি করেন। তিনি সর্বপ্রথম কাবার গিলাফ নামানোর নির্দেশ জারি করেন।

যুবায়ের বিন বাকার 'মুকাযিয়াত' গ্রন্থে যহরীর ভাতিজার বরাত দিয়ে লিখেছেন, আমীর মুআবিয়া (রা.) সর্বপ্রথম বাইআতের সময় কসম খাওয়ার প্রথা চালু করেন। তিনি খিলাফতের বিষয়ে কসম করেছিলেন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রেও কসম নিতেন।

আসকারী 'আওয়ায়েল' গ্রন্থে সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুআম্মারের বরাত দিয়ে লিখেছেন, একদা আমীর মুআবিয়া (রা.) মক্কা অথবা মদীনার মসজিদে গমন

করলেন। সেখানে ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বসেছিলেন। আমীর মুআবিয়া (রা.) তাঁদের নিকট এসে বসলে ইবনে আব্বাস (রা.) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, হে মুখ ঘুরিয়েলেনেওয়ালা! আমি তোমার চাচাতো ভাই-এর চেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণের জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম সহাচর্য দানের জন্য? না হুযূর (সা.)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে আপনি তার চেয়ে বেশি খিলাফতের হকদার? আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তোমার চাচার ছেলে নিহত হওয়ার কারণে। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে আবু বকর (রা.) বেশি হকদার। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, আবু বকর (রা.) তো স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাহলে ইবনে উমর (রা.) হকদার। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, এদিক থেকে তোমার যুক্তি পরিত্যাজ্য। কারণ আপনার চাচার ছেলের উপর যারা আক্রমণ করে শহীদ করেছে তারা মুসলমান।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল বলেন, আমি একবার মদীনা শরীফে আমীর মুআবিয়ার নিকট গেলাম। কিছুক্ষণ পর আবু কাতাদা (রা.) আনসারীও এলেন। আমীর মুআবিয়া (রা.) তাকে বললেন, আমার নিকট সকলেই আসলেও আনসারগণ এলেন না। তিনি জবাব দিলেন, আমাদের আনসারদের নিকট কোনো বাহন নেই। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তোমাদের উটগুলো কি হয়েছে? তিনি বললেন, বদর যুদ্ধে আপনাদের এবং আপনার বাবার পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সবগুলো মারা পড়েছে। অতঃপর তিনি আবার বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট ইরশাদ করেছেন, আমার পর অন্যরা হকদারদের উপর প্রাধ্যান্য পাবে। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তুমি এ পরিস্থিতিতে কি করবে? তিনি বললেন, সহনশীল হব। ধৈর্যধারণ করবো। আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তবে ধৈর্যধারণ করে থাক।

এ প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান বিন হাসসান এ কবিতাটি রচনা করেন, "আমিরুল মুমিনীন মুআবিয়া বিন হরবের নিকট অবশ্যই এ সংবাদ পৌছে দিবে যে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আপনাকে সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং আমরা সেই ইনসাফের দিন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবো।"

ইবনে আবীদ দুনিয়া এবং ইবনে আসাকির জাবালা বিন সাহীম থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমীর মুআবিয়ার দরবারে গিয়ে মুআবিয়ার গলায় দড়ি লাগিয়ে এক

বাচ্চাকে টানতে দেখে বললাম, এ বাচ্চা কী করছে? তিনি বললেন, চুপ করো। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, বাচ্চার সঙ্গে মিশলে নিজেকে বাচ্চা হয়ে যেতে হয়। ইবনে আসাকিরের মতে হাদীসটি গরীব।

ইবনে আবী শায়বা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, জনৈক কুরাইশ ব্যক্তি আমীর মুআবিয়ার কাছে গিয়ে অনেক নরম-গরম মন্তব্য শুনানোর পর হযরত আমীর মুআবিয়া বললেন, ভাতিজা! এ ধরনের মন্তব্য থেকে ফিরে আস। বাদশাহর রাগ বাচ্চার রাগের মতো। আর বাদশাহর আক্রমণ বাঘের ন্যায় ক্ষিপ্র ও দুর্ধর্ষ।

শা'বী (রা.) যিয়াদের বরাত দিয়ে বলেন, আমি খারাজ আদায় করার জন্য এক লোককে পাঠালাম। সে ফিরে এসে সন্তোষজনক হিসাব দিতে না পারায় আমার ভয়ে আমীর মুআবিযার নিকট আশ্রয় নেয়। আমি বিষয়টি তাঁকে অবগত করালে তিনি পত্র লিখে জানালেন, আমাদের একই পদ্ধতিতে রাজনীতি করা সম্ভব নয়। আমরা উভয়ে নমনীয় হলে জাতি পাপকার্যে নিমজ্জিত হবে। আবার উভয়ে কঠোর হলে আমজনতা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তুমি নমনীয় হলে আমার অবস্থান শক্ত হবে, আর তুমি কঠোর হলে আমি মমতার আশীর্বাদ নিয়ে জাতির সামনে এসে দাঁড়াব।

শা'বী (রা.) বলেন, আমি হযরত মুআবিয়াকে বলতে শুনেছি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদ থাকবে সে জাতির উপর ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায় প্রাধান্য পাবে। তবে এ উম্মতের উপর এমনটা হবে না।

তৌরিয়াত গ্রন্থে সুলায়মান আল-মাখযুমী কর্তৃক বর্ণিত, একদা হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) জনসাধারণের এক উন্মুক্ত সমাবেশে নিজের জন্য প্রযোজ্য এমন অর্থবোধক তিনটি আরবী কবিতা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের তিন লক্ষ দেরহামের বিনিময়ে তা শোনাতে সম্মত হন। পরিশেষে আমীর মুআবিয়ার রাজী হওয়ার প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) আবৃত্তি করেন, প্রথম কবিতা "আমি জনতাকে পালন করে থাকি আমি তোমাকে ছাড়া লোকদের মধ্যে কাউকে শত্রুতা পোষণ করতে দেখেনি।" দ্বিতীয় কবিতা, "আমি তোমার যুগে বেদনায় বিধ্বস্ত জনতার দলকে শত্রুতা ছাড়া আর কিছু করতে দেখিনি।" তৃতীয় কবিতা, "আমি সকল দুঃখ ও লজ্জার স্বাদ পেয়েছি। কিন্তু ভীক্ষাবৃত্তির চেয়ে বড় লজ্জাকর কাজ আর দেখেনি।" আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, তুমি যথার্থই বলেছ। অতঃপর তিনি কবিকে তিন লক্ষ দেরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ এবং ইবনে আবী হাতিম (রহ:) কর্তৃক স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, মারওয়ান যখন আমীর মুআবিয়া (রা.) কর্তৃক মদীনার গভর্নর সে সময় একদিন তিনি খুতবার মধ্যে বলেছিলেন, আমিরুল মুমেনীন হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর ছেলেকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে যে অভিমত পেশ করছেন তা যথাযথ। কারণ এটাই ছিল হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের নীতি। এতদশ্রবণে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বললেন, এটা আবু বকর এবং উমরের নীতি নয়; বরং তা কেসরা ও কায়সারের নীতি। কারণ আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) নিজের সন্তানাদি এবং পরিবারের মধ্য থেকে কারো জন্য বাইআত গ্রহণ করেননি। আর হযরত মুআবিযা (রা:০ দয়ার্দ্র পিতা হিসেবেই ছেলের জন্য এমনটা করেছেন। মারওয়ান বললেন, তোমরা তো সেই ব্যক্তি নও যাদের কথা কুরআনে বিধৃত রয়েছে। তোমাদের পিতার মৃত্যুতে তোমরা তো আহ শব্দটুকুও বলনি। তোমরা তো নিজ পিতাদের প্রতিরোধ করেছিলে। ইবনে আবু বকর (রা.) বললেন, তুমি কি অভিশপ্তের পুত্র নও? রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমার বাবাকে অভিশাপ দিয়ে ছিলেন। বিষয়টি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পর্যন্ত পৌছে গেলে তিনি বললেন, মারওয়ান মিথ্যা বলেছে। আয়াতটি অমুক লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মারওয়ান তার পিতার ঔরসে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মারওয়ানের পিতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এ দিক থেকে মারওয়ান অভিশাপের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে।

ইবনে আবি শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে ওরওয়ার বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত মুআবিয়া বলেন, মানুষের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ছাড়া ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয় না।

ইবনে আসাকির (রহ:) শা'বী (রহ:) থেকে রেওয়ায়েত করেন, মুআবিয়া, আমর বিন আস, মুগীরা বিন শোবা এবং যিয়াদ হলেন আরবের শ্রেষ্ঠ চার বুদ্ধিমান। হযরত মুআবিয়া (রা.) ভদ্রতা, বিনয় এবং বিচক্ষণতায় হযরত আমর বিন আস কষ্ট সহিষ্ণুতায়, মুগীরা বিন শোবা স্বাধীনতা হাত ছাড়া না হওয়ার জন্য যত্নশীল হওয়ায় এবং যিয়াদ বল্গাহীন কথাবলার জন্য বিখ্যাত। ইবনে আসাকির এটাও বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং যায়েদ বিন সাবিত (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ চার বিচারক।

কুবায়সা বিন জাবির বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাহচর্যে থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তাঁর চেয়ে বেশি কুরআন শরীফ এবং আইনের জ্ঞান কারো ছিল না। আমি তলহা বিন উবায়দুল্লাহর সাথেও ছিলাম। না চাইতে দান

করার প্রবণতা তাঁর চেয়ে বেশি কারো মধ্যে দেখিনি। আমি হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথেও ছিলাম হযরত মুআবিয়ার চেয়ে ধৈর্যশীল এবং বিচক্ষণ আলেম আমার চোখে পড়েনি। হযরত আমার বিন আসের চেয়ে নিরাপদ সহকর্মী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু আর কেউ নেই।

ইবনে আসাকির জাফর বিন মুহাম্মাদের পিতার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, একদিন হযরত আকীল (রা.) আমীর মুআবিযার কাছে গেলে তিনি বললেন, এ তো সেই আকীল যার চাচা আবু লাহাব। হযরত আকীল (রা.) বললেন, এ তো সেই মুআবিয়া যার ফুফু হামালাতুল হতব (আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম-অনুবাদক)

ইবনে আসাকির (রহ:) আওযায়ী (রহ:) থেকে বর্ণনা করেন, একদা হুযায়েম বিন ফাতাক আমীর মুআবিয়ার নিকট গেলেন। হুযায়েমের পায়ের গোছা ছিল অত্যন্ত সুদর্শন, তা দেখে আমীর মুআবিয়া (রা.) বললেন, এ পায়ের গোছা কোন্ নারীর? হুযায়েম বললেন, হে আমিরুল মুমেনীন, আপনার পত্নীর।

তাঁর খিলাফতকালে যেসব প্রখ্যাত আলেম বুযুর্গ ইন্তোকল করেছেন তাঁরা হলেন-সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হাফসা, উম্মে হাবীবা, সুফিয়া, মাইমূনা, সাওদা, জুয়াইরিয়া, আয়েশা সিদ্দীকা, লবীদ কবি, উমরান বিন হাসীন, উসমান বিন তালহা, আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ বিন সালাম, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, আবু মূসা আশআরী, যায়েদ বিন সাবিত, আবু বকর, কাব বিন মালিক, মুগীরা বিন শোবা, জারিরুল বিজ্লী, আবু আউয়ুব আনসারী, সাঈদ বিন যায়েদ, আবু কাতাদা আনসারী, ফুজালা বিন উবায়েদ, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর, যুবায়ের বিন মুতঈম, উসামা বিন যায়েদ, ছওবান, অমর বিন হাজম, হাসসান বিন সাবিত, হাকিম বিন হাযাম, সাদ বিন আবী ওয়াককাস, আবু লাইসাম, কসম বিন আস, তার ভাই উবায়দুল্লাহ এবং উকবা বিন আমের (রা.)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি এ মর্মে প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আমাকে ৬০ হিজরী এবং বাঁদীদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করো। তাঁর দোআ কবুল হয়েছিল।

ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া

ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবু খালিদ আল উমুয়ী ২৫ অথবা ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্থূল শরীরের অধিকারী ইয়াযিদের গোটা শরীরে পশম ছিল। তার মা মাইসুন বিনতে বহদে কালবীয়া। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তার রেওয়ায়েতগুলো তার ছেলে খালিদ এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বর্ণনা

করেছেন। তিনি আগে থেকেই উত্তরাধিকার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং লোকদের বাধ্য করে বাইআত গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (রহ:) বলেন, ইয়াযিদ আগেই উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত এ প্রথা অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় পরামর্শ সাপেক্ষে মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই থাকতেন।

ইবনে সিরীন (রহ:) বলেন, আমর বিন হাযাম মুআবিয়ার নিকট গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্য থেকে কাকে খলীফা মনোনীত করতে চাইছেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, তোমার উপদেশে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে অনেকের অনেক ছেলে রয়েছে, তাদের মধ্যে আমার ছেলে বেশি হকদার। এজন্য তাকে উত্তরাধিকার বানাতে চাইছি।

আতীয়া বিন কায়েস বলেন, একদিন হযরত মুআবিয়া (রা.) খুতবার সময় বলেন, হে আল্লাহ! যদি ইয়াযিদকে তার মর্যাদার কারণে উত্তরাধিকার মনোনীত করি তবে তুমি তাকে সাহায্য ও রক্ষা করো। আর যদি দয়ার্দ্র পিতা হিসেবে করে থাকি এবং যদি সে খিলাফতের যোগ্য না হয় তাহলে সে যেন মসনদে আরোহণের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আমীর মুআবিয়ার ইন্তেকালের পর সিরিয়াবাসী ইয়াযিদের নিকট বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি মদীনাবাসীর বাইআত গ্রহণের ফরমান জারি করলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করে সে রাতেই তাঁরা মক্কা শরীফে গমন করেন। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) ইয়াযদের বাইয়াত গ্রহণ করেননি এবং নিজের জন্যও বাইআত করাতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে কুফাবাসী হযরত মুআবিয়ার আমল থেকেই বলে রেখেছিল এবং তারা ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বাইআত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। তবে তিনি কোনো সময় রাজী হননি। যখন ইয়াযিদ বাইআত করায়ে নিল তখন প্রথমে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার চেষ্টা করেন। অতঃপর কুফা যাওয়ার ইচ্ছা করেন, হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) তাঁকে এ পরামর্শই দেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে নিষেধ করেন। ইবনে উমর (রা.) বের হতে নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া এবং আখেরাত দু-এর মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কলিজা। আপনি আখেরাতকে কবুল করুন, দুনিয়া আপনার জন্য নয়। ইমাম হোসাইন (রা.)

নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ইবনে উমর (রা.) কেঁদে ফেলেন, গলায় জড়িয়ে ধরে অবশেষে বিদায় দেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আমার নিষেধ উপেক্ষা করে যাত্রা করলেন। ফলে তাঁর পিতা এবং ভ্রাতার মতোই পরীক্ষিত কুফাবাসীর নিকট তাঁকে একই পরিণাম ভোগ করতে হয়।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ এবং আবু ওয়াকেদী আল লাইছীও ইমাম হোসাইনকে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে ইরাক গমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যাত্রার প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমার মন বলছে, বিবি বাচ্চাদের সামনে হযরত উসমান গনী (রা.)-এর মতো আপনাকেও শহীদ করে দেবে। অতঃপর তিনি নিজেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনি ইবনে যুবায়েরের চক্ষুযুগল শীতল করছেন। এরপর তিনি ইবনে যুবায়ের (রা.) কে বললেন, তুমি যা চাইছ তাই হতে চলেছে। ইমাম হোসাইন (রা.) যাত্রা করছেন। আর তুমিও হিজায ছেড়ে যাত্রা করছ। অতঃপর তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, "হে উড়ন্ত প্রাণী! শূন্য চারণভূমির যেখানে খুশি চরবে যেখানে খুশি ডিম দিবে।"

ইরাকবাসীর দূত এবং পত্রসম্বলিত আহ্বানের প্রেক্ষিতে ইমাম হোসাইন (রা.) যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে পরিবার পরিজন যাঁদের মধ্যে নারী এবং শিশু ছিল মক্কা থেকে ইরাক গমন করেন। এদিকে ইয়াযিদ ইরাক শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইমাম হোসাইনের সাথে যুদ্ধ করার লিখিত আদেশ দেন এবং আমর বিন সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইমাম হোসাইনের গতিপথ রুদ্ধ করতে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। কুফাবাসী নিজেদের পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) প্রমুখদের সাথে যেমন আচরণ করেছিল, তদ্রুপ ইমাম হোসাইন (রা.) কে একা ফেলে তারা চলে যায়। ইয়াযিদ বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলে ইমাম হোসাইন (রা.) সন্ধি, প্রত্যাবর্তন অথবা ইয়াযিদের নিকট গমন এ তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। অথচ তারা সবগুলোই পত্যাখ্যান করে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) কে শহীদ করে তাঁর মস্তক মোবারক এক ট্রেতে করে ইবনে যিয়াদের সামনে পেশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইমাম হোসাইন (রা.)-এর হত্যাকারী ইবনে যিয়াদ এবং ইয়াযিদের প্রতি অভিশাপ বর্ষন করুন।

ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াওমে আশুরায় শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর সাথে পরিবারের ষোলোজন শহীদ হন। তিনি শহীদ হওয়ার মুহূর্তে সাতদিন পর্যন্ত দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সূর্যের রং বিকৃত হয়ে যায়। তারকারাজি ভেঙে ভেঙে

নিচে পতিত হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল এবং ছয় মাস পর্যন্ত আকাশের এক কোণে সর্বদা একটি লাল রেখা উদ্ভাসিত ছিল, যা এ মর্মান্তিক ঘটনার পূর্বে আর কোনোদিন দেখা যায়নি।

এ রেওয়ায়েতটিও বর্ণিত রয়েছে যে, সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাসের যে পাথর উঠানো হয়েছে তার নিচ দিয়েই রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। বিরোধী শিবিরে সেদিনের হর্ষ কেন জানি বিষাধে পরিণত হয়েছিল তাদের যবেহকৃত উটের গোশত আগুনের মতো জ্বলছিল। পাকানোর সময় তা কয়লার মতো কালো হয়ে যায় এবং এর স্বাদ আলকাম বৃক্ষের মতো তিক্ত হয়।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শানে কটূক্তি করায় আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে তারা নিক্ষেপ করে তার চক্ষুদ্বয় নষ্ট করে দেন। ছালাবী আব্দুল মালিক বিন উমায়ের আল লাইছী থেকে বর্ণনা করেন, আমি এ প্রাসাদে (কুফার প্রশাসনিক ভবনে) হযরত হোসাইন বিন আলী (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে ঢালের উপর প্রতিস্থাপিত অবস্থায় দেখেছি। এর কিছুদিন পর এ প্রসাদেই উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কর্তিত মাথা মুখতার বিন আবু উবায়েদের সামনে দেখেছি। অতঃপর মুখতার বিন আবু উবায়েদের মাথা মুসআব বিন যুবায়েরের সামনে, আবার এর কিছুদিন পর মুসআব বিন যুবায়েরের বিচ্ছিন্ন মস্তক আব্দুল মালিকের সামনে রাখা অবস্থায় দেখেছি। আমি এ ঘটনা আব্দুল মালিকের নিকট বিবৃত করলে তিনি এ প্রাসাদকে অমঙ্গলজনক ভেবে তা বর্জন করেন।

ইমাম তিরমিযী (রা.) সালামা থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে কাঁদতে দেখে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মস্তক এবং দাড়ি ধূলায় ধূসরিত দেখে আরয করলাম, আমি আল্লাহর রসূলের একি অবস্থায় দেখছি? তিনি বললেন, আমি এ মুহূর্তে শহীদ হোসাইনকে দেখে ফিরছি।

বায়হাকী 'দালায়েল' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দুপুরের সময় স্বপ্নে দেখলাম, তিনি ধুলাময় অবস্থায় হেঁটে চলছেন। তাঁর হাতে এক বোতল রক্ত। আমি আরয করলাম, আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাতে এটা কি? তিলি বললেন, এগুলো হাসাইন এবং তাঁর সাথীদের রক্ত। আমি আজ সারা দিন এগুলো সঞ্চয় করেছি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে দিনটি ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দিন ছিল।

আবু নুয়াইম 'দালায়েল' গ্রন্থে উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি হোসাইনের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য প্রাণিকুলের বিলাপ শুনেছি। ছাআলাবা স্বরচিত 'আমালী' গ্রন্থে লিখেছেন, জনাব কালবী বলেছেন, আমি কারবালার প্রান্তে আরবের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি পশুদের বিলাপ শুনেছেন? তিনি বললেন, তুমি এ ব্যাপারে যাকেই জিজ্ঞেস করবে তিনিই বলবেন, শুনেছি। আমি বললাম, আপনি স্বকর্ণে গোচর করেছেন কি? তিনি বললেন, আমি এ কবিতা শুনেছি, (অর্থ) "রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চেহারার উপর হস্ত সঞ্চালন করেছেন। তাঁর গণ্ডদেশ দীপ্তি ছড়াত। তাঁর পিতা-মাতা কুরাইশদের অভিজাত গোত্রের সন্তান। তাঁর দাদা সকল দাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।"

ইবনে যিয়াদ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সহ তাঁর সাথীদের শহীদ করে তাদের ছিন্ন মস্তকগুলো ইয়াযিদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ইয়াযিদ প্রাথমিক অবস্থায় এ মর্মান্তি ঘটনায় আনন্দিত হন, কিন্তু মুসলমানগণ তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং কাজকে ঘৃণ্য বলে অভিহিত করায় তিনি অনুতপ্ত হন।

আবু ইয়ালা 'মুসনাদ' গ্রন্থে দুর্বল সূত্রে আবু উবায়দের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মত সর্বদা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু বনূ উমাইয়্যার ইয়াযিদ নামক এক ব্যক্তি ইনসাফের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

রুয়ানী 'মুসনাদ' গ্রন্থে আবু দ্দারদাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে প্রথম আমার সুন্নতের মধ্যে পরিবর্তন করবে সে বনূ উমাইয়্যার ইয়াযিদ।

নওফেল বিন আবুল ফারাত বলেন, একদা আমি খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট বসেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে ইয়াযিদের বিষয় এসে গেলে জনৈক ব্যক্তি আমিরুল মুমেনীন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া বলে তার নাম নিলে খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) বললেন, তুমি একে আমিরুল মুমেনীন বলছো? এ বলে তিনি এ অপরাধের জন্য তাকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন।

৬৩ হিজরীতে মদীনাবাসীর বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হয়ে ইয়াযিদ বিশাল সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। রসূলের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র মদীনা নগরী ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করে ইয়াযিদ মক্কা শরীফে ইবনে যুবায়েরকে অবরুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে পরবর্তী নিদের্শ দেন। হযরত হাসান বসরী (রা.) ইয়াযিদ বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, সেদিন ইয়াযিদ বাহিনীর নির্যাতন থেকে মদীনাবাসীর একজনও পরিত্রাণ পায়নি। সহস্রাধিক সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হন।

মদীনা শরীফ লুণ্ঠিত হয়। হাজার হাজার তরুণী ধর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে মদীনাবাসীকে ভতিসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রকম্পিত করে রাখবেন এবং আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও লোকেরা তাকে অভিশাপ দিবে। (মুসলিম)

ইয়াযিদ পাপাচারে নিমগ্ন হয়ে পড়ায় মদীনাবাসী তার বাইআত প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওয়াকেদী আব্দুল্লাহ বিন হানযালা আল গাসীল থেকে রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হতেই থাকবে (রা.) এ আমার বিশ্বাস। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে সময় লোকেরা (শিয়ারা-অনুবাদক) মা, মেয়ে এবং বোনদের বিবাহ করত এবং তারা প্রকাশ্যে শরাব পান করত, আর নামায ছেড়ে দিয়েছিল।

যাহাবী (রহ.) বলেন, মদীনাবাসীর সাথে এহেন আচরণ, মদ পান ইত্যাদি মন্দ কাজের সাথে জড়িত থাকার কারণে ইয়াযিদের প্রতি জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তার জীবনকে দীর্ঘ করে দিলেন। তিনি ইবনে যুবায়ের (রা.) এবং মক্কাবাসীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। পথিমধ্যে সেনাপতি মারা গেলে তদস্থলে আরেকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে ইবনে যুবায়েরের যুদ্ধ হয়। তারা ইবনে যুবায়েরকে অবরোধ করে এবং অবরোধ চলাকালীন সময়ে ইয়াযিদ বাহিনী মিনযানিক থেকে আগুন ও পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে আগুনের গোলায় কাবা শরীফের দেয়াল, ছাদ এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নিকট ফিদয়া হিসেবে প্রেরিত সেই দুম্বার ঐতিহাসিক শিং যা আজ পর্যন্ত কাবার ছাদে লটকানো আছে সব ভস্মীভূত হয়ে যায়। ৬৪ হিজরীর সফর মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। লড়াইরত অবস্থায় তার মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌছুলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) ঘোষণা দিয়ে বললেন, হে সিরিয়াবাসী, তোমাদের পথভ্রষ্টকারী সেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে। এ কথা শুনে সৈন্যগণ প্রস্থান করে এবং লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অতঃপর ইবনে যুবায়ের (রা.) লোকদের নিকট বাইআত গ্রহণ করেন এবং খলীফা বলে নিজেকে ঘোষণা দেন। ওদিকে সিরিয়াবাসী মুআবিয়া বিন ইয়াযিদের আসক্তি ছিল। তার অনেক কবিতার চারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ইবনে আসাকির ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা আবু বকর এবং উমরের নাম ঠিক রেখেছ। উসমান বিন আফফান (রা.) শহীদ হয়েছে। মুআবিয়া তার ছেলে ইয়াযিদ, সাফাহ, সালাম, মানসুর, জাবের এবং মাহদী হলেন বাদশাহ। অভিশপ্ত শাসনকর্তা সকলেই কা'ব বিন লুয়াই-এর

বংশধর। যাহাবী বলেন, ইবনে উমরের এ বর্ণনাটি কয়েক পদ্ধতিতে বর্ণিত। কিন্তু কেউ একে মারফু বলেননি।

ওয়াকেদী আবু জাফর আল বাকের থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে রেশমী গেলাফে আচ্ছাদন করেন। কারবালা এবং মদীনার হত্যাযজ্ঞ ছাড়া ইয়াযিদের আমলে যেসব উলামা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা হলেন, উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালাম, খালিদ বিন আরফাতা, জরহদ আল আসলামী, জাবের বিন আতীক, বুরায়দা বিন হাসীব, মাসলামা বিন মুখাল্লাদ, আলকামা বিন কায়েস, মাসরুক, মাসুর বিন মুখরিমা প্রমুখ। আর মদীনার হত্যাযজ্ঞে তিন শত কুরাইশ মুহাজির এবং আনসার শাহাদাত বরণ করেন।

মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ

মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবু আব্দুর রহমান, আবু ইয়াযিদ আবু ইয়লালা পিতার শাসনামলে উত্তরাধিকার মনোনীত হন। ৬৪ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে পিতার পর খিলাফতের তখতে আসীন হন। তিনি যুবক ছিলেন। এ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি কোথাও সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করেননি এবং কোনো শাসনকার্যও পরিচালনা করেননি এবং লোকদের নামাযও পড়াননি। তার খিলাফত চল্লিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। কারো মতে দু'সপ্তাহ, আবার কারো মতে তিন মাস। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল একুশ বছর। কারো মতে বিশ বছর। মৃত্যুর সময় তাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়ার কথা বলা হলে তিনি বলেন, আমি নিজেই যখন খিলাফতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারলাম না তখন তিক্ততা কেন ছড়াব।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের বিন আওয়াম বিন খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসসী আল-আসাদীর উপনাম আবু বকর এবং আবু খুবায়ের। তিনি নিজে সাহাবী এবং সাহাবীর পুত্র। তাঁর পিতা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্যে অন্যতম। মা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তার দাদী সুফিয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু। তিনি মদীনা শরীফে হিজরতের বিশ মাস পর জন্ম গ্রহণ করেন। কেউ বলেন, হিজরতের বছর তাঁর জন্ম। হিজরতের পর মুহাজিরদের প্রথম সন্তান তিনি। তাঁর জন্মে মুসলমানগণ আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ ইহুদীরা

প্রচার করেছিল তারা যাদু করে মুসলমানদের সন্তান হওয়া বন্দ করে দিয়েছে।

জন্মের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে তাঁকে পেশ করা হলে হুযূর (সা.) একটি খেজুর চিবিয়ে তাঁকে চাটায়ে দেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নানা আবু বকর সিদ্দীকের নামে নাম ও উপনাম রাখলেন। তিনি বেশি বেশি রোযা রাখতেন। দীর্ঘ কেরাত দিয়ে নামায পড়তেন। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র, অসীম সাহসী ও যুগশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি কোনো কোনো রাতকে নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়েই শেষ করে দিতেন, রুকুর মধ্যেই কোনো রাত সকাল হয়ে যেত, আবার কোনো রাত তিনি সেজদায় কাটিয়ে দিতেন। তিনি ৩৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন, তাঁর ভাই উরওয়া, ইবনে আবী মালীকা, আব্বাস বিন সহল, সাবিত আল-বানানী, আত, উবায়দা আল-সালমানী প্রমুখ।

তিনি ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার বাইআত প্রত্যাখ্যান করে মক্কায় গমনকরত : নিকে কারো বাইআত গ্রহণ করেননি এবং নিজের জন্যও অন্যের নিকট থেকেও বাইআত নেননি। এজন্য ইয়াযিদ তাঁর প্রতি রুষ্ট ছিলেন। ইয়াযিদের মৃত্যুতে হিজ্ যবাসী, ইয়ামানবাসী, ইরাকবাসী, খুরাসানবাসী তাঁর নিকট বাইআত গ্রহণ করে। তিনি কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে কাবা শরীফ যেমন ছিল, তেমনিভাবে তিনি কাবা শরীফের দুটি দরজা নির্মাণ করেন। তিনি তাঁর খালা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী জানাযায় যে, "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইচ্ছা ছিলো আরো ছয় গজ জায়গা কাবা শরীফরে অন্তর্ভুক্ত করা।" এজন্য তিনি তাই করেন।

মিসর এবং সিরিয়াবাসী ইয়াযিদের পর তদীয় ছেলে মুআবিয়ার বাইআত গ্রহণ করে। মুআবিয়ার পর তারা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বাইআত গ্রহণ করে। এতে মারওয়ান বিন হাকাম বিদ্রোহ করে মিসর ও সিরিয়া গমন করে। তার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ, ৬৫ হিজরী অবধি মিসর ও সিরিয়া তাঁর অধীনেই ছিল। তার শাসনকালে মারওয়ান তার পুত্র আঃ মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

যাহাবী বলেন, মারওয়ান খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এ দিক থেকে তিনি বিদ্রোহী। তার ছেলে আব্দুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করাও সঠিক ছিল না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে শহীদ করার পর তার খিলাফত সহীহ হয়েছে।

সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় খিলাফতের মসনদে সমাসীন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইবনে যুবায়েরকে হত্যার জন্য চল্লিশ হাজ

ার সৈন্য নিয়ে হাজ্জাজকে পাঠালেন। হাজ্জাজ এসে এক মাস মক্কা শরীফ অবরোধ করে রাখেন এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিনযানিক (কামান) স্থাপন করেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলেন। ইবনে যুবায়েরের সহচরবৃন্দ তাকে ছেড়ে দুশমনের শিবিরে গিয়ে যোগ দেয়ায় তিনি মর্মাহত হন। কিছুদিন পর হাজ্জাজ বিজয় অর্জন করেন এবং ৭৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের সতেরো তারিখ সোমবারে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) কে শূলে চড়ানো হয়।

মুহাম্মদ বিন যায়েদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন, হাজ্জাজ মিনযানিক (কামান) স্থাপনের সময় আমি আবু কুবায়েস পাহাড় থেকে দেখলাম, আগুনের এক বিশাল লেলিহান শিখা আকাশ থেকে পড়ে মিনযানিকের নিকটবর্তী পঁচিশজন সৈন্য নিহত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) অভিজাত কুরাইশ বংশীয় ছিলেন এবং তাঁর অনেক ঘটনা ও জনশ্রুতি জনতার মুখে মুখে প্রসিদ্ধ।

আবু ইয়ালা 'মুসনাদ' গ্রন্থে ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কিছু রক্ত দিলেন এবং তা মানুষের দৃষ্টির বাইরে ফেলে আসতে বললেন। আমি অন্তরালে গিয়ে তা পান করে ফেললাম। আমি ফিরে এলে নবীজী (সা.) বললেন, তুমি রক্তগুলো কি করলে? আমি বললাম, আমি সেগুলো এমন এক স্থানে গোপন করে ফেলেছি, যা কেউ দেখতে পাবে না। তিনি বললেন, মনে হয় তুমি তা পান করেছ। আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, তোমার থেকে লোকেরা এবং লোকদের থেকে তুমি কষ্ট পাবে। কথিত আছে, ইবনে যুবায়েরের এ শক্তি সামর্থ্যই ছিল সেই রক্তের অদৃশ্য প্রতিক্রিয়া।

নাওফুল বাকালী বলেন, আসমানী কিতাবে আমি দেখেছি সেখানে লিখা রয়েছে, ইবনে যুবায়ের হলেন فارس للخلفاء তথা খলীফাদের বাহন।

আমর বিন দিনার বলেন, আমি তার মতো অত্যন্ত যত্নের সাথে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। মিনযানিক থেকে গোলা বর্ষণের মুহূর্তেও তিনি হারাম শরীফে নামায পড়ছিলেন। সে সময় তার কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

মুজাহিদ বলেন, তিনি যেভাবে ইবাদত করেন, তাঁর স্থানে অন্য কেউ হলে বিরক্ত হয়ে যেতো। একবার কাবা শরীফ বন্যা প্লাবিত হয়ে পড়লে তিনি সাঁতরিয়ে তাওয়াফ করেন।

উসমান বিন তালহা বলেন, তিনটি বিষয়ে ইবনে যুবায়েরের সমকক্ষ কেউ নেই। এক. বীরত্ব ও সহসিকতা। দুই. ইবাদতবন্দেগী এবং তিন. বাগ্মিতা ও

বাকপটুতা। তিনি এমন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী যে, খুতবা প্রদানের সময় তার কণ্ঠ পাহাড়ে ধাক্কা লাগত।

উরওয়া বলেন, নাবাগা জাআদী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শানে যে কবিতা রচনা করেছেন তার অর্থ হলো, "তিনি শাসনকর্তা হয়ে আবু বকর (রা.), উমর (রা.) এবং উসমান (রা.)-এর মতো দুস্থের সেবা করবেন। সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিমিরের মাঝে আরো প্রদীপ জ্বালাবেন।"

হিশাম বিন উরওয়া এবং খুবায়েব বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে রেশমী চাদরে আচ্ছাদন করেন। এর পূর্বে কাবা ঘর চট এবং চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকতো।

আমর বিন কায়েস বলেন, ইবনে যুবায়েরের বিভিন্ন ভাষাভাষীর এক'শ গোলাম ছিল। তিনি তাদের ভাষাতেই গোলামদের সাথে কথা বলতেন। আমি তাঁকে পার্থিব জগতের কাজে এমনভাবে মশগুল হতে দেখে ভাবতাম মনে হয় তিনি আর আখেরাতের কাজের সাথে জড়িত হবেন না। আর যখন তাঁকে আখেরাতের কাজে সম্পৃক্ত দেখতাম, মনে হতো পার্থিব কাজে আর নিজেকে জড়াবেন না।

হিশাম বিন উরওয়া বলেন, আমার চাচা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) শিশুকালে সর্বপ্রথম 'তলোয়ার' শব্দ উচ্চারণ করেছেন। অতঃপর তা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পিতা ছেলের এ শব্দ শ্রবণে বললেন, তোমাকে তলোয়ার দ্বারা অনেক মধ্যস্থতা করতে হবে। আবু উবায়দা রেওয়ায়েত করেন, একদিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের আল-আসাদী ইবনে যুবায়েরের দরবারে গিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমেনীন! ওমুক দিক দিয়ে আমি আপনার আত্মীয়। ইবনে যুবায়ের বললেন, হ্যাঁ, সঠিক বলেছ। তবে তুমি যদি চিন্তা করে দেখ তাহলে বুঝতে পারবে যে, সকল মানুষ একই মা এবং বাবা থেকে নির্গত। আল-আসাদী বললেন, আমার অর্থকড়ি শেষ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি এর জিম্মাদার নই। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আসাদী বললেন, আমার উট ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্থ। তিনি বললেন, কোনো এক চারণ ভূমিতে তোমার উট ছাড়িয়ে দাও। আসাদী বললেন, আমি কিছু পাবার আশায় আপনার কাছে এসেছি, অভিমত জিজ্ঞেস করার জন্য নয়। অভিশাপ ক্ষুধার্থ সেই উটনীর প্রতি যে আমাকে আপনার কাছে এনেছে। তিনি বললেন, তার বাহনের উপরও।

আব্দুর রাজ্জাক 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে যহরী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে কখনোই দুশমনের কর্তিত মস্তক পেশ করা হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পেশ করা হলে তিনি দারুণ

অসন্তুষ্ট হন। ইবনে যুবায়েরের দরবারে দুশমনের কর্তিত মস্তক পেশ করা হয়েছে।

ইবনে যুবায়েরের যুগে মুখতার কাযযাব নামে ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হয়। সে নবুওয়াত দাবী এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ইবনে যুবায়ের ৬৭ হিজরীতে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তাঁর খিলাফত কালে উসাঈদ বিন যহরি, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস, নোমান বিন বসীর, সুলাইমান বিন সরদ, জাবের বিন সমরা, যায়েদ বিন আরকাম, আল লাইছী, যায়েদ বিন খালিদ আল জাহনী, আবুল আসওয়াদ ওয়ায়েল প্রমুখ আলেমে দ্বীন ইন্তেকাল করেন।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা বিন আব্দুস শামস বিন আব্দে মান্নাফ বিন কুসসী বিন কেলাব আবুল ওয়ালীদ ২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে যুবায়েরের খিলাফতকালে মারওয়ান আব্দুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। আর এজন্যই ইবনে যুবায়ের জীবিত থাকাকালীন আব্দুল মালিকের খিলাফত সঠিক ছিল না। মিসর এবং সিরিয়া নির্যাতনের মাধ্যমে প্রথম থেকেই তার অধীনে ছিল। অতঃপর ইরাক ইত্যাদি তার পদানত হয়। ৭৩ হিজরীতে ইবনে যুবায়েরের শাহাদাতের পর তার খিলাফত বিশুদ্ধ হয়। এ বছর হাজ্জাজ কাবা শরীফ বর্তমানে যে মডেলে আছে সেভাবে পুনর্নির্মাণ করেন। হাজ্জাজের ইশারায় জনৈক ব্যক্তি বিষ মিশ্রিত বর্শার আঘাতে ইবনে উমর (রা.) গুরুতর আহত হন এবং একারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তিনি ইন্তেকাল করেন। ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ মদীনা শরীফে গিয়ে মদীনাবাসী এবং যে সকল আসহাবে রসূল (সা.) সে সময় জীবিত ছিলেন তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করতে আরম্ভ করেন। হযরত আনাস (সা.) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত সহল বিন সাদী (রা.) প্রমুখ সাহাবীদের গলা এবং হাতে মোহর এঁটে দেয়ার মাধ্যমে তাদের চরম অপমানিত করা হয়।

৭৫ হিজরীতে আব্দুল মালিক হজ্জ করেন এবং হাজ্জাজ ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হন। ৭৭ হিজরীতে গুরত্বপূর্ণ প্রতিটি দুর্গ বিজিত হয় এবং মিসরের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ ভেঙে আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান চারদিকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করেন। ৮২ হিজরীতে সিনানা দুর্গ হস্তগত হয় এবং আরমেনিয়া ও সানহাযার যুদ্ধ হয়। ৮৩ হিজরীতে হাজ্জাজ একটি শহরের গোড়া পত্তন করেন।

৮৪ হিজরীতে মাসীসা এবং আওদীয়ায়ে মাগরিব হাতে আসে। ৮৫ হিজরীতে আব্দুল আযীয বিন আবু হাতিম বিন তাগমান আল বাহলী নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন। ৮৬ হিজরীতে তাওলিক এবং ইহজাম নামক দুটি দুর্গ হস্তগত হয়। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে এ দুটি দুর্গের অধিকাংশ মহিলা মারা যায়। এজন্য দুর্গদ্বয়কে প্লেগের সমাধি নামে অভিহিত করা হয়। এ বছরের শাওয়াল মাসে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইন্তেকাল করেন।

আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল আজলী বলেন, আব্দুল মালিকের মেধা পচনের অসুখ ছিল। ১৭ জন পুত্র সন্তান রেখে তিনি পরলোক গমন করেন। ইবনে সাদ বলেন, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান হযরত উম্মে দারদা সাহাবীর দরবারে যাতায়াত করতেন। একদিন উম্মে দারদা বললেন, হে আমিরুল মুমেনীন, আমি শুনেছি আপনি ইবাদত করার পরও মাদ পান করেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি মদ পানের সাথে সাথে কাপালিকে পরিণত হয়েছি।

হযরত নাফে বলেন, আমি মদীনায় আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের চেয়ে অধিক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক, চালাক ইবাদতকারী, আইনবিদ, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ ব্যক্তি আর দেখিনি।

আবুয যানাদ বলেন, মদীনার ফকীহগণ হলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যাব, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, উরওয়া বিন যুবায়ের এবং কাবিযা বিন ওযীব।

ইবনে উমর (রা.) বলেন, সকলে ছেলের জন্ম দেয়। আর মারওয়ান দিয়েছেন পিতার জন্ম।

উবাদা বিন লাবনী বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত উবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কুরাইশদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনার ইন্তেকালের পর আমরা মাসয়ালা মাসায়েল কাকে জিজ্ঞেস করবো? তিনি বললেন, মারওয়ানের ছেলে ফকীহ, তাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর গোলাম সুহায়েম বলেন, তরুণ আব্দুল মালিক হযরত আবু হুরায়রার দরবারে এলে তিনি বললেন, এ যুবক একদিন আরবের বাদশাহ হবেন।

উবায়দা বিন রাব্বাহ আল গাসসানী বলেন, আব্দুল মালিক খলীফা হওয়ার পর হযরত উম্মে দারদা তাকে বললেন, আমি তোমাকে দেখেই বুঝে ছিলাম তুমি একদিন বাদশাহ হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বুঝে ছিলেন? তিনি বললেন, তোমার চেয়ে বাগ্মী এবং চিন্তাশীল আর দেখিনি।

শা'বী (রহ:) বলেন, যে আমার সাহচর্য লাভ করছে সেই আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে লা জওয়াব হয়েছে। আর আমি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধার নিকট লা জওয়াব হয়েছি। কারণ আমি তার সামনে কোনো হাদীস পেশ করলে তিনি অবশ্যই সে হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন। আর কোনো বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করলে একই বিষয়ে তিনি আরো অধিক কবিতা পাঠ করতেন।

যাহাবী বলেন, তিনি যাঁদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন তঁরা হলেন, উসমান, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ, উম্মের সালমা, বুরায়দা, ইবনে উমর এবং মুআবিয়া (রা.) প্রমুখ। আর যাঁরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তঁরা হলেন, উরওয়া, খালিদ বিন মিদাদ, রাজা বিন হায়া, যহুরী, ইউনুস বিন মায়সারা, রবীআ বিন ইয়াযিদ, ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ, জারীর বিন উসমান প্রমুখ।

বাকার বিন আব্দুল্লাহ মাযানী বলেন, ইউসুফ নামক এক ইহুদী মুসলমান হন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তার মধ্যে প্রবল আগ্রহ সর্বদা বিদ্যমান থাকতো। একদিন তিনি আব্দুল মালিকের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় উচ্চ কণ্ঠে বললেন, এ বাড়ির মালিকের কাছ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীয়া প্রবল অত্যাচারের শিকার হবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, কতদিন পর্যন্ত তা চলবে? তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী না আসবে। ইউনুস আব্দুল মালিকের বন্ধু ছিলেন। একদা তিনি আব্দুল মালিকের মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করবো না। কথিত আছে যে, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া মক্কা শরীফে সৈন্য পাঠালে আব্দুল মালিক মন্তব্য করেছিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এ লোকটি তো পবিত্র নগরীতে সৈন্য পাঠিয়েছে। ইউসুফ বললেন, তোমার সেনারা ইয়াযিদ বাহিনীর চেয়ে নিষ্ঠুর হবে।

ইয়াহইয়া গাসসানী বলেন, মুসলিম বিন উকবা মদীনায় প্রবেশ করলে আমি মসজিদে নববীতে আব্দুল মালিকের সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বাহিনরি অন্তর্ভুক্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দুর্ভাগা, তুমি কি জান না - তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়াই করতে এসেছ যারা ইসলামের প্রথম সন্তান, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী এবং তিনি তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। যদি দিনে তাদের কাছে যাও তবে তারা রোযাদার, আর রাতে গেলে দেখবে তাহাজ্জুদের নামাযে মশগুল। স্মরণ রেখো, পৃথিবীর সবাই মিলে যদি তাদের হত্যা করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আব্দুল মারিক খিলাফতের তখতে আসীন হয়ে হাজ্জাজের

নেতৃত্বে তাদের প্রতি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং ইবনে যুবায়েরকে হত্যা করা হয়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বলেন, যখন খিলাফত আব্দুল মালিকের হাতে গিয়ে পৌঁছে ঠিক তখন কুরআন শরীফ তার কোলে ছিল। তিনি তা বন্ধ করে বললেন, এটাই হলো তোমার সাথে শেষ সাক্ষাত।

ইমাম মালিক (রা.) বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন সাঈদের নিকট শুনেছি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময় থেকে আসর পর্যন্ত আরো দু'জনকে নিয়ে মসজিদে নামায আদায় করেন। সাঈদ বিন মুসায়্যাবকে কেউ জিজ্ঞেস করল, এরা তিনজন তো নামায পড়ছে, আমরাও যদি উক্ত সময়ে নামায পড়ি তবে কোনো ক্ষতি হবে না তো? তিনি বললেন, বেশি বেশি নামায পড়া আর অধিক রোযা রাখার নাম ইবাদত নয়। দ্বীন নিয়ে গবেষনা ও চিন্তাশীলতা এবং গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার নাম ইবাদত।

মুসআব বিন আব্দুল্লাহ বলেন, ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম তার নাম আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রাখা হয়েছে। ইয়াহইয়া বিন বাকীর বলেন, আমি ইমাম মালিক (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আব্দুল মালিক দিনারের উপর ছাপ দেন এবং কুরআনের আয়াত অঙ্কিত করেন।

মুসআব বলেন, আব্দুল মালিক দিনারের উপর একদিকে قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ খোদাই করেন এবং অপর দিকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ নকশা করেন। দিনারের চতুর্দিকে চান্দীর একটি গোল বৃত্ত ছিল। এ বৃত্তের উপর ভাগে মুদ্রা প্রস্তুতকারী সরকারী কারখানা ও শহরের নাম এবং বাহিরাংশে অর্থাৎ বৃত্তের চতুর্দিকে مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ। লিখা ছিল। আসকারী কর্তৃক রচিত, "আওয়ায়েল" গ্রন্থে রছে, প্রথমে মুদ্রার হস্তাক্ষরে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। অপর দিকে নবীজী (সা.)-এর নাম এবং তারিখ লিখা থাকত। এ প্রথা মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানই চালু করেন। তবে তার সাম্রাজ্যে কোনো মুদ্রার প্রচলন ছিল না; বরং খ্রিস্টানদের মুদ্রাই তার রাজ্যে চলত। খ্রিস্ট মুদ্রায় তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী লিখার কারণে একদা রোম সম্রাট এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি মুদ্রায় হস্তাক্ষরে আপনার নবীর নাম লিখার প্রথা বর্জন করুন। অন্যথায় দিনারে আমি এমন কিছু লিখব যা দ্বারা আপনারা মর্ম পীড়নে ভুগবেন। কারণ আপনাদের কাজে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। আব্দুল মালিক খালিক বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়াকে পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি সব শুনে বললেন,

আপনার সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট মুদ্রা প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিন। নিজে মুদ্রার প্রবর্তন করুন এবং মুদ্রায় হস্তাক্ষরের পরিবর্তে লিখাগুলো খোদাই করে দিন। তিনি এ পরামর্শ মোতাবেক৭৫ হিজরীতে নিজস্ব দিনার তৈরি করেন।

আসকারী বলেন, খলীফাদের মধ্যে কৃপণতা করার জন্য আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নাম রাশহুল হুজারা এবং মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরুনের জন্য আবুল যবান নামে প্রসিদ্ধ। যে খলীফা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, যে খলীফার সামনে কথা বলা নিষেধ ছিল এবং যে যুগে প্রচলিত কোনো বচন উথাপন করা যেতো না তিনি আব্দুল মালিক।

আসকারী কালবী থেকে রেওয়ায়েত করেন, মারওয়ান বিন হাকাম নিজ সন্তান আব্দুল মালিকের পর আমর বিন সাঈদ বিন আসকে উত্তরাধিকার মনোনতি করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল মালিক তাকে হত্যা করেন। ইসলামের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম ওজর।

ইবনে জারীর তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করার পর ৭৫ হিজরীতে আব্দুল মালিক মদীনায় এক বক্তৃতায় বলেন, (হামদ ও সানার পর) আমি দুর্বল খলীফা উসমান (রা.) নই, আমি শক্তিহীন খলীফা মুআবিয়া এবং ক্ষীণ মনের খলীফা ইয়াযিদও নই। আমার পুর্ববর্তী খলীফাগণ এ সম্পদ ভোগ করতেন। খবরদার এ ব্যাপারে আমার তলোয়ার খুব তীক্ষ্ণ। তোমাদের বর্শাগুলো আমার সাহায্যে উঁচিয়ে ধরো। আমরা মুহাজিরদের প্রচলিত রীতিনীতি সংরক্ষণ করব, তবে এর উপর আমল না করলে আমি তোমাদের ধ্বংস করে দিব। আমর বিন সাঈদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাসহ আরো অন্যান্য গুণাবলী থাকলেও প্রশাসন এবং খিলাফত ভিন্ন বিষয়। তিনি সামান্য মাথা চাড়া দিলে তাকে শেষ করে দিব। স্মরণ রেখো, আমি তোমাদের সকল আবেদন রক্ষা করব, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আমি কিছুতেই তা মেনে নিব না। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটাই যে, যে আমর বিন সাঈদের দলে গিয়ে ভিড়বে এবং যে মাথা চাড়া দিবে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। আর এরপরে যদি কেউ আমাকে আল্লাহর ভয় দেখায় তবে তার গর্দানও উড়িয়ে দিব। এ বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। (এ বর্ণনার প্রথম রাবী করীমী মুসতাহাম মিথ্যাবাদী)

আসকারী বলেন, আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম সরকারী অনেক নথিপত্র ফার্সী থেকে আরবী ভাষায় স্থানান্তর করেন। তিনি সর্বপ্রথম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলছি, আব্দুল মালিক দশটি বিষয়ের প্রবর্তক। এর মধ্যে পাঁচটি ভালো এবং পাঁচটি মন্দ।

ইবনে আবী শায়বা 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রহ.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, মারওয়ানের সন্তানদের মধ্য থেকে আব্দুল মালিক বা অন্য কেউ ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার আযানের প্রথা চালু করেছিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক ইবনে জারীর থেকে রেওয়ায়েত করেন, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সর্বপ্রথম কাবা শরীফে রেশমী কাপড়ের গেলাফ চড়িয়ে দেন। মুফতীগণকে রেশমী কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে কাবা শরীফের জন্য রেশমী কাপড়ই সঠিক বলে অভিমত পেশ করেন। ইউসুফ বিন মাজশু বলেন, বিচার করার সময় আব্দুল মালিকের মাথার উপর তলোয়ারের ছায়া দান করা হতো। আসমায়ী বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল মালিককে জিজ্ঞেস করল হে আমিরুল মুমেনীন! আপনি অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, কেন হব না বল, প্রতি জুমআয় নিজের মেধা যেভাবে জনতার কাছে বিলিয়ে দিচ্ছি।

মুহাম্মাদ বিন হরব যিয়াদী বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল মালিককে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি্য সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, বিনয়ী এবং সর্ব অবস্থায় ইনসাফ করে।

ইবনে আয়শা বলেন, কোনো ব্যক্তি শহর, নগর অথবা গ্রাম থেকে আব্দুল মালিকের কাছে আসলে তিনি তাদের চারটি বিষয়ে সাবধান করে দিতেন। এক মিথ্যা বলবে না, কারণ মিথ্যার কোনো মূল্য নেই। দুই. আমি যে প্রশ্ন করব শুধু তারই উত্তর দিবে। তিন. আমার প্রশংসায় অহেতুক কল্পনার রং ছড়িয়ে দিবে না। চার. আমাকে আমার প্রজাবৃন্দের উপর উত্তেজিত করতে পারবে না।

মাদায়েনী বলেন, জীবনে অন্তিম মুহূর্তে আব্দুল মালিক তাঁর ছেলেকে এ উপদেশ দেন-সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, মতভেদ থেকে অনেক দূরে থাকবে, যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করবে, পুণ্যে দৃষ্টান্ত হবে, যুদ্ধের পূর্বে মৃত্যুকে আহ্বান করা হয় না, আর পুণ্যের পূর্ণতা এবং আলোচনা যুগ যুগ ধরে থেকে যায়। তিক্ততার মধ্যে মিষ্টি এবং প্রতাবশালীতার মাঝে নমনীয় হয়ে যাও।

ইবনে আবুল আ'লা আশ শায়বানী কবিতার মাধ্যমে আব্দুল মালিকের নসীহতগুলো তুলে ধরেছেন এভাবে- "অনেকগুলো তীর একত্রিত করে ভাঙা অসম্ভ ব। তবে একটি তীর যে কারো পক্ষে ভেঙে ফেলে সম্ভব। হে ওয়ালিদ! খিলাফতের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। হাজ্জাজের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখবে, তাকে

সম্মান করবে, কারণ তিনিই তোমাকে খিলাফত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। হে ওয়ালীদ! হাজ্জাজ তোমার বাহু এবং তলোয়ার। তার ব্যাপারে কারো অভিযোগ গ্রহণ করবে না। সবসময় তার প্রয়োজন হবে। আমার মৃত্যুর পর নিজের জন্য বাইআত করে নিবে। যদি বাইআত গ্রহণে কেউ অস্বীকার করে তাবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।"

আব্দুল মালিক যখন মৃত্যুপ্রায় সে সময় ওয়ালীদ পিতাকে দেখার জন্য এলে তিনি তৎক্ষণাত এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- "রোগীর শুশ্রুষাকারী আসছে। শুশ্রুষা করার জন্য নয়, বরং মরেছি কিনা তা দেখার জন্য।" এ কথা শুনে ওয়ালীদ কেঁদে উঠলে আব্দুল মালিক বললেন, মেয়েদের মত কেঁদে কি লাভ হবে। আমার মৃত্যুর পর নিজ পায়ে ভর করে দাঁড়াবে, বীরত্বকে কাজে লাগাবে, সিংহের পোশাক পরবে, নিজের তলোয়ার কাঁধে রাখবে, যে অবাধ্য হবে তার মস্তক ছিন্ন করে দেবে, আর যে নীরব থাকবে তাকে ছেড়ে দিবে।

আব্দুল মালিকের মন্দ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জঘন্য কাজটি হলো হাজ্জাজকে মুসলমান এবং সাহাবীদের শাসনকর্তা নিয়োগ করা। কারণ এ হতভাগ্য লোকটি অনেক আকাবেরে আসহাবে রসূল (সা.) এবং তাবেয়ীকে শহীদ করে দিয়েছে এবং হযরত আনাসসহ প্রমুখ সাহাবীদের গলায় ও হাতে মেহার এঁটে দিয়ে নির্যাতনের চরম দৃষ্টান্ত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

ইবনে আসাকির স্বরচিত 'ইতিহাস' গ্রন্থে ইবরাহীম বিন আদীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের হত্যাকাণ্ড, জায়েশ বিন দালজার হিজাযে নিহত হওয়া, রোম সম্রাট কর্তৃক মুসলিম বিশ্বে উত্তেজনা ছড়ানোর অপকৌশল এবং আমর বিন সাঈদের দামেশক -গমন থেকে এ চারটি বিপদ একই রাতে হলেও আব্দুল মালিকের চেহারায় কোনো বিষাদের ছাপ পড়েনি।

আসমায়ী বলেন, শা'বী, আব্দুল মালিক, হাজ্জাজ এবং ইবনুল কারীয়া এ চারজ ন হাসি-তামাশার সময়ও সাধারণত ভুল করতেন না।

সালাফী তৌরিয়াত গ্রন্থে লিখেছেন, আব্দুল মালিক একবার বাইরে গেলে জনৈক মহিলা এসে বলল, হে আমিরুল মুমেনীন, আমার ভাই ছয় শ'দিনার রেখে ইন্তেকাল করেছে। পরিবারের লোকেরা একটি দিনার দিয়ে আমাকে বলেছে, এটা তোমার মিরাছ। এ মাসয়ালাটি আব্দুল মালিকের বুঝে না আসায় শা'বীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বিষয়টি যথার্থ। মৃত্যু ব্যক্তির দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার শ' দিনার পাবে। মা পাবে এক শ' স্ত্রী পাবে পঁচাত্তর এবং বারোজন ভাই পাবে চব্বিশটি দিনার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভাগে একটি দিনারই পড়বে।

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নাফ গ্রন্থে লিখেছেন, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বলেছেন, আনন্দ উপভোগের জন্য বারবার বাঁদী, সন্তানের জন্য ফার্সী বাঁদী এবং সেবার জন্য হলে রোমান দাসী ক্রয় করবে।

ছালাবা বলেন, আব্দুল মালিক বলতেন, আমি রমযানে জন্মগ্রহণ করেছি, রমযানে মায়ের দুধ ছেড়েছি, রমযানে কুরআন মজীদ শেষ করেছি, রমযানে বালেগ হয়েছি, রমযানে উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছি, রমযানে খিলাফত পেয়েছি এবং রমযানেই মৃত্যু বরণ করব। রমযান এলে তিনি খুব ভয় পেতেন এবং রমযান চলে গেলে তিনি নিশ্চিত হতেন, কিন্তু তিনি শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর শাসনামলে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন, ইবনে উমর, আসমা বিনতে আবু বকর, আবু সাঈদ বিন মাআলা, আবু সাঈদ খুদরী, রাফে বিন খুদায়েজ, সালমা বিন আকওয়া, আরবাস বিন সারিয়া, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব, সায়িব বিন ইয়াযিদ, উমরের গোলাম আসলাম, আবু ইদরীস আল খাওলানী, শুরাইহ্ কাযী, আবান বিন উসমান বিন আফফান, আশা শায়ের, এবং অলংকার শাস্ত্রের নক্ষত্র আউয়ুব বিন কারিয়া, খালিক বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া, যাররা বিন জায়েশ, সিনান বিন সালামা বিন মুহবিক, সুয়াইদ বিন গাফলা, আবু ওয়ায়েল তারেক বিন শিহাব, মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ, আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আমর বিন হারীছ, আমর বিন সালামা, জরমী (রহ:)।

ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক

নাম ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক আবুল আব্বাস। শা'বী বলেন, ওয়ালীদকে তার পিতামাতা অত্যন্ত আদর-যত্নে লালিত পালিত করার কারণে তিনি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হন। রুহ বিন যানবাহ বলেন, আমি একদিন আব্দুল মালিকের নিকট গিয়ে তাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করব এ চিন্তা আমাকে কাতর করে দিয়েছে। আমি ওয়ালীদের নাম প্রস্তাব করলে তিনি বললেন, সে তো অশিক্ষিত। আমাদের কথাগুলো শুনতে পেয়ে ওয়ালীদ বিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট সেদিন থেকে লাগাতার ছয় মাস শিক্ষা অর্জন করেও কোনো জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি। আব্দুল মালিক বলতেন, এ বেচারা (ওয়ালীদ) খিলাফতের দণ্ড ধারণে অক্ষম।

আবুয যানাদ বলেন, ওয়ালীদের আরবী ভাষায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত

হয়। তিনি একবার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে মদীনাবাসীকে এভাবে সম্বোধন করছিলেন - يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ

আবু ইকরামা যাবী বলেন, একবার তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে এভাবে আয়াত তিলাওয়াত করেন - يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ সেদিন মিম্বারের পার্শ্বে উমর বিন আব্দুল আযীয এবং সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের মতো মনীষীরা বসে ছিলেন। অবশেষে সুলাইমান বললেন, দারুণ পড়েছেন।

ওয়ালীদ ছিলেন পরাক্রমশালী এবং উৎপীড়ক। আবু নায়ায়েম 'হালীয়া' গ্রন্থে ইবনে শওযবের বরাত দিয়ে লিখেছেন, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, ওয়ালীদ সিরিয়ায়, হাজ্জাজ ইরাকে, উসমান বিন জাবারাহ হিজাযে এবং কুররা বিন শারীক মিসরে - আল্লাহর কসম, গোটা পৃথিবী অত্যাচারের কালো আবরণে ছেয়ে গেছে।

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে ইবরাহীম যারআর বরাত দিয়ে লিখেছেন, ইবরাহীম বলেন, ওয়ালীদ আমাকে বললেন, খলীফাদের কোনো হিসাব নিকাশ হবে কি? আমি বললাম, আপনি না দাউদ (আ.)-কে বেশি মর্যাদাশীল? আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ.)-কে খিলাফত এবং নবুওয়াত উভয়টা দান করেছিলেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে -

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً -

এরপরও তিনি ভয় করেছেন। ওয়ালীদ জিহাদ করেছেন। নিজ খিলাফত-কালে অনেক জটিল ফতোয়া সংকলন করায়েছেন। এতিমদের খতনা করাতেন এবং শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবক এবং অন্ধদের জন্য পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি মুফতী এবং ভিক্ষুকদের ভাতা দিতেন।

ইবনে আবী আইলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওয়ালদের প্রতি করুণা করুন। ওয়ালীদের শাসনামলে ভারতবর্ষ এবং স্পেন হস্তগত হয়। তিনি দামেশকের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তুর স্থাপন করেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিক্ষুকদের চান্দীর পেয়ালা দান করেন।

আব্দুল মালিক ওয়ালীদকে ৮৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ৮৭ হিজরীতে তিনি দামেশকের জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তুর স্থাপন করেন এবং মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এ বছর বীকন্দ, বোখারা, সরওয়ানিয়া, মাতুমুরা, কামীম এবং বাহিতুল ফুরসান প্রভৃতি শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। একই বছর উমর বিন আব্দুল আযীয (সে সময় তিনি মদীনার

শাসনকর্তা ছিলেন) হজ্জ করেন এবং কুরবানীর দিন ভুল করে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের ফলে দারুণ মর্মাহত হন। ৮৮ হিজরীতে জরছুমা এবং তাওয়ানা, ৮৯ হিজরীতে জারীরা, মুতারাকা এবং মৌরাকা, ৯১ হিজরীতে নসফ, কাশ, শআরবান, মাদায়েন, বাহরে আযার বায়জান, ৯২ হিজরীতে গোটা স্পেন, আরমাবিল শহর, কাতারবুন, ৯৩ হিজরীতে দেবল, দাবাজা, বায়বা, খারেজম, সমরকন্দ, সাদ ৯৪ হিজরীতে কাবুল, ফারগানা, শাশ, সান্দারাহ, ৯৫ হিজরীতে মুকান, মদীনাতুল বাবা, ৯৬ হিজরতিে তাউ হস্তগত হয়। এ বছর জমাদিউল আখের মাসের মাঝামাঝিতে ওয়ালীদ ইন্তেকাল করেন।

যাহাবী বলেন, ওয়ালীদের যুগে জিহাদ অব্যাহত ছিল এবং হযরত উমর ফারুকের যুগের মতো আইনশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়।

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, কবরে নামানোর সময় ওয়ালদিকে কাফনের মধ্য থেকে মাটিতে পা মারতে দেখেছি।

ওয়ালীদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে লূত সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করলে অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হয় তা আমার খেয়াল থাকতো না। ওয়ালীদের শাসনামলে যেসব প্রসিদ্ধ ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তাঁরা হলেন, উতবা বিন আব্দুস সালামা, মুকাদ্দাস বিন মাআদি করব, আব্দ বিন বশরুল মাযনী, আব্দুল্লাহ বিন আবী আওনী আবুল আলীয়া, জাবের বিন যায়েদ, আনাস বিন মালিক, সহল বিন সাদ, সায়েব বিন ইয়াযিদ, সায়েব ইবনে খালাত, খাবীব বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, বিলাল বিন আবী দারদা, সাইদ বিন মুসায়্যাব, আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান, আবু বকর বিন আব্দুর রহমান, সাঈদ বিন যুবায়ের যাকে হাজ্জাজ শহীদ করেছে, ইবরাহীম নাখয়ী, মুতাররফ, ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ, কবি উজাজ প্রমুখ।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক আবু আইয়ুবকে বনু উমাইয়্যাদের মধ্যে সর্বোত্তম বাদশাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তার পিতা ওয়ালিদের পর তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তিনি ৯৬ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে ভ্রাতার পর মসনদে আরোহণ করেন। তিনি পিতা আব্দুল মালিক এবং আব্দুর রহমান বিন হুরায়রাহ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন এবং তার ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ এবং যহরী হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

তিনি সুমিষ্টভাষী, বাগ্মী, ন্যায়পরায়ণ এবং জিহাদের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক পুণ্যময় কাজ

করেছিলেন। উমর বিন আব্দুল আযীযের মতো মহান নেতা ছিলেন তার মন্ত্রী যিনি সর্বদা তাকে সৎ উপদেশ দিতেন এবং কল্যাণকর কাজের দিকে আহ্বান করতেন। তিনি হাজ্জাজ কর্তৃক প্রশাসনের নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে একসঙ্গে চাকরিচ্যুত করেন এবং ইরাকের জেল খানায় আটক সকলকে মুক্তি দেন। বনু উমাইয়্যার খলীফাগণ সবসময় শেষ ওয়াক্তে (বিলম্বে) নামায আদায় করতেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের পরামর্শে তিনি আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়তে শুরু করেন।

ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা সুলায়মানের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন তিনি তার খিলাফতকালে দুটি চমৎকার কাজ করেছেন। এক. আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার প্রবর্তন এবং দুই. উমর বিন আব্দুল আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যাওয়া।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক নাচ-গান নিষিদ্ধ করেন। তার খোরাক ছিল বেশি। কোনো এক ভোজসভায় সত্তরটি আনার, ছয় মাসের একটি ছাগল, ছয়টি মোরগ এবং চার কেজি কিশমিশ একাই খেয়ে ফেলেন।

ইয়াহইয়া গাসসানী বলেন, একদা তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের তারুণ্যদীপ্ত অবয়ব দর্শনে বললেন, মুহাম্মাদ (সা.) নবী ছিলেন, আবু বকর (রা.) সিদ্দীক (সত্যবাদী) ছিলেন, উমর (রা.) ফারুক (পৃথককারী) ছিলেন, উসমান (রা.) লজ্জাশীল, মুআবিয়া (রা.) বীর, ইয়াযিদ ধৈর্যশীল, আব্দুল মালিক রাজনীতিবিদ, ওয়ালীদ অত্যাচারী এবং আমি নওজোয়ান বাদশাহ। তার এ বক্তব্যের এক মাসের মধ্যেই ৯৯ হিজরীর সফর মাসের দশ তারিখ জুমাআর দিন তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার যুগে যুরযান, হাদীদ দুর্গ, সরদা, শাকা, তবরিসতান এবং সুফালিয়া শহর বিজিত হয়। আর যে সব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন- কায়েস বিন আবু হাযিম, মাহমুদ বিন লাবীদ, হাসান বিন হোসাইন বিন আলী, ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস কারীব, আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ, নাখআ প্রমুখ।

আব্দুর রহমান বিন হাসসান কিনানী বলেন, সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক যুদ্ধের ময়দানে ওয়াবেক নামক জনপদে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি রাজা বিন হায়াকে জিজ্ঞেস করেন, আমার পর খিলাফতের তখতে কে আসীন হবেন? আমি কি আমার ছেলেকে উত্তরাধিকার মনোনীত করব? রাজা বললেন, আপনার ছেলে এখানে নেই। সুলায়মান বললেন, অন্য ছেলেকে করতে পারি? রাজা বললেন, তিনি বয়সে ছোট। সুলায়মান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মতে সর্বোত্তম কে? রাজা বললেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের চেয়ে

সর্বোত্তম আর কেউ নেই। আপনি তাকেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে পারেন। সুলায়মান বললেন, আমার ভাই উমর বিন আব্দুল আযীযের খিলাফত মেনে নেবে না বলেই আমার ধারণা। রাজা বললেন, এর পদ্ধতি হল আপনি মোহর অঙ্কিত ওসীয়তনামা লিখে দিন যে, উমর বিন আব্দুল আযীযের পর ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক উত্তরাধিকার মনোনীত হবেন। অতঃপর দেশবাসীকে ডেকে বলুন, এ অসীয়ত নামায় যার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তার নামে বাইআত করুন। সুলায়মান এ অভিমতকে পছন্দ করে কাগজ, কলম ও কালি চেয়ে এক ওসীয়ত নামা প্রস্তুত করে রাজাকে তা দিয়ে বললেন, এ অসীয়ত নামায় যার নাম উল্লেখ রয়েছে তার ব্যাপারে এক্ষুণি বাইরে গিয়ে লোকদের নিকট বাইআত গ্রহণ করুন। রাজা বাইরে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমিরুল মুমেনীনের নির্দেশে আমি এর মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তির নামে আপনাদের নিকট বাইআত নিচ্ছি। লোকেরা বলল, এর মধ্যে কার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে? রাজা বললেন, এতে মোহর লাগানো রয়েছে। খলীফার মৃত্যুর পর তার নাম জানা যাবে। লোকেরা বলল, আমরা এভাবে বাইআত করব না। রাজা বিষয়টি খলীফার কানে দিলে খলীফা বললেন, জল্লাদ এবং পুলিশদের সাথে নিয়ে জনতাকে একত্রিত করে বাইআত নিন। যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবেন। অবশেষে এভাবেই বাইআতের কাজ সম্পন্ন হয়।

রাজা বলেন, বাইআত গ্রহণের পর ফেরার পথে হটাৎ হিশামের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, রাজা! আমার ব্যাপারে আমিরুল মুমেনীনের সিদ্ধান্ত কি? যদি বঞ্চিত হই তবে নিজের জন্য ব্যবস্থা করবো। আমি বললাম, আমিরুল মুমেনীন বিষয়টি গোপন রেখেছেন, আমি কিভাবে বলবো। অতঃপর উমর বিন আব্দুল আযীযের সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাজা! সুলায়মানের ক্ষেত্রে আমার সংশয় রয়েছে। আমার মন বলছে, তিনি যেন আমাকে খলীফা মনোনীত না করেন। আমার মধ্যে খিলাফতের দক্ষতা ও যোগ্যতা নেই। অতএব যদি আপনি এ ব্যাপারে অবগত থাকেন তাহলে বলুন আমি যে কোন পদ্ধতিতে চেষ্টার মাধ্যমে এ আপদ মাথা থেকে নামিয়ে দিব। আমি হিশামের মতো তাকেও একই জবাব দিলাম।

সুলায়মানের ইন্তেকালের পর অসীয়ত নামায় উমর বিন আব্দুল আযীযের নাম দেখে আব্দুল মালিকের সন্তানদের চেহারা বিবর্ণ ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের নাম শুনলেন তখন তারা আশ্বস্ত হন এবং উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট এসে খিলাফতের দায়িত্ব

তার উপর অর্পণ করেন। আর উমর বিন আব্দুল আযীয কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। সে মুহূর্তে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি তার ছিল না। অবশেষে লোকেরা তার বাহু ধরে মিম্বরে উঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানেও অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। রাজা বললেন, কেন আপনারা দাঁড়িয়ে আমিরুল মুমেনীনের বাইআত গ্রহণ করছেন না। অতঃপর তারা বাইআত করলেন এবং রাজা উমর বিন আব্দুল আযীয়ের হাত ধরে লোকদের প্রতি বাড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হামদ এবং সানার পর বললেন, আমি এ বিষয়ের মিমাংসাকারী নই; বরং বহনকারী। আমি কোনো বিষয়ের প্রবর্তক নই; বরং পূর্ববর্তীতের অনুগামী। অন্যান্য জনপদের লোকেরাও যদি আপনাদের মতো আমার আনুগত্য মেনে নেয় তবেই আমি আপনাদের খলীফা হবো, অন্যথায় নয়। এ বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলে সামরিক আস্তাবল থেকে চমৎকার একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হলো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকেরা বলল, এটা খলীফার বাহন, রাজকীয় অশ্ব। তিনি বললেন, এটা আমার প্রয়োজন নেই। আমার ঘোড়াই যথেষ্ট। অবশেষে তার নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে আসা হলো এবং এতে চড়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। অতঃপর তিনি কালির দোয়াত নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শাসনকর্তার নিকট স্বহস্তে একটি ফরমান লিখলেন। রাজা বলেন, আমার স্মরণ রয়েছে তিনি কোথাও নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা লিখেননি। তিনি যখন ফরমান লিখছিলেন তখন আমি দেখলাম তার কলমের অগ্রভাগ দিয়ে খিলাফতের শাসনকার্য পরিচালনা দক্ষতা ও বিজ্ঞাত প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্ণিত রয়েছে, একবার মারওয়ান বিন আব্দুল মালিক এবং সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের মধ্যে খিলাফত নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সুলায়মান তাকে গালি দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয তার মুখে হাত রেখে বললেন, তিনি ভালো মানুষ, খলীফা, আপনার বড় ভাই, আপনি চুপ করুন। মারওয়ান চুপ করলেন, তবে উমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, আপনি আমাকে হত্যা করে ফেললেন, আমার শরীরে আগুন ধরে গেছে। সে রাতেই মারওয়ান ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া যিয়াদ বিন উসমান থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মানের ছেলে আইয়ুব মারা গেলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আমিরুল মুমেনীন! আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদ আপদের সময় ধৈর্যধারণ করবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)

উমর বিন আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান নেককার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম নম্বর খলীফা। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান গনী, আলী মুর্তজা এবং উমর বিন আব্দুল আযীয-এরা পাঁচজন খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত। এ রেওয়ায়েতটি আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।

তিনি ৬১ হিজরী অথবা ৬৫ হিজরীতে মিসরের প্রখ্যাত হুলওয়ানে মুসাফাত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন, মায়ের নাম উম্মে আসেম বিনতে আসেম বিন উমর বিন খাত্তাব (রা.)। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ঘোড়ার পদাঘাতে তাঁর মুখে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সে সময় তাঁর পিতা তাঁর রক্তাক্ত চেহারা মুছে দিতে দিতে বলেন, ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট বনূ উমাইয়্যাগণ ভাগ্যবান। (ইবনে আসাকির)

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, আমার বংশে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন থাকবে। তাঁর শাসনে পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে। (তিরমিযী) পরবর্তীতে তাঁর বচন সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হায়! আমি যদি আমার সেই বংশধরের যুগ পেতাম যিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। (ইবনে সাদ)

ইবনে উমর বলেন, আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম যে, উমর বিন খাত্তাবের বংশ থেকে তাঁর মত ন্যায়পরায়ণ খলীফার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কোনো দিন কিয়ামত হবে না।

বেলাল বিন আব্দুল্লাহ বিন উমরের চেহারায় ক্ষতচিহ্ন থাকায় লোকেরা মনে করত হযরত উমর বিন খাত্তাবের বচনে উল্লিখিত এই সেই ব্যক্তি। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা উমর বিন আব্দুল আযীযকে প্রেরণ করেন।

উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) যাঁদের নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন– তাঁরা হলেন, তাঁর পিতা আব্দুল আযীয, হযরত আনাস, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব, ইবনে কারিয, ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, আমের বিন সাদ, সাঈদ বিন মুসায়্যেব, উরওয়া বিন যুবায়ের, আবু বকর বিন আব্দুর রহমান, রাবীআ বিন সমরা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁরা হলেন, যহরী, মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী, মাসলামা বিন আব্দুল মালিক, রাজা বিন হায়া প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

তিনি কৈশোরে কুরআন শরীফ হিফয করার পর তাঁর পিতা জ্ঞান অর্জনের জন্য মদীনার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহর নিকট পাঠান। ছাত্রজীবনে

পিতার মৃত্যু হওয়ায় আব্দুল মালিক তাঁকে দামেশকে ডেকে নেন এবং নিজ কন্যা ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি খলীফা মনোনীত হওয়ার আগে থেকেই অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তবে তাঁর পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং রুচিসম্মত আহার্য গ্রহণের জন্য লোকেরা বিষয়টিকে অতিশয়োক্তি বলে অভিহিত করতো।

ওয়ালীদ তার শাসনামলে উমর বিন আব্দুল আযীযকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৮৬ হিজরী থেকে ৯৩ হিজরী পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনার পর তাঁকে অপসারণ করা হলে তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ওয়ালীদ নিজের ভাই সুলায়মানকে উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তদস্থলে স্বীয় পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চাইলে আরবের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক খলীফার অভিমতকে সমর্থন করলেও উমর বিন আব্দুল আযীয বিরোধিতা করে বলেছিলেন, সুলায়মানের বাইআত আমার শিরধার্য এবং আমি এ বিষয়ে অটল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়ালীদ তাঁকে তিন বছর বন্দী করে রাখেন। অবশেষে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। সুলায়মান তাঁর এ বদান্যতার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এবং সুলায়মান তাঁর পর উমর বিন আব্দুল আযীযকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

যায়েদ বিন আসলাম হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাযের মত উমর বিন আব্দুল আযীয ছাড়া কারো পেছনে পড়িনি। সে সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন এবং মদীনা শরীফে নামায পড়াতেন। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, তিনি রুকু এবং সেজদাগুলো দীর্ঘ করতেন, আর দাঁড়ানো ও বসানোগুলো সংক্ষিপ্ত করতেন। (বাইহাকী) জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয উমাইয়্যা বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা। তিনি কিয়ামত দিবসে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতির মহান নেতা হিসেবে উত্থিত হবেন।

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের অনেক সহচর ছিলেন যাঁরা শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

আবু নঈম সহীহ সনদে রিবাহ বিন উবায়দাহ থেকে বর্ণনা করেন, একদিন উমর বিন আব্দুল আযীয নামায পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক অপরিচিত বৃদ্ধ মানুষ তাঁর হাত ধরলেন এবং পাশাপাশি চলতে শুরু করলেন। নামায শেষে কোনো প্রশ্নকারী বৃদ্ধের পরিচয় জানতে চাইলে উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, । তুমি তাঁকে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি হলেন হযরত খিযির (আ.)। তিনি আমাকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার খলীফা হওয়ার সংবাদ এবং সুবিচার, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ দিতে এসেছিলেন।

আবু হাশিম বলেন, জনৈক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট তার স্বপ্নের বিবরণ এভাবে পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এসেছেন, তাঁর ডান দিকে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং বাম দিকে উমর ফারুক (রা.)। সামনে দুই বিচারপ্রার্থী, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে (উমর বিন আব্দুল আযীয) ইশারা করে বললেন, তুমি খলীফা হলে এদের (আবু বকর এবং উমর) পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। এ কথা শ্রবণে উমর বিন আব্দুল আযীয বর্ণনাকারীকে কসম করতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঠিক এমনটাই দেখেছ? বর্ণনাকারী কসম খেলে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয কেঁদে ফেললেন।

৯৯ হিজরীর সফর মাসে সুলায়মান উমর বিন আব্দুল আযীযের ব্যাপারে লোকদের থেকে বাইআত নেন। তাঁর খিলাফতের সময়সীমা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময়সীমার সমান দু'বছর পাঁচ মাস ছিল। এ সময়ের মধ্যে তিনি অত্যাচার ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফের রাজ্য কায়েম করেছিলেন।

হাকিম বিন উমর বলেন, একদা খলীফাতুল মুসলিমীন উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট (তাঁর নিজস্ব-অনুবাদক) আস্তাবলের প্রহরী এসে অশ্বের পরিচর্যার খরচাদি চাইলে তিনি বললেন, এ সকল অশ্ব সিরিয়ায় নিয়ে বিক্রয় করে দাও এবং বিক্রয়ের প্রাপ্ত অর্থ বাইতুল মালে জমা করো। আমার জন্য শ্বেত খচ্চরই যথেষ্ট।

উমর বিন যর বলেন, সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের জানাযা থেকে ফিরে আসার পর উমর বিন আব্দুল আযীযের গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আজ আপনি এত মর্মাহত কেন? উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, পৃথিবীর মধ্যে আজ আমি সর্বাপেক্ষা মর্মাহত ও ধ্যানমগ্ন। আমার মন চাইছে ক্ষমতা ধারণের পূর্বে ক্ষমতার দাবীদার বের হলে ক্ষমতা তাকে দিয়ে দিতাম।

উরওয়া বিন মুহাজির কর্তৃক বর্ণিত, উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা মনোনীত হবার পর দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানার পর বললেন, আমি বিচারক নই, বিচারকের রায় পঠনকারী। আমি অনুসরণীয় নই, অনুসরণকারী, আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই; বরং আমার বোঝা অনেক বেশি। যে অত্যাচারী নেতা থেকে দূরে সরে যায় সে অত্যাচারী নয়, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির মধ্যে মানুষের আনুগত্য নেই।

যহরী কর্তৃক বর্ণিত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সদকা আদায়ের সর্বজন স্বীকৃত নীতি মোতাবেক উমর বিন আব্দুল আযীয সালেম বিন আব্দুল্লাহর নিকট পত্র লিখলে তিনি জবাবে রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করার পর পত্রের শেষাংশে লেখেন, আপনি যদি লোকদের সাথে উমর বিন খাত্তাবের মত আচরণ করতে পারেন তবে আপনার মর্যাদা তাঁর চেয়েও বেশি হবে। কারণ এযুগের লোকেরা সাহাবী নয়।

হযরত হাম্মাদ (রা.) বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা হওয়ার পর কেঁদে কেঁদে আমাকে বললেন, হাম্মাদ! আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে। আমি বললাম, আপনি দিনার-দেরহাম কতটুকু ভালোবাসেন? তিনি বললেন, মোটেও না। আমি বললাম, তাহলে আপনার ভয় কিসের? আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি খলীফা হয়ে তাঁর ভাইদের সমবেত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফিদকের বাগান ছিল, এর আয় দিয়ে তিনি বনূ হাশিমের শিশুদের লালন-পালন করতেন এবং বিধবাদের বিয়ে দিতেন। হযরত ফাতেমা (রা.) এ বাগান নিতে চাইলে তিনি (সা.) তা দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে বাগানটি আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক এবং মারওয়ানের হাত বদল হয়ে আজ আমার হস্তগত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বস্তু নিজের মেয়েকে দেননি তা আমার জন্য কিভাবে হালাল হতে পারে! অতএব তিনি এর আয় যেভাবে ব্যয় করেছেন আমিও তাই করব ইনশাআল্লাহ।

লাবীছ বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা হওয়ার পর নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে রাষ্ট্রের হিসাব নেন এবং এতে করে রাষ্ট্রের যে সম্পদ উদ্ধার হয় তা তিনি অত্যাচারের মাল হিসেবে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করেন।

আসমা ইবনে উবায়েদ বলেন, একদা উকাষা বিন সাঈদ বিন আস তাঁর নিকট এসে এ অভিযোগ করেন যে, আমিরুল মোমিনীন! আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমাকে উপঢৌকন দিতেন যা আপনি আজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে আমি অর্থ সংকটে পড়েছি। আমার নিকট রাষ্ট্র কর্তৃক নিষ্কর জমিদারী রয়েছে। আপনি হুকুম দিলে আমি স্বীয় পরিবারের জন্য এখান থেকে কিছু নিব। তিনি বললেন, আমার মতে নিজের কষ্টার্জিত সম্পদই সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর তিনি আবার বললেন, তুমি মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ করো, যদি তুমি সংকটে থাক তাহলে প্রাচুর্যতা অনুভব করবে। আর যদি আভিজাত্যের মোড়কে আবদ্ধ থাক তবে দরিদ্রতার কথা মনে পড়বে।

ফারাত বিন সায়েব বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিককে তার পিতা অনেক মূল্যবান অলংকারাদি দিয়েছিলেন, একদিন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তোমার অলংকারগুলো বাইতুল মালে জমা দাও। অন্যথায় আমাকে পছন্দ না হলে তোমাকে পৃথক করে দিব। কারণ আমি, তুমি এবং তোমার অলংকারাদি এক ঘরে থাকাটা আমি মোটেও সহ্য করতে পারছি না। ফাতেমা বললেন, আমি আপনাকেই প্রাধান্য দিব। আপনি আমার অলংকারগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দিন। তিনি তাই করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক খলীফা হলে তিনি তার অলংকারগুলো ফেরত দিতে চাইলে ফাতেমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, স্বামীর মহত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর জীবদ্দশায় যে জিনিস আমি দিয়েছি তাঁর ইন্তেকালের পর তা ফেরত নেব না।

কথিত আছে, জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট এ মর্মে পত্র লেখেন যে, আমাদের শহরের রাস্তা-ঘাটগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। আমিরুল মোমিনীনের নির্দেশ হলে কিছু অর্থ খরচ করে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করব। জবাবে তিনি লেখেন, আমার পত্র হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে তোমার শহরের দুর্গগুলোতে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করো। আর শহরের রাস্তাগুলো অত্যাচার মুক্ত করো, এটাই হবে সেগুলোর মেরামত।

ইবরাহীম সকুফী বলেন, তিনি বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি জেনেছি মিথ্যা বলা নিন্দনীয় তখন থেকে আর কখনো মিথ্যা বলিনি।

কায়েস বিন জাবের বলেন, বনূ উমাইয়্যার মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীযের দৃষ্টান্ত হলো ফিরাউনের বংশের মধ্যে একজন মুমিনের মত।

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেমন এক নবীর জন্য অন্য নবীর শপথ নিয়েছেন, অনুরূপ উমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য তিনি লোকদের থেকে শপথ নিয়েছেন। ওহাব বিন মানবাহ বলেন, এ উম্মতের মাহদী হলেন উমর বিন আব্দুল আযীয (র.)।

মুহাম্মাদ বিন ফুযালা বলেন, একদা উমর বিন আব্দুল আযীযের পুত্র আব্দুল্লাহ মরুভূমির মধ্যে জনৈক সন্ন্যাসীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সন্ন্যাসী তাকে দেখে কাছে এলেন। অথচ এ সন্ন্যাসী ইতোপূর্বে কারো নিকট গমন করেননি। সন্ন্যাসী বললেন, আপনি কি জানেন আমি কেন আপনার কাছে এসেছি? আব্দুল্লাহ বললেন, এ ব্যাপারে আমি অবগত নই। তিনি বললেন, আপনি এক ন্যায়পরায়ণ নেতার ছেলে হওয়ার কারণে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি, যাঁর বিবরণ আমি পূর্ববর্তী কিতাবে পড়েছি।

হাসান কাযাব বলেন, তাঁর খিলাফতকালে বাঘ এবং ছাগল এক সাথে চরতে দেখে বললাম, সুবহানাল্লাহ বাঘ-বকরী একত্রে থেকেও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। এ কথা শুনে রাখাল বলল, মাথা বিশুদ্ধ হলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।

মালিক বিন দিনার বলেন, তিনি খলীফা হওয়ার পর জনৈক রাখাল বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এমন কোন ব্যক্তি খলীফা মনোনীত হয়েছেন যে, বাঘ আমার ছাগলের ক্ষতি করে না।

মূসা বিন আয়েন বলেন, তাঁর শাসনামলে আমি কারমানের ছাগল চরাতাম।

সে সময় বাঘ ও বকরী একত্রে থাকতো। কিন্তু বাঘ বকরীর উপর আক্রমণ করতো না। একদিন বাঘকে বকরীর উপর হামলা করতে দেখে বললাম, মনে হয় আজ সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিটি পরপারে যাত্রা করেছেন। বস্তুত অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি সে দিনেই ইন্তেকাল করেন।

ওলীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি জানতাম স্বপ্নে খোরাসানের এক লোককে জনৈক ব্যক্তি বলল, বনূ উমাইয়্যার মধ্যে ক্ষতচিহ্নবিশিষ্ট একজন খলীফার আবির্ভাব হলে তুমি গিয়ে তাঁর বাইআত গ্রহণ করবে। কারণ তিনি হলেন নিষ্ঠাবান নেতা. লোকটি বনূ উমাইয়্যার প্রতিটি খলীফার বিবরণ সংগ্রহ করতো। অবশেষে উমর বিন আব্দুল আযীয খিলাফতের তখত অলংকৃত করলে লোকটি পুনরায় পরপর তিন দিন একই স্বপ্ন দেখায় খোরাসান থেকে এসে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের বাইআত গ্রহণ করেন।

হাবীব বিন হিন্দাল আসলামী বলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যেব আমাকে বললেন, আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক এবং উমর বিন আব্দুল আযীয–এ তিনজন হলেন খলীফা। আমি বললাম, আমি আবু বকর এবং উমরকে চিনি। কিন্তু উমর বিন আব্দুল আযীয আবার কে? তিনি বললেন, যদি তাঁর শাসনামলে তুমি জীবিত থাক তাহলে জানতে পাবে। গ্রন্থকার বলেন, সাঈদ বিন মুসায়্যেব তাঁর খিলাফতের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আউফ বলেন, ইবনে সিরীনকে মদ্যপ অবস্থায় কসম করা সংক্রান্ত মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ইমাম মাহদী অর্থাৎ উমর বিন আব্দুল আযীয মদ্যপ অবস্থায় কসম করতে নিষেধ করেছেন।

হাসান বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয হলেন মাহদী। অন্যথায় ঈসা বিন মারইয়াম (আ.) ছাড়া কোনো মাহদী নেই।

মালিক বিন দিনার বলেন, লোকেরা মালিককে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলে থাকে। আসলে উমর বিন আব্দুল আযীয হলেন ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি। কারণ দুনিয়ার ঐশ্বর্য পেয়েও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইউনুস বিন আবু শাবীব বলেন, তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। খিলাফত লাভের পর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।

উমর বিন আব্দুল আযীযের পুত্র বলেন, আবু জাফর মানসুর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পিতা খলীফা হওয়ার সময় আপনার আয় কত ছিল। আমি বললাম, চল্লিশ হাজার দিনার। তিনি বললেন, পরবর্তীতে এর পরিমাণ কত হয়েছে? বললাম, চার'শ দিনার।

মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বলেন, অমি রুগ্ন উমর বিন আব্দুল আযীযকে দেখতে গিয়ে তাঁর পোশাক অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন দেখে তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে বললাম, তুমি কেন তাঁর পোশাক পরিষ্কার করে দাও না? তিনি বললেন, এ ছাড়া তাঁর কোনো দ্বিতীয় পোশাক নেই যে, এ পোশাক পরিষ্কারের সময় অন্য পোশাক পরতে পারবে।

তার মুক্ত দাস আবু উমাইয়্যা খাসমী বলেন, আমি একদিন আমার মুনিবকে বললাম, প্রতিদিন মসুর ডাল খাবেন না, জবাবে তিনি বললেন, বৎস! তোমার মনিবের আহার্য তো এটাই।

আউন বিন মুআম্মার বলেন, একদা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ফাতেমা! আজ আঙুর খেতে মন চাইছে, তোমার কাছে এক দিরহাম হবে? ফাতেমা বললেন, আমি কোথায় পাব? আপনি তো আমিরুল মোমিনীন, অথচ আপনার কাছে একটিমাত্র দিরহাম নেই যা দিয়ে আঙুর কিনতে পারেন। তিনি বললেন, তুমি যে অর্থের কথা বলছ তা দিয়ে আঙুর খেতে না পাওয়া আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ করুণা। সেই অর্থের অপব্যয় করলে জাহান্নামের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতাম না। ফাতেমা বলেন, খলীফা হওয়ার পর থেকে মৃত্যু অবধি তাঁর গোসল ফরয হতে দেখিনি।

সহল বিন সদকা বলেন, তিনি খলীফা হওয়ার পর তাঁর বাসভবন থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তিনি তাঁর বাঁদীদের বলেছেন, আমার উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ হওয়ায় আমি তোমাদের ব্যাপারে দারুণ উদাসীন হয়ে গেছি। অতএব যারা মুক্ত হতে চাও তারা চলে যাও, আর যারা থাকবে তাদের প্রতি শর্ত হলো আমি তাদের আর কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না। এ কথা শুনে বাঁদীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বলেন, তিনি বাড়িতে এসে সেজদায় নিজের মাথাকে লুটিয়ে দিতেন, অঝোর ধারায় কেঁদে চলতেন এবং মুনাজাত করতেন। এভাবে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। যখন ঘুম ভাঙতো তখন থেকে সারা রাত আবার এভাবেই কাটিয়ে দিতেন।

ওলীদ বিন সায়েব বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি খোদাভীরু লোক কাউকে দেখিনি।

সাঈদ বিন সুয়ায়েদ বলেন, একদা তিনি তালিযুক্ত পোশাক পরে জুমআর নামায পড়াতে যাচ্ছিলেন। তা দেখে জনৈক ব্যক্তি আরয করলো। আমিরুল মোমিনীন, আল্লাহ আপনাকে সব কিছু দেবার পরও আপনি কেন পোশাক তৈরি

করছেন না? তিনি দীর্ঘক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। অতঃপর মস্তক তুলে বললেন, তুমি শহরের মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর লোক, আর ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষের ত্রুটি মার্জনা করা সর্বোত্তম।

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, আমি পঞ্চাশ বছর খলীফা হয়ে থাকলেও পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো না। আমি শুধু তোমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার লালসা বের করে দিতে চাই। কিন্তু আমার ভয় হয় তোমাদের মন যেন বিষিয়ে না উঠে।

ইবরাহীম বিন মায়সারা বলেন, আমি তাউসকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর বিন আব্দুল আযীয কি মাহদী? তিনি বললেন, শুধু মাহদীই নন, তিনি একজন সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ সৎ শাসক।

উমর বিন আ'সাদ বলেন, লোকেরা খলীফার নিকট প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে আসতো, আর তিনি তা গ্রহণ না করে তাদেরকে সেগুলো ইচ্ছেমত খরচ করতে বলতেন। আর এভাবে তিনি লোকদের ঐশ্বর্যশালী করেন।

জোরিয়া বলেন, একদিন আমি ফাতেমা বিনতে আলী বিন আবু তালিবের কাছে গেলে তিনি উমর বিন আব্দুল আযীযের প্রশংসা করে বললেন, তিনি জীবিত থাকলে আমার আর কারো প্রয়োজন হতো না।

আতা বিন আবু রিবাহ বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক আমাকে বলেছেন, তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হওয়ার পর ঘরে এসে জায়নামাযে বসে এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, আমি আরয করলাম, আমিরুল মোমিনীন! আপনি এত কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, ফাতেমা! আমার কাঁধে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বোঝা চাপানো হয়েছে। আমি সকল ক্ষুধার্থ, দরিদ্র, মুমূর্ষু, বস্ত্রহীন, উৎপীড়িত, বন্দী, মুসাফির, বৃদ্ধ, এতিমসহ পৃথিবীর সকল দুর্ভাগ্য লোকদের ভাগ্য নিয়ে ভাবছি। আর এদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাব যদি দিতে না পারি– সে জন্য কাঁদছি।

হামীদ বলেন, একদা হাসান উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট আমার মারফত চিঠি লেখেন। এতে আমার বড় পরিবারে দারুণ অর্থ সংকটের উল্লেখ করলে তিনি পরিতোষ প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ইমাম আওযায়ী বলেন, নিজের ব্যক্তিগত ক্রোধ যেন প্রকাশ না পায় সে জন্য অপরাধীকে প্রথমে তিনদিন বন্দী করে রাখতেন তিনি।

জেয়াইরিয়া বিন আসমা বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, আমার অন্তর বড়ই প্রাচুর্যময়। মনের একটি ইচ্ছে পূরণ করলে এর চেয়ে বড় ইচ্ছে জাগ্রত হয়।

আমর বিন মুহাজির বলেন, বাইতুল মাল থেকে প্রতিদিন তাঁকে দু'দিরহাম দেয়া হতো। ইউসুফ বিন ইয়াকুব কাবলী বলেন, তিনি রাতে চামড়া উড়তেন। আতা খোরাসানী বলেন, তিনি পানি গরম করে আনতে বললে তার গোলাম শাহী রন্ধনশালা থেকে পানি গরম করে আনে, এ কথা জানতে পেরে তিনি শাহী রন্ধনশালার জ্বালানি বাবদ এক দিরহাম প্রদান করেন।

আমর বিন মুহাজির বলেন, তিনি খিলাফতের কাজেই শুধু রাষ্ট্রীয় প্রদীপ ব্যবহার করতেন। কাজ শেষে তা নিভিয়ে দিতেন এবং নিজস্ব বাতি জ্বালাতেন।

হাকিম বিন উমর বলেন, উমাইয়্যা বংশের খলীফাদের নীতি ছিল পদের নিরাপত্তার জন্য সর্বদা তিনশ' চৌকিদার এবং চারশ' পুলিশ মোতায়েন থাকতো, কিন্তু তিনি খলীফা হওয়ার পর বললেন, আমার নিরাপত্তার জন্য এদের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, যারা আমার সাথে থাকতে চাও তাদের প্রত্যেককে দশ দিনার দিব, আর যারা থাকতে চাও না তারা নিজ বাড়িতে ফিরে যাও।

উমর বিন মুহাজির বলেন, একবার তিনি আপেল খাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তার এক নিকটাত্মীয় হাদিয়া হিসেবে কিছু আপেল পাঠিয়ে দেন। এতে করে তিনি হাদিয়া দানকারীর প্রশংসা করেন এবং দারুণ আনন্দিত হন। অবশেষে গোলামকে ডেকে বললেন, হাদিয়া প্রেরণকারীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, তার হাদিয়া আমার মাথা ও চোখের মধ্যে রইল। তিনি আমাদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু। অতঃপর তিনি আপেলগুলো ফেরত দিলেন। আমি বললাম, আমিরুল মোমিনীন! এ হাদিয়া আপনার চাচাতো ভাই পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন, হাদিয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য হাদিয়াই ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য তা উৎকোচ।

ইবরাহীম বিন মায়সারা বলেন, হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শানে বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি উচ্চারণকারী ব্যক্তি ছাড়া তিনি আর কাউকে বেত্রাঘাত করেননি।

ইমাম আওযায়ী বলেন, তিনি তার পরিবারের খরচাদি হ্রাস করায় তার পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে বলেন, এরচেয়ে বেশি ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা আমার নেই। আর দূর দেশের একজন সাধারণ মানুষের যতটুকু অধিকার বাইতুল মালে রয়েছে তোমাদেরও ততটুকু রয়েছে।

আবু উমর বলেন, তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিপরীত লিখিত ফরমান প্রেরণ করেন।

ইয়াহইয়া গাস্সানী বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয মুসুলের শাসনকর্তা করে আমাকে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গেলে এক চোর ধরা পড়ে এবং এ ব্যাপারে

বহুজনের বহুমত হওয়ার কারণে বিষয়টি কিভাবে ফায়সালা করবো তা আমিরুল মোমেনীনের নিকট পরামর্শ চাইলাম। তিনি সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার করার নির্দেশ দিলেন।

রাজা বিন হায়া বলেন, এক রাতে জরুরি কথা বলার জন্য উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট গেলাম। ইত্যবসরে বাতির তেল শেষ হয়ে তা নিভে গেল। তখন গোলাম ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, গোলামকে জাগিয়ে দেই? তিনি বললেন, প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, তাহলে আমি বাতিটি জ্বালিয়ে দেই। তিনি বললেন, মেহমানের নিকট থেকে কাজ নেয়া ভদ্রতার পরিপন্থী। অতঃপর তিনি নিজেই উঠে গিয়ে প্রদীপে তেল ঢেলে তা জ্বলিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, আমি নিজে সব কিছু করার পরও আমি সেই উমরই রয়ে গেছি।

মাকহুল বলেন, আমি যদি কসম করে বলি তিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও ধর্মনিষ্ঠ সাধক ব্যক্তি তাহলে আমার কসম ভাঙবে না। সাঈদ বিন আবু উরওয়াবা বলেন, মৃত্যুর বিবরণ দানের সময় তার শরীর কাঁদতে কাঁদতে বাঁকা হয়ে যেতো।

আতা বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয প্রতি রাতে রাজ্যের মুফতীদের একত্রিত করে মৃত্যু ও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং এমনভাবে কাঁদতেন, লাশ সামনে রেখে মানুষ যেভাবে কাঁদে।

উবায়দুল্লাহ বিন আয়যার বলেন, একদা তিনি সিরিয়ায় এক মাটির মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! নিজের অভ্যন্তর সংশোধন কর, বাহিরটা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। আর আখেরাতের জন্য অর্জন কর, দুনিয়া এমনিতেই এসে যাবে। স্মরণ রেখো মৃত্যু তোমাদের মা-বাবাকে পরপারে নিয়ে গেছে।

ওহীব বিন ওরদ বলেন, একদিন মারওয়ানের বংশধররা তার দরজায় এসে সমবেত হন এবং তার ছেলে আব্দুল মালিককে বলেন, তোমার পিতাকে গিয়ে বল পূর্ববর্তী সকল খলীফা আমাদের ভাতা দিতেন, আর আপনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। আব্দুল মালিক বিষয়টি খলীফাকে জানালে তিনি বললেন,

إِنِّىْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করলে কিয়ামত দিবসে আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

ইমাম আওযায়ী বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, পূর্ববর্তীদের অভিমত অনুযায়ী কাজ করবে। তাঁদের সাথে মতভেদ করবে না। কারণ তাঁরা তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং ধর্মনিষ্ঠ।

একবার জারীর অনেকক্ষণ ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার পরও তিনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করায় অবশেষে জারীর তার সচিব আউন বিন আব্দুল্লাহর নিকট গিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করেন- "হে পাগড়িধারী! এটা তোমাদের যুগ, আমার যুগ শেষ হয়েছে। খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হলে বলে দিও, আমি বন্দীদের মতো এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

জোয়াইরিয়া বিন আসমা বলেন, তিনি খলীফা হওয়ার পর তাঁর নিকট বেলাল বিন আবু বারদা এসে তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, খিলাফত অন্যান্য খলীফাদের মর্যাদাশীল করেছে, আর আপনি খিলাফতকে মর্যাদা দান করেছেন। খিলাফত খলীফাদের অলংকার, আর আপনি খিলাফতের অলংকার। অতঃপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন- "আপনার আগমনে সুরভি আরো সুগন্ধময় হয়েছে। কারণ আপনার উপমা আপনি নিজেই। যদিও মুক্তা অলংকারকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, কিন্তু আপনি অলংকারের মুক্তাকে নয়নাভিরাম করেছেন।"

জুয়ুনা বলেন, তাঁর পুত্র আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল হলে তিনি ছেলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুসলিমা আরয করলেন, আমিরুল মোমেনীন! তিনি জীবিত থাকলে কি তাঁকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতেন? তিনি বললেন, কখনই না। মুসলিমা বললেন, তাহলে এত প্রশংসার অর্থ কি? তিনি বললেন, অপরের কাছে সে প্রশংসিত হওয়ায় আমার দৃষ্টিতেও সে প্রশংসনীয়। কারণ পিতার দৃষ্টিতে ছেলে প্রশংসার যোগ্য।

গাস্সান বলেন, জনৈক ব্যক্তির উপদেশ প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর আদেশ মান্য করে চল। তিনিই তোমার মুসিবত দূর করে দিবেন।

আবু উমর বলেন, তাঁর নিকট উসামা বিন যায়েদের কন্যা এলে তিনি সম্মানার্থে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে নিজের আসনে বসতে দিয়ে তার সামনে গিয়ে বসেন এবং তিনি যা চান তাই তাকে দিয়ে দেন।

হাজ্জাজ বিন আনয়াসা বলেন, মারওয়ান বংশের কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে খলীফার সাথে কৌতুক করার সিদ্ধান্ত নিল। খলীফার নিকট এসে একজন রঙ্গরসের কথা বললে খলীফা তার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আরেকজন অনুরূপ রসাত্মক কথা বলায় তিনি বললেন, তোমরা জঘন্য বিষয়ে একমত হয়েছ, যা অন্তরে হিংসা ও ঘৃণার জন্ম দিবে। ভালো হবে যদি তোমরা সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত কর। তিলাওয়াত শেষে হাদীস শরীফ পাঠ কর। অতঃপর হাদীস নিয়ে গবেষণা কর।

আয়াস বিন মুআবিয়া বিন কুররা বলেন, তিনি এক অনন্য সচেতন কারিগর। তাঁর নিকট কোন মেশিন ছিল না, মেশিন ছাড়াই তিনি নিপুণ কারিগরীর কারিশমা প্রদর্শন করেছেন।

আমর বিন হাফয বলেন, কোন মুসলমানের কথায় বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ নিহিত থাকলে তা উড়িয়ে দিতে তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন।

ইয়াহইয়া গাস্‌সানী বলেন, একবার আমিরুল মোমিনীন সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মত্যাগীর প্রতি আরোপিত শাস্তি উমর বিন আব্দুল আযীয এভাবে স্থগিত করেন যে, সে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। সুলায়মানের নিকট ধর্মত্যাগী লোকটিকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, তোমার বক্তব্য কি? লোকটি উত্তরে বলল, হে পাপীর পুত্র পাপী তুমি কি জানতে চাও? এ কথা শুনে সুলায়মান উমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বিষয়টি নিরীক্ষণ করলে লোকটি আবার ভ্রষ্ট কথা বলল। এবার উমর বিন আব্দুল আযীয নীরব হয়ে গেলেন। সুলায়মান বললেন, আপনি বলুন, আমি আপনার উপর নির্ভর করছি। তিনি বললেন, আমার অভিমত হল আপনিও তাকে গালি দিন। সুলায়মান বললেন, এটা হয় না। অতঃপর সুলায়মান লোকটিকে হত্যার আদেশ দিলেন। উমন বিন আব্দুল আযীয সেখান থেকে বেরিয়ে এলে পথিমধ্যে খালিদ নামক শহরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত হয়। খালিদ বলল, আপনি খলীফাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে আমার ভয় হয়েছিল যে, তিনি মনে হয় আপনাকেই হত্যার আদেশ দিবেন। উমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, আমাকে হত্যার আজ্ঞা প্রাপ্ত হলে তুমি কি করতে? খালিদ বলল, সঙ্গে সঙ্গে গর্দান উড়িয়ে দিতাম। উমর বিন আব্দুল আযীয খলীফা মনোনীত হবার পর প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ তার সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি বললেন, খালিদ তোমার তলোয়ার রেখে দাও। অতঃপর তিনি তাকে অব্যহতি দিলেন এবং তার জন্য দোআ করলেন। এরপর তিনি পুলিশ অফিসারদের মধ্য থেকে আমর বিন মুহাজির আনসারীকে ডেকে বললেন, হে আমর! আল্লাহর কসম, ইসলাম ছাড়া তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুনেছি তুমি অধিক পরিমাণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর। আমি তোমাকে এমনভাবে নামায পড়তে দেখেছি যে, মনে হয় তুমি কোন মানুষ নও। উপরন্তু তুমি আনসার, তুমি এ তলোয়ার তুলে নাও। আজ থেকে আমি তোমাকে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা মনোনীত করলাম।

শোয়ায়েব বলেন, তার ছেলে আব্দুল মালিক উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট

গিয়ে বললেন, আমিরুল মোমিনীন, আপনি আপনার প্রতিপালকের একান্ত অনুগত। তিনি যদি আপনাকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি লোকদের বিদআত করতে দেখে বিদআত প্রতিরোধ এবং সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছিলে, তাহলে আপনি কি জবাব দিবেন? তিনি এ প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন এবং উত্তম প্রতিদান দিন! বৎস! সমাজে বিদআত ছড়িয়ে পড়ায় সুন্নত তলিয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিদআত প্রতিরোধে মরু প্রান্তরে খুনের নহর বয়ে দিতে চাই না। আল্লাহর কসম, এক বিন্দু রক্ত ঝরাতেও আমি প্রস্তুত নাই, বিদআত প্রতিহত এবং সুন্নত প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি আমার জীবনে যেন না আসে।

আদী বিন ফজল বলেন, আমি উমর বিন আব্দুল আযীযের এক অভিভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় কর এবং হালাল পথে রিযিকের অনুসন্ধান কর, তোমাদের ভাগ্যে রিযিক থাকলে পাহাড়ের চূড়া কিংবা ভূগর্ভ থেকে হলেও তা সরবরাহ করা হবেই।

আযহার বলেন, আমি একবার তাঁকে সেলাই করা জামা পরে খুতবা দিতে দেখেছি।

আব্দুল্লাহ বিন আলা বলেন, তিনি অধিকাংশ জুমআর খুতবা শুরুর পূর্বে এ বাক্যমালা পঠন করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ

আর এ আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে খুতবা শেষ করতেন–

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

হাজিব বিন খলীফা বরজামী বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের খিলাফতকালে

তাঁর এক অভিভাষণে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর দু'সহচর কর্তৃক প্রবর্তিত পন্থাই একমাত্র সঠিক পথ, এ পথে জীবন পরিচালিত করতে হবে। আর এর বিপরীত সকল পথ ও মত পরিত্যাজ্য। (আবু নাঈম)

ইবনে আসাকির ইবরামী বিন আবু আয়লার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, ঈদের দিন লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলতো, আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। জবাবে তিনিও তাই বলতেন।

জুয়ূনা বলেন, আমর বিন কায়েস সুকুনীকে সেনাপতি করে প্রেরণের প্রাক্কালে তিনি তাকে এই বলে নসীহত করলেন যে, সে নগরীর ভালো লোকদের পরামর্শ নিবে এবং দুশ্চরিত্রদের থেকে মুক্ত থাকবে, তাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবে। আর যদি প্রথমেই তাদের প্রতি শাসনের খড়গ উত্তোলন কর তবে তারা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাবে, তোমার দাওয়াতের আহ্বান তাদের কানে পৌছুবে না। এজন্য মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে তারা তোমার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সক্ষম হয় এবং তোমার কথা শোনে।

সায়েব বিন মুহাম্মাদ বলেন, একবার খোরাসানের শাসনকর্তা জারাহ বিন আব্দুল্লাহ খলীফার নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন- আমিরুল মোমিনীন! খোরাসানবাসী লাইনচ্যুত হয়েছে। তলোয়ার ছাড়া তাদের সঠিক পথে আনা সম্ভব নয়। খলীফার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। উমর বিন আব্দুল আযীয প্রাপ্ত পত্রের জবাবে লিখলেন, তুমি সঠিক বিষয় উপলব্ধি করনি। তলোয়ার ছাড়া খোরাসানবাসী সৎপথে আসবে না- এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যবাদিতা এমন একটি বিষয় যার সংস্পর্শে আসলে এমনিতেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। অতএব তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং সত্যবাদিতার মহিমা প্রচার কর।

উমাইয়্যা বিন যায়েদ কুরশী বলেন, তিনি আমার থেকে পত্র লিখে নেবার সময় এ দোআ পড়তেন- হে আল্লাহ! তুমি আমার রসনার অপরাধ মার্জনা কর।

সালেহ বিন জাবের বলেন, ঘটনাক্রমে তিনি আমার প্রতি রাগ করলে আমি বললাম, আমি কোন এক গ্রন্থে দেখেছি তরুণ বাদশাহদের রাগ থেকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে। অতঃপর তার রাগ ঠাণ্ডা হলে আমি তার নিকট ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন, হে সালেহ! রেগে গেলে তোমার এ কথা অবশ্যই আমাকে স্মরণ করে দিবে।

আব্দুল হাকীম বিন মুহাম্মাদ মাখযুমী বলেন, একদিন জারীর বিন খাতফী

সাক্ষাতের জন্য উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট এসে সাক্ষাতের অনুমতি না পেয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কথা বলেছি। এরপর অনুমতি পেয়ে জারীর এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন– "সেই পবিত্র সত্ত্বা যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন এবং খিলাফতের মসনদে ন্যায়পরায়ণ নেতাকে সমাসীন করেছেন, তিনি অত্যাচারের প্রতিরোধক এবং সাম্যের সুরভি ছড়ানোকারী। আমি আপনার নিকট তাড়াতাড়ি কিছু সম্পদ প্রার্থনা করছি।" তিনি বললেন, কুরআন শরীফে দেখেছি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তোমার কোন হক নেই। জারীর বললেন, আমিরুল মোমিনীন! কুরআন শরীফে আমার হকের কথা উল্লেখ রয়েছে, কারণ আমি মুসাফির। অবশেষে তিনি নিজ তহবিল থেকে পঞ্চাশ দিনার দান করলেন।

তৌরিয়াত গ্রন্থে রয়েছে, হারীয বিন উসমান রাজী পিতার সাথে উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট গেলে তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, তোমার ছেলেকে ফুকাহায়ে আকবরের (বিচারপতির) শিক্ষা দান করবে। আর অল্পে তুষ্টি এবং মুসলমানদের কষ্ট না দেয়া বিচারপতির প্রধান শিক্ষা।

ইবনে আবী হাতিম স্বরচিত তাফসীর গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন কাব কারতীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, একদিন উমর বিন আব্দুল আযীয আমাকে ডেকে ন্যায়পরায়ণতার সংজ্ঞা জানতে চাইলে আমি বললাম, আপনি মহান এক বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞেস করেছেন। বয়সে বড় মহিলাদের সাথে বাবার মত, ছোট মেয়েদের সাথে ছেলের মত এবং সমবয়সী মেয়েদের সাথে নিজের ভাইয়ের মত আচরণ করা, শরীর ভেদে অপরাধীর শাস্তি দেয়া এবং ব্যক্তিগত ক্রোধে অন্যকে কষ্ট না দেয়াই হলো ন্যায়পরায়ণতা। আর এ সীমা অতিক্রম করাটা হলো জুলুম।

আব্দুর রাজ্জাক 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে যহরীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, তিনি পাক করা খানা খেলে অযু করে শুকরিয়া আদায় করতেন।

ওহীব কর্তৃক বর্ণিত, উমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, যে কথাকে আমল হিসেবে গণ্য করে সে কম কথা বলে।

যাহাবী বলেন, তাঁর খিলাফতকালে ভাগ্যকে অস্বীকারকারী একটি দলের আবির্ভাব হলে তিনি তাদের তওবা করতে বললেন। তারা বলল, আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আমাদের হিদায়েত করেছেন আপনি। তিনি দোআ করলেন, "হে আল্লাহ, যদি তাদের কথা সত্য হয় তবে ভালো, অন্যথায় তাদের হাত পা কেটে শুলে চড়িয়ে দিন।" তারা নিজেদের বিশ্বাসে অটল রইল। পরবর্তীতে হিশাম বিন আব্দুল মালিক তখতে আসীন হয়ে তাদের হাত পা কেটে শুলে চড়ান।

বনূ উমাইয়্যার খলীফাগণ তাদের অভিভাষণে হযরত আলী (রা.)-এর শানে

ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করতেন। উমর বিন আব্দুল আযীয কঠোরভাবে এ প্রথা নিষিদ্ধ করেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট কটূক্তির পরিবর্তে তাদের অভিভাষণে এ আয়াত তিলাওয়াতের জন্য লিখিত ফরমান পাঠান–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الخ

তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর বহু কাব্য ও চরণপুঞ্জ জনশ্রুতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ছালাবা বলেন, উমর বিন খাত্তাব (রা.), উসমান গনী (রা.), আলী (রা.), মারওয়ান বিন হাকাম এবং উমর বিন আব্দুল আযীযের মাথায় চুল ছিল না।

যুবায়ের বিন বাকার বলেন, জনৈক কবি ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের শানে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, "আপনি খলীফার কন্যা, খলীফার ফুফু, খলীফাদের বোন এবং খলীফার পত্নী"। যুবায়ের বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের পৃথিবীর আর কোন নারী এমন ছিলেন না। গ্রন্থকার বলেন, আমার যুগ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখিনি।

ইন্তেকাল ঃ

আইয়ুব বলেন, জনৈক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, আপনি মদীনায় চলে আসলে সেখানে আপনার মৃত্যু হবে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্শ্বে রওজা আতহারে চতুর্থ স্থানে আপনাকে সমাহিত করা হবে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, সেখানকার হকদার মনে করাটাই হবে নিজের জন্য বড় শাস্তি।

ওয়ালীদ বিন হিশাম বলেন, তিনি অসুস্থতার জন্য কোন ঔষধ সেবন করতেন না। তিনি বলেন, বিষ খাওয়ানের সময় যদি আমাকে বলা হতো, আপনি নিজের কানের লতি স্পর্শ করুন, অথবা এ সুগন্ধীর ঘ্রাণ নিন, আর এটা হলো আপনার রোগের ঔষধ– তবুও আমি তা করতাম না।

উবায়েদ বিন হাসসান বলেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি সকলকে চলে যেতে বললেন। সকলেই চলে গেলেও শ্যালক মুসলিমা এবং স্ত্রী ফাতেমা দরজায় বসে রইলেন। তাঁরা শুনলেন– তিনি বলছেন, "সুস্বাগতম, আল্লাহর নামে আসুন।" তাঁরা বলেন, আগন্তুকগণ মানুষও নন, জিনও নন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিশাম বলেন, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণে হাসান বসরী বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম লোকটির অন্তর্ধান ঘটল। খালিদ রবয়ী বলেন, আমি তৌরাত গ্রন্থে পড়েছি উমর বিন আব্দুল আযীযের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল চল্লিশ দিন ক্রন্দন করবে। ইউসুফ বিন মালিক বলেন, আমরা তাঁর কবরের মাটি সমান করার সময় আকাশ থেকে এক টুকরো কাগজ পড়ে, যাতে লিখাছিল- "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উমর বিন আব্দুল আযীযকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে।"

কাতাদা বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয খিলাফতের উত্তরাধিকারী ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট একখানা পত্র লেখেন, পত্রটি নিম্নরূপ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এ পত্র আল্লাহর বান্দা উমরের পক্ষ হতে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের প্রতি, তোমার উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সেই প্রতিপালকের প্রশংসা করছি, যাঁর কোন প্রতিপালক নেই। অতঃপর আমি আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ পত্র লিখছি। আমি অবগত রয়েছি যে, দুনিয়া এবং আখেরাতের মালিক কর্তৃক আমার খিলাফত সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। আর এমন কোন কাজ নেই যা তাঁর অগোচরে করেছি। তিনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে সুখ ও কল্যাণের সন্ধান পাবো এবং অপমান ও অসম্মান থেকে মুক্তি পাবো। আর তিনি যদি রুষ্ট থাকেন তবে আমি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হবো। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি নিজ করুণা দ্বারা আমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন এবং আমার প্রতি দয়াপ্রবণ হয়ে জান্নাত দান করুন। তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, প্রজাকুলের বশ্যতা মান্য করবে এবং আমার পর অল্প কিছু দিন তুমি জীবিত থাকবে। (আবু নাঈম)

১০১ হিজরীর রযব মাসের বিশ অথবা পঁচিশ তারিখে উনচল্লিশ বছর ছয় মাস বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বনূ উমাইয়্যা তাঁকে বিষ খাওয়ায়ে শহীদ করে দেয়। তিনি অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে বনূ উমাইয়্যার উপর করারোপ করেছিলেন। তবে বিষয়টি সহজতর করার জন্য তিনি বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের উপরই ছিল।

মুজাহিদ বলেন, আমাকে ডেকে তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে লোকদের ধারণা কি? আমি বললাম আপনাকে জাদু করা হয়েছে। তিনি বললেন, না, এ কল্পনা মিথ্যা, আমাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে এবং আমাকে যে সময় বিষ পান করানো হয় সে সময় সম্পর্কেও আমি অবগত। তিনি তৎক্ষণাত গোলামকে (যে তাকে বিষ খাওয়ায়েছিল) ডেকে বললাম, তোমার প্রতি আফসোস, তোমাকে এ কাজ করতে কে প্ররোচিত করেছে? কেন আমাকে বিষ পান করালে? সে বলল, আমাকে সহস্র দিনার দেয়া হয়েছে এবং আযাদ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি দিনারগুলো আনতে বললেন, অতঃপর সেগুলো নিয়ে তিনি বাইতুল মালে জমা করে দিয়ে গোলামকে বললেন, এখান থেকে এমনভাবে পালিয়ে যাও যেন কেউ তোমাকে না দেখতে পায়।

তাঁর খিলাফতকালে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেছেন তাঁরা হলেন, আবু উমামা বিন সহল বিন হানীফ, খারেজা বিন যায়েদ বিন সাবিত, সালিম বিন আবুল জু'আদ, বসর বিন সাঈদ, আবু উসমান নাহদী, আবুল যহা প্রমুখ।

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম আবু খালিদ উমুয়ী দামেশকী ৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতা সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের ওসীয়ত অনুযায়ী উমর বিন আব্দুল আযীযের পর তিনি মসনদে আসীন হন।

আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বলেন, তিনি খলীফা হওয়ার পর উমর বিন আব্দুল আযীযের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ঘোষণা দেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর চল্লিশ জন বৃদ্ধ লোক এসে সাক্ষ্য দিয়ে বলল, খলীফার যা ইচ্ছে করতে পারবেন। তাঁর প্রতি কোন শাস্তি নেই, তাকে কোন জবাবদিহিও করতে হবে না।

ইবনে মাজশুন বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীযের মৃত্যুর সময় ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক কসম করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি উমর বিন আব্দুল আযীযের যে মোখাপেক্ষিতা ছিল, আমার তার চেয়ে বেশি থাকবে। তিনি চল্লিশ দিন তাঁকে পূর্ণ অনুসরণ করেন, অতঃপর তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়ান।

সালীম বিন বশীর বলেন, উমর বিন আব্দুল আযীয জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের প্রতি এ ওসীয়তনামা লিখে যান,

"আসসালামু আলাইকুম। অতঃপর আমার অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত। উম্মতে মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। তুমি পৃথিবীতে এমন লোক পাবে যারা তোমার প্রশংসা করবে না এবং এমন লোক তোমার প্রতি অর্পিত হবে যারা তোমাকে ক্ষমা করবে না। তোমার প্রতি সালাম।"

১০২ হিজরীতে ইয়াযিদ বিন মোহলাব খিলাফত দখলের ষড়যন্ত্র করলে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাকে প্রতিহত ও পরাজিত করে কারবালার নিকটবর্তী আকীর অঞ্চলে হত্যা করেন।

ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফত কালে যেসব ওলামা মাশায়েখ মারা যান তাঁরা হলেন- যহাক বিন মাযাহিম, আদী বিন রতাত, আবুল মুতাওয়াক্কীল নাজী, আতা বিন ইয়াসার, মুজাহিদ, ইয়াহইয়া বিন ওতাব (কুফার বিখ্যাত শিক্ষক), খালিদ বিন মাআদান, শাআবী (ইরাকের প্রখ্যাত আলেম), আব্দুর রহমান বিন হাস্‌সান বিন সাবিত, আবু কালাবাতুলজারমী, আবু বারদা বিন আবু মূসা আশআরী প্রমুখ।

হিশাম বিন আব্দুল মালিক

হিশাম বিন আব্দুল মালিক আবুল ওলীদ ৭০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ভ্রাতা ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের পর খিলাফতের তখতে আসীন হন।

মুসআব যুবায়রী বলেন, একদা আব্দুল মালিক স্বপ্নে দেখেন তিনি মসজিদের মিহরাবে চারবার পেশাব করছেন। সাঈদ বিন মুসায়্যেবকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আপনার চার পুত্র বাদশাহ হবেন। আর হিশাম হলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ বাদশাহ।

তিনি অত্যন্ত সচেতন এবং জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। সম্পদটি বৈধ পন্থায় উপার্জিত কিনা- এ বিষয়ে চল্লিশ জনের সাক্ষী ছাড়া তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অন্তর্ভুক্ত করতেন না। আসমায়ী বলেন, আমি এক লোককে হিশামের সাথে বিতর্ক করতে দেখলাম। হিশাম তাকে বলছেন, নিজের খলীফাকে এ কথা বলার জন্য তুমি উপযুক্ত নও। একদা জনৈক ব্যক্তির প্রতি রাগান্বিত হয়ে তিনি কসম করে বলেন, তোমাকে বেত্রাঘাত করতে আমার মন চাইছে।

সাহবাল বিন মুহাম্মাদ বলেন, খলীফাদের মধ্যে হিশাম অবৈধ রক্তপাত ঘটানোকে অধিক ঘৃণা করতেন। শাফী বলেন, সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত অবস্থায় তিনি তার নবনির্মিত প্রাসাদে একটি দিন অতিবাহিত করার অভিপ্রায় পোষণ করলেন। দুপুরে সীমান্ত এলাকা থেকে এক ভীতিপ্রদ সংবাদ এলে "এমন একটি ধনও পেলাম না" এ মন্তব্য করে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। উল্লেখ্য তার এ কবিতা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উক্তি সংরক্ষিত নেই। কবিতার অর্থ, "কামনার দাসত্ব করতে না চাইলেও কামনার হুল তোমাকে বিদ্ধ করবেই।" তিনি ১২৫ হিজরীর রবিউল আখের মাসে ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতের সপ্তম বর্ষে রোম, অষ্টম বর্ষে হানজারা এবং দশম বর্ষে হিরসানা হস্তগত হয়। তার শাসনামলে সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, তাউস, সুলায়মান বিন ইয়াসার, ইবনে আব্বাসের গোলাম ইকরামা, কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দীক, সামরিক কবি কাসীর, মুহাম্মাদ বিন কাব আল-কারযী, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ বিন সিরীন, আবুল তোফায়েল, আমর বিন ওয়াছালা (তিনি সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে সকলের পর ইন্তেকাল করেন), জারীর, ফিরজোক, মুআবিয়া বিন কিরতা, মাকহুল, আতার বিন আবু রিবাহ, আবু জাফর, ওহাব ইবনে মানবাহ, সাকীনা বিনতে হোসাইন, কাতাদা, ইবনে উমরের গোলাম নাফে, সিরিয়ার বিখ্যাত শিক্ষক ইবনে আমের, মক্কা শরীফের সম্মানিত শিক্ষক ইবনে কাছীর, ছাবেত আল-বানানী, মালিক বিন দিনার, ইবনে মুহিস, ইবনে শিহাব যহরী প্রমুখ মনীষীগণ ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বিন আবু আয়লা বলেন, হিশাম আমাকে শহরের রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব দিলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। আমার প্রতি রক্তিম চক্ষুদ্বয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, তোমার যা খুশি করবে, আমি তৎক্ষণাত আর কোন উত্তর দিলাম না। ক্রোধ প্রশমিত হলে অনুমতি নিয়ে বললাম, আমিরুল মোমেনীন! আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন, আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং পর্বতমালাকে নেতৃত্ব দানের নির্দেশ দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রুষ্ট, অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপর বল প্রয়োগও করেননি। আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করায় আপনি কেন আমার প্রতি বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হবেন? এ কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিলেন।

খালিদ বিন সাফওয়ান বলেন, একদিন আমি হিশামের অতিথি হলাম। তিনি আমার নিকট গল্প শুনতে চাইলেন। আমি বললাম, জনৈক বাদশাহ নগর ভ্রমণের সময় এক প্রাসাদের প্রতি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, এটা কার? বাদশাহর সহচরগণ বললেন, সুলতানের। তিনি আবার বললেন, আমার নিকট যতটুকু সম্পদ রয়েছে পৃথিবীর কোন বাদশাহর কাছে কোন সময় কি তা ছিল? এক প্রাচীন যুগের বয়ঃবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন বললেন, আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে আমি এর জবাব দিব। বাদশাহ বললেন, বলুন। তিনি বললেন, আপনার নিকট যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা কি আগের চেয়ে হ্রাস পায়নি? এ সম্পদ কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নন? আপনার স্থলাভিষিক্ত কি এ সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে না? বাদশাহ বললেন, আপনার তিনটি প্রশ্নই যথার্থ। তিনি বললেন, এ সম্পদের মোহই আপনাকে অন্ধ

করে দিয়েছে। যে সম্পদ ক্ষয়শীল, যে সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যের হস্তগত হবে এবং যে সম্পদ ব্যয় করেছেন তার হিসাব হবে। এ কথা শুনে বাদশাহ শিহরিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমি উত্তর পেয়ে গেছি। বৃদ্ধ আলেম বললেন, বাদশাহী করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করুন। অন্যথায় তা বর্জন করতে হবে। বাদশাহ এ বিষয়ে সারা রাত চিন্তা-ভাবনা করে সকালে বললেন, আমি বাদশাহী ছেড়ে মরু বিয়াবানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনি আমার সঙ্গে থাকলে খুশি হবো। অতঃপর তারা মৃত্যু অবধি এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেন।

এ ঘটনা শ্রবণে হিশাম এতই কাঁদলেন যে, তার চোখাশ্রু দ্বারা দাড়ি সিক্ত হয়ে উঠল। পুত্রদ্বয়কে প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে তিনি ঘরের এক কোণে বসে ইবাদত করতে লাগলেন। তিনি বাইরে যাতায়াত ছেড়ে দিলেন। খলীফার এ অবস্থা দেখে রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ খালিদ বিন সাফওয়ানকে বললেন, আপনি আমিরুল মোমিনীনকে এমন কি করলেন যার প্রভাবে তার বিলাসিতা বিদূরিত হয়েছে। খালিদ বিন সাফওয়ান বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এমর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমি কোন বাদশাহর নিকট গেলে তাকে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিব।

ওলীদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক

ওলীদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম আবুল আব্বাস ৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফাসিক। ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যুর সময় অল্পবয়স্ক হওয়ায় হিশাম খলীফা মনোনীত হন। তবে হিশামের পর তাকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করায় হিশামের ইন্তেকালের পর ১২৫ হিজরীর রবিউল আখের মাসে তিনি খিলাফতের তখতে আসীন হন।

ওলীদ বিন ইয়াযিদ অসৎ, পাপাসক্ত এবং মদ্যপ ছিলেন। পবিত্র কাবা গৃহের ছাদে বসে মদ পানের মানসে হজ্ব করার ইচ্ছা করেন। পাপাচারের জন্য জনতা তাকে অবরুদ্ধ করে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ১২৬ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে তাকে হত্যা করা হয়।

তাকে অবরোধের সময় তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিনি? আমি তো তোমাদের উপর কঠোরতা করিনি। আমি কি দরিদ্রদের কল্যাণ করিনি? তবে কেন আমার প্রতি এ অত্যাচার? জনতা জবাব দিল, আপনি সবই করেছেন। কিন্তু আপনাকে হত্যা করার কারণ হলো আপনি মদ্যপায়ী

এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছেন আপনি তা হালাল বলে অনুমোদন দিয়েছেন।

তাকে হত্যা করার পর তার ছিন্ন মস্তক ইয়াযিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইয়াযিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক তার কর্তিত মাথা বর্শায় বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখেন। তা দেখে ওলীদ বিন ইয়াযিদের ভাই সুলায়মান বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ লোকটি অত্যন্ত বেশরম, মদখোর এবং ব্যভিচারী। সে আমার সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হতে চাইত। মাআফী জারীরী বলেন, আমি ওলীদের কিছু জীবন বৃত্তান্ত এবং তার কবিতা সংগ্রহ করেছি- যা অবিশ্বাস, পাপাচার এবং ব্যভিচারে ভরা।

যাহাবী বলেন, ওলীদের অবিশ্বাস এবং ধর্মচ্যুতির বিষয়টি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি। তবে তিনি মদ পান করতেন এবং সমকামিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য জনতা বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে, একদা মাহদীর সামনে জনৈক ব্যক্তি ওলীদকে ধর্মচ্যুত হিসেবে অবিহিত করলে মাহদী ধমক দিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কোন ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে কোনোদিন খিলাফতের মর্যাদা দান করেন না।

মারওয়ান বিন আবু হাফয বলেন, ওলীদ ছিলেন উঁচু মাপের একজন কবি। আবুল যানাদ বলেন, যহরী সবসময় হিশামের নিকট ওলীদের দোষ-ত্রুটিগুলো তুলে ধরে ওলীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত না করার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু হিশাম তার উপদেশ গ্রহণ করেননি। যহরী ওলীদের খিলাফত প্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন, অন্যথায় ওলীদ খলিফা হওয়ার পর তাকে অত্যাচার করতেন।

যহ্হাক বিন উসমান বলেন, হিশাম ওলীদের উত্তরাধিকারের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে স্বীয় পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চাইলে ওলীদ এ কবিতাটি লিখে হিশামের নিকট পাঠালেন, "আপনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেননি, যদি তা করেন তবে তার প্রতিদান পাবেন। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করছি আপনি আমার অভিভাবকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চান। আপনি সচেতন হলে এমনটা করতেন না। আপনি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এ কাজ করছেন। আফসোস, আপনি তাদেরই একজন যারা আমার দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করে ইতোপূর্বে ইন্তেকাল করেছেন।"

হাম্মাদ এক বর্ণনায় বলেন, একদিন ওলীদের দরবারে দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এসে বলল, আমরা নক্ষত্রসূচী দেখে জেনেছি, আপনি আরো সাত বছর জীবিত থাকবেন। হাম্মাদ বলেন, আমি মনে মনে বললাম, ওলীদকে ধোঁকা দিতে পারলে ভালোই হবে। আমি বললাম, এরা দু'জন অসত্য প্রলাপ বকছে। আমি জ্যোতির বিদ্যায় তাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ। আমি নক্ষত্রসূচী দেখে জেনেছি, আপনি আরো

চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন। এ কথা শুনে ওলীদ মাথা নীচু করলেন এবং বললেন, তাদের কথায় আমি বিমর্ষ হয়নি এবং তোমার বক্তব্যেও উদ্বেলিত হইনি। আল্লাহর কসম, আমি জীবন প্রিয় মানুষের মত সম্পদ সঞ্চয় করতে চাই। আর ব্যয় করতে চাই অন্তিম জীবনে উপনীত হয়ে যারা ব্যয় করে তাদের মত।"

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রয়েছে, এ উম্মতের মধ্যে ওলীদ নামে এক জনের আবির্ভাব হবে, যিনি এ উম্মতের উপর ফিরাউনের চেয়েও অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন।

মাসালিক গ্রন্থে ইবনে ফাযলুল্লাহ বলেন, ওলীদ বিন ইয়াযিদ হলেন, অত্যাচারী, ঔদ্ধত্য, পথভ্রষ্ট, মিথ্যা শপথকারী, তৎকালীন যুগের ফিরাউন, যুগশ্রেষ্ঠ মন্দ মানব, কিয়ামতের দিনে স্বজাতিকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শনকারী, কুরআন শরীফ নিক্ষেপকারী, পাপী এবং দুশ্চরিত্র।

সাঈদ বিন সুলায়েম বলেন, ইবনে মিয়াবিয়া ওলীদকে বললেন, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার ছাড়া কুরাইশদের এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের ছাড়া মারওয়ান পরিবারকে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। এ কথা শুনে ওলীদ বললেন, তুমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর আত্মীয়দের আমার উপর মর্যাদা দিতে চাও? তিনি বললেন, আমি এটাকেই সঠিক জ্ঞান করি। অতঃপর তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, "আমি দুশমনদের সামনেও সত্য কথা বলতে চাই। আমি ওলীদের অভিজাত সেনাদের দেখেছি যারা রাষ্ট্রের কাজে অত্যন্ত অলস।"

ইয়াযিদ বিন ওলীদ

ইয়াযিদ আবু খালিদ বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক সৈন্যদের ভাতা হ্রাস করায় তাকে নাকেস (অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। চাচাত ভাই ওলীদকে হত্যা করে তিনি খিলাফতের তখত অধিকার করেন। ইয়াযিদের মা হলেন ফরান্দ বিনতে ফিরোজ, ফিরোজের মা হলেন শিরাওয়া বিন কিসরার মেয়ে, শিরাওয়ার মা হলেন খাকান বাদশাহর মেয়ে, আর ফিরোজের নানী হলেন কায়সারের কন্যা। এ জন্য তিনি গর্ব করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, "আমি কিসরার দৌহিত্র, মারওয়ানের পুত্র এবং আমার নানা কায়সার ও খাকান।"

ছালাবী বলেন, ইয়াযিদ দাদা এবং নানা উভয় দিক থেকে শাহজাদা ছিলেন। ওলীদের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি এক অভিভাষণে বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি গর্বিত ও উদ্ধত হয়ে আপনাদের সামনে আসিনি। দুনিয়ার মোহ এবং সাম্রাজ্যের লোভ আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি করুণা না করলে আমি গুনাহগার

হবো। আমি আপনাদের আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি আহ্বান করছি। যখন হালালকে হারামকারীদের এবং বিদআতের রক্ষকদের আবির্ভাব হয়েছে তখন হিদায়েতের নিশান পুরাতন হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহভীরুদের দীপ্তি নির্বাপিত হয়েছে। সমাজের এ চিত্র দর্শনে আমি আজ ভীতসন্ত্রস্ত। অন্তরের কঠোরতা এবং চরিত্রের তিমিরাচ্ছন্নতা দূর করুন। আমি আপনাদের সঠিক ও সোজা পথে ফিরিয়ে নিতে চাই। আমি এ বিষয়ে ইসতেখারা করেছি। আমি আমার আত্মীয় এবং বন্ধুদের বলবো, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী এবং তাঁর বান্দাদের ভ্রষ্টাচার থেকে নিরাপদ রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই। জনতা! আমি আপনাদের একটি ইট অথবা একটি পাথরও অর্থহীন হতে দিব না- এ মানসিকতা নিয়েই আমি আপনাদের নেতা হয়েছি। সংগৃহীত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট শহর-নগরেই ব্যয় করবো, যাতে আপনারা সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন। যদি এ শর্তে আপনারা আমার বাইআত গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাদের এবং আপনাদের সেবা করা আমার জন্য ফরয, আর এ শর্ত থেকে সরে দাঁড়ালে আমার কোন বাইআত নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমার চেয়ে কোন যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তি থাকলে আপনারা তার বাইআত গ্রহণ করুন। আর আমি আপনাদের আগে তার কাছে বাইআত এবং তার আনুগত্য করবো। আমি আল্লাহর নিকট আমার এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

উসমান বিন আবুল আতিকা বলেন, ইয়াযিদ হলেন প্রথম খলীফা যিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঈদগাহে যান। তার খিলাফতকালে দুর্গের দরজা থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত অশ্বারোহীর দল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো।

আবু উসমান লাইছী কর্তৃক বর্ণিত, ইয়াযিদ, বনু উমাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা গান-বাজনা বর্জন কর। গান মানুষের লজ্জা হ্রাস করে, মনের কামনা বাড়িয়ে দেয়, মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে ফেলে, সুরা পানের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং যিনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কারণ গান যিনার অগ্র স্তম্ভ। পারপক্ষে নারীর কণ্ঠে গান শ্রবণ থেকে বিরত থাক।

ইবনে আব্দুল হাকিম বলেন, আমি ইমাম শাফী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খলীফা হওয়ার পর ইয়াযিদ কাদিরীয়া বিশ্বাসের প্রতি মানুষদের আহ্বান করেন।

তিনি বেশি দিন খিলাফত পরিচালনা করেননি। খিলাফত লাভের বর্ষেই জিলহজ্জ মাসের সাত তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৩৫ অথবা ৪৬ বছর। কথিত আছে যে, তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

ইবরাহীম বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক

ইবরাহীম বিন ওলীদ বিন আব্দুল মালিক আবু ইসহাক স্বীয় ভ্রাতা ইয়াযিদের মৃত্যুর পর খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

বুরদা বিন সিনান বলেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে আমি ইয়াযিদের নিকট গেলাম। কিছুক্ষণ পর প্রখ্যাত আলেম কাতান এসে ইয়াযিদকে বললেন, আপনার প্রাসাদ তোরণে অনেক লোক দন্ডায়মান আমি তাদের দূত হিসেবে আপনার নিকট এসেছি। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আপনি স্বীয় ভ্রাতা ইবরাহীমকে কেন উত্তরাধিকার মনোনীত করছেন না? এ কথা শুনে ইয়াযিদ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি ইবরাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করবো? হে আবুল উলামা! আপনিই বলুন আমি কাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে পারি? আমি এ বিষয়ে কাউকে ইশারাও করবো না। পরবর্তীতে কাতান বলেন, অতঃপর খলীফা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আমি খলীফার ইন্তেকাল হয়েছে ভেবে তার নিকট বসে পড়লাম এবং তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে এর উপর সাক্ষ্যপ্রদান সাপেক্ষে লোকদের বাইআত নিলাম। বর্ণনাকারী (বুরদা বিন সিনান) বলেন, আল্লাহর কসম, খলীফা ইয়াযিদ কাউকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি।

ইবরাহীম সত্তর দিন খিলাফতের তখতে আসীন ছিলেন, অতঃপর মারওয়ান বিন মুহাম্মদের আক্রমণের ফলে ইবরাহীম পলায়ন করেন এবং মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ লোকদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ইবরাহীম ফিরে এসে তার বাইআত প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের উপর অর্পণ করত তিনি নিজেও তার বাইআত গ্রহণ করেন।

ইবরাহীম এ ঘটনার পর ১৩২ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। উমাইয়্যা বংশের পতনের সময় সিফ্ফাহ-এর গোলযোগে তাকে হত্যা করা হয়। তারীখে ইবনে আসাকির গ্রন্থে রয়েছে, ইবরাহীম যহরীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তার চাচা হিশামের কাছে তা বর্ণনা করেছেন এবং পুত্র ইয়াকুব তার নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। জনৈক দাসী তার জননী। তিনি ১২৭ হিজরীর সফর মাসের ২৪ তারিখ সোমবারে বাইআত প্রত্যাহার করেন।

মাদায়েনী বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো অনেকেই উত্তরাধিকারের মনোনয়ন নিয়ে খলীফা ভেবে ইবরাহীমকে সালাম দিতেন। অনেকেই আবার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আমীর ভেবে তাকে শ্রদ্ধা করতো, আবার কেউ তার ব্যাপারে উভয় বিষয় প্রত্যাখ্যান করতো।

জনৈক কবি বলেন, আমরা প্রত্যেক জুমআয় ইবরাহীমের জন্য বাইআত করতাম। কিন্তু তিনি এমন এক নেতা যিনি ধ্বংস হয়েছেন।

কথিত আছে যে, ইবরাহীমের আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল–

يثق با الله

মারওয়ানুল হিমার

আবু আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান বিন হাকাম হলেন উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলীফা। তিনি জদ বিন দিরহামের সহচর হওয়ার কারণে তাকে জদী বলেও ডাকা হতো। তার হিমার বা গাধা উপাধির দু'টি কারণ রয়েছে। এক. তার ঘোড়ার পিঠে গদি লাগানোই থাকতো, দুশমনদের সাথে লড়াই করার জন্য তিনি তা কখনই খুলতেন না। যুদ্ধের জন্য তিনি অবিরাম যাত্রা করতেন। সমর গ্লানি তার সংকল্পকে ম্লান করতে পারতো না। তিনি যুদ্ধের কষ্টগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতেন। এ জন্য আরব বিশ্বে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, অমুক ব্যক্তি লড়াই করার ক্ষেত্রে গাধার চেয়েও বেশি নীরবে আক্রমণ করেন– এ কারণে তিনি হিমার বা গাধা উপাধিতে ভূষিত হন। দুই. আরবের প্রথা ছিল প্রত্যেক শতাব্দীর শেষ বাদশাহকে হিমার বলা হতো। উমাইয়্যা বংশের খিলাফত এক শতাব্দীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে হিমার বলা হতো।

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ৭২ হিজরীতে জারীরা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জারীরা শাসন করতেন। তার মা দাসী। তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে বড় বড় শহর, নগর ও জনপদের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১০৫ হিজরীতে কাওনিয়া দখল করেন। তিনি শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে সাহসিকতা, কঠোরতা এবং সচেতনতা প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

ওলীদ নিহত হওয়ার সময় তিনি আরমেনিয়া ছিলেন। সেখানে ওলীদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে তিনি তার প্রতি অনুগত মুসলমানদের বাইআত করান। অতঃপর ইয়াযিদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি তার কোষাগার উন্মুক্ত করে দেন। এরপর ইবরাহীমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে পরাজিতকরত নিজের বাইআত করান এবং ১২৭ হিজরীর সফর মাসের মাঝামাঝিতে নিজের জন্য খিলাফতের তখত পাকাপোক্ত করেন।

খলীফা হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম কবর থেকে ইয়াযিদের লাশ উত্তোলন করেন এবং ওলীদকে হত্যার অপরাধে তার লাশটি শূলে ঝুলিয়ে রাখেন। এরপর চতুর্দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ আসতে থাকে। ১৩২ হিজরী পর্যন্ত এ অবস্থাই

বিদ্যমান ছিল। অতঃপর বনূ আব্বাসীয়া গোত্র তার উপর আক্রমণ করে। আব্দুল্লাহ বিন আলী সাফ্ফাহর চাচা আব্বাসীয়া বংশের সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। মৌসূলের নিকটবর্তী উভয় পক্ষের লড়াইয়ে আব্দুল্লাহ তাকে পরাজিত করেন। মারওয়ান সিরিয়ায় পালিয়ে গেলে আব্দুল্লাহ তার পশ্চাৎধাবন করেন। অবশেষে তিনি মিসরে পালিয়ে গেলে আব্দুল্লাহর ভাই সালেহ-এর সাথে বসীর অঞ্চলে লড়াই হয় এবং ১৩২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সালেহ তাকে হত্যা করেন। তার শাসনামলে সাদী আল-কাবীর, মালিক বিন দিনার আল-যাহাদ, আসেম বিন আবু নুজুদ আল-মকরী, ইয়াযিদী বিন আবু হাবীব, শায়বা বিন নাসাহ আল-মাকরী, মুহাম্মাদ বিন মিনকাদার, আবু জাফর, ইয়াযিদ বিন কা'কা আল-মাকরী, আল-মাদানী আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী, আবুল যানাদ, হাম্মাম বিন মানবাহ, ওয়াসেল বিন আতা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন।

সূলী মুহাম্মাদ বিন সালেহ থেকে বর্ণনা করেন, মারওয়ানকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক আব্দুল্লাহ বিন আলীর নিকট পাঠানো হলে তিনি তা এক জায়গায় রাখতে বললেন। তার কর্তিত মাথা এক স্থানে রাখা হলে একটি বিড়াল এসে জিহ্বা টেনে বের করে তা-চাবাতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ বিন আলী বললেন, এ শিক্ষাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

সাফ্ফাহ : বনূ আব্বাসের প্রথম খলীফা

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। উপাধি আবুল আব্বাস। সাফফাহ বনূ আব্বাসের প্রথম বাদশাহ। তিনি ১০৮ হিজরী ভিন্ন মতে ১০৪ হিজরীতে বলকার উত্তপ্ত রণাঙ্গনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। কুফায় তার বাইআত গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। জননীর নাম রায়েলাতুল হারেছা। তিনি স্বীয় ভ্রাতা ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। চাচা ঈসা বিন আলী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বয়সে স্বীয় ভ্রাতা মানসুরের ছোট।

ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, একটি বিশৃঙ্খল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলে আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে সাফফাহ নামক একজনের আবির্ভাব হবে। তিনি প্রচুর পরিমাণে সম্পদ লোকদের দান করবেন।

উবাইদুল্লাহ আয়শী বলেন, আমার বাবা বলেছেন, বনূ আব্বাসের শাসনামল যখন এলো তখন আমার শিক্ষক বললেন, আল্লাহর কসম! বনূ আব্বাসের পরিবার

অপেক্ষা বড় কারী, ইবাদতকারী এবং দানশীল এ ভুবনে আর কেউ নেই।

ইবনে জারীর তাবারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় চাচা হযরত আব্বাসকে "আপনার বংশে খিলাফত স্থানান্তর হবে" এ কথা বলার পর থেকে হযরত আব্বাসের বংশধররা খিলাফত প্রাপ্তির কামনা করতে থাকেন।

রাশিদীন বিন কুরায়েব কর্তৃক বর্ণিত, আবু হাশিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হানীফ সিরিয়া যাবার পথে মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সাথে সাক্ষাত হলে বলেন, হে চাচাতো ভাই! এ কথা কাউকে বলবেন না, আমার মন বলছে, অচিরেই খিলাফত আপনাদের হাতে এসে পড়বে। মুহাম্মাদ বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, এ কথা আর কাউকে জানাবেন না।

মাদায়েনী বলেন, আমি অনেক লোকের নিকট শুনেছি, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তিন বার অর্থাৎ প্রথম বার ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় বার এ শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং তৃতীয় বার আফ্রিকায় বিশৃঙ্খলার সময় বলেছিলেন, আমার মনে হয় পূর্ব দিক থেকে দলে দলে লোকেরা আমাদের সাহায্য নিতে ছুটে আসবে এবং তাদের সাহায্যে বনূ আব্বাসের অশ্বগুলো পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাবে। ইয়াযিদ বিন আবু মুসলিম আফ্রিকায় শহীদ হওয়ার পর বারবার জাতি বিদ্রোহ করলে হযরত ইমাম মুহাম্মাদ আবু মুসলিম খোরাসানীকে একটি পত্র দিয়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের প্রতি লোকদের আহ্বান করার জন্য পাঠান। লোকেরা প্রস্তুত ছিল। ইত্যবসরে ইমাম মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। লোকেরা তার পুত্র ইবরাহীমের নিকট বাইআত করে। এ সংবাদ পেয়ে মারওয়ান ইবরাহীমকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে। অতঃপর ইবরাহীমের ভাই সাফফার কাছে দলে দলে আমজনতা আসতে থাকে। অবশেষে ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখে কুফায় সাফফার নিকট লোকেরা বাইআত গ্রহণ করে। তিনি এসব লোকের জুমআর নামায পড়ান এবং খুতবার মধ্যে বলেন, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর তিনি কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিজ পরিবারের বিবরণ দানে বললেন, নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের সকল কার্যাদি আসহাবে রসূল (সা.)-দের উপর বর্তায়। কিন্তু বনূ হরব এবং মারওয়ান তা কুক্ষিগত করে অত্যাচার আরম্ভ করে। তারা অনেক অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রাপ্য আমাদের দেয়া হলে আমরা সে যুগের হতদরিদ্রদের সেবা করতে পারতাম। যারা আমাদের বংশের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রেখেছে আমাদের বংশের সাথে তাদেরকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সে সময় আমাদের

এবং আহলে বাইতের কোন প্রকার ক্ষমতাই ছিল না। হে কুফাবাসী! আপনারা আমার ভালোবাসার প্রাসাদ এবং বন্ধুত্বের মারকায। আপনারা কখনই আমার ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাবেন না। অত্যাচারীর নির্মম অত্যাচারও আমাদের পৃথক করে রাখতে পারবে না।

ঈসা বিন আলী (বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাশেমী, হিজাযী, বাগদাদী) হুমায়মা থেকে কুফা আসার সময় সাফফাহর সাথে চৌদ্দজন বীর সাহসী লোককে নিতে বলেন, সংবাদ পেয়ে মারওয়ান প্রতিরোধ করতে এলে তিনি নির্মমভাবে পরাজিত হন এবং তিনি সহ বনূ উমাইয়্যার অসংখ্য মানুষ ও অগনন সৈনিক নিহত হয়। এভাবে সাফফাহ গোটা পশ্চিমাঞ্চল পদানত করেন।

যাহাবী বলেন, সাফফাহর শাসনামলে ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরায় তাহেরা থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, গোটা স্পেন এবং কতিপয় শহর বেদখল হয়ে যায়। অতঃপর সেগুলো আর হাতে আসেনি। সাফফাহ ১৩৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি ভ্রাতা আবু জাফরকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। তিনি ১৩৪ হিজরীতে খিলাফতের রাজধানী কুফা থেকে আনবারে স্থানান্তর করেন।

সূলী বলেন, সাফফাহ বিভিন্ন সময় এ কথাগুলো বলেছেন, কুদরত বাড়লে প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। পরহেযগারী কমে গেলে সত্য ম্লান হয়। অসভ্য সেই ব্যক্তি যে কৃপণতা গ্রহণ এবং ধৈর্যকে অসম্মান জ্ঞান করে। ধৈর্য ও নম্রতা ক্ষতির কারণ হলে ক্ষমা করে দিবে। ধৈর্য এক মহৎ গুণ। শরীয়তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বাদশাহ কোন প্রকার বিশ্রাম নিবে না, চিন্তাভাবনা করে অবিশ্রান্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সূলী বলেন, সাফফাহ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াদা করলে তা পূরণ না করা পর্যন্ত স্থানচ্যুত হতেন না। একবার আব্দুল্লাহ বিন হাসান তাকে বললেন, আমি কোন দিন এক লাখ দেরহাম দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ এক লাখ দেরহাম নিয়ে এসে তার বাড়িতে পৌছে দেবার নির্দেশ দেন। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তার আংটিতে খোদাই করে লিখা ছিল–

الله ثقة عبد الله به يؤ من

সাঈদ বিন মুসলিম বাহালী বলেন, একদা তিনি বনূ হাশিমসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মজলিসে বসেছিলেন। তার হাতে ছিল পবিত্র কুরআন শরীফ। ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ বিন হাসান এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে

আমাদের যে প্রাপ্যের কথা বলেছেন তা আমদের বুঝিয়ে দিন। সাফফাহ বললেন, তোমার পূর্বপুরুষ হযরত আলী (রা.) আমার চেয়ে অনেক উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ খলীফা ছিলেন। আর তোমার পিতামহ হযরত হাসান এবং হযরত হোসেন তোমার চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন। অতএব আমার উপর কর্তব্য হযরত আলী (রা.) স্বীয় সন্তানদের যতটুকু দিয়েছেন আমিও তোমাকে ততটুকু দিব– এটাই ইনসাফ। এর অতিরিক্ত প্রাপ্তির যোগ্য তুমি নও। এ কথা শুনে তিনি নিরুত্তর রইলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বনূ আব্বাসের শাসনামলে প্রশাসনিক দফতরগুলো থেকে আরবদের নাম বাদ পড়ে এবং তদস্থলে তুর্কীরা আসে। আস্তে আস্তে সবই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং পরবর্তীতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এ সাম্রাজ্য বহু ভাগে বিভক্ত হয় এবং তারা পৃথক পৃথক গভর্নরের মাধ্যমে অত্যাচারের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

কথিত আছে, তিনি রক্ত ঝরিয়ে সকল গভর্নরের আনুগত্য অর্জন করেন। তবে তার বদান্যতা ছিল অপার। তার খিলাফতকালে যায়েদ বিন আসলাম, আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাজাম, মদীনা শরীফের বিচারপতি রাবীআ, আব্দুল মালিক বিন উমায়ের, ইয়াহইয়া বিন আবু ইসহাক হাযরামী, সুপ্রসিদ্ধ লেখক আব্দুল হামিদ (তিনি মারওয়ানের সাথে বুসির নামক স্থানে নিহত হন), মানসুর বিন মুতামার, হাম্মাম বিন মানবাহ প্রমুখ ওলামা ইন্তেকাল করেন।

মানসুর আবু জাফর আব্দুল্লাহ

নাম আল-মানসুর আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। তিনি ৯৫ হিজরীতে সালামা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দাদাকে দেখলেও তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি; বরং পিতা এবং আতা বিন ইয়াসার থেকে রেওয়ায়েত করেন এবং তার ছেলে মাহদীও তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার ভাইয়ের শাসনামলে লোকেরা খিলাফতের উত্তরাধিকার হিসেবে তার বাইআত গ্রহণ করে। তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভীতিকর, সাহসী, দৃঢ় মেজাজ এবং ধৈর্যশীল খলীফা হিসেবে পরিচিত। তিনি অঢেল সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি খেলাধুলা, সাহিত্য ও আইনবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক বনী আদম হত্যা করার মধ্য দিয়ে নিজের একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করায় তিনিই তাঁকে বন্দী করে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। কারো

মতে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফতোয়া দেয়ায় তাকে বিষ পানে শহীদ করা হয়।

মানসুর স্পষ্টভাষী, কৃপণ এবং লোভী ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের থেকে এক পয়সার অষ্টমাংশেরও হিসাব নিতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি এক-অষ্টমাংশ পয়সার প্রবর্তন করায় তাকে আবুদ দাওয়ানীক উপাধি প্রদান করা হয়।

খতীব যহাক থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমাদের মধ্যে সাফফাহ, মানসুর এবং মাহদী। যাহাবী বলেন, এ হাদীসটি মুনকীর মুনকাতে। খতীব এবং ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে সাফফাহ, মানসুর এবং মাহদী। যাহাবী বলেন এ হাদীসের সনদ সঠিক।

ইবনে আসাকির আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, আমাদের মধ্যে কায়েম, মানসুর, মাহদী এবং সাফফাহ। কায়েমের খিলাফত হবে রক্তপাতহীন। মানসুরের শাসন হবে কঠোর। সাফফাহ হবেন দানশীল এবং মাহদী পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।

খলীফা মানসুর বলেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি হারাম শরীফে, আর রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবা শরীফে। কাবা শরীফের দরজা খোলা। একজন নকীব আব্দুল্লাহ কোথায় বলে আওয়াজ দিল। আমার ভাই আবুল আব্বাস (সাফফাহ) সিঁড়ি বেয়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর কালো পতাকা বাঁধা বর্শা হাতে তিনি বেরিয়ে এলেন। অতঃপর আবার আব্দুল্লাহ কোথায় আওয়াজ শুনলাম। এবার আমি কাবা অভ্যন্তরে গিয়ে দেখলাম সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) বসা। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট থেকে ওয়াদা নেন, উম্মতের ব্যাপারে ওসীয়ত করেন, আমার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন, যার প্রান্ত আমার গ্রীবা পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। অতঃপর বললেন, হে খলীফাদের পিতা! একে কিয়ামত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাও।

১৩৭ হিজরীর সূচনা লগ্নে মানসুর খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম আবু মুসলিম খোরাসানী যিনি সর্বপ্রথম বনূ আব্বাসের প্রতি লোকদের আহবান করেন এবং আব্বাসীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম নকীব তাকে হত্যা করেন।

১৩৮ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান স্পেন পদানত করেন এবং চার'শ বছর পর্যন্ত তার বংশধর স্পেন শাসন করেন। তিনি আলেম এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর জননী বারবার বংশীয়

মহিলা। এজন্য লোকেরা বলতো, ইসলামের রাজত্ব দুই বারবার মহিলার সন্তানদ্বয় মানসুর এবং আঃ রহমানের মধ্যে বণ্টন হয়ে গেছে।

১৪১ হিজরীতে মৃত্যুর পর দুনিয়ায় পুনর্গমনের বিশ্বাস নিয়ে একটি ভ্রান্ত দলে আবির্ভাব হলে তিনি তাদের হত্যা করেন। এ বছর তবরস্তান বিজিত হয়।

যাহাবী বলেন, ১৪৩ হিজরীতে মানসুর যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের সমবেত করে হাদীস, ফিকহ এবং তফসীর চর্চার প্রতি আহ্বান জানালে ইবনে জারীর মক্কায় হাদীসের কিতাব, মদীনায় ইমাম মালেক মুয়াত্তা নামক কিতাব, ইমাম আওযায়ী সিরিয়ায়, হাম্মাদ বিন সালামা বসরায়, মুআম্মার ইয়ামনে, হযরত ছুফিয়ান ছাওরী কুফায়, ইবনে ইসহাক মাগাযী, হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) ফিকহ ও কিয়াস নিয়ে বিশাল গবেষণা লব্ধ ও প্রনিধানযোগ্য গ্রন্থাদি রচনা করেন। এর কিছুদিন পর হাশিম, লায়ছ ইবনে লাহীআ, ইবনে মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবনে ওহাব প্রমুখ প্রচুর সৃজনশীল রচনা সৃষ্টি করেন। অল্প দিনের মধ্যেই আরবী অভিধান, ইতিহাস, রাবীদের বর্ণনা, সীরাত ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত বই-এর ভাণ্ডার গড়ে উঠে; এর পূর্বে ইমাম এবং ওলামাগণ মুখস্থ পড়ায়ে ছাত্রদের মুখস্থ করে দিতেন। তবে কিছু কিছু লোকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ছিল।

১৪৫ হিজরীতে মুহাম্মাদ, ইবরাহীম এবং আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন আবু তালিবের গোটা পরিবার মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি ভ্রাতাদ্বয়কে (মুহাম্মাদ এবং ইবরাহীম) পরাজিত করে হত্যা করেন। এদের সাথে অনেক আহলে বাইতকেও শহীদ করে দেয়া হয়। এটা ছিল প্রথম বিশৃঙ্খলা যা বনূ আব্বাস এবং আলেমদের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইতোপূর্বে উভয়ে এক ও অভিন্ন ছিল।

এরপর মানসুর মুহাম্মাদ এবং ইবরাহীমকে যারা সঙ্গ দিয়েছেন অথবা সঙ্গ দেবার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন সে সব আলেমদের কাউকে হত্যা, আবার কাউকে ভীষণ প্রহার করেন। এসব আলেমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.), আব্দুল হামীদ বিন জাফর (র.), ইবনে আজলান (র.), ইমাম মালেক বিন আনাস (র.) প্রমুখ। লোকেরা ইমাম মালেক বিন আনাসকে বলেছিল, আমরা যেখানে মানসুরের বাইআতের অধীনে সেখানে কিভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো? ইমাম মালেক বলেছিলেন, তোমরা স্বেচ্ছায় বাইআত করনি, বলপূর্বক করানো হয়েছে। অতএব এ বাইআত কার্যকরী নয়।

১৪৬ হিজরীতে কবরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৪৭ হিজরীতে মানসুর তার চাচা ইসা বিন মূসা, যাকে সাফফাহ মানসুরের পর খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। তিনি তাকে বাদ দিয়ে পুত্র মাহদীকে উত্তরাধিকার মনোনীত

করেন। অথচ ঈসা বিন মূসা মানসুরের পক্ষ হয়ে ইবরাহীমের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। আর তিনি তার সাথে এ আচরণ করেন।

১৪৮ হিজরীতে স্পেন ছাড়া গোটা সাম্রাজ্য মানসুরের পদানত হয় এবং তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন স্পেনে আমিরুল মোমিননের পরিবর্তে শুধু 'আমীর' উপাধি ধারণ করে উমাইয়া বংশীয় আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া অত্যন্ত প্রতাপের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন, পরবর্তীতে তার ছেলেরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

১৪৯ হিজরীতে বাগদাদ নগরী পুনর্গঠনের কাজ সুসম্পন্ন হয়। ১৫০ হিজরীতে খোরাসানের সৈন্যরা আসনাদসীসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে খোরাসানের অধিকাংশ জনপদ দখল করে নিলে মানসুর চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তিন লাখ পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈনিকের এক সুবিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। আজছাম নামক মানসুরের বিশেষ এলিট বাহিনী প্রাণপণে লড়াই করেও এলিট বাহিনীসহ অনেক সাধারণ সৈনিক নিহত হয়। মানসুর এ সংবাদ পেয়ে হাযেম বিন খুযাইমাকে সিপাহসালার করে তার নেতৃত্বে আবার তিনি এক লাখ সৈন্য প্রেরণ করেন। উন্মুক্ত ময়দানে লড়াই শুরু হয়। আফ্রিকানরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করতে থাকে। এ যুদ্ধে সত্তর হাজার প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে আসনাদসীস পরাজিত হয়ে স্বসৈন্যে এক পাহাড়ে আত্মগোপন করে। হাযেম তাদের পশ্চাদ্বাবন করে চৌদ্দ হাজার সৈন্য বন্দী করে এবং এক বছর পর তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। আসনাদসীস দীর্ঘদিন এক দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর তার পিতাসহ ত্রিশ হাজার সৈন্য মানসুরের হাতে তুলে দেয়। তবে সিপাহসালার তাকে বন্দী করে সকলকে আযাদ করে দেয়।

১৫১ হিজরীতে রিসাফা শহরকে চুনা-পাথর দিয়ে দেয়াল তৈরির মাধ্যমে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়। ১৫৩ হিজরীতে বাঁশ এবং পাতা দ্বারা তৈরি উঁচু এক ধরনের বিশেষ টুপি ব্যবহারের আদেশ জারি করেন।

১৫৭ হিজরীতে মানসুর হযরত সুফিয়ান ছাওরী এবং উবাদা বিন কাছীরকে বন্দী করার জন্য মক্কার গভর্ণরকে নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বন্দী করেন। তাদেরকে হত্যার আশঙ্কায় জনতা ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। ইত্যবসরে হজের মৌসুম সমাগত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ সবল হয়ে মক্কায় পৌছাননি। তিনি অসুস্থ হয়ে মক্কায় আসেন এবং এখানেই মারা যান। তিনি যিলহজ মাসে বতন অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন এবং তাকে হুজুন ও বিরে মাইমুনের মধ্যবর্তী স্থানে সমাহিত করা হয়।

তার মৃত্যুকে উপজীব্য করে কবি সালিম বলেন, "মুহাম্মাদের পুত্রকে কবরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্তে রেখে হাজীগণ ফিরে আসেন। তাকে মক্কায় বন্ধক রাখা হয়েছে। লোকেরা আসবে, হজ্ব পালন করবে এবং জানবে তাদের নেতা ইহরাম অবস্থায় পাথরের নিচে শুয়ে আছে।"

ইবনে আসাকির স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, মানসুর খিলাফত লাভের পূর্বে শিক্ষা অর্জনের জন্য সফর করছিলেন। এক মনজিলে গিয়ে থামলে এক চৌকিদার বলল, দু'দিরহাম না দিলে আমি এখানে থাকতে দিব না। মানসুর বললেন, আমাকে ক্ষমা করো আমি বনূ হাশিমের সন্তান। সে বলল, 'দু'দিরহাম দিলে থাকতে পারবে। তিনি বললেন, আমি নবীজী (সা.)-এর চাচার বংশধর। চৌকিদার নিজের কথায় অনঢ়। তিনি বললেন, আমি কুরআনের কারী। চৌকিদারের দু'দিরহাম চাই। তিনি বললেন, আমি ফকীহ এবং ইলমুল ফারায়েজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখি। কিন্তু সে কিছুতেই তার কথা না মানায় তিনি অপারক হয়ে তার হাতে দু'দিরহাম তুলে দিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে সম্পদ জমার প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে পড়েন।

রাবে' বিন ইউনুস হাজিব বলেন, মানসুর বলেছেন, খলীফা চার জন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গনী (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)। আর বাদশাহ চার জন হযরত মুআবিয়া (রা.), আব্দুল মালিক, হিশাম এবং আমি।

হযরত মালেক বিন আনাস বলেন, একদিন মানসুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর কে সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি বললাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)। মানসুর বললেন, সত্য বলেছেন। আমারও অভিমত তাই।

ইসমাঈল ফিহরী বলেন, মানসুর আরাফাত দিবসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ অভিভাষণ প্রদান করেন– উপস্থিতি! আল্লাহ তা'আলা প্রজাবৃন্দকে সতর্ক করার জন্য আমাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। তিনি দান করার জন্য আমাকে ধনাগার দিয়েছেন। জনমণ্ডলী! পবিত্রতম এই আরাফার দিবসে তোমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি এই দিনে পবিত্র কুরআন মজীদে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

তোমরা তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করো– হে আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়েতের পথ নির্দেশ করুন। তোমাদের সাথে তিনি আমাকেও নমনীয়তা, করুণা এবং দান করার শিক্ষা দিন।

সূলী বলেন, লোকেরা তাকে কৃপণ ভাবত বিধায় তিনি তার এ অভিভাষণের শেষাংশের কথাগুলো বলেন।

আসমা'য়ী বলেন, একদা মানসুর মিম্বরে দাঁড়িয়ে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَاُؤْمِنُ بِهٖ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

এ পর্যন্ত বলেছেন এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমিরুল মুমিনীন! বলুন আপনি কে? মানসুর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, স্বাগতম! তুমি মূল্যবান কথা বলেছ। আল্লাহর শুকরিয়া আমি তাদের মধ্যে নই আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করার পরও অধিক হারে পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের ঘর থেকেই ওয়ায-নসীহত শুরু হয়েছে। হে প্রশ্নকারী! আল্লাহর কসম! তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভালো নয়। প্রসিদ্ধতা অর্জনের জন্য তা বলেছ। আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। জনতা! এ ধরনের লোক থেকে তোমরা দূরে থাক। অতঃপর তিনি মূল খুতবা যেখান থেকে ছেড়েছিলেন সেখান থেকে আবার শুরু করেন। তিনি কাগজে লিখিত খুতবা পাঠ করতেন।

বর্ণিত রয়েছে, মানসুর তার ছেলে মাহদীকে এই বলে উপদেশ দেন– হে আবু আব্দুল্লাহ! খলীফাকে পরহেযগারী এবং বাদশাহকে ফরমাবরদারী ঠিক রাখতে হয়। কোন প্রজা ইনসাফ ছাড়া আনুগত্য করবে না। যে ক্ষমাশীল সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর যে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে সে নির্বোধ। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কাজ করবে না। কারণ মননশীলতা মানুষের দর্পণ। এ দর্পণে নিজ নিজ কাজের ভুলগুলো ধরা যায়। বাবা! সবসময় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। ক্ষমা পরায়ণ হবে। দয়ার্দ্রতার মধ্য দিয়ে শাসন করবে। স্মরণ রাখবে, বিজয় অর্জনের পর সর্বদা নমনীয়তা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন করবে।

মোবারক বিন ফুযালা বলেন, একদিন আমি মানসুরের নিকট বসেছিলাম। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আমি হযরত হাসান (রা.) থেকে শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী এ বলে

আওয়াজ দিবে "যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করবেন তিনি দাঁড়াবে, এছাড়া অন্য কেউ দাঁড়াতে পারবেন না।" তখন সেই দাঁড়াবে যে ক্ষমা করতো। একথা শুনে মানসুর বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

আসমা'য়ী বলেন, মানসুর এক অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য ডেকে আনলে সে বলল, আমিরুল মোমিনীন! প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইনসাফ। কিন্তু ক্ষমা করা মহৎ গুণ। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমিরুল মুমিনীনের জন্য দু'আ করবো তিনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। এ কথা শুনে তিনি তার ক্ষমা পত্রে স্বাক্ষর করেন।

আসমা'য়ী বলেন, একবার মানসুর শাম দেশে গিয়ে এক গেঁয়ো লোককে বললেন, আল্লাহর শোকর, আমার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তিনি তোমাদের উপর থেকে প্লেগ রোগ তুলে নিয়েছেন। গেঁয়ো লোকটি বলল, আপনার শাসন এবং প্লেগ রোগ দু'টোই সমান। আল্লাহর শোকর, তিনি উভয়টি আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি।

মুহাম্মাদ বিন মানসুর বাগদাদী বলেন, জনৈক সাধক ব্যক্তি মানসুরের নিকট এসে নসীহত করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল নেয়ামত দান করেছেন। আপনি তা দ্বারা আখেরাতে নিজের শান্তির জন্য কিছু ক্রয় করুন। আপনি সেই রাতের কথা স্মরণ করুন, যে রাত কবর জীবনের প্রথম রজনী হবে। এবং সেই দিনের কথা ভেবে দেখুন যারপর আর কোনো রাত হবে না। এ কথা শুনে মানসুর তাকে অর্থকড়ি দেবার নির্দেশ দিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। সাধক বললেন, আমি আপনার অর্থ-কড়ির আশা করলে আপনাকে নসীহত করার সওয়াব পেতে পারি না।

আব্দুস সালাম বিন হরব বলেন, একদা মানসুর হযরত আমর বিন উবায়েদকে ডেকে এনে তার সামনে অনেক সম্পদ পেশ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় মানসুর বললেন, আল্লাহর কসম, তোমাকে তা গ্রহণ করতেই হবে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তা কখনই ছুঁবো না। মাহদী হযরত আমরকে বললেন, আমিরুল মুমিনীন তো কসম করেছেন। তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীনের কাফ্ফারাহ আদায় করা আমার চেয়ে বেশি সহজ। মানসুর বললেন, আপনি জানেন যে, আমি মাহদীকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছি। তিনি বললেন, মৃত্যুর সময় আপনি অন্যের বিষয় নিয়ে চিন্তিত। আপনার স্মরণ নেই তখন তিনি হবেন শাসনকর্তা। আব্দুল্লাহ বিন সালিম বলেন, বসরার বিচারপতি সাওয়ার বিন আব্দুল্লাহকে এ মর্মে পত্র লিখলেন– জমিজমা নিয়ে বিরোধ সংক্রান্ত যে মামলা আপনার কাছে আছে তা ব্যবসায়ীর পক্ষে রায় দিবেন। জবাবে বিচারপতি

মানসুরকে সাফ জানিয়ে দিলেন- আল্লাহর কসম, আমি ইনসাফের বিপক্ষে রায় দিব না। মানসুর আবার নির্দেশ দিলে তিনি একই জবাব দিলে মানসুর বললেন, আল্লাহর কসম. আমি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আমার নিয়োগকৃত বিচারপতি আদালতে সত্যের পক্ষে লড়তে গিয়ে আমার বিরোধিতা করতে পারেন।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক বিচারপতি সওয়ারকে তলব করে বাদী-বিবাদীর সামনে মানসুর হাঁচি দিলেন। বিচারপতি এর জবাবে ইয়ার হামুকাল্লাহ না বলায় তিনি কারণ জানতে চাইলে সওয়ার বললেন, আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেননি। মানসুর বললেন, মনে মনে বলেছি, তিনি বললেন, আমিও মনে মনে বলেছি। মানসুর বললেন, আপনি যেহেতু আমার পক্ষপাতিত্ব করলেন না, সেহেতু আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায়ভাবে কারো পক্ষ নিতে পারেন না। অতএব আপনি নিজ পদে ফিরে যান।

নামীর মাদয়ী বলেন, একদা মানসুর মদীনায় এলে কতিপয় উষ্ট্রচালক মানসুরের বিরুদ্ধে মদীনার বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন ইমরানের নিকট কোনো এক বিষয়ে অভিযোগ করলো। আমি সে সময় বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন ইমরানের নিয়োগ করা কেরানী। তিনি খলীফার বিরুদ্ধে আমাকে সমন জারি করার নির্দেশ দিলেন। আমি নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দিলাম। তিনি আবার তাকিদ দিলেন। অবশেষে আমি অভিযোগলিপি লিখে তাতে মোহর লাগিয়ে দিলাম। অতঃপর বিচারপতি এ পত্র নিয়ে যেতে বললেন। আমি তা নিয়ে মন্ত্রী রবীর কাছে গেলাম। তিনি খলীফার নিকট গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তার কাছ থেকে ফিরে এসে রবী বললেন, আমিরুল মুমিনীন বলেছেন, আমাকে আদালতে ডাকা হয়েছে, আমার সাথে কেউ যেতে পারবে না। অবশেষে মানসুর এবং রবী উভয়ে আদালতে এলেন। খলীফার সম্মানার্থে আমাদের কেউ দাঁড়ালো না। বিচারপতি চাদর পরে নিজ আসনে বসলেন। বিচারের বাদী পক্ষকে ডাকা হল। উভয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। বিচার কাজ শেষে মানসুর বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ ইনসাফপূর্ণ বিচারের জন্য আমি আপনাকে দশ হাজার দিনার প্রদান করছি।

মুহাম্মাদ বিন হাফয আল-আজলী বলেন, আবু দালামার পুত্র সন্তান হলে তিনি এখবর মানসুরকে জানানোর পর এ কবিতা আবৃত্তি করলেন,- "অলৌকিকতা এবং বুযর্গীর কারণে কেউ যদি সূর্যে গিয়ে উপবেসন করেন হে আব্বাস সন্তান! সেটা আপনি। কারণ আপনিই লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" এ বলে আবু দালামা একখানা

থলি বের করে মানসুরের সামনে রাখলেন। মানসুর বললেন, এটা কি? আবু দালামা বললেন, আপনি যা দিতেন আমি এর মধ্যে আপনাকে তাই দিয়েছি। অতঃপর মানসুর থলিটি ভরে দিরহাম দিয়ে দিতে বলেন। বস্তুত সেই থলিতে আরো দুই হাজার দিরহাম ধরেছিল।

মুহাম্মাদ বিন সালাম জামহী বলেন, জনৈক ব্যক্তি মানসুরকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কোনো আশা অপূর্ণ রয়েছে কি? তিনি বললেন, একটি আকাঙ্ক্ষা বাকী রয়ে গেছে। আর তা হলো, আমি এক চত্বরে বসে থাকব, আর আমাকে ঘিরে বসবে আসহাবে হাদীসের একটি দল। রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন। অতঃপর তিনি অন্যান্য আলোচনা করলেন। পরদিন মন্ত্রীদের ছেলেরা তার কাছে এসে বলল, নিন, আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। মানসুর বললেন, এরা তো সেই লোক নয়। (যারা হাদীসের চর্চা করবে) তাদের পোশাক হবে ময়লা এবং বেহাল অবস্থা। তাদের পদ যুগল হবে নগ্ন। মাথার চুল হবে লম্বা, তারা হবেন মুসাফির। আর তারাই হাদীস নকলের কাজ করবেন।

আব্দুস সামাদ বিন আলী মানসুরকে বললেন, আপনি এমনভাবে শাস্তি দেন যে, মনে হয় ক্ষমা শব্দটি কখনই আপনি শোনেননি। মানসুর বললেন, বনূ মারওয়ানের রক্ত এখনও শুকায়নি এবং আবু তালিব পরিবারের তলোয়ারগুলো এখনও খাপবদ্ধ হয়নি। আমরা এখন পর্যন্ত ঐ জাতির মধ্যে বসবাস করছি, তারা কিছুদিন পূর্বে আমাদেরকে বাজারে ঘুরতে দেখেছে। অথচ আজ খলীফা হিসেবে দেখছে। এখনও আমাদের দাপট লোকদের অন্তরে বসেনি। লোকেরা যেন আমাদের ক্ষমার কথা ভুলে না যায় এবং সর্বদা যেন শাস্তির জন্য প্রস্তুত না থাকে।

ইউনুস বিন হাবীব বলেন, একবার যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ হারেছী সাহিত্য রসে সিক্ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় নিজের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য মানসুরের নিকট পত্র লিখলেন। জবাবে মানসুর লিখলেন, ভাষার অলংকার এবং অহংকার একত্রিত হলে সেই লোকের মধ্যে গর্ব ফুটে উঠে। আমিরুল মুমিনীন তোমার ব্যাপারে এ আশঙ্কাই করছেন। তুমি এ অহংকার মিশ্রিত ভাষা বর্জন করো।

মুহাম্মাদ বিন সালাম বলেন, একদিন মানসুরকে তালিযুক্ত পোশাক পরতে দেখে জনৈক বাঁদি বলল, ইনি খলীফা, কিন্তু পোশাক তা প্রমাণ করে না। মানসুর বললেন, আফসোস! তুমি কি ইবনে হরামার এ কবিতা শ্রবণ করনি- (অর্থ) "পুরাতন চাদর এবং তালিযুক্ত পোশাক পরিহিতরাও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।"

আসাকেরী "আওয়ায়েল" গ্রন্থে লিখেছেন, উমাইয়া বংশের আব্দুল মালিকের মত আব্বাসীয় বংশের মানসুর ছিলেন কৃপণ। জনৈক ব্যক্তি তাকে তালি দেয়া পোশাক পরতে দেখে বলল, আল্লাহ তা'আলার কুদরত তিনি মানসুরের রাজত্বকে দরিদ্রতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে মুসলিম আল-হাদী একটি গান গাইল। তিনি পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি এ গান শুনে আনন্দিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অর্ধেক দিরহাম বখশিশ দিলেন। মুসলিম আল-হাদী বলল, আমার গান শুনে হিশাম দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। মানসুর বললেন, এ ব্যাপারে বাইতুল মালের অর্থ খরচ করা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি শর্ত করে সে কথা ভিন্ন।

আসাকেরী "আওয়ায়েল" গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে হারামা মদ পান করতো। একবার সে মানসুরের কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলো– "তার দৃষ্টি তখতের আশেপাশে নিবদ্ধ। যেখানে শাস্তি ও পুরস্কার উভয়টাই রয়েছে। তখত যাকে নিরাপত্তা দেয় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও সে নিরাপত্তা পায়। আর যাকে ধ্বংস করে তার মা কেঁদে ফেরে।" এ কবিতা শুনে মানসুর খুশি হয়ে বললেন, তুমি কি চাও? হারামা বলল, আপনি মদীনার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠান, তিনি আমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখলে আমার প্রতি যেন হদ জারি (আশি বেত্রাঘাত) না করেন। তিনি বললেন, আমি কিছুতেই শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারবো না। সে বলল, তাহলে আমার জন্য বিকল্প একটা কিছু করুন। মানসুর মদীনার শাসনকর্তাকে লিখলেন, যে ইবনে হারামাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনবে তাকে এক'শ বেত্রাঘাত এবং ইবনে হারামাকে আশি বেত্রাঘাত করবেন। এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনার শাসনকর্তা যদি নিজেও নেশায় বুদ হতে দেখতেন, তাহলে তাকে এ বলে ছেড়ে দিতেন, আশি বেত্রাঘাত লাগানোর জন্য কে এক'শ বেত্রাঘাত খাবে। মানসুর একবার তার কবিতা শুনে খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বলেন, হে ইবরাহীম! (ইবনে হারামা) একে সাবধানতার সাথে খরচ করবে। তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে আর কিছু নেই। ইবনে হারামা বলল, আমি এগুলো শক্ত মোহর দিয়ে এঁটে রাখব এবং তা পুলসীরাত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাব।

মানসুর অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তন্মধ্যে দুটি চরণ এমন– "তুমি জ্ঞানী হলে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে শক্ত করবে। কারণ ভঙ্গুর ইচ্ছাশক্তি মানুষকে দোদুল্যতায় নিক্ষেপ করে। শত্রু পক্ষের উপর বিজয় অর্জনের পর তাদেরকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিবে না।"

আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন ইনআম আফ্রিকী বলেন, আমি মানসুরের সাথে

পড়া লেখা করেছি. একবার তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমার জন্য খানা এলো, যার মধ্যে গোশত ছিল না। মানসুর সেবিকাকে বললেন, মিষ্টি নেই? সে বলল, না, তিনি বললেন, খেজুর নেই? সে বলল, না, এ কথা শুনে তিনি শুয়ে গেলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন–

عَسٰي رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

মানসুর খিলাফত পাবার পর আমি তার কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, উমাইয়া বংশের মোকাবিলায় আমাদের রাজত্ব কেমন? আমি বললাম, কোনো বাদশাহর যুগে এত অত্যাচার হয়নি, যা এখন হচ্ছে। মানসুর বললেন, আমি কোনো সাহায্যকারী পাইনি। আমি বললাম, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয বলেছেন, বাদশাহকে বাজারের সাথে উপমা দেয়া যায়। বাজারে সর্বাধিক বিক্রিত দ্রব্যাদিই আমদানি হয়। বাদশাহ দানশীল এবং সাধক হলে তার কাছে এমন লোকরাই আসবে। আর বাদশাহ বদকার ও পাপাচারী হলে এমন লোকেরই সঙ্গ মিলবে। এ কথা শুনে মানসুর মাথা নিচু করে ফেলেন।

মানসুরের বাণী হল– তিনটি বিষয় ছাড়া বাদশাহগণ সকল কথা শুনতে রাজি। এক, গোপন তথ্য ফাঁস না করা। দুই, হারাম কাজে বাধা প্রদান এবং তিন, সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়া। সূলী আরেকটি সংযোজন করেছেন, শত্রুর হাত প্রসারিত করলে হাত কেটে ফেলবে।

ইসহাক মসূলী বর্ণনা করেন, খানাপিনা ইত্যাদির সময় মানসুর নিজ সাথীদের সাথে একত্রে বসতেন না। উভয়ের মাঝে বিশ গজের একটি পর্দা ঝোলানো থাকত। এ পর্দা থেকে উভয়ে বিশ গজ দূরত্বে বসতেন। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে মাহদী সর্বপ্রথম সাথীদের সাথে একত্রে বসতেন।

সূলী বলেন, একদা মাছি মানসুরকে খুব বিরক্ত করলে তিনি মুকাবিন বিন সুলায়মানকে ডেকে মাছি সৃষ্টির রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাছিরা অত্যাচারীদের অপমানিত করে।

মুহাম্মাদ বিন আলী খোরাসানী বলেন, খলীফা মানসুর সর্বপ্রথম কবিদের সভাসদ হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তাদের পরামর্শে কাজ করেন। তিনি সর্বপ্রথম অনারব সুরিয়ানী ভাষায় আরবী গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। মানসুর সর্বপ্রথম অনারব লোকদের আহলে আরবদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এভাবে একদিন আসে যখন আরবের লোকদের জন্য শাসনকর্তা হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়।

মানসূর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

সূলী বলেন, মানসুর তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দীস এবং বংশ তালিকা মুখস্থের দিক দিয়ে প্রথিতযশা পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে আসাকির "তারীখে দামেশক" গ্রন্থে লিখেছেন, খলীফা মানসুর তার বাবা, তার দাদা এবং ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ডান হাতে আংটি পরতেন।

সূলী মানসূরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার আহলে বাইত নূহ (আ.)-এর কিশতীর মতো। যারা এতে আরোহণ করবে তারা পরিত্রাণ পাবে। আর যারা দাঁড়িয়ে থাকবে (আরোহণ করবে না) তারা ধ্বংস হবে।

মানসুর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি যখন কাউকে আমীর বানিয়ে তার জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দিব, যদি সে এর চেয়ে বেশি নেয় তবে সে আত্মসাৎকারী। (সূলী)

ইয়াহইয়া বিন হামযা হাযরামী বলেন, আমি আমার পিতার কাছ থেকে জেনেছি যে, খলীফা মাহদী তাকে দায়িত্ব দেবার পর বলেন, নির্দেশ বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন করবে না। কারণ আমার পিতা মানসুরের কাছে জেনেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম! আমি জালেমের থেকে দুনিয়া এবং আখেরাতে প্রতিশোধ নেব। মাজলুমকে দেখেও যারা সাধ্যমত সাহায্য করে না তাদেরও বদলা নিব। (সূলী)

সূলী আবু ইসহাকের বরাত দিয়ে মানসুর থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, চাঁদের শেষতিন তারিখে ভ্রমণ করবে না।

মানসুরের শাসনামলে বর্ণিত ওলামাগণ পরলোক গমন করেন– ইবনে মুকফাআ, সুহায়েল বিন আবু সালেহ, আলা বিন আব্দুর রহমান, মিসরের আইনবিদ খালিদ বিন ইয়াযিদ, দাউদ বিন আবু হিন্দ, আবু হাযিম, সালামা বিন দিনার আল-আরাজ, খাত্তা বিন আবু মুসলিম খোরাসানী, ইউনুস বিন উবায়েদ, সুলায়মান আল-আহওয়াল, বিখ্যাত মাগাযী গ্রন্থের লেখক মূসা বিন উকবা, আমর বিন উবায়েদ মুতাযালী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী কালবী, ইবনে ইসহাক, জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদেক আমাশ, শবল বিন উবাদা মাকরী মক্কা, মদীনার আইনবিদ মুহাম্মাদ বিন আজলান, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা, ইবনে জারীর, ইমামে আযম আবু হানিফা, হাজ্জাজ বিন আরতাত, হাম্মাদ, রুবা শায়ের হায়েরী, সুলায়মান তামীমী, আসেম আল আহওয়াল, ইবনে শাবারামা আল-যবী, মোতেল বিন

হাইয়ান, মোকাতেল বিন সুলায়মান, হিশাম বিন উরওয়া, আবু আমর বিন আলা, হামযা বিন হাবীব প্রমুখ।

মাহদী

আল-মাহদী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মানসুর ১২৭ হিজরীতে আইদবিজ নামক স্থানে, ভিন্ন মতে ১২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জননীর নাম উম্মে মূসা বিনতে মানসুর আল-হুমায়রিয়া। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত। তিনি সুন্দর চেহারা এবং নির্মল বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের মূলোৎপাটন করেন। মাহদী প্রথম খলীফা যিনি প্রাথমিক জীবনে ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসীদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি পিতা মানসুর এবং হযরত মুবারক বিন ফুযালা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর থেকে ইয়াহয়া বিন হামযা, জাফর বিন সুলায়মান আনসাবয়ী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রাকাশী, আবু সুফিয়ান, সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-হুমায়রী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেন, মাহদীর রেওয়ায়েতকে কেউ খণ্ডন এবং পরিমার্জন করেনি।

ইবনে আদী হযরত উসমান থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মাহদী হবেন আমার চাচা আব্বাসের বংশধর। এ হাদীস মাওযু।

আবু দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসটি হলো, মাহদীর নাম আমার নামের সাথে এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নামের সাথে মিল থাকবে।

মাহদী যৌবন প্রাপ্ত হলে মানসুর তাকে তিবরিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে জ্ঞান চর্চা ও আলেমদের সহচার্য গ্রহণে ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা অর্জন করলে মানসুর তাকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মানসুরের ইন্তেকালের সংবাদ বাগদাদে গিয়ে পৌছলে আমজনতা সেখানে মাহদীর নিকট বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ অভিভাষণ প্রদান করেন- আমিরুল মুমিনীনও এক আল্লাহর বান্দা। ডাক আসলে তিনিও চলে যাবেন, অথবা কোন নির্দেশ এলে তা পূর্ণমর্যাদায় বাস্তবায়ন করবে। এ কথা বলতে বলতে তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই বন্ধুর পৃথক হওয়ায় কেঁদেছিলেন। আর আমি প্রথমত বাবার শোকে মুহ্যমান এবং দ্বিতীয়ত আমার উপর খিলাফতের বোঝা অর্পিত হয়েছে। আমিরুল মুমিনীনের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। আমি মুসলমানদের খিলাফত পরিচালনার জন্য তাঁরই সাহায্য

প্রার্থনা করছি। উপস্থিতি! আপনারা আমার আনুগত্যের প্রকাশ যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবেই আমার আদেশ পালন করার জন্য নিজেদের মনকে প্রস্তুত করুন। যাতে আমি আপনাদের খেদমত করতে পারি এবং প্রতিটি কাজের ফলাফল সুন্দর হবে। আপনাদের মধ্যে যারা ইনসাফের প্রসার ঘটাতে চায় আমি তাদের ফরমাবরদারী করবো। আপনাদের উপর কঠোরতা হলে আমি তা দমন করার চেষ্টা করবো। আমি আপনাদের প্রতি সাধ্যমত সর্বদা প্রশান্তির শীতল বাতাস ছড়িয়ে দিবো। আপনাদেরকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দিতে এবং ইহসান করতে আমি জীবনকে উৎসর্গ করবো।

লাফযুয়া বলেন, ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হলে মাহদী অত্যাচারীদের দমন করার জন্য প্রচুর ব্যয় করেন। অভাবীদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাপক খরচ করেন। তিনি গভর্নরদের পুরস্কার দেন এবং পরিবার পরিজন ও গোলাম বাঁদিদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন।

তিনি বলেন, আবু দালামা সর্বপ্রথম মাহদীকে তাঁর খিলাফতের সুসংবাদ এবং তার পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আবু দালামা খিলাফতের জন্য অভিনন্দন এবং বাবার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে গিয়ে মাহদীর সামনে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন– "আমার চক্ষুদ্বয় আজব দৃশ্য দেখছে। এক দিকে খিলাফতের আনন্দ। অন্য দিকে বইছে শোকের অশ্রু। সর্বদা একটি চোখ রোদন করছে, অন্যটি হাসছে। একটি কষ্ট ভারী মনে হলেও অপর প্রান্তে রয়েছে খুশি ও আনন্দ। এক খলীফার মৃত্যুতে দুঃখ পেলেও অপর দয়ার্দ্র খলীফার তখতে আরোহণের খুশি ছড়িয়ে পড়েছে। একজন খলীফা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনীত দ্বীনের উপর ইন্তেকাল করার পর সহকারী এসেছে আপনার কাছে। আল্লাহ তাকে হিদায়েত দিন, খিলাফতের মর্যাদা দান করুন এবং জান্নাতুন নাঈমের পথে পরিচালিত করুন।"

১৫৯ হিজরীতে মাহদী তাঁর দুই ছেলে মূসা হাদী, অতঃপর হারুন রশীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

১৬০ হিজরীতে ভারতের আরবাদ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়। মাহদী এ বছর হজ্জ আদায় করেন। পর্দার ভারে কাবা গৃহ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় কাবা শরীফে মাহদী কর্তৃক নির্দিষ্ট পর্দা ছাড়া অতিরিক্ত পর্দা দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাহদীর জন্য মক্কায় বরফ সরবরাহ করা হয়। যাহাবী বলেন, মাহদী ছাড়া অন্য কোনো খলীফার জন্য মক্কায় আর কোনো দিন বরফ তৈরি বা সরবরাহ করা হয়নি।

১৬১ হিজরীতে মাহদী মক্কা শরীফে প্রশস্ত রাস্তা, ভবন এবং পানির হাউস তৈরি

করেন। তিনি জামে মসজিদগুলোর গভীর মেহরাব তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের অনুরূপ ছোট মিম্বর নির্মাণ করেন।

১৬৩ হিজরী এবং এর পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হয়।

১৬৬ হিজরীতে তিনি দারুস সালামকে দারুস সুলতানাত হিসেবে অভিহিত করেন এবং এখান থেকে মক্কা, মদীনা ও ইয়ামনের সাথে উট ও খচ্চরের মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ স্থাপন করেন। যাহাবী বলেন, মাহদীই সর্বপ্রথম হিজায থেকে ইরাক পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। এ বছর তিনি অনেক জায়গায় পথভ্রষ্টদের সাথে সরাসরি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।

১৬৭ হিজরীতে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। এতে অনেক ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৬৯ হিজরীতে একবার মাহদী এক শিকারের পেছনে ঘোড়া ছুটান, শিকারটি এক পুরাতন বাড়ির মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে। ঘোড়াটিও শিকার ধরার জন্য প্রাণপণে ছুটে চলে। দ্রুত চলতে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় মাহদীর কোমরে এমনভাবে আঘাত লাগে যে, সেখানেই তাঁর জীবন সাঙ্গ ঘটে। সেদিন ছিল ১৬৯ হিজরীর মুহাররম মাসের ২২ তারিখ। কারো মতে বিষ খাওয়ায়ে তার মৃত্যু হয়। সালেম আল-খাতির মাহদীর মৃত্যুতে একটি করুণ শোক গাঁথা রচনা করেছেন।

সূলী বলেন, জনৈক রমণী মাহদীর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের বংশধর! আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ শব্দগুলো আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি। অতঃপর তিনি তাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

কুরাইশ খাত্তালী বলেন, সালেম বিন আব্দুল কুদ্দুস বসরীকে অপরাধের শাস্তি প্রদানের জন্য মাহদীর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে হত্যা করতে চাইলেন। সে বলল, আমি ভ্রান্ত আকীদা গ্রহণের জন্য তাওবা করছি। অতঃপর সে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। তিনি ক্ষমা করে দিলেন। সে গমনোদ্যত হলে তিনি তাকে বললেন, তোমার পঠিত কবিতার একটি চরণ তুমি গোপন করেছ। আর যা হল– "বৃদ্ধ কালে কোন লোক তার অভ্যাস ছাড়তে পারে না।" সে বলল, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন।

যাহির বলেন, দশজন হাদীস বিশারদ মাহদীর কাছে এলেন। যাদের মধ্যে ফরজ বিন ফুযালা এবং গায়াছ বিন ইবরাহীমও ছিলেন। মাহদী কবুতর নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। মাহদী গায়াছ বিন ইবরাহীমকে বললেন, একটি হাদীস শোনান। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফুআন

বর্ণনা করেন, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ (মাহদীর কারণে হাদীসের মধ্যে এতটুকু বৃদ্ধি করে বললেন), পাখি প্রেমীদের মোকাবিলা করা জায়েয নেই। মাহদী এটি শুনে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন। গায়াছ যাবার সময় (মাহদীর মনে হল আমাকে খুশি করার জন্য হাদীসের কিছু অংশ বৃদ্ধি করেছেন।) তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি মিথ্যা বলেছেন এবং মিথ্যার বেড়াজালে অর্থ উপার্জন করেছেন। অতঃপর তিনি কবুতরগুলো যবেহ করার নির্দেশ দেন।

কথিত আছে একবার শরীক মাহদীর কাছে এলে মাহদী বললেন, হয় আমার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা আমার ছেলেদের ইলম শিক্ষা দিতে হবে, না হয় আমার সাথে খানা খেতে হবে। এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। শরীক কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আপনার সাথে খানা খাওয়াই সবচেয়ে সহজ। মাহদী দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকার খানা দিতে বললেন। খাদ্য গ্রহণের সময় শাহী বাবুর্চি বলল, হযরত! এখন আপনি ফেঁসে গেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি অতঃপর শিক্ষাদান শুরু করেন এবং আনুগত্য গ্রহণ করেন।

বাগবী জা'দিয়াদ গ্রন্থে হামদান ইস্পাহানী থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমি একদিন শরীকের সাথে বসে ছিলাম। মাহদীর ছেলে এসে হেলান দিয়ে বসে শরীককে একখানা হাদীস জিজ্ঞেস করল। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার প্রশ্ন করল। তিনি কোনই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। শাহজাদা বলল, আপনি খলীফার বংশধরকে অবজ্ঞা করছেন। শরীক বললেন, আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে শাহজাদার বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। অতঃপর সে আদবের সাথে বসে পুনরায় প্রশ্ন করলে শরীক বললেন, হ্যাঁ, এটা হল তালবে ইলমদের পদ্ধতি।

মাহদী অনেক কাব্য-কবিতা আবৃত্তি করেন। সূলী মুহাম্মাদ বিন আম্মারাহ থেকে নকল করেন, মাহদী এক বাঁদির প্রেমে পড়েন। একদিন বাঁদির মনের ভাব বুঝার জন্য তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বাঁদির কাছে পাঠান। লোকটি কথা বললে বাঁদি তাকে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, তিনি আমাকে বিরক্ত করবেন এবং বর্জন করবেন। আর এতে আমার মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। এ প্রেক্ষিতে মাহদী এই কবিতাটি পাঠ করেন– "চাঁদের চেয়েও কোমল এক প্রেমিকা আমার অন্তর জয় করেছে। তার প্রতি আমার প্রেম বিশুদ্ধ। অথচ সে অসুস্থতার বাহানা করছে। আবার সে পৃথকও হয়ে যায় না।"

উমর বিন ইয়াযিআ হলো মাহদীর বন্ধু। তিনি তার সম্বন্ধে এ কবিতা রচনা করেন– "হে আল্লাহ! আমার একান্ত বন্ধু আবু হাফযের জন্য আমার অবদানকে পরিপূর্ণ করে দাও। গান, বদান্যতা, সুগন্ধ, বাঁদী, সুরা এবং আভিজাত্যের মধ্যে আমার জীবন সীমাবদ্ধ।'

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে মাহদীর কবিতাগুলো পিতা মানসুর এবং তার ছেলেদের চেয়েও সৌন্দর্যের রসে সিক্ত। তিনি কবিদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সূলী আবু কারীমা থেকে নকল করেন, মাহদী হঠাৎ এক বাঁদির কক্ষে ঢুকে পড়ে। বাঁদি সে সময় কাপড় খুলে অন্য কাপড় পরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মাহদীকে আসতে দেখে তড়িঘড়ি করে সে হাত দিয়ে সতর ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে। মাহদী হেসে উঠে এ কবিতাটি আবৃতি করেন– "আমার চক্ষু আমাকে ধ্বংসের দৃশ্য দেখিয়েছে।"

ইসহাক মসূলী বলেন, মাহদী এক বছর পর্যন্ত সাথীদের সাথে পর্দার আড়ালে বসতেন। পরে পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলে জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনার জন্য পর্দাই উত্তম ছিল। মাহদী বললেন, দেখার মধ্যে যে তৃপ্তি, অদৃশ্যে তা নেই।

মাহদী বিন সাবেক বলেন, একদা মাহদী একটি ছোট্ট সেনাদল পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে একা যাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে এ কবিতা আবৃত্তি করে– "খলীফাকে জানিয়ে দাও, আপনার হাতিম বিশ্বাসঘাতক। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমাদেরকে হাতিম থেকে রক্ষা করুন। যদি সৎ লোক বিশ্বাসঘাতককে সাহায্য করে, তার সওয়াবও গুনায় পরিণত হবে।" এ কবিতা শুনে মাহদী নির্দেশ দিলেন, "আমার সাম্রাজ্যে হাতিম নামে যে গভর্নর আছে তাকে অপসারণ কর।"

আবু উবায়দা বলেন, মাহদী বসরায় এলে জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতেন, একদিন তিনি এলেন। লোকেরা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এক গ্রাম্য লোক বলে উঠল, আপনার পেছনে নামায পড়ার খুব ইচ্ছা। কিন্তু আমি অযূ করিনি। মাহদী মুসল্লিদের লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে বলে তিনি নিজেও মিহরাবে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায় রইলেন। লোকেরা এ সুন্দর চরিত্র দেখে বিমুগ্ধ হয়।

ইবরাহীম বিন নাফে বলেন, একটি নদী নিয়ে বসরাবাসীর মধ্যে ঝগড়া হলে মাহদী বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ভূখণ্ড মুসলমানদের দান করেছেন। অতএব এর কোন একক মালিক নেই। কেউ একে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। যদি করা হয় তবে এর সমুদয় অর্থ সকল মুসলমানের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, নয়তো মুসলমানদের সাহায্যার্থে তা ব্যয় করতে হবে। একদল লোক নিজেদের দাবীতে অনড় রইল। তারা বলল, নদী আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে মৃত যমীনকে জীবিত করে (যে পরিত্যক্ত যমীনে চাষাবাদ করে ফসল ফলায়– অনুবাদক) সে হবে সেই যমীনের হকদার। আমাদের যমীন

মৃত। ফলে এটি শুধুই আমাদের হক। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফরমান শুনে মাহদী মাথা এতই নিচু করলেন যে তা যমীন স্পর্শ করবে। তিনি বললেন, তোমরা যে হাদীস শরীফের বিবরণ পেশ করছ তা আমি মানি এবং শুনেছি, তবে আমি সরেজমিনে এটাই দেখতে এসেছিলাম যে, এ যমীন মৃত কিনা! কুদরতীভাবে যার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় সে যমীন মৃত হতে পারে না– আমি এটা মানতে পারি না। তবে তোমরা যদি তা প্রমাণ করতে পার তাহলে মানব।

আসমায়ী বলেন, আমি বসরায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সেই কাজ করতে আদেশ করেছেন যা তিনি নিজ সত্ত্বা এবং ফিরেশতাদের জন্য পছন্দ করতেন। অর্থাৎ কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

বর্ণিত আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝায় যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সকল রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন। এ ভাবেই আপনাদেরকেও সকল উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, সর্বপ্রথম মাহদীই খুতবার মধ্যে এ আয়াত পাঠ করেন। এরপর থেকে সকল খতীব তাদের স্ব স্ব খুতরায় আবশ্যকীয়ভাবে এ আয়াতের উল্লেখ করেন।

মাহদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

সূলী আহমদ বিন মুহাম্মাদ এবং তিনি আব্দুর রহমান বিন মুসলিম মাদায়েনী থেকে বর্ণনা করেন, মাহদী তাঁর খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঐ খুতবাটি উল্লেখ করতেন যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় সম্বন্ধে বর্ণিত।

সূলী বলেন, ইয়াকুব বিন হাফয খাত্তাবী কর্তৃক বর্ণিত, মাহদী বলেন, অনারব এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এল। তাদের দাড়ি ছিল কামানো, আর গোঁফ লম্বা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা এদের বিপরীতে দাড়ি লম্বা এবং গোঁফ ছোট করবে। যাতে তা মুখে এসে না পড়ে। মাহদী হাদীসটি বর্ণনা করার সময় ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন। ইয়াহইয়া বিন হামযা বলেন, মাহদী আমাদের মাগরীবের নামায পড়ানোর সময় উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতেন। আমি বললাম, আমিরুল মোমিনীন! এটা আপনি কি করছেন?

মাহদী জবাবে বললেন, আমি আমার পিতা থেকে, তিনি আমার দাদা থেকে, আমার দাদা হযরত আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনটাই করতেন। আমি বললাম, এ জন্যই কি আপনি এমনটা করছেন? মাহদী বললেন, হ্যাঁ।

যাহাবী বলেন, এ হাদীসের সনদগুলো মোত্তাসিল (সংযুক্ত)। তবে আমার জানা নেই কে মাহদী এবং তার পিতাকে শরীয়তে দলীল বানিয়েছেন।

এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে বনূ হাশিমের গোলাম মুহাম্মাদ ইবনে ওলীদ একজন। তার সম্বন্ধে ইবনে আদী বলেন, তিনি মুনফারিদ (একক)। তিনি হাদীস পরিবর্তন করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, এটা বললে বিশুদ্ধ হবে না। তিনি মুনফারিদ নন বরং লোকদের তার বাধ্যতায় দেখা গেছে।

মাহদীর শাসনামলে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন, শুবা বিন আবু যানবা, সুফিয়ান ছাওরী, ইবরাহীম বিন আদহাম (দানশীল), দাউদ তাঈ (দানশীল), হাদীস বিশারদদের মধ্যে প্রথম কবি বাশার বিন বারদ, হাম্মাদ বিন সালামা, ইবরাহীম বিন তহান, খলীল বিন আহমদ।

আবু মুহাম্মাদ হাদী

হাদী আবু মুহাম্মাদ মূসা বিন মাহদী বিন মানসুর বারবার বংশীয়া খীযরান বিনতে আদরামের গর্ভ থেকে ১৪৭ হিজরীতে যী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন বাঁদী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের তখতে আসীন হন।

খতীব বলেন, যে বয়সে হাদী তখতে উপবেশন করেন সে বয়সে আর কোন খলীফা তখতে বসেননি। তাঁর বয়স তাঁর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেনি। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস খিলাফতের তখতে ছিলেন। তাঁর পিতা মাহদী ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের হত্যা করার জন্য তাকে ওসীয়ত করেছিলেন। সে কারণে তিনি অনেককে ইহজগত থেকে সরিয়ে দেন।

তার উপাধি মূসা আতবাক। তিনি উপরের ঠোঁটটি উঁচু করে রাখার কারণে সর্বদা তার মুখ ফাঁক হয়ে থাকত। এজন্য তার বাবা একজন লোক নিয়োগ করেন। মুখ ফাঁক দেখলেই সে তাকে বলত, মূসা আতবাক (অর্থাৎ মূসা মুখ বন্ধ কর)। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ বন্ধ করে নিতেন। এ কারণে তার নাম মূসা আতবাক হয়ে যায়।

যাহাবী বলেন, হাদী মদ পান করতেন। খেলাধুলায় মশগুল থাকতেন। নকশা করা গদির উপর সওয়ার হতেন। খিলাফতের কাজে অনেক ভুল-ত্রুটি করেন। তবে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, ভীতু এবং উঁচু মাপের কথা শিল্পী।

কেউ বলেন, তিনি জালেম ছিলেন। হাদীর যাত্রা পথে একদল সওয়ারী খোলা তলোয়ার, বর্শা ও তীর নিয়ে তার আগে আগে চলত। তিনি সর্বপ্রথম এ প্রথার প্রবর্তন করেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণের অংশ হিসেবে তার শাসনকর্তারাও এমন করত। তার যুগে অস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

১৭০ হিজরীর রবিউল আখের মাসে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বাঁশ বাগানে হাদীর বন্ধু পড়ে যাবার সময় সাহায্য চাইলে হাদী ধরতে গিয়ে তিনিও পড়ে যান। বন্ধুর পেটে এবং তার নাকে বাঁশ ঢুকে উভয়ের মৃত্যু হয়। কারো মতে, পেটে আঘাত পেয়ে তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেন, তার পর খিলাফতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হারুন রশীদকে হত্যা করে হাদী তার ছেলেকে উত্তরাধিকার বানাতে চাইলে তার মা নিজে তাকে বিষ খাওয়ায়।

অন্যান্যরা বলেন, হাদীর মা খীযরার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজের দেখভাল করতেন। তার দরজায় সওয়ারীরা পাহারা দিত, এটা দেখে হাদী তার মায়ের সাথে কর্কশ ভাষায় তর্ক করেন এবং বলেন, আজ থেকে আপনার দরজায় পাহারা দেখলে আমি তাদের হত্যা করব, আপনার কাজ চরকা কাটা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, তাসবীহ পাঠ এবং নাযাযে মশগুল থাকা। প্রশাসনিক কাজে আপনাকে আর যেন নাক গলাতে না দেখি। তার মা প্রবল ক্রোধে প্রস্থান করলেন। সেদিনই হাদী তার মায়ের কাছে বিষ মিশ্রিত খাবার পাঠান, তিনি তা কুকুরকে খেতে দেন। কুকুর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এটা দেখে খীযরান হাদীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। একদিন হাদীর জ্বর হয়। তিনি জ্বরের প্রকোপে মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন। কতিপয় লোক তার মায়ের ইশারায় হাদীকে গলা টিপে মেরে ফেলে। তিনি সাত পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন।

হাদী তার ভাই হারুন রশীদ সম্বন্ধে এ কবিতাটি রচনা করেন। (অর্থ) "আমি হারুনকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। যে নসীহত গ্রহণ করে না সে লজ্জিত হয়। আমি তাকে এমন কাজের প্রতি আহ্বান করেছিলাম যাতে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা সম্পর্ক অটুট থাকে। কিন্তু সে তা মানল না। সে এক কাজ করায় জালেম, আমি যদি সামনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করতাম তবে সে তাই করত যা আমি তাকে বলেছি। আর এর কারণে সে সময় সে ভীষণ অপমানিত হতো।"

খতীব ফজল থেকে বর্ণনা করেন, হাদী এক লোকের উপর ভীষণ রাগ করেন। জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে সুপারিশ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। এরপরও সে বারবার

ক্ষমাপ্রার্থনা করায় হাদী তাকে বললেন, আবার কেন ক্ষমা চাইছ। আমার সন্তুষ্টিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

মারওয়ান ইবনে আবু হাফস হাদীর কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, "এক দিন আমি তাকে এবং তার অনুদানকে তুলনা করছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে এটা বলতে পারেনি যে, আমি কাকে প্রাধান্য দিব।" হাদী তাকে বললেন, (পুরস্কারের মধ্যে) তুমি কোন জিনিসকে প্রাধান্য দাও। নগদ ত্রিশ হাজার দিরহাম না এক লাখ। মারওয়ান বললেন, নগদ ত্রিশ হাজার। আর পরবর্তীতে এক লাখ। হাদী বললেন, তুমি এখনই সম্পূর্ণ নিতে চাইছ। অতঃপর তিনি তাকে এক লাখ ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।

সূলী বলেন, যে সব রমণীর পেট থেকে দু'জন খলীফা জন্মগ্রহণ করেন তারা হলেন– খীযরান, হাদী এবং হারুন রশীদের মা। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের স্ত্রী ওলাদাহ বিনতে আব্বাস, যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ওলীদ এবং সুলায়মান। ওলীদ বিন আব্দুল মালিকের স্ত্রী শাহ ফিরন্দ বিনতে ফিরোজ বিন ইয়াযদ জরদ বিন কিসরা, এর গর্ভজাত দুই পুত্র যারা খিলাফতের তখতে আরোহণ করে তারা হলেন ইয়াযিদ নাকেস (প্রকৃত নাম মারওয়ান-অনুবাদক) এবং ইবরাহীম। খলীফা আব্বাস এবং খলীফা হামযার জননী হলেন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের বাঁদি বায়ী খাতুন। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আরেক বাঁদীর নাম কাজল, এর গর্ভে দাউদ এবং সুলায়মান যারা খিলাফত প্রাপ্ত হন।

সূলী বলেন, হাদী ছাড়া কোন খলীফা জুরজান থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ডাক যোগাযোগ স্থাপন করেননি। হাদীর মোহরে খোদাই করে লিখা ছিল–

الله ثقة موسى وبه يؤمن

সূলী বলেন, সালেম আল-খাসের হাদীর শানে অভিনব ধারায় একটি কাব্য রচনা করেন, যা ইতোপূর্বে দেখা যায়নি।

সূলী সাঈদ বিন সালেম থেকে বর্ণনা করেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি আশাবাদী তিনি হাদীর সমস্ত গুনাহ একটি কারণে ক্ষমা করে দিবেন। আর তা হল– একদিন আবুল খাত্তাব সাদী হাদীর কাছে এসে তার স্বরচিত কাব্য আবৃত্তি করলেন। (অর্থ) "হে পৃথিবীর ভালো মানুষ এবং সেই ভালো মানুষেরা, যারা আসন করেছে।" এ কাব্য শুনে হাদী বললেন, চুপ কর এসব কি বলছ! কবি বলল, এ থেকে এ যুগের লোকের উদ্দেশ্য, অতঃপর তিনি কাব্যের আরেকটি চরণ আবৃত্তি করেন, (অর্থ) "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য পৃথিবীর সকল

মর্যাদা, আর তুমি তার মর্যাদার কারণেই গর্ব করছ।" এ রচনাটি শুনে হাদী তাকে এক হাজার দিরহাম দিলেন।

মাদায়েনী বলেন, এক লোকের পুত্র সন্তান মারা যাওয়ায় হাদী তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন, ফিতনা এবং বালা মুসিবত হয়ে সে জীবিত থাকলে তুমি খুশি হতে। আর এখন সে তোমার জন্য সওয়াব ও রহমতের আধার হয়েছে তাই দুঃখ করছ।

সূলী বলেন, সালেম আল খাসের হাদীর শানে দু'টি চরণ আবৃত্তি করেন–" মূসা খিলাফত এবং হিদায়েত প্রাপ্ত। আমিরুল মুমিনীন মুহাম্মাদ পরলোক গমন করেছেন। যিনি দুর্ভিক্ষকে দূর করতেন তিনিও ইন্তেকাল করেন। আর যিনি সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের জন্য একাই যথেষ্ট তিনি তখ্ত নশীন।"

মারওয়ান বিন আবু হাফয হাদীর শানে এ কবিতা আবৃত্তি করেন– "আমিরুল মুমিনীনের কবরের কারণে শহরের সকল কবর গর্বিত। যদি তার ছেলের (হাদীর) আবির্ভাবে সান্ত্বনা না পেত তবে কাঁদতেই থাকত।"

হাদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

সূলী বলেন, মুত্তালিব বিন আকাশাহ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি কুরাইশদের অপবাদ দেয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে বেয়াদবী পূর্ণ উক্তি করে, আমি হাদীকে গিয়ে বিষয়টি জানালাম। তিনি তৎকালীন ফকীহদের (আইনবিদদের) এবং সেই লোকটিকে মজলিশে ডাকলেন। আমি সকলের সামনে তার বেয়াদবীর সাক্ষ্য দিলাম। হাদীর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি অবনত মস্তকে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে বললেন, আমি আমার পিতা মাহদী, তিনি তার পিতা মানসুর, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ, তিনি তার পিতা আলী এবং তিনি তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছেন। (তিনি বলেন) যে কুরাইশদের অপবাদ দিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করবেন। অতঃপর হাদী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি কুরাইশদের গালি দিয়ে সন্তুষ্ট নও? যে গালি রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌছে গেছে। এরপর তিনি তার গর্দান উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন।

এ হাদীসটি বর্ণিত সনদে মওকুফ। তবে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা মারফু (খতীব)।

হাদীর শাসনামলে মদীনার কারি নাফে প্রমুখ ইন্তেকাল করেন।

হারুন রশীদ আবু জাফর

আবু জাফর হারুন রশীদ বিন মাহদী মুহাম্মাদ বিন মানসুর আব্দুল্লাহ বিন

মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস। তার পিতা মাহদী হাদীর পর তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ভাই-এর পর ১৭০ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ শনিবার রাতে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

সূলী বলেন, সে রাতেই হারুন রশীদের পুত্র আব্দুল্লাহ মামুন ভূমিষ্ঠ হন। একই রাতে এক খলীফার মৃত্যু, অন্যজনের সিংহাসনে আরোহণ এবং আরেক জনের জন্মগ্রহণ- এমন ঘটনা কখনই ঘটেনি।

প্রথমে তার পারিবারিক নাম ছিল আবু মূসা। পরবর্তীতে তা হয় আবু জাফর। তিনি তার পিতা, তার দাদা এবং মুবারক বিন ফুযালা থেকে হাদীস শোনেন এবং তার ছেলে মামুন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পচেতা খলীফা। পৃথিবীর বাদশাহদের মধ্যে তিনি অনেক বড় মর্যাদাশীল বাদশাহ। তিনি অনেক জিহাদ এবং হজ্ব করেন। এ ক্ষেত্রে আবুল আলা কাবী তার শানে এ কাব্যটি রচনা করেন, কেউ আপনার সাথে দেখা করতে চাইলে সে যেন হারামাইন শরীফাইনে, অথবা সীমান্তের ওপারে তালাশ করলে আপনাকে শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় ঘোড়ার পিঠে অথবা পবিত্র ভূমিতে উটের পিঠে পাবে।"

খলীফা হারুন পিতার শাসনামলে ১৪৭ হিজরীতে রায় অঞ্চলে খীযরানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খীযরানের গর্ভে হাদীও জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মারওয়ান বিন আবু হাফযা এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- হে খীযরান তোমাকে ধন্যবাদ! আবার ধন্যবাদ! তোমার দু'সন্তান পৃথিবীর প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ।"

হারুন রশীদ ছিলেন সুদর্শন, সুবক্তা এবং ইলমে আদবে (সাহিত্য রচনায়-অনুবাদক) পূর্ণদক্ষ। তিনি তার খিলাফত কালে জীবিত থাকা পর্যন্ত অসুস্থতা ছাড়া প্রতিদিন এক'শ রাকাত নামায পড়তেন। প্রাত্যহিক নিজ সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞান পিপাসুদের বন্ধু। পবিত্র ইসলামের সম্মান করতেন। শরীয়তের বিরুদ্ধবাদী লোকদের এবং নসের (আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নির্দেশের-অনুবাদক) বিরোধীদের ঘোর শত্রু ছিলেন। কুরআনের সৃষ্টির অনুগামী যারা পবিত্র ইসলামের মর্যাদাকে কটাক্ষ করে তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি এদের উপর বিজিত হলে এদের হত্যা করবো। তিনি নিজ গুনাহর জন্য সীমাহীন কাঁদতেন। ওয়াজ-নসীহত শ্রবণ করতেন ও পাপের জন্য দারুণ অনুতপ্ত হতেন। তার প্রশংসাকারীদের অনেক পুরস্কার দিতেন ও সম্মান করতেন। তিনি নিজে একজন উচ্চাঙ্গের কবি।

মাররাহ বিন সামাক একদিন তার কাছে এলে তিনি তাকে অত্যন্ত সমাদর

করেন, তা দেখে ইবনে সামাক বললেন, আপনার বিনয় আপনার মর্যাদার চেয়েও বেশি। অতঃপর ইবনে সামাক ওয়াজ করলে তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন।

তিনি ফযীল বিন আয়াসের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একদিন আমি মক্কা শরীফে ফযীল বিন আয়াসের খিদমতে উপস্থিত হলাম। সামনে দিয়ে হারুন রশীদকে যেতে দেখে তিনি বললেন, লোকেরা হারুনকে ভালো মনে করে না। আমার মতে পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি ইন্তেকাল করলে লোকদের উপর বালামুসীবত নাযিল হবে।

আবু মুআবিয়া যারীর বলেন, হারুনের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম উচ্চারিত হলে তিনি বলতেন

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِىْ

(অর্থাৎ, আমার নেতার উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া বর্ষিত হোক)। একদিন আমি তাকে এ হাদীস শোনালাম– আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হব। আবার জীবিত হব। আবার নিহত হব। এটা শোনে হারুন রশীদ চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন। একবার আমি তাঁকে এ হাদীসটি শোনালাম– হযরত আদম (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর কথা হয়েছে। সে সময় তার কাছে কুরাইশদের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বসে ছিলেন। তিনি হাদীসটি শুনে বললেন, দুই পয়গম্বরের সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল? এ কথা শুনে হারুন রশীদ ক্রোধান্বিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, এ লোকটির শাস্তি তলোয়ার। সে নবী (সা.)–এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে। আমি বললাম, আমিরুল মোমিনীন! তার অজ্ঞতার কারণে এমনটা হয়েছে। অতঃপর হারুনের ক্রোধ প্রশমিত হয়

আবু মুআবিয়া বলেন, একদিন হারুন রশীদ আমাকে নিয়ে খানা খেতে বসলেন। রীতি অনুযায়ী একজন আমার হাত ধুয়ে দিলেন। হাত ধোয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, বলতে পারেন কে আপনাকে হাত ধুয়ে দিয়েছেন? বললাম, আমার জানা নেই, তিনি বললেন, ইলমের সম্মানার্থে আমি নিজেই আপনার হাত ধুয়ে দিয়েছি।

মানসুর বিন আম্মার বলেন ফযীল বিন আয়াস, হারুন রশীদ ও জনৈক ব্যক্তি এ তিনজন ছাড়া ওয়ায়েযের মধ্যে কাউকে এত অধিক কাঁদতে দেখিনি।

আব্দুল্লাহ আল-কাওয়ারিরী বলেন, একদা হারুন রশীদ ফযীল বিন আয়াসের সাথে দেখা করলে তিনি তাকে বললেন, হে সুদর্শন ব্যক্তি! কিয়ামত দিবসে এ উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতঃপর ফযীল বিন আয়াস–

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابِ

-এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, কিয়ামতের দিনে দুনিয়ার সকল বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছেদ হবে। এটা শুনে হারুন রশীদ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ইবনে মোবারকের ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে খলীফা সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সাম্রাজ্যের আমীর-উমারাদেরও সমবেদনা জ্ঞাপনের নির্দেশ দেন

লাফযুয়া বলেন, হারুন রশীদ তাঁর দাদা আবু জাফর মানসুরের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তবে পার্থক্য শুধু মানসুর কৃপণ ও লোভী। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। উপরন্তু খলীফাদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী দানশীল। একবার তিনি সুফিয়ান বিন আইয়েনাকে এক লাখ অর্থ প্রদান করেন। একবার ইসহাক মুওসুলীকে দু'লাখ অর্থ দানের নির্দেশ দেন। একটি কাব্যের প্রতিদান হিসেবে তিনি মারওয়ান বিন আবু হাফসকে পাঁচ হাজার দিনার, শাহী পোশাক, নিজের খাস ঘোড়া এবং দশজন রোমান গোলাম পুরস্কার দেন।

আসমায়ী বলেন, একবার তিনি আমাকে বললেন, হে আসমায়ী! আমার প্রতি কেন আপনার এই জুলুম এবং উদাসীনতা? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম, আপনার খিদমতে হাযির হওয়ার জন্য অতিদ্রুত গতিতে ছুটে এসেছি। কোন জনপদে দু'দণ্ড বিশ্রাম নেইনি। এ কথা শুনে হারুন চুপ হয়ে গেলেন। লোকেরা চলে গেলে আমি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম– "দান করার কারণে আপনার হাতে দিরহাম লেগেই থাকে। আর অন্য হাতে থাকে রক্ত মাখা তলোয়ার।" এটা শুনে তিনি বললেন, যথার্থ। আপনি আমাকে লোকদের সামনে কিছু বলবেন না এবং নির্জনে আমাকে নসীহত করুন। অতঃপর আমাকে পাঁচ হাজার দিনার পুরস্কার দিলেন।

মরুজুল মাসউদী গ্রন্থে রয়েছে, হারুন রশীদের ইচ্ছা ছিল রোমান সমুদ্র ও কলুজুম সমুদ্রের গতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত করার। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন খালিদ বরমকী এ পরামর্শ দিলেন, এমনটা করলে রোমান মুসলমানদের মসজিদে হারাম দ্রুত আক্রমণের পদ ত্বরান্বিত হবে। তা ছাড়া রোমানদের জাহাজ হিজাজ পর্যন্ত যাতায়াত করে। এ কথা শুনে তিনি তার সিদ্ধান্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

হাখত বলেন, এমন লোকদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হারুন রশীদের জন্য যত সহজ ছিল অন্য খলীফাদের জন্য তত সহজ ছিল না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ছিলেন বিচারক, মারওয়ান বিন আবু হাফয কবি, আয়াস বিন মুহাম্মাদের বাবার চাচা

তার সভাসদ, ফজল বিন রবীআ প্রহরী, ইবরাহীন মওসূলী মুখপাত্র এবং রাবেদা তার পত্নী। হারুন রশীদের যুগ ছিল ঈর্ষণীয় যুগ, যেমন বিয়ের সময় বর ঈর্ষণীয়।

যাহাবী বলেন, হারুন রশীদের আরো অনেক দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে। তিনি খেলাধুলা করতেন না। গান শুনতেন না। নিষিদ্ধ কাজ করতেন না, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

তাঁর শাসনামলে যেসকল ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন– মালিক বিন আনাস, লায়েছ বিন সাদ, বিচারক ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আবু হানীফা, কাসিম বিন মঈন, মুসলিম বিন খালিদ আযযানযী, নূহল জামে, হাফেজ আবু আওয়ানাহ ইয়াশকারী, ইবরাহীম বিন সাদ যহরী, আবু ইসহাক ফরনারী, ইমাম শাফী (র.)-এর উস্তাদ ইবরাহীম বিন আবু ইয়াহইয়া, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ছাত্র আসাদুল কুফী, ইসমাঈল বিন আয়াশ, বশর বিন মুফাসসল, জারীর বিন আব্দুল হামীদ, যিয়াদুল বাকায়ী, হামযার ছাত্র সলিমুল মুকরা, আরবের ইমাম সায়বুয়া, দানশীল আব্দুল্লাহ উমরী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস কুফী, সভাসদ আব্দুল আযীয বিন আবু হাযিম, কাসাই কারী এবং অলংকার শাস্ত্রবিদের উস্তাদ, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন হাসান, (তাঁরা উভয়ে একই দিন ইন্তেকাল করেন)। আলী বিন মুসহার, গিনজার, ঈসা বিন ইউনুস সাবীয়ী, ফযীল বিন আয়্যাস, ইবনে সামাকা, কবি মারওয়ান বিন আবু হাফয, মাআবী ইমরান মওসূলী, মুঅতামার বিন সুলায়মান, মিসরের বিচারক মুফসল বিন ফুযালা, মূসা, মূসা রবীআ, তৎকালীন যুগের বিখ্যাত ওলী আবুল হাকাম মিসরী, নোমান বিন আব্দুস সালাম ইস্পাহানী, হাশিম ইয়াহইয়া বিন আবু যায়েদাহ, ইয়াযিদ বিন যারীআ, নাহুবিদ ইউনুস বিন হাবীব, মদীনা শরীফের কারি ইয়াকুব বিন আব্দুর রহমান, ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র স্পেনের বরেণ্য আলেম সাআসআ বিন সালাম, ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র আব্দুর রহমান বিন কাসিম, প্রসিদ্ধ কবি আবু বকর বিন আয়্যাশ মকরী, আব্বাস বিন আহনাফ, ইউনুস বিন মাজশু প্রমুখ।

১৭৫ হিজরীতে তাঁর শাসনামলে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে। আব্দুল্লাহ বিন মুসআব যহরী ইয়াহইয়া বিন আব্দ বিন হাসান উলুয়ীর ব্যাপারে এ অপবাদ ছড়ায় যে, সে একটি দল সংগঠিত করেছে। অচিরেই এ দলটি হারুন রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এ অভিযোগের কারণে ইয়াহইয়াকে ডেকে আনা হল। অতঃপর হারুন তার হাতে হাত রেখে ইয়াহয়াকে এ দু'আ করতে বললেন– "ইয়া রাব্বাল আলামীন! ইয়াহইয়া যদি আমিরুল মুমিনীনের খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করে তাহলে আপনি আমাকে স্বীয় শক্তি ও শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!! প্রথমে ইয়াহইয়া এ দু'আ করল। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন মুসআব এ দু'আ করতে অনীহা পোষণ করে এবং পরবর্তীতে সেও দুআ করে, দু'আ শেষে উভয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিনেই আব্দুল্লাহ বিন মুসআব ইন্তেকাল করে। ১৭৬ হিজরীতে আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালিক বিন সালেহ আব্বাসীর হাতে ওবাসা শহর বিজিত হয়।

১৭৯ হিজরীর রমযান মাসে হারুন রশীদ উমরাহ করেন। এই ইহরামেই তিনি হজ্ব করেন এবং মক্কা থেকে আরাফাতে পায়ে হেঁটে সফর করেন। ১৮০ হিজরীতে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প হয়। যার কারণে ইস্কান্দারিয়ার মিনারগুলোর উপরাংশ ভেঙে পড়ে।

১৮২ হিজরীতে প্রত্যক্ষ লড়াই-এর মাধ্যমে স্বয়ং আমিরুল মুমিনীন হারুন রশীদের হাতে সফ্‌সাফ নামক দূর্গ বিজিত হয়। ১৮৩ হিজরীতে খারাজ সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট বিদ্রোহে আরমেনিয়ায় অনেক মুসলমান ধ্বংস হয়। তারা এক লাখ মুসলমানকে বন্দী করে, এমন মুসীবতের কথা ইতোপূর্বে আর কখনই শোনা যায়নি।

১৮৭ হিজরীতে রোম সম্রাট ইয়াকফুর অঙ্গিকার ভঙ্গ পত্র যে অঙ্গিকার সম্পাদিত হয়েছিল মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে। তা হারুন রশীদের নিকট পাঠান। তাতে লিখা ছিল– "রোমান অধিপতি ইয়াকফুরের পক্ষ হতে আরব জাহানের বাদশাহ রশীদের প্রতি। অবগত আছেন, যে সম্পত্তি আমার পূর্বে রোমানদের অধীনে ছিল, সে সময় আপনার অবস্থা ছিল দাবার গুটির মত। আর তারা ছিল দুর্বল ও নির্বুদ্ধি। ফলে তারা প্রচুর ধন-রত্ন দিয়ে তারা আপনার সাথে সন্ধি করেছে। অতএব এ পত্র পৌছার সঙ্গে সঙ্গে যে ধনরাজি আপনি তাদের থেকে অর্জন করেছেন তা ফেরত দিবেন। অন্যথায় তলোয়ার দ্বারা ফায়সালা হবে।"

পত্রটি পড়ে হারুন রশীদ এতই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লেন যে, রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তার চেহারার দিকে তাকানোর মত সাহস কারো ছিল না। কেউ কথাও বলতে পারল না। তার সভাসদবৃন্দ এবং আমীর-উমারাগণ তার সামনে থেকে চলে গেলেন। হারুন রশীদ আমীর-উমারাদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই এ পত্রটি লিখলেন– "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমিরুল মুমিনীন হারুনের পক্ষ হতে ইয়াকফুক নামক রোমান কুকুরের জেনে রাখা উচিত যে, হে কাফিরের বাচ্চা! আমি তোমার পত্র পড়েছি। এর জবাব অচিরেই তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে– শোনার প্রয়োজন নেই।"

তিনি সে দিনই একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। হিরাকিল শহরে পৌছে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের তীব্রতার কথা আজও জনশ্রুতি হয়ে মুখে মুখে ফেরে। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে ইয়াকফুর সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং প্রতি বছর খারাজ দিতে সম্মত হন। হারুন রশীদ এ প্রস্তাব অনুমোদন করে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সদলবলে রাকা জনপদে ফিরে এলে কাফেরের বাচ্চা আবার সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করে এবং তারা এ ধারণা করে যে, শীতের কারণে হারুন আর আক্রমণ করবেন না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সংবাদ সাহস করে কেউ আমিরুল মুমিনীনের কানে দিতে পারল না। অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ তামীমী এ কবিতাটি আবৃত্তির মাধ্যমে খবরটি আমিরুল মুমিনীনের কর্ণ কুহরে পৌছে দেন। (কবিতার অর্থ) "ইয়াকফুর আপনাকে যা দিয়েছিলেন তিনি আবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। সম্ভবত পরিভ্রমণের দিনগুলো এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমিরুল মুমিনীনের জন্য সুসংবাদ আল্লাহ পাক আপনাকে অনেক ছাগল দান করেছেন।"

আবুল-আতাহীও এ ধরনের একখানা কবিতা পাঠ করেন, যা দ্বারা হারুন রশীদ বিষয়টি অনুধাবন করেন এবং আবার ফিরে যান। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে সেখানে পৌছেন এবং নিজেদের শক্তি নিঃশেষ ও ইয়াকফুরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আবুল আতাহীয়া এ কবিতা আবৃত্তি করেন– "হিরাকল যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাদশাহ (হারুন রশীদ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিজয় লাভ করেছেন। হারুন বিদ্যুতের মত তরবারী নিয়ে বিজয়ের হেলাল খচিত পতাকা হাতে পৌছেন।"

১৮৯ হিজরীতে রোমানরা সেখান থেকে মুসলমানদের বের করে দেন। ১৯০ হিজরীতে রোমান সাম্রাজ্যে শারাহীল বিন মাআন ইবনে যায়েদা সেনাপতিত্বে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। তারা রোমান সৈনিকদের পর্যদুস্ত করেন। হিরাকেলা এবং সাকালীয়া দূর্গ বিজিত হয়। উপরন্তু ইয়াযিদ বিন মুখাল্লাদ ফালকুনীয়া জয় করেন। আর হামীদ বিন মায়ুফকে কবরশের দিকে পাঠানো হয়। তিনি কবরশবাসীকে পরাজিত করে সেখানে অগ্নিসংযোগ করেন। আগুনের লেলিহান শিখা হাজার লোককে ভস্ম করে

১৯২ হিজরীতে হারুন খোরাসানের দিকে মুভ করেন। তিনি নিজেই সেখানে যান। মুহাম্মাদ বিন সাবাহ তবরী বলেন, আমার বাবা নহরে ওয়ান পর্যন্ত হারুনের সাথে ছিলেন। সফরের মধ্যে এক দিন হারুন তাকে বললেন, সাবাহ! মনে হয় এরপর আর তুমি আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুস্থতার সাথে ফিরে আনুন, আবার তিনি বললেন, এরপর আর

তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। সাবাহ পুনরায় একই জবাব দিলেন। হারুন রাস্তা থেকে সরে এসে বললেন, তুমি এসো, তোমাকে রাষ্ট্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না। অতঃপর তিনি জামার কাপড় সরায়ে পেট বের করলেন। পেটের চারিপাশে রেশমের পট্টি বাঁধা ছিল। দেখায়ে তিনি বললেন, আমার এ রোগ হয়েছে যা আমি লোকদের কাছে গোপন রেখেছি। আর আমাদের ছেলেদের অবস্থা এই যে, তাদের তত্ত্বাবধান আমার সাথে সম্পৃক্ত। মামুনের সহায়ক মাসরুর, আমীনের সহায়ক জিবরীল বিন বাজুদীজু, (রাবী বলেন) আর তিনি (হারুন) যে তৃতীয় জনের নাম বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তারা প্রত্যেকেই আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায়। তারা আমার জীবনের দিনগুলো গুনছে। এবং আমার জীবনকে দীর্ঘ মনে করছে। যদি এ কথায় সত্যতা জানতে চাও তবে এসো। আমি তুর্কী ঘোড়া চাইছি। কিন্তু আমার অসুস্থা যেন বেড়ে যায় সে জন্য দুর্বল ঘোড়া দেয়া হবে। (রাবী বলেন) তিনি ঘোড়া চাইলেন। তাকে দুর্বল ঘোড়া দেয়া হল। তিনি বেদনাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বিদায় দিয়ে জুরজানের দিকে চলে গেলেন, হারুন অসুস্থ অবস্থায় তওস অঞ্চলে পৌছে ১৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৭৫ হিজরীতে হারুন রশীদ যাবেদার ইচ্ছা অনুযায়ী পুত্র আমীনকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সে সময় তার বয়স পাঁচ বছর। আমীনের নাম মুহাম্মাদ, পদবী আমীন।

যাহাবী বলেন, মুসলিম বিশ্বে এটা ছিল দুর্বলতার প্রথম সূচনা। হারুন রশীদ ১৮২ হিজরীতে আমীনের পর আব্দুল্লাহকে যার পদবী মামুন তাকে উত্তরাধিকার বানিয়ে খোরাসানের প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন। মামুনের পর তিনি পুত্র কাসেমকে যিনি অত্যন্ত অল্প বয়স্ক তাকে মুতামন পদবী দিয়ে ১৮৬ হিজরীতে উত্তরাধিকার মনোনীত করে জাযীরা এবং সীমান্তাঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবে তিনি ইসলামী জগতকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। কোন কোন জ্ঞানী সে সময় বলেছিলেন, হারুন এদের মধ্যে সংঘাতের বীজ বপন করলেন। প্রজা জনসাধারণকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। কবিগণ তাদের প্রশংসাসূচক কবিতায় এদের গুণকীর্তন করেছেন। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্রমধারার অঙ্গিকার নামাটি কাবা শরীফে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

কেউ কেউ বলেন, হারুন রশীদ স্বীয় পুত্র মুতাসিমকে মূর্খ ও একেবারে অশিক্ষিত হওয়ার কারণে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর বংশধরের মধ্যেই খিলাফত স্থানান্তর করেন এবং সকল খলীফা তাঁরই বংশভূত। হারুন রশীদের অপর আওলাদ থেকে কোন খলীফা জন্ম নেননি।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

সালাফী তাওরিয়াত গ্রন্থে ইবনে মুবারকের সূত্রে লিখেছেন, হারুন রশীদ খলীফা হওয়ার পর মাহ্দীর এক বাঁদিকে তার মনে ধরে। হারুন রশীদ বাঁদিকে ডাকলে সে বলল, আমার সাথে আপনার বাবার মিলন হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রেমের হস্তবাহু উন্মুক্তই রাখলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-কে এ সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, আমিরুল মুমিনীন! বাঁদি যা বলেছে তা কি সত্য? কারণ সে তো পবিত্র নয়, তাকে সত্যায়িত করবেন না।

ইবনে মুবারক বলেন, আমি যে সব বিষয়ে আশ্চর্য ও আফসোস করি তা হলো– ঐ বাদশাহ এবং খলীফাদের ব্যাপারে যাদের হাত মুসলমানদের মালে ও রক্তে রঞ্জিত এবং যিনি পিতার মর্যাদার প্রতি খেয়াল করেন না। অথবা আমিরুল মুমিনীনের মত শানদার খলীফাও বাঁদির প্রতি আসক্ত, অথবা যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং ইসলামের কাযী যিনি খলীফাকে বাবার অভিব্যক্তি ও সংকল্পের সাথে সহবাসের পরামর্শ দিয়ে গুনাহর বোঝা (নাউযুবিল্লাহ-অনুবাদক) নিজ কাঁধে নেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ বলেন, রশীদ একদা কাযী আবু ইউসুফকে বলেন, আমি এক বাঁদি কিনেছি। এক হায়েয পার হওয়ার আগেই আমি তার সাথে সহবাস করতে চাই। সুতরাং যদি শরীয়তের কোন হিলা আপনার জানা থাকে তবে বলুন। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, প্রথমে তাকে নিজের ছেলের কাছে হেবা করুন। অতঃপর তাকে বিয়ে করুন।

ইসহাক বিন রাহুয়া বলেন, এক দিন রাতে হারুন কাযী আবু ইউসুফকে ডেকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। মাসয়ালা বয়ান করার পর হারুন তাকে এক লাখ দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, আমিরুল মুমিনীন! এ অর্থ আমাকে ভোর হওয়ার আগে দিলে ভালো হবে। হারুন সকাল হওয়ার পূর্বে অর্থ দানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি বলল, কোষাধ্যক্ষ বাড়িতে এবং কোষাগার বন্ধ। কাযী আবু ইউসুফ বললেন, যখন আমাকে ডাকা হয়েছিল তখনও দরজা বন্ধ ছিল। এ কথা শুনে কোষাগারের দরজা খুলে দেয়া হল।

সূলী ইয়াকুব বিন জাফর থেকে বর্ণনা করেন, হারুন রশীদ খলীফা হওয়ার পর সে বছরেই রোমের আশপাশের অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শেষে শাবান মাসে সেখান থেকে ফিরে এসে হজ্বের ফরযিয়ত আদায় করেন। তিনি হারামাইন শরীফাইনে গিয়ে বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পদ খরচ করেন। এর পূর্বে হারুন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, এ মাসেই তোমার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হবে। তোমার জন্য উচিত যে, তুমি লড়াই

করবে, জিহাদ করবে, হজ্ব করবে এবং হারামাইন অধিবাসীদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করবে। হারুন খিলাফত লাভের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি হুকুম অক্ষরে অক্ষরে আদায় করেন।

মুআবিয়া বিন সালেহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, হারুন রশীদ জীবনের প্রথম কবিতাটি প্রথম হজ্বের সময় আবৃত্তি করেন। ঘটনাটি এ রকম– তিনি এক বাড়িতে গেলেন, সে বাড়ির দেয়ালে এ কবিতাটি লিখা ছিল– "আমিরুল মুমিনীন! আপনি দেখেননি যে, আমি আপনাকে ফিদয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রিয়তমকে বর্জন করেছি।" হারুন এর নিচে এ কবিতাটি লিখলেন– "হজ্বের যে পশুগুলো হারাম শরীফে যবেহ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেগুলো পবিত্র মক্কা শরীফের দিকে ধাবিত হতে অসমর্থ রয়ে গেছে।"

সাঈদ বিন মুসলিম বলেন, হারুন রশীদের জ্ঞান ছিল আলেমদের অনুরূপ। তিনি অধিকাংশ কবির বিভিন্ন কাব্য ও চরণ শুদ্ধ ও সংস্কার করে দিতেন। একবার কবি নো'মানের কবিতার একটি চরণ শুদ্ধ করে দেন, যা তিনি অশ্ব চিহ্নিতকরণে লিখেছিলেন।

ইবনে আসাকির ইবনে উলায়া থেকে বর্ণনা করেন, হারুন রশীদ এক ধর্মচ্যুতকে ধরে এনে হত্যা করার নির্দেশ দিলে সে বলল, আপনি কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করবেন? তিনি বললেন, তোমার ফিতনা থেকে আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিরাপদ থাকবে। সে বলল, আমি এক হাজার মনগড়া হাদীস লিপিবদ্ধ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি– এগুলো আপনি কি করবেন? হারুন রশীদ বললেন, এমনটা কেন করেছ হে আল্লাহর দুশমন? পরবর্তীরা আবু ইসহাক কুযারী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক জাল হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে এক একটি করে অক্ষর সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন।

সূলী ইসহাক হাশমী থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আমি হারুন রশীদের কাছে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আম জনতা আমার প্রতি এ ধারণা পোষণ করছে যে, আমি নাকি হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করি। আল্লাহর কসম! আমি কাউকে হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসি না। বস্তুত যারা আমার শত্রুতা করে তারা আমার অপবাদ ছড়াচ্ছে। যারা আমার সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তারা এ কথা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর শুধু এজন্য যে, আমি তাদের শাস্তি দিব তাই এবং তারা বনু উমাইয়্যার অনুগত। হযরত আলী (রা.)-এর পুত্রদ্বয় সকল মর্যাদাবান ও সম্মানিতদেরও উর্ধ্বে, আমার বাবা মাহদী আমার নিকট এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন, যা তিনি তার পিতা থেকে এবং

তিনি তার পিতা থেকি বর্ণনা করেছেন– নবী আকরাম (সা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেন, যে এ দুজনকে ভালোবাসবে সে আমাকেও ভালোবাসবে, আর যে তার শত্রুতা করবে সে আমারও শত্রুতা করবে। তিনি (সা.) আরো বলেন, হযরত ফাতিমাতুয যুহরা হযরত মারিয়ম বিনতে ইমরান এবং হযরত আসীয়া বিন মুযাহিম (ফিরাউনের স্ত্রী) ছাড়া পৃথিবীর সকল নারীদের নেত্রী।

বর্ণিত আছে, একদা ইবনে সামাক হারুন রশীদের কাছে এলেন। সে সময় হারুন রশীদের পিপাসা লেগেছিল। তিনি পানি চাইলেন, কেউ পানি এগিয়ে দিলে ইবনে সামাক বললেন, থামুন, আপনার যদি খুব পিপাসা লাগে আর কোথাও পানি না পান তাহলে এক গ্লাস পানি আপনি কত দিয়ে ক্রয় করবেন? হারুন রশীদ বললেন, অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে। ইবনে সামাক বললেন, এবার পান করুন। তিনি পানি পান করলে ইবনে সামাক আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পানকৃত পানি যদি পেটেই থেকে যায় তাহলে তা বের করার জন্য আপনি কতটুকু খরচ করবেন? হারুন বললেন বাকী অর্ধেক রাজ্য। ইবনে সামাক বললেন, আপনি স্মরণ রাখবেন, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এক গ্লাস পানি পান এবং পেশাবের সমমূল্য। অতএব একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য বাদশাহীর দিকে ঝুঁকে পড়া নিরেট বোকামী ছাড়া কিছু নয়। এ কথা শুনে হারুন রশীদ খুব কাঁদলেন।

ইবনে জাওযী বলেন, হারুন রশীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে শায়বান তাকে এ নসীহত করেন– আপনার যে প্রিয়জন আপনাকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং এর ফলাফল হয় নিরাপদ তিনি সেই প্রিয়জনের চেয়ে উত্তম যার ভয় প্রদর্শনের ফল দাঁড়ায় বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। হারুন বললেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন আপনার কথার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে বলবে কিয়ামত দিবসে সকল বিষয়ে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। অতএব আল্লাহকে ভয় করুন। এ ব্যক্তিটি ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে বলবে– আপনি আহলে বাইত, আপনার সকল পাপরাশি মার্জনীয়। কারণ আপনি নবী আকরাম (সা.)-এর নিকটাত্মীয়। এ কথা শুনে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যারা তাঁর পার্শ্বে ছিল তাদের মাঝেও দয়ার উদ্রেক হলো।

সূলী স্বরচিত কিতাবুল আওরাক গ্রন্থে লিখেছেন, হারুন খলীফা হওয়ার পর ইয়াহইয়া বিন খালিদ মক্কীকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিলে ইবরাহীম মওসূলী এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন– "হে সম্বোধিত ব্যক্তি! আপনি কি দেখেননি যে, সূর্য অসুস্থ (আলোহীন) ছিল। হারুন খিলাফত প্রাপ্ত হওয়ায় তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পৃথিবী

তার সৌন্দর্যে প্লাবিত, কারণ হারুন বাদশাহ, আর তার মন্ত্রী হলেন ইয়াহইয়া।" এ কবিতা শুনে হারুন কবিকে এক লাখ দিরহাম এবং ইয়াহইয়াকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

দাউদ বিন যারীন ওয়াসতীও অনুরূপ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন- "হারুনের সংস্পর্শে প্রতিটি শহর, নগর, জনপদে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এর কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনসাফ। তিনি লোকদের ইমাম। তাঁর কাজ হল হজ্ব করা এবং জিহাদের ময়দানে গমন করা। তাঁর চেহারার নূরে পৃথিবীর আলো বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি লোকদের সামনে এলে তাঁর বদান্যতার হস্ত প্রসারিত হতো। সে সময় যারা তাঁর থেকে যতটুকু আশা করতেন তারা তার চেয়েও অনেক বেশি পেতেন।

কাযী ফাযেল স্বরচিত কতিপয় পুস্তিকায় লিখেছেন আমার দৃষ্টিতে দু'জন বাদশাহ ছাড়া জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন বাদশাহ এত অধিক ভ্রমণ করেননি। এক, হারুন রশীদ তার দুই ছেলে আমীন এবং মামুনকে নিয়ে মুয়াত্তা ইমাম মালিক পড়ার জন্য ইমাম মালিক (র.)-এর দরবারে গমন করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের যে কপিটি তারা তিনজন পড়েছেন তা মিসর অধিপতিদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। দুই, সুলতান সালাহউদ্দীন বিন আইয়ূব পরবর্তীতে এই মুয়াত্তা ইমাম মালিক পড়ার উদ্দেশ্যেই ইসকান্দারিয়া পর্যন্ত সফর করেন। এবং সেখানে আলী বিন তহেব বিন আউন তাকে মুয়াত্তা পড়ান।

মানসুর নামরী এ সম্বন্ধে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- "তিনি কুরআনকে নিজের ইমাম এবং দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কুরআন শরীফ তার মতে অবশ্য অনুসরণীয়।"। এ প্রেক্ষিতে তিনি এক লাখ দিরহাম ইনাম পান।

হারুন রশীদের স্মরণীয় উক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো- তিনি বলেন, আমার প্রশংসাসূচক কাব্যগুলোর মধ্যে আমার নিকট এ কাব্যটি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়- "হে আমীন, মামুন এবং মুতামিনের বাবার আওলাদ কতইনা নেককার।"

ইসহাক মওসূলী বলেন, একদা আমি হারুন রশীদের নিকট এসে এ কবিতাটি পেশ করলাম- "যখন এ নারী কৃপণতার নির্দেশ করেছিলেন তখন আমি বললাম, কৃপণতা হ্রাস কর। কারণ অর্থ এমন জিনিস যা আসবে যাবে। আমি লোকদেরকে দানশীলদের বন্ধু হতে দেখেছি। কৃপণদের কোন বন্ধু আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। কৃপণতা কৃপণকে কলঙ্কিত করে। আমার মন চায় কোন কৃপণ আমাকে বলে, এ যুবকের ভালো দিকগুলোর মধ্যে এটি একটি যে, যখন তার কাছে সম্পদ থাকে তখন সর্বদা সে তা খরচ করে। আমি কেন দরিদ্রতাকে ভয় এবং ধনাঢ্যতাকে

সম্মান করবো যখন আমিরুল মুমিনীন আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করবেন।" এটা শুনে হারুন রশীদ বললেন, হ্যাঁ কেন ভয় পাবে! হে ফজল, তাকে এক লাখ দিরহাম দাও। আল্লাহর কসম! তার কবিতাগুলো অত্যন্ত সুন্দর। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আমার কবিতার চেয়ে আপনার ফরমান আরো সুন্দর। হারুন বললেন, ফজল! তাকে আরো এক লাখ দিরহাম দাও।

মুহাম্মাদ বিন আলী খোরাসানী বলেন, খলীফাদের মধ্যে হারুন রশীদ সর্বপ্রথম পোলো এবং চিহ্ন নিশানা করে তীর নিক্ষেপকরণ জাতীয় খেলা খেলেন। বনু আব্বাসের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম দাবা খেলেন। সূলী বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম গায়কদের পদ মর্যাদা নির্ধারণ করেন।

তিনি বাঁদি হেলেনার মৃত্যুতে একটি দীর্ঘ শোক গাঁথা আবৃত্তি করেন।

হারুন রশীদ খোরাসান রাজ্যের তওস অঞ্চলে জিহাদে গিয়ে ১৯৩ হিজরীর জামাদিউল আখির মাসের তিন তারিখে ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। তার ছেলে সালেহ তাঁর জানাযা পড়ান।

সূলী বলেন, হারুন রশীদ নগদ দশ কোটি দিনার, বিপুল পরিমাণ জিনিস পত্র, মনি-মুক্তা, রৌপ্য, অশ্ব এবং দশ কোটি পঁচিশ হাজার ভূসম্পত্তি রেখে যান।

কথিত আছে, হারুন স্বপ্নে দেখেন তিনি তওস যাত্রা করছেন। ভোরে উঠে তিনি খুব কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার কবর খনন কর। কবর খনন করা হলো। তিনি নিজে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে কবর দেখতে যান। কবরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন– হে ইবনে আদম! তুমি একেই গ্রহণ করবে। অতঃপর কয়েকজনকে কবরে নামার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তিনি কুরআন শরীফ খতম করান। সে সময় তিনি কবরের পাশে বসে ছিলেন।

তার ইন্তেকালের পর লোকেরা আমীনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। আমীন সে সময় বাগদাদে ছিলেন। বাগদাদে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছার পর আমীন জুমআর দিন খুতবা প্রদান করেন এবং এতে লোকদের হারুন রশীদের ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়ে দেন। সে দিন সেখানেই আম বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। রাজা নামক হারুন রশীদের গোলাম হারুন রশীদের চাদর, ছড়ি এবং মোহর নিয়ে বারো দিন পর জামাদিউল আখির মাসের পনেরো তারিখে বাগদাদে এসে সেগুলো আমীনকে বুঝিয়ে দেয়।

সূলী বলেন, হারুন রশীদ দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হযরত আনাস (রা.) থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সদকা খেজুরের অর্ধেক অংশ হলেও তা পরিশোধ করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। দ্বিতীয়টি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), তিনি হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মুখ পরিষ্কার করবে। কারণ এটি কুরআন শরীফের পথ।

আমীন মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ

আমীন মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ বিন রশীদ পিতার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছিলেন। ফলে পিতার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের তখ্‌তে আরোহণ করেন।

তিনি ছিলেন সুদর্শন, নির্ভীক এবং টগবগে যুবক। কথিত আছে, তিনি একবার নিজ হাতে বাঘ হত্যা করেন। তিনি বক্তা, বাগ্মী, সাহিত্যিক এবং মর্যাদাবান। তবে তিনি অপব্যয়ী, দুর্বল মতামত এবং বোকা ছিলেন, খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না। খলীফা হওয়ার আগের দিন মনসুর প্রাসাদ সংলগ্ন পোলো খেলার মাঠ তৈরির নির্দেশ দেন। ১৯৪ হিজরীতে স্বীয় ভ্রাতা কাসেম যাকে তার পর উত্তরাধিকার মনোনীত করা হয়েছিল তাকে সরিয়ে দেয়ার কারণে মামুনের সাথে তার মনোমালিন্যতার সৃষ্টি হয়।

কথিত আছে, ফজল বিন রবীআ ভাবল মামুন খলীফা হলে আমার শপথ অক্ষুণ্ণ থাকবে না। ফলে সে আমীনকে উত্তেজিত করে মামুনকে উত্তরাধিকারের পথ থেকে অপসারণ করে মূসা বিন আসীনকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে নেয়। সংবাদ পেয়ে মামুন আমীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতঃপর আমীন দূত মারফত মামুনকে জানালেন– তোমার পরিবর্তে আমার ছেলে মূসাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছি। মূসার পর তুমি উত্তরাধিকার। মূসার নাম নাতেক বিলহক রাখা হয়েছে। মামুন এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন এবং দূতকে কাছে বসিয়ে সরাব পান করান। রাজকীয় অনুকম্পায় প্রভাবিত হয়ে দূত মামুনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে মামুনকে নিয়মিত সেখানকার সংবাদ জানিয়ে দিত।

দূত ফিরে এসে মামুনের আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সংবাদ দিলে আমীন শপথ নামা থেকে তার নাম সরিয়ে দেন, যা হারুন রশীদ কাবা শরীফে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। আমীন তা নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। ফলে উভয় পক্ষে শত্রুতার জের বৃদ্ধি পায়।

আমীনকে অনেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ কথা বুঝিয়েছেন এবং হাযেম বিন খুজাইমা আমীনকে বলেন, আমিরুল মুমিনীন! যে আপনার সামনে মিথ্যা বলে সে কল্যাণ বয়ে আনে না, আর যে সত্য বলে সে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে না। আপনি বাইআত থেকে (মামুনকে) বঞ্চিত করবেন না। তাহলে জনগণ আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। লোকদের সাথে শপথ ভঙ্গ করবেন না। তবে তারা আপনার সাথে শপথ ভঙ্গ করবে। স্মরণ রাখবেন, আপত্তি উত্থাপনকারীদের প্রতি জনতা হিংসা করে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমীন কারো কথাই শুনলেন না। লোকদের উপঢৌকন দিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে মূসার বাইআত করায়ে নিলেন। সে সময় মূসা দুধের শিশু।

মামুন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর নিজেকে ইমামুল মুমিনীন দাবী করেন এবং এ নামটি লিখতে শুরু করেন। এদিকে ১৯৫ হিজরীতে আমীন আলী বিন ঈসা বিন মাহানকে জবল, হামদান, নিহাওন্দ, কম এবং আসফান শহরে প্রেরণ করেন। শহরগুলো মামুনের বৃত্তি হিসেবে প্রাপ্য ছিল। আলী বিন ঈসা জমাদিউল আখের মাসের মাঝামাঝিতে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে যাত্রা করল। মামুনকে বন্দী করে আনার জন্য আলী রুপার একটি হাত কড়া সাথে নিয়েছিল। তাদের প্রতিহত করার জন্য মামুন চার হাজারের কিছু কম সৈন্য দিয়ে তাহের বিন হোসাইনকে প্রেরণ করেন। তাহের জয়লাভ করে। আলী বিন ঈসা যুদ্ধে নিহত হয় এবং তার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাহের আলী বিন ঈসার মাথা কেটে মামুনের নিকট প্রেরণ করে। মামুন নির্দেশ দিলেন এ কর্তিত মাথা খোরাসানের পথে পথে নিয়ে ফের এবং জনতাকে বল তারা যেন মামুনকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়।

যখন পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এলো আমীন তখন মৎস্য শিকারে ব্যস্ত। তিনি দূতকে ধমক দিয়ে বললেন, কমবখত! এ পুকুর থেকে দু'টি মাছ ধরার সুযোগ তো দিবে। কারণ কাওছার দু'টি পেয়েছে আর আমি একটাও না। এদিকে আমীনের ছিল এ অবস্থা, আর ওদিকে মামুন খিলাফতের তখত কব্জা করেন।

আব্দুল্লাহ বিন সালেহ জারমী বলেন, যুদ্ধে আলী বিন ঈসা নিহত হওয়ায় বাগদাদে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন আমীনের চক্ষু খুলল। মামুনকে বাইআত থেকে পৃথক করায় লজ্জিত হলেন। সভাসদদের ধোঁকা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদিকে ভাতা না দেয়ায় সৈনিকদের মাঝে গোলমাল লেগে যায়। অন্যদিকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়। এর সাথে যুক্ত হয় আমীনের খেলাধুলার নেশা এবং চরম মূর্খতা। ফলে তার সৌভাগ্যের পতন হয়। আর মামুন আহলে হারামাইন শরীফাইন এবং অধিকাংশ ইরাকীর বাইআত করানোর কারণে তার সৌভাগ্যের বাতায়ন অবারিত হতে থাকে। ইরাকসহ প্রভৃতি শহর-নগর হাতছাড়া হওয়ায় আমীনের অবস্থা আরো সংকটময় হয়। সৈন্যদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কোষাগার শূন্য হয়ে যায়। জনতার উপর মুসীবত চেপে বসে। সংঘাত ও সংঘর্ষে শহর বিজন বনে পরিণত হয়। ভবনগুলো কামানের গোলায় ভেঙে পড়ে। বাগদাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কবিগণ এ দৃশ্য দেখে রচনা করেন দীর্ঘ শোক গাঁথা।

জনৈক কবি লিখেছেন আমি চোখের অশ্রু দিয়ে রক্তাক্ত বাগদাদ দেখেছি, যখন আনন্দ ম্লান হয়েছে, হিংসুকদের দৃষ্টি পড়েছে এবং কামানের গোলায় বাগদাদ

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পনেরো দিন বাগদাদ অবরুদ্ধ ছিল। অধিকাংশ বনূ আব্বাস এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মামুনের দলে এসে যোগ দেয়। তারা বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর জন্য আমীনের সাথে লড়াই করে। অবশেষে ১৯৮ হিজরীতে তাহের বিন হোসাইন তরবারীর জোরে বাগদাদে প্রবেশ করে আমীন, তার মা এবং তার পরিবারকে শাহী প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আল-মানসুর শহরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তিনি তার সেনাবাহিনী ও গোলাম-ভৃত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সেখানে তার সবচেয়ে বড় দুর্দশা ছিল খানাপিনার। তার কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না।

মুহাম্মাদ বিন রাশেদ বলেন, ইবরাহীম বিন মাহদী আমার নিকট বলেছেন, আল-মানসুর শহরে আমি আমীনের সাথে ছিলাম। এক রাতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, দেখ কি চমৎকার রজনী। চাঁদের জোছনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। চন্দ্রের কিরণ পানিতে পড়ে কি বিমোহিতকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ সুন্দর পরিবেশে শরাব পানের অনুষ্ঠান দারুণ মানাবে। আমি বললাম, আপনার যেমন অভিরুচি। শরাব পানের মজলিস বসল। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমীন যউফ নাম্নী জনৈক বাঁদিকে তলব করলেন। বাঁদির গান শুনে আমীন বললেন, আল্লাহ তোমার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তুমি চলে যাও। বাঁদির প্রস্থান পথে একখানা কাচের মূল্যবান গ্লাস তার পায়ের আঘাতে পড়ে ভেঙে গেলে আমীন বললেন, ইবরাহীম! দেখ তো কি হল। আল্লাহর কসম! আমার মনে হচ্ছে আমার সময় সমাগত প্রায়। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার আয়ু বৃদ্ধি করুন। আপনার সাম্রাজ্য অটুট থাকবে। আমি এ কথা বলেছি এমন সময় দজলা নদীর দিক থেকে এ আওয়াজ বেসে এলো– "যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলে তা পূর্ণ হয়েছে।" আমীন এ কথা শুনে বিষণ্ন ও বিবর্ণ হয়ে পড়েন। এর এক / দুই দিন পর তিনি বন্দী হন। তাকে এক স্থানে আটকে রাখা হয়। কতিপয় অনারব লোক সেখানে এসে তলোয়ার দ্বারা একটি আঘাত করে। তিনি পড়ে গেলে তারা মাথা কেটে তাহেরের কাছে নিয়ে গেল। তাহের তার কর্তিত মস্তক এক বাগানের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে এ ঘোষণা করে দিল– এটা আমীনের বিচ্ছিন্ন মস্তক। তার দেহখানা পাহাড় চূড়ায় ফেলে রাখা হয়েছে।

অতঃপর তাহের এ মাথা, চাদর, ছড়ি এবং খেজুরের পাতার জায়নামায মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। নিজের ভাই নিহত হওয়ায় মামুন দারুণ মর্মাহত হন। তিনি ভেবেছিলেন আমীনকে জীবিত তার কাছে পাঠানো হবে এবং তার মতামতের উপর ভিত্তি করে তার প্রতি শাস্তির দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এ অপরাধের প্রতিশোধ

হিসেবে মামুন তাহেরকে নির্বাসিত করেন এবং তাহের সেখানেই মারা যায়। এর মধ্য দিয়ে আমীনের একটি কথার প্রতিফলন ঘটে। একবার আমীন তাহেরকে লিখেছিলেন, হে তাহের! যে লোকটি আজ পর্যন্ত আমার প্রাপ্য কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং আমার উপর অত্যাচার করছে তার শাস্তি সর্বদা তলোয়ার। ফলে তুমিও তার অপেক্ষায় থাক।

কথিত আছে, আমীন চতুর্দিক থেকে খেলোয়াড়দের সংগ্রহ করেন। তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি বন্য প্রাণী ও বিভিন্ন ধরনের পাখি পুষতেন। নিজ পরিবার এবং সভাসদদের থেকে পর্দা করতেন। এবং তাদের অমর্যাদা করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন করেন। মণিমুক্তা ও মূল্যবান সম্পদ অপচয় করেন। খেলাধুলার জন্য অনেক ভবন নির্মাণ করেন। এক গায়ককে সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য এক নৌকা ভর্তি স্বর্ণ পুরস্কার দেন। পাঁচটি প্রাণী বাঘ, হাতি, সাপ, ঘোড়া এবং ঈগল পাখি শিকারের জন্য পাঁচটি জাহাজ তৈরি করেছিলেন।

আমীন নিহত হলে আমীনের পক্ষ অবলম্বনকারী কবি তাঈমী মামুনের কাছে এসে তার প্রশংসা করল। কিন্তু তিনি তার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফজল বিন সহল তার ব্যাপারে সুপারিশে কিছুটা নমনীয় হলে মামুন তাঈমীর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, তাঈমী! তোমার কবিতা এখন কেমন হবে যখন একজন বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে হিংসা করছে। তাঈমী তখন এ কবিতা আবৃত্তি করল– "মামুন আব্দুল্লাহর প্রতি অত্যাচার এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি বিজয় অর্জন করেছেন। সেই প্রতিশ্রুতি যা তার পিতা তাদের করায়েছিলেন। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার ভাই কাজ করেনি।" এটা শুনে মামুন তার অপরাধ মার্জনা করে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার কাছে আমার একান্ত আশা তিনি আমীনকে শুধু এ কারণে ক্ষমা করে দিবেন যে, ইসমাঈল বিন উলীয়া তার নিকট এলে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে বললেন, হারামজাদা! তুই কুরআন শরীফকে মাখলুক বানিয়েছিস!

মাসউদী বলেন, আমার সময় পর্যন্ত আলী বিন আবু তালিব, ইমাম হাসান এবং আমীন ছাড়া কোন হাশেমী খলীফা হাশেমী নারীর পেট থেকে জন্মগ্রহণ করে খিলাফতের তখতে বসেননি। আমীনের মা হলেন যাবীদা বিনতে জাফর বিন আবু জাফর মানসুর। তার আসল নাম উম্মুল আযীয, লকব যাবীদা।

ইসহাক মওসূলী বলেন, আমীনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যা অন্যান্য খলীফার মধ্যে ছিল না। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, দানশীল, মা বাবা উভয় দিক দিয়ে

সম্মানিত, সুযোগ্য সাহিত্যিক এবং উচ্চাঙ্গের কবি। কিন্তু আফসোস! খেলাধুলা তাকে গ্রাস করে। তিনি তদানীন্তন যুগের দানশীল ছিলেন। কিন্তু খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দারুণ কৃপণ ছিলেন।

আবুল হাসান আহমর বলেন, আমি যদি কখনো কোন কবিতা দলিল দেবার সময় ব্যাকরণ ভুলে যেতাম তখন আমীন আমাকে সেই কবিতাটি পড়ে শোনাতেন। আমি বাদশাহর ছেলেদের মধ্যে আমীন এবং মামুনের চেয়ে বেশি মেধাবী আর কাউকে দেখিনি।

১৯৮ হিজরীর মুহাররম মাসে ২৭ বছর বয়সে আমীন নিহত হন। তার খিলাফত কালে নিম্নেবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– ইসমাঈল বিন উলীয়া, গিন্দর, শফীক, আবু মুআবিয়া জরীর, ঐতিহাসিক সুদুসী, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর, কবি আবু নাওয়াস, ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন ওহাব, দরশে মাকরী, কাঈ প্রমুখ।

আলী বিন মুহাম্মাদ, নওফেল প্রমুখ বলেন, সাফফাহ, মানসুর, মাহদী, হাদী, রশীদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে কেউ নিজেদের গুণাবলী প্রকাশ করতেন না। কিন্তু আমীন খলীফা হওয়ার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিজের গুণাবলী জাহির করতেন। তিনি চিঠির শুরুটা এভাবে লিখতেন– আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আমীন আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে।

আসকারী বর্ণনা করেন, তার কবিতাগুলো ছিল পবিত্র। তিনি যখন শুনলেন মামুন তাকে দোষিয়েছে এবং আমীনের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলেছে তখন তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। যাতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মামুন যে মায়ের পেট থেকে প্রসবিত হয়েছেন সে মায়ের কারণে অমর্যাদার বিষয়টি বিধৃত রয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে এ কবিতার গুণগত মান উচ্চাঙ্গের, তার ভাই এবং তার পিতার কবিতার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম।

তাহের বিজয় অর্জন করলে আমীন খিলাফতের আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন– "হে প্রাণ! সত্যকে মেনে নাও। আল্লাহর হুকুম থেকে সরে আসার কোন পথ নেই। যারা সরে আসবে তারা ভুলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।"

সূলী বলেন, আমীন নিজের কাতেব দ্বারা লিখিয়ে তাহেরের নিকট এ পত্রটি পাঠান–"আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আমীন আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে তাহের বিন হোসাইনের প্রতি আসসালামু আলাইকুম। অতঃপর আমি এবং আমার ভাইয়ের মধ্যবর্তীতে এসে যে দাঁড়িয়েছে লোকেরা তাকে স্পষ্টভাবে চেনে। ভাগ্যে যা লিখা রয়েছে তাই হবে। তবে আমি চাই তুমি আমার উপর থেকে পরওয়ানা উঠিয়ে

নাও। যাতে আমি আমার ভাইয়ের কাছে যেতে পারি। যদি সে আমার সম্মান করে তবে সে তার যোগ্য। আর যদি হত্যা করে তবে এটাই তার পুঁজি। বীরত্ব বীরত্বকে কর্তন করে। আর তলোয়ার তলোয়ারকে, যদি আমাকে কোন বন্য প্রাণী টুকরো টুকরো করে তাহলে তা হবে কোন ক্ষুধার্থ কুকুর টুকরো টুকরো করার চেয়ে উত্তম।" কিন্তু তাহের তা প্রত্যাখ্যান করল।

ইসমাঈল বিন আবু মুহাম্মাদ ইয়াযিদী বলেন, আমার বাবা অনেক বার আমীন এবং মামুনের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি তাদের দু'জনকে অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং বাকপটু হিসেবে পেয়েছি। বনূ উমাইয়ার খলীফাদের ছেলেরা বাগ্মীতা অর্জনের জন্য বাদযূর নিকট গমন করত। এরপরও বনূ আব্বাস ভাষা-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি অগ্রগামী। সূলী বলেন, আমি আমীনকে একটি ছাড়া আর কোন হাদীস রেওয়ায়েত করতে দেখিনি। মুগীরা বিন মুহাম্মাদ বলেন, একবার হুসাইন বিন যহাকের কাছে বনূ হাশিমের একটি দল বসেছিল। এ দলে মুতাওয়াককীলের ছেলেরাও ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি হুসাইন বিন যহাককে জিজ্ঞেস করল, আমীন কেমন সাহিত্যিক? হুসাইন বললেন, খুব উঁচু মাপের। আবার প্রশ্ন করা হল, ফিকাহ (আইন) শাস্ত্রে তার অবস্থান? তিনি বললেন, মামুন তার চেয়ে বড় ফিকাহবিদ। বলা হল, আর হাদীসে? তিনি বললেন, আমি তার মুখ থেকে মাত্র একটি হাদীস শ্রবণ করেছি। তার এক গোলাম হজ্জে গিয়ে ইন্তেকাল করে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমীন বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মারা যাবে কিয়ামত দিবসে তাকে লাব্বাইক বলতে বলতে উপস্থিত করানো হবে।

ছাআলাবী লিতইফীল মাআরিফ গ্রন্থে লিখেছেন, আবুল আইনা বলেন, যাবীদা তার খোঁপার চুল ছেড়ে দিলে চুলের ভাঁজে ভাঁজে খলীফা এবং উত্তরাধিকার দেখা যেত। কারণ মানসুর তার দাদা, সাফফাহ দাদার ভাই, মাহদী চাচা, রশীদ স্বামী, আমীন সন্তান, মামুন এবং মুতাসিম সতিনের ছেলে, মুতাওয়াককিলও সতিনের ছেলে। আর উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত যদি দেয়া হয় তাহলে বনূ উমাইয়ার আতীকা বিনতে ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ ইয়াযিদ তার পিতা, হযরত মুআবিয়া (রা.) দাদা, মুআবিয়া বিন ইয়াযিদ তার ভাই, মারওয়ান বিন হাকাম তার শ্বশুর, আব্দুল মালিক তার স্বামী, ওলীদ তার ছেলে, হিশাম তার পৌত্র, সুলায়মান তার সতিনের ছেলে এবং ইয়াযিদ ও ইবরাহীম তার সতিনের পৌত্র।

আল-মামুন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস

মামুন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস বিন হারুন রশীদ ১৭০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝিতে জুমআর রাতে যেদিন হাদীর ইন্তেকাল হয় সেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আমীনের পর তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তার মাতার নাম মারাজিল, যিনি বাদী ছিলেন। তিনি সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিনের মধ্যেই মারা যান।

মামুন বাল্যকালে ইলম অর্জন করেন। তিনি তার পিতা, হাশিম, উবাদা বিন আওয়াম, ইউসুফ বিন আতীয়া আবু মুআবিয়া আল-যরীর, ইসমাঈল বিন উলীয়া, হাজ্জাজ আউর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইয়াযিদীর নিকট ভাষা-সাহিত্য চর্চা করেন। দূর-দূরান্ত থেকে ফিকাহবিদদের সমবেত করে ফিকাহ, আরবী এবং ইতিহাসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি দর্শন ও উলুমুল আওয়ায়েল (সূচনা সংক্রান্ত বিদ্যা– অনুবাদক) অর্জন করেন এবং তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও চর্চা করার কারণে তিনি খলকে কুরআনে বিশ্বাসীতে পরিণত হন। তার থেকে তার ছেলে ফজল, ইয়াহইয়া বিন আকতাম, জাফর বিন আবু উসমান আল-তায়ালাসী, আমীর আব্দুল্লাহ বিন তাহের, আহমদ বিন হারেছ শায়আ, ওয়ায়েল খাযায়ীসহ অনেক লোক হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি বনূ আব্বাস বংশে অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, সংকল্প, নম্রতা, জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধিমত্তা, আকস্মিকতা, বীরত্ব ও নেতৃত্বের দিক থেকে সবার বড়। তার মধ্যে বহু নেক গুণাবলীর সমাবেশ ছিল। এর মধ্যে কারো কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, বনূ আব্বাস খান্দানে তিনি সবচেয়ে বড় আলেম, তিনি উঁচু মাপের বাগ্মী এবং ভাষাবিদ। তার বিখ্যাত উক্তি হল– মুআবিয়ার, উমরের এবং আব্দুল মালিকের হাজ্জাজের প্রয়োজন ছিল। আর আমার কারো প্রয়োজন নেই।

বর্ণিত রয়েছে, বনূ আব্বাসের প্রথম খলীফা সাফফাহ, মধ্যবর্তী খলীফা মামুন এবং শেষ খলীফা মুতাযদ। কথিত আছে, কোন কোন রমযানে তিনি ৩৩ বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। তার ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি ছিলেন শীআ। যারা এ মত প্রকাশ করেছে তাদের দলিল হলো, তিনি নিজের ভাই মুতামানকে উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ইমাম আলী রেযাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

আবু মুশার আল-মজ্জাম বলেন, মামুন ন্যায় বিচারক এবং প্রশাসকদের ইনসাফের প্রতি তাকীদ দিতেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে এতই বিজ্ঞ ছিলেন যে, তাকে বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

হারুন রশীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মামুনের মধ্যে মনসুরের মত দৃঢ়তর সংকল্প, মাহদীর মত বদান্যতা এবং হাদীর মত মর্যাদাবোধ ছিল। আমি ইচ্ছে করলে তাকে আমার পর স্থান করে দিতে পারতাম। আমীন প্রবৃত্তি তাড়িত ব্যক্তি। সে অপচয়, বাঁদি এবং নারীদের সাথে যুক্ত- এ কারণে মামুন তার চেয়ে অগ্রগামী। যদিও তার মা বনূ হাশিম বংশোদ্ভূত এছাড়া সর্ব বিষয়ে মামুন অগ্রজ্ঞ।

১৯৮ হিজরীতে আমীন নিহত হওয়ার পর মামুন আবু জাফর উপাধি ধারণ করে খলীফা হন।

সূলী বলেন, এ উপাধি মামুনের খুব প্রিয় ছিল। কারণ মানসুরের এ উপাধি ছিল। আর তিনি হলেন অত্যন্ত প্রতাপান্বিত বাদশাহ। এ উপাধি ধারণকারী বাদশাহগণ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। যেমন মানসুর এবং হারুন রশীদ।

২০১ হিজরীতে মামুন নিজ ভাই মুতামিনকে বঞ্চিত করে তদস্থলে আলী রেযা মূসা আল-কাযিম বিন জাফর সাদিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। লোকেরা এ কাজ তার শীআ হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এমনকি তারা এ কথাও বলে যে, মামুন নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে খিলাফতের দায়িত্ব আলী রেযার উপর অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাকে রেযা উপাধিতে ভূষিত করেন। তার নাম ধারণের জন্য শাস্তি দেন। নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। গোটা সাম্রাজ্যে তার নাম ঘোষণা করেন। তিনি কালো কাপড় পরতে নিষেধ করে সবুজ কাপড় পরার হুকুম জারি করেন। এ নির্দেশে বনূ আব্বাস অসন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম বিন মাহদীর নিকট বাইআত করে মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বনূ আব্বাস সে সময় ইবরাহীম বিন মাহদীকে মুবারক উপাধিতে ভূষিত করে। মামুন তার সাথে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মামুন ইরাক সফরে গেলে ২০৩ হিজরীতে আলী রেযা পরলোক গমন করে। অতঃপর মামুন বাগদাদবাসীকে এ পত্র লিখে পাঠান- আলী রেযার মৃত্যু হওয়ায় তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছ। জবাবে বাগদাদবাসী লিখল- মামুনকে তারা অত্যন্ত জঘন্য মনে করে। এরপর তারা সহজে ইবরাহীমকে সহযোগিতা করতে লাগল। ফলে ইবরাহীম প্রায় দুই বছর লড়াই শেষে যিলহজ্জ মাসে আত্মগোপন করেন। আট বছর তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। ২০৪ হিজরীর সফর মাসে মামুন বাগদাদে ফিরে আসেন। তখন বনূ আব্বাসসহ অন্যান্য লোকেরা সবুজ কাপড় ছেড়ে কালো কাপড় পরতে আরম্ভ করে। প্রথমে মামুন এ বিষয়টিকে ভিন্ন চোখে দেখলেও পরবর্তীতে তা মানিয়ে নেন।

সূলী বলেন, মামুনের পরিবারের কিছু লোক তাকে বলল, আপনি আলী বিন

আবু তালিবের সন্তানদের সাথে সৎ আচরণ করতে চাইলে তাদের উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলে কিভাবে আপনি এ কাজ পরিচালনা করবেন? সুতরাং খিলাফত আপনার হাতে থাকা পর্যন্ত আপনি শক্তিধর। তাদের হাতে চলে গেলে আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না। মামুন জবাবে বললেন, আমি তা এ জন্যই করছি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর হাশেমী লোককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। এভাবে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) কেন হাশেমীকে খিলাফতের কোন দায়িত্ব দেননি। খলীফা হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে বসরায়, উবায়দুল্লাহকে ইয়ামনে, মা'বাদকে মক্কায় এবং কাছামকে বাহরাইনে প্রশাসক নিয়োগ করেন; বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোনভাবে পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার নিয়োগ করেছেন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমি তার আওলাদদের তা প্রদান করতে চাই।

২১০ হিজরীতে মামুন বোরান বিনতে হুসাইন বিন সহলকে বিয়ে করেন। এতে সহস্রাধিক সম্পদ মামুনকে দেয়া হয়। বোরানের বাবা ছিলেন মহানুভব দাতা। তিনি সকল নেতাদের উপঢৌকন দেন এবং সতেরো দিন দাওয়াত খাওয়ান। তিনি অনেক স্লিপ লিখেন। প্রত্যেক স্লিপে কোন না কোন জায়গীরের (জমিদার কর্তৃক প্রাপ্ত জমি– অনুবাদক) কথা উল্লেখ ছিল। স্লিপগুলো বনূ আব্বাস এবং আমন্ত্রিত নেতাদের বণ্টন করে দেয়া হয়। যে স্লিপ যার কাছে যায় তাকেই সেই জায়গীর প্রদান করা হয়। যাবার সময় সোনা ও মুক্তভর্তি অনেকগুলো থলে এনে মামুনকে দেয়া হয়।

২১১ হিজরীতে মামুন ঘোষণা করেন, যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গুণাবলী আলোচনা করবে আমি তার নিরাপত্তা থেকে দূরে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত আলী (রা.)। ২১২ হিজরীতে তিনি খলকে কুরআনের মাসয়ালা ইলান করেন। এবং তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর উপর হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদার কথা ঘোষণা করেন। এতে করে তার প্রতি লোকদের ঘৃণা জন্ম নেয়। অধিকাংশ শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেউ তার এ আকীদা গ্রহণ না করায় ২১৮ হিজরী–তে মামুন অপারগ হয়ে নিজের প্রচারিত মতবাদ থেকে নিজেই ফিরে আসেন।

২১৫ হিজরীতে যুদ্ধ করতে রোম যাত্রা করেন। সেখানে কুরা এবং মাজেদা নামক দূর্গদ্বয় যুদ্ধ করে জয় করেন। অতঃপর দামেশক ফিরে আসেন। ২১৬ হিজরীতে আবার রোমে গিয়ে কতিপয় দূর্গ জয় করে দামেশক প্রত্যাবর্তন করেন। দামেশক থেকে মিসরে যান। আব্বাসীয় কোন বাদশাহর এটাই প্রথম মিসর

সফর। ২১৭ হিজরীতে মিসর থেকে এসে আবার রোম গমন করেন।

২১৮ হিজরীতে খলকে কুরআনের মাসয়ালা সম্পর্কে লোকদের পরীক্ষা করেন। বাগদাদ সাম্রাজ্যের নায়েব তাহের বিন হুসাইনের চাচাতো ভাই ইসহাক বিন ইবরাহীম খাযায়ী বাগদাদের আধ্যাত্মিক ওলামাদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে- আমিরুল মুমিনীন অনেক মর্যাদাবান এবং ব্যক্তিবর্গ এমনকি আলেম থেকে জাহেল পর্যন্ত যাদের দ্বীনের কোন জ্ঞান নেই, যাদের অন্তরে ইলমের আলো নেই, যাদের কাছে কোন দলিল নেই- তাদের ব্যাপারেও অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলার মারিফাতে যারা মূর্খ, অন্ধ এবং গোমরাহ, যারা দ্বীনের গূঢ় রহস্য জানে না, আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে চেনে না, যারা হাকিকত- মারিফত বোঝে না, তাঁর সৃষ্টি জগতের পার্থক্য করতে পারে না। তারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর মাখলুক এবং যা কিছু কুরআন শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে সবগুলোকে একই সমান মনে করে। এ কারণে লোকদের ধারণা কুরআন শরীফ পুরাতন বা সেকেলে- আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেননি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا

অর্থ- "আমি কুরআন শরীফকে আরবী বানিয়েছি।" বুঝা গেল যাকে বানানো হয় সে মাখলুক। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدْ سَبَقَ

অর্থ- "আমি সেই লোকদের অবস্থা বয়ান করছি যারা গত হয়েছে।" আবার ইরশাদ হচ্ছে-

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرِ

অর্থ- "আমি অন্ধকার এবং আলো বানিয়েছি।" এ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

أُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ

অর্থ- "এ নিদর্শনগুলো সুরক্ষিত (মোহকাম) এবং তার বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়েছে।" এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে আহকাম এবং বিস্তারিত করে বানিয়েছেন। তিনিই খালেক বা সৃষ্টিকর্তা। এরপরও তারা নিজেদের সুন্নতের দাবীদার হিসেবে জাহির করে এবং নিজেদের আহলুল হক ওয়াল জামাত নাম রাখে। যারা তাদের আকীদা বিশ্বাস করে না তাদেরকে আহলে বাতেল ওয়াল কুফর বলা হয়। এ বিষয়ে তারা সীমালঙ্ঘন করে এবং জাহেলদের ধোঁকার

মধ্যে ফেলে এমনকি পরহেযগার লোকেরাও তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে এবং সত্য থেকে মিথ্যার দিকে চলে যাচ্ছে। তারা নিজের গোমরাহীর কারণে নিজের মত করে আল্লাহর ইবাদত করছে। আমিরুল মুমিনীনের দৃষ্টিতে বজ্জাত এবং জঘন্য ওরা, যারা তাওহীদ থেকে সরে যায়। যারা তাওহীদের মধ্যে কমি করবে সে জাহেল। আর যে তাওহীদের মিথ্যা প্রচার করবে সে শয়তান। শয়তান তার বন্ধুর মুখ দিয়ে কথা বলে। আর শত্রু অর্থাৎ আল্লাহর খাস বান্দাদের ভয় করে। ওদের (শয়তানের বন্ধুদের) সত্য কথারও কোন মূল্য নেই। তাদের সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য, কারণ যে তাওহীদের বিষয়ে অন্ধ তার চেয়ে বড় অন্ধ এবং পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে। আমিরুল মুমিনীনের কসম, সবচেয়ে মিথ্যাবাদী লোক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং তার ওহীকে মিথ্যা জ্ঞান করে, বাতেলের সঙ্গ দেয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে চেনে না। অতএব সকল কাযীকে সমবেত করে আমার পত্রখানা তাদের সামনে পড়া হবে। তারা কিছু বললে তাদেরও পরীক্ষা নেয়া হবে। সৃষ্টি জগৎ এবং কুরআনের জন্ম সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তাদের বলা হবে, যে ব্যক্তি দীনের উপর অটল নয় তার প্রতি কখনই ভরসা করা হবে না। কোন কাজে তাকে সাহায্য করা হবে না। আর যদি সে এ মাসয়ালাকে স্বীকৃতি দেয় তবুও তার জন্য কুরআনের জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতি এবং তাদের সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। যারা এ মাসয়ালাকে স্বীকৃতি দেবে না তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাযীদের নির্দেশ প্রদান করেছি।

মামুন এ পত্রটি নিম্নবর্ণিত সাত জনের নিকট পাঠিয়ে তাদের ডেকে পাঠান। তারা হলেন– ওকেদীর লেখক মুহাম্মাদ বিন সাদ, ইয়াহইয়া বিন মঈন, আবু খায়ছামা (যাহীর বিন হরব-অনুবাদক), আবু মুসলিম মুসতামলা, ইয়াযিদ বিন হারুন, ইসমাঈল বিন দাউদ, ইসমাঈল বিন আবু মাসউদ এবং আহমদ বিন ইবরাহীম দুরকী। তারা এলে খলকে কুরআন সম্পর্কে তাদের পরীক্ষা করা হয়। তাদের ভূমিকা অপরিবর্তনীয় থাকায় তাদের জন্য বাগদাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ফলে দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা তা কবুল করেন।

অতঃপর মামুন ইসহাক বিন ইবরাহীমকে পত্র মারফত জানালেন যে, তুমি মুফতী এবং আলেমদের একত্রিত করে জানিয়ে দাও যে, উপরিউক্ত সাত জন খলকে কুরআনের আকীদা মেনে নিয়েছেন। ইসহাক তাই করলেন। কিছু লোক কথাটি বিশ্বাস করল। আবার অধিকাংশরা তা প্রত্যাখ্যান করল। পুনরায় মামুন ইসহাককে পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন– যারা এ আকীদা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের

একত্রিত করে ভালোভাবে জেনে নাও। ইসহাক তাদের ডাকলেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, তলোয়ারের জোরে আমরা এ আকীদা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

ইসহাকের ডাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, বশর বিন ওলীদ কিন্দী, আবু হাসান যিয়াদী, আলী বিন আবু মুকাতিল, ফজল বিন গানিম, উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারেরী, আলী বিন জাআদা, সুজাদা যিয়াল বিন হাশিম, কায়তাবা বিন সাঈদ, ইসহাক বিন ইসরাঈল, ইবনে হরশ, ইবনে উলীয়া আল-আকবর, মুহাম্মাদ বিন নূহ আল-আজলী, ইয়াহইয়া বিন আঃ রহমান উমরী, বাবু নসর তামার, আবু মুআম্মার কতীয়ী, মুহাম্মাদ বিন হাতিম বিন মাইমুন, সাদ প্রমুখ সমবেত হলে ইসহাক মামুনের পত্রটি পড়ে শোনান। শ্রবণান্তে তারা মাথা নিচু করে ফেলেন। কোন উত্তর দিলেন না; বরং ভাসা ভাসা কিছু কথা বললেন। অবশেষে ইসহাক বশর বিন ওলীদকে বললেন, আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, আমি আমিরুল মুমিনীনকে বলব। ইসহাক বললেন, আমিরুল মুমিনীন একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার ফরমানকে মান্য করা জরুরি। তিনি বললেন, আমার মতামত হল, কুরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলার কালাম। ইসহাক বললেন, আমি আপনাকে এটা প্রশ্ন করিনি; বরং আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি কুরআন শরীফকে মাখলুক বলেন কিনা? তিনি বললেন, আমি যা বলেছি এর চেয়ে বেশি কিছু বলা শোভন মনে করি না। আমি আমিরুল মুমিনীনের নিকট শপথ করেছি যে, এ মাসয়ালা সম্বন্ধে অগ্রিম কিছু বলব না।

অতঃপর ইসহাক আলী বিন আবু মুকাতিলের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী। যদি আমিরুল মুমিনীন কিছু বলেন তবে আমরা শুনব এবং তার আনুগত্য করব। ফের আবু হাসান যিয়াদীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। তারপর হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। ইসহাক বললেন, কুরআন মাখলুক কিনা? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর কালাম—এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। অতঃপর অবশিষ্টদের যাচাই করা হয়। অবশেষে ইবনে বাকা আল-আকবার বললেন, কুরআন শরীফ বানানো (তৈরি বা সৃষ্টি করা) হয়েছে। কুরআন মুহ্দিস। কারণ এ ব্যাপারে কুরআনিক দলিল রয়েছে। ইসহাক বললেন, যাকে বানানো হয় সেই তো মাখলুক। ইবনে বাকা আল-আকবার বললেন, জ্বি হ্যাঁ। ইসহাক বললেন, তাহলে কুরআন শরীফও মাখলুক? ইবনে বাকা আল-আকবার বললেন, আমি কুরআনকে মাখলুক বলব না।

ইসহাক আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে খলীফা মামুনের কাছে পাঠিয়ে

দিলেন। জবাবে মামুন দীর্ঘ চিঠি লিখে ইসহাকের কাছে পাঠালেন। তিনি লিখেছিলেন- তোমার পত্র পড়েছি। যারা নিজেদের আহলে কিবলা এবং শাসকগোষ্ঠী বলে দাবী করছেন তারা মূলত আহলে কিবলা এবং শাসকগোষ্ঠী নয়। যারা খলকে কুরআনে বিশ্বাসী নয় তাদেরকে ফতোয়া দেয়া, হাদীস বর্ণনা করা এবং কুরআন শিক্ষা দেয়া থেকে বিরত রাখবে। বশর মিথ্যা বলেছে, আমিরুল মুমিনীনের সাথে তার কোন কসমের মোয়ামেলা নেই। আমিরুল মুমিনীনের বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং বাণী হল কুরআন মাখলুক। যা তাকে বলা হয়েছে। যদি সে তাওবা করে তবে তা ঘোষণা করবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করে তার মস্তক আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। ইবরাহীম বিন মাহদীকে আবার বল, যদি সে তা গ্রহণ করে তবে ভালো, না হলে তার গর্দানও উড়িয়ে দাও। আলী বিন আবু মুকাতিলকে বল, সে কি আমিরুল মুমিনীনকে বলেনি আপনিই হালাল হারাম করবেন। যিয়ালকে বল, শহরে লুটতরাজের অপরাধই তোমার জন্য যথেষ্ট। আহমদ বিন ইয়াযিদ এবং আবুল আওয়ামের কুরআন সম্পর্কীত জবাব সন্তোষজনক নয়। তারা বয়সে বৃদ্ধ হলেও বুদ্ধির দিক থেকে শিশু এবং মূর্খ। তাদের আবার জিজ্ঞেস কর। যদি তারা নিজ অবস্থানে অটল থাকে তাহলে ঘোষণা দিয়ে তলোয়ার দ্বারা তাদের মোকাবিলা করবে। আহমদ বিন হাম্বলকে বল, আমিরুল মুমিনীন আপনার জবাবের উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছেন এবং আপনার মূর্খতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফজল বিন গানিমকে জানিয়ে দিবে, মিসরে সে যা করেছে আমিরুল মুমিনীনের তা অজানা নয়। অর্থাৎ মিসরে অল্প সময়ের জন্য কাযী থাকা অবস্থায় তিনি অনেক সম্পদ অর্জন করেছেন। যিয়াদীকে বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ। আবু নসরকে বল, তার ব্যবসার ব্যাপারে আমিরুল মুমিনীনের আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। ইবনে নূহ এবং ইবনে হাতিমকে জানিয়ে দিবে, সুদ খেতে খেতে তাওহীদের জ্ঞান তাদের লোপ পেয়েছে। সুদ খাওয়ার কারণে আমিরুল মুমিনীন তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবেন। ইবনে শুজাকে বল, আমীরের সম্পদ আলী বিন হিশামের জন্য বৈধ, যা তুমি গ্রাস করেছ। সাদকে বলবে, যে রাজত্বের লোভ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এতটুকুও দিবেন না। সাজাদাহকে জানিয়ে দাও, তুমি এ বিষয়টি অস্বীকার করবে যে, তোমার পার্শ্বে যে আলেমরা থাকেন তাদের নিকট থেকে কুরআন মাখলুক- এ কথা শোননি? আলী বিন ইয়াহইয়ার আমানতদারী ঠিক করতে গিয়ে সে তওহীদের কথা ভুলে গেছে। কাওয়ায়েরীর জানা আছে যে, আমি তার রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অবগত। তুমি আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। মানলে তা ঘোষণা করে দাও। অন্যথায় তাদের বেঁধে আমিরুল মুমিনীনের

সৈনিকদের কাছে পাঠিয়ে দাও। তারা তাদের জিজ্ঞেসবাদ করবে। তারপরও না মানলে তলোয়ার দ্বারা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

এ ফরমান শ্রবণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, সাজ্জাদাহ, মুহাম্মাদ বিন নূহ এবং কাওয়ারেরী ছাড়া সকলেই খলকে কুরআনের আকীদা গ্রহণ করে নেন। ইসহাক এ চার জনকে বন্দী করেন। পর দিন তিনি জেলখানায় গিয়ে এ আকীদা সম্পর্কে তাদের আবার জিজ্ঞেস করেন। সাজ্জাদাহ এবং কাওয়ারেরী চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন এবং এ আকীদা মেনে নেন। অতঃপর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং মুহাম্মাদ বিন নূহকে রোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে মামুন জানতে পান যে, সকলেই জেদাজেদীর কারণে এ মতাদর্শ গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে এ আদেশ লিখে পাঠালেন– সকলকে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইসহাক সকলকেই পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তারা গিয়ে না পৌছুতেই মামুন পরলোক গমন করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করলেন।

মামুন রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের পীড়া তীব্রতর হলে তিনি পুত্র আব্বাসকে ডেকে পাঠান, তার ধারণা ছিল আব্বাস আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু মামুনের মুমূর্ষু অবস্থায় আব্বাস এসে পৌছেন। তবে এর আগেই বিভিন্ন শহরে, নগরের জনপদে পত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। যার উপরাংশে লিখা ছিল–এ পত্র মামুন এবং তার ভাই আবু ইসহাকের পক্ষ থেকে, যিনি মামুনের পর খলীফা হবেন। কথিত আছে, এ পত্রখানা আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে লিখা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, মামুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর এ পত্রটি লিখা হয়।

২১৮ হিজরীর রযব মাসের ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবারে রোমের বাযনাদুন অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন। তাকে তারতুসে দাফন করা হয়।

মাসউদী বলেন, বাযনাদুন ঝর্ণার পাদদেশে মামুন তাঁবু স্থাপন করেন। এলাকাটি শীতল, পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও মনোরম হওয়ায় তিনি তা পছন্দ করেছিলেন। হঠাৎ পাশের ঝর্ণায় চাঁদীর মত চকচকে একটি মাছ দেখা গেল। মামুন এতে আশ্চর্য হয়ে মাছটি ধরার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঝর্ণার পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে কেউ পা দিতে সাহস করল না। মামুন মাছটি ধরার জন্য একটি তলোয়ার পুরস্কার ঘোষণা করলে ফারাশ নামক একজন ঝর্ণায় নেমে মাছটি ধরে কিনারায় নিয়ে এলে লাফ দিয়ে তা পানিতে পড়ে যায়। ফারাশ আবার ঝর্ণায় নেমে মাছটি ধরে আনে। মামুন একে কাবাব বানানোর নির্দেশ দিলেন। কাবাব তৈরি না হতেই মামুনকে দারুণ ঠাণ্ডায় পেয়ে বসে। তিনি কাঁপতে থাকেন। ফলে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে যান। এরপরও কম্পন থামে না। তিনি অসম্ভব রকম কাঁপতেই থাকেন।

এতে করে তার দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষ হতে থাকে। চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মাছটি কাবাব হয়ে আসে। কিন্তু মামুন তা একটুও চাখতে পারলেন না। মৃত্যু এসে তাকে পরপারে নিয়ে গেল। এর মধ্যে তিনি অল্পক্ষণের জন্য কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে বাযনাদুনের অর্থ জানতে চাইলেন। একজন বলল, পা ফেলাকে বাযনাদুন বলা হয়। এরপর তিনি এর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের নাম জিজ্ঞেস করলেন। বলা হল, এর নাম রোকা। মামুনের জন্মের সময় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তাতে লিখা ছিল তিনি রোকায় মারা যাবেন। তিনি রোকার কথা শুনে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করেন। সে সময় তিনি এ দোআ করেন- "হে জগতের প্রতিপালক! হে সেই পবিত্র সত্তা! যার রাজত্ব কোন দিন ধ্বংস হবে না। এ বান্দার প্রতি রহম করুন, যার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ছালাবী বলেন, মামুন এবং তার পিতা হারুন রশীদের কবর (রাজধানী থেকে) যত দূরে আমার দৃষ্টিতে খলীফাদের মধ্যে কোন পিতা-পুত্রের কবর এত দূরে নয়। বনূ আব্বাসের পাঁচ জনের কবর অনেক দূরে, তারা হলেন, আব্দুল্লাহ তায়েফে, উবায়দুল্লাহ মদীনায়, ফজল সিরিয়ায়, কাছাম সমরকন্দে এবং মাবাদ আফ্রিকায়।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

লাফযূয়া বলেন, হামেদ বিন আব্বাস বিন উযীর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি মামুনের কাছে বসেছিলাম। মামুন হাঁচি দিলেন। আমি আলহামদুলিল্লাহর জবাব দিলাম না। মামুন এর কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য বলিনি। তিনি বললেন, আমি সে রকম বাদশাহ নই যারা দো'আকে পরোয়া করে না।

ইবনে আসাকির আবু মুহাম্মাদ ইয়াযিদী থেকে বর্ণনা করেন, আমি মামুনকে শৈশবকালে শিক্ষাদান করেছি, একদিন যথারীতি আমি এলাম কিন্তু মামুন অন্দর থেকে বের হলো না। আমি পরপর দু'জন খাদেমকে ডাকতে পাঠালাম। এরপরও সে এল না। আমি বললাম, সে নিজের সময়গুলো নষ্ট করছে। এ কথা শুনে খাদেমরা বলল, আপনি যাবার পর শাহজাদা খাদেমদের যথেচ্ছা ব্যবহার করে এবং তাদের প্রহার করে। আজ তাকে হাল্কা শাসন করবেন। ইত্যবসরে মামুন এলো, আমি তাকে সাতটি বেত্রাঘাত করলাম। মামুন কাঁদতে লাগল। এমন সময় জাফর বিন ইয়াহইয়া বরমকী এসে পড়লেন। শাহজাদা রুমাল দিয়ে চোখাশ্রু মুছতে মুছতে কার্পেটের উপর গিয়ে বসল এবং জাফরকে ডেকে নিলেন। আমি উঠে বাইরে গেলাম। মামুন জাফরের কাছে নালিশ করে কিনা এ ব্যাপারে আমার ভয়

হল। জাফর চলে গেলে আমি তার কাছে এসে বললাম, আমার ভয় ছিল যদি আমার ব্যাপারে নালিশ কর। এটা শুনে মামুন বলল, হে বাবা মুহাম্মাদ! আমি হারুন রশীদকেও বলি না, সেখানে জাফরকে বলব? কারণ শিক্ষা গ্রহণে আমার উপকার। আমি আদবের মোহতাজ।

আসমায়ী বলেন, মামুনের মোহরে খোদাই করে লিখা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ। মুহাম্মাদ বিন উবাদা বলেন, খলীফাদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) এবং মামুন ছাড়া কেউ হাফেজ ছিলেন না। ইবনে আয়নাহ বলেন, একদিন মামুন ওলামাদের সাথে সাধারণ পরিষদে বসেছিলেন। জনৈক মহিলা এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার ভাই ইন্তেকাল করেছে। মৃত্যুর সময় ছয় শত দিনার রেখে গেছে, আমাকে এক দিনার দিয়ে বলা হয়েছে, এটাই তোমার অংশ। মামুন কিছুক্ষণ ফারায়েযের অঙ্ক কষে বললেন, তুমি একটি দিনারই পাবে। ওলামা হযরত বললেন, আমিরুল মুমিনীন! এটা কি করে হয়? মামুন বললেন, মৃত ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তান রেখে গেছে। মহিলা বলল, হ্যাঁ। মামুন বললেন, এ দু'সন্তান পেয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ চার'শ দিনার। তার মা রয়েছে, সে পেয়েছে অষ্টাংশ অর্থাৎ এক'শ দিনার। স্ত্রীর ভাগে অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৭৫ দিনার, তার বারো জন ভাই ছিল না? মহিলা বলল, হ্যাঁ। মামুন বললেন, তারা পেয়েছে দুই দিনার করে। অবশিষ্ট থাকে এক দিনার, যা তোমার ভাগে এসেছে।

মুহাম্মাদ বিন হাফয আল-আনমাতী বর্ণনা করেন, ঈদের দিন আমি মামুনের সাথে খানা খেতে বসলাম। দসতরখানে ছিল তিন শতাধিক প্রকার খানা। মামুন এক একটি খানার প্রতি ইশারা করে বললেন, এ খানা অমুক রোগের ঔষধ। যার বমন করার অভ্যাস রয়েছে সে এ খানা খাবে না ইত্যাদি এ ধরনের আরো অনেক কথা। ইয়াহইয়া বিন আকতাম এ দৃশ্য দেখে বলল, আমিরুল মুমিনীন! চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে দেখা হলে আপনি জালেনুস। জ্যোতির্বিদ্যায় আপনি হলেন হরমুস। উলুমুল ফিকহে আলী বিন আবু তালিব। দানশীলতায় হাতেম তাঈ। সত্যবাদিতায় আবু যর। দয়ার্দ্রতায় কাব বিন উমামা। এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আপনি হলেন সমুল বিন আদিয়া। এ কথা শুনে মামুন দারুণ খুশি হয়ে বললেন, এজন্য জ্ঞানের কারণে মানুষকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

ইয়াহইয়া বিন আকতাম বলেন, আমি মামুনের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি আর দেখিনি। একদিন রাতে আমি তার সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, ইয়াহইয়া দেখ তো আমার পায়ের কাছে কি? আমি তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বিছানার দায়িত্বে নিয়োজিত

প্রহরীদের ডাকলেন। জনৈক প্রহরী মোমবাতি নিয়ে হাযির হলো। তিনি তাকেও দেখতে বললেন, ফলে দেখা গেল বিছানার নিচে একটি লম্বা সাপ বসে রয়েছে। তারা সাপটি মেরে ফেলল। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলেমুল গায়েব বললেও কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, আল্লাহ ক্ষমা করুন। তুমি একি বলছ? আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে এ কবিতাটি আবৃত্তি করল- "হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! জেগে উঠুন এবং নগ্ন তলোয়ার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করুন।" এটা শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং বিশ্বাস হল অবশ্যই কিছু একটা হতে চলেছে। অবশেষে বিছানার নিচে সাপ পাওয়া গেল।

উমারাহ বিন আকল বলেন, একদিন কবি আবু হাফসা আমাকে বললেন, তুমি কি কখন ভেবে দেখেছ যে, আমার দৃষ্টিতে মামুন কবিতার ভাবার্থ মোটেও অনুধাবন করতে সক্ষম নন। আমি বললাম, তার চেয়ে বেশি কথোপকথন অনুধাবনকারী আর কে আছে। আল্লাহর কসম! আপনি তাকে অনেক কবিতা শুনিয়েছেন। আর তিনি প্রথম চরণ শুনেই গোটা কবিতার সারাংশ ও ভাবার্থ বুঝে ফেলেন। তিনি বললেন, আমার শ্রেষ্ঠ রচনা চমৎকার একটি কবিতা তাকে শুনালাম। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার অনুভূতি জাগ্রত হল বলে মনে হল না। কবিতার অর্থটি এরূপ- "ইমামুল হুদা মামুন দ্বীন নিয়ে মশগুল। আর জনতা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন।" আমি বললাম, কবিতার প্রভাব-শক্তি মাটি হয়ে গেছে। মামুন যদি শুধু দ্বীন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি কিভাবে সম্পাদন হবে? আপনি তার শানে সে কবিতাটিই আবৃত্তি করেছেন, যা আপনার চাচা ওলীদের সামনে আবৃত্তি করেছিলেন।

নযর বিন শামীল বলেন, আমি তালিযুক্ত চাদর পরে মামুনের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, নযর! আমিরুল মুমিনীনের সামনে এভাবেই কি আসা উচিত? আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! এমনটা পরেছি গরমের কারণে। তিনি বললেন, না না, কথা এটা নয়। মনে হয় তুমি গরীব হয়ে গেছ। এ হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, যা হিশাম বিন বশীর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুজাহিদ থেকে, মুজাহিদ আল-শা'বী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এমন নারী যার মধ্যে দ্বীন এবং লাবণ্য রয়েছে এমন নারীকে বিয়ে করলে অভাব ও দরিদ্রতার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার অভিমত সত্য। তবে হাসানের বরাত দিয়ে আউফুল আরাবী আমার কাছে

রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, দ্বীনী ও লাবণ্যময়ী নারীকে বিয়ে করলে আয়েশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। মামুন কোলবালিসে হেলান দিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তিনি বললেন, তবে কি প্রথম হাদীসে শব্দ ভুল রয়েছে? বললাম, জ্বি হ্যাঁ, হিশাম ভুল বলেছেন। তিনি বুঝতে পারেননি। অতঃপর মামুন রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করলেন।

মামুন আমাকে বললেন, তুমি কি আরবী কবিদের সনদ বর্ণনা করতে পারবে? আমি আরবী কবির একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। এটা শুনে মামুন বললেন, আল্লাহ তা'আলা এমন ধরনের কবিদের বিধ্বস্ত করুন, যারা ইলমুল আদব (আরবী সাহিত্য) ভালোভাবে জানে না। অতঃপর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ইবনে আবী উরওয়াতাল মাদানী কবির কাব্য বলে শোনালেন। আমিও তাকে অনেক কবিতা শোনালাম। তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দেবার নির্দেশ লিখে আমাকেসহ কাগজটি ফজল বিন সহলের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। আমি গেলাম। ফজল বললেন, অমিরুল মুমিনীনের খুব ভুল ধরছেন? আমি বললাম, হিশাম ভুলের উপর ছিলেন। আর তিনি তার অনুসরণ করছিলেন। এ কথা শুনে ফজল নিজের পক্ষ থেকে আরো ত্রিশ হাজার দিরহাম দিলেন।

খতীব মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আরাবী থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আমি মামুনকে ইয়াহইয়া বিন আকতামের সাথে বাগানে পায়চারী করতে দেখলাম। সামনে গিয়ে খলীফা সূচক অভিবাদন জানালাম। আমি শুনলাম তিনি ইয়াহইয়াকে বললেন, আবু মুহাম্মাদ ইলমে আদব সম্পর্কে অভিজ্ঞ, অতঃপর তিনি আমাকে একটি কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি এর যথাযথ ব্যাখ্যা করায় তিনি আমাকে আম্বর দান করলেন, সে সময় যা তার হাতে ছিল। আমি সেটি পাঁচ হাজার দিরহামে বিক্রি করি।

আবু উবাদা বলেন, মামুন পৃথিবীর বাদশাহ, তার মত আর একজনকেও দেখিনি।

আবু দাউদ বলেন, মামুনের নিকট এক খারেজী লোক এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আমার খিলাফতের কোন দলিল আছে কি? সে বলল, আছে তা হলো কুরআন শরীফের এ আয়াত–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

মামুন বললেন, কিভাবে বুঝলে এটা কুরআনের আয়াত?

সে বলল, উম্মতের ইজমা দ্বারা। তিনি বললেন, যখন তোমরা নাযিলকৃত

আয়াতের ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমা দ্বারা একমত হচ্ছে, তখন বিশ্লেষণসাপেক্ষেও ঐকমত্যে পৌঁছা উচিত। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

ইবনে আসাকির মুহাম্মাদ বিন মানসূর থেকে বর্ণনা করেন। মামুনের উক্তি হল–ভদ্র লোকদের আলামত হচ্ছে সে উর্ধ্বতন লোকদের অত্যাচার সহ্য করবে। কিন্তু দুর্বলদের উপর জুলুম করবে না।

সাঈদ বিন মুসলিম বলেন, মামুন বলতেন, আমি ক্ষমা করতে এতটাই ভালোবাসি যে, যদি অপরাধীরা তা জানতে পারে তাহলে তাদের অন্তর থেকে ভয় উঠে যাবে এবং তারা ভীষণ আনন্দিত হবে।

ইবরাহীম বিন সাঈদ জাওহারী থেকে বর্ণনা করেন, এক অপরাধীকে মামুনের সামনে আনা হলে তিনি কসম খেয়ে বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! একটু ধৈর্য ধরুন এবং সহনশীলতার সাথে কাজ করুন। কারণ নমনীয়তা প্রদর্শন অর্ধেক ক্ষমা করার সমান। মামুন বললেন, আমি যে কসম করেছি। সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সামনে হত্যাকারী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে কসম তরককারী হয়ে হাযির হওয়া অনেক ভালো। এ কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

খতীব আবুল সলত আব্দুস সালাম বিন সালেহ থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আমি মামুনের কক্ষে শুয়ে গেলাম। এদিকে মশালবাহীদের তন্দ্রার কারণে মশাল গলে পড়ে যায়। মামুন নিজেই উঠে আসেন এবং মশালগুলো ঠিক করে দেন। এমন সময় আমার চোখ খুলল। আমি শুনতে পেলাম মামুন বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী আমি গোসলখানায় ছিলাম। গোসলখানার খাদেমরা আমাকে গালি দিল। আমি যে তাদের গালি শুনতে পেলাম তা তারা জানত না। আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

সূলী আব্দুল্লাহ বিন আল-বাওয়াব থেকে বর্ণনা করেন, মামুন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি তার ধৈর্যশীলতা দেখে আমাদেরই রাগ হত। একদিন আমরা জাহাজে করে দজলা নদী ভ্রমণ করছিলাম। জাহাজের ডেকে পর্দা টানানো ছিল। একদিকে আমরা অন্যদিকে মাঝি মাল্লার দল বসেছিল। একজন মাঝি বলল, তোমরা জান আমার অন্তরে মামুনের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ নেই। তিনি আমার চোখের কাঁটা। কারণ তিনি নিজ ভাইয়ের হত্যাকারী, আল্লাহর কসম, এ কথা শুনে মামুন হেসে উঠলেন। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, আপনারা একটি গ্রহণযোগ্য উপায় বের করুন যা দ্বারা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত হতে পারি।

খতীব ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেন, আমি মামুনের চেয়ে দয়াবান আর কাউকে দেখিনি। একদিন আমি তার গৃহে শয়ন করলাম। তখনও আমি ঘুমিয়ে যাইনি। মামুন হাঁচি দিয়ে উঠে বসলেন। হাঁচির শব্দে কারো যেন ঘুমের ক্ষতি না হয় সেজন্য জামার কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়ে বলতে লাগলেন, ইনসাফের প্রথম পর্যায় হচ্ছে নিকটবর্তী বন্ধুদের প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে নগণ্যদের প্রতিও।

ইবনে আসাকির ইয়াহইয়া বিন খালিদ বরমক্কী থেকে রেওয়ায়েত করেন, একদা মামুন আমাকে বললেন, ইয়াহইয়া! লোকদের প্রয়োজনে সাহায্য করাকে সৌভাগ্য মনে করবে। কারণ আকাশ ধ্বংস হবে। যুগ যুগান্তর কেউ বেঁচে থাকবে না। এবং কারো দয়াও অবিনশ্বর নয়।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ যহরী কর্তৃক বর্ণিত, মামুন বলেন, আমার মতে কষ্টার্জিত বিজয় স্বভাবজাত বিজয়ের চেয়ে প্রিয়। কারণ স্বভাবজাত বিজয় ম্লান হয়ে পড়ে। আর কষ্টার্জিত বিজয় অটুট থাকে।

শা'বী থেকে বর্ণিত মামুন বলেন, যে তোমার ভালো সংকল্পে গর্বিত নয়, সে তোমার নেক কাজেরও সমর্থক নয়। আবুল আলীয়া বলেন, আমি মামুনকে বলতে শুনেছি, সুলতানের খোশামোদ করা ঘৃণ্য কাজ।

আলী বিন আব্দুর রহীম আল-মুরুযী বলেন, মামুন বলতেন, ঐ ব্যক্তি নিজের নফ্সের উপর অত্যাচার করে যে এমন কাউকে কাছে পেতে চায় যে তার থেকে নিজেকে দূরে রাখে। যে এমন ব্যক্তির সামনে বিনয় প্রদর্শন করে যে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না। এবং যে এমন লোকের প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হয় যে তার সম্পর্কে জানে না।

মুখারিক বলেন, একদা আমি মামুনের সামনে এ কবিতাটি আবৃত্তি করলাম, "আমি এমন বন্ধু চাই চরম হতাশা ও বেদনার সময় যে আমাকে সান্ত্বনা দিবে।" মামুন কবিতাটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে বললেন। আমি সাতবার আবৃত্তি করলাম। তিনি বললেন, মুখারিক! আমার গোটা রাজত্ব নিয়ে নাও, পরিবর্তে আমাকে এ ধরনের একটি বন্ধু এনে দাও।

হুদাবা বিন খালিদ বলেন, একবার আমি মামুনের সাথে খেতে বসলাম। খাওয়া দাওয়া শেষে দসতরখান উঠানের সময় যেসব দানা মাটিতে পড়ে যায় সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগলাম। তা দেখে মামুন বললেন, তোমার কি পেট ভরেনি? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, পেট ভরেছে। কিন্তু হাম্মাদ বিন সালামা-সাবিত বাসফীর বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রা.)-এর একখানা হাদীস আমার নিকট

বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে দসতরখানের নীচে পড়ে থাকা দানা উঠিয়ে খাবে সে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকবে। এ হাদীস শুনে মামুন আমাকে এক হাজার দিরহাম দিলেন।

হাসান বিন আবদাশ সাফার বলেন, মামুন বুরান বিনতে হাসান বিন সাদকে বিয়ে করার সময় লোকেরা হাসানকে অনেক উপহার দেয়। এক ফকীর দু'টি উপহার পাত্র প্রেরণ করে। সে একটিতে লবণ অপরটি পাউডার ভর্তি করে এ মর্মে একখানা পত্র লিখে হাসানের কাছে পাঠায়। আমি এক ফকীরের পক্ষ থেকে এ উপহারটুকু পাঠালাম। ধনাঢ্যদের উপহার সামগ্রীর তালিকায় যেন আমার নাম লিখা না হয়। বরকতের জন্য লবণ এবং সুগন্ধির জন্য পাউডার পাঠালাম। হাসান এ পাত্র দু'টি মামুনের সামনে পেশ করল। তিনি তা পছন্দ করলেন এবং পাত্র দু'টি খালি করে তাকে স্বর্ণমুদ্রা ভরে পাত্র দু'টি ফকীরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সূলী মুহাম্মাদ বিন কাসেম থেকে বর্ণনা করেন, আমি মামুনকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কসম! ক্ষমা করার মধ্যে আমি এমন মজা পাই যে, এটা অনুধাবন করতে পারলে লোকেরা অপরাধ করে এমনিতেই আমার কাছে আসত।

সূলী হুসাইন আল-খলীহ থেকে বর্ণনা করেন, একদা মামুন রেগে আমার ভাতা বন্ধ করে দেন। আমি একটি কবিতা লিখে জনৈক লোকের হাতে মামুনের কাছে পাঠালাম। এতে তার প্রশংসা এবং আমার অর্থ সংকটের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি তা পাঠান্তে বললেন, কবিতাটি সুন্দর হয়েছে। তবে আমার কাছে সে কিছু পাবে না। কারণ সে আমীনের প্রশংসা গাথায় আমার দুর্নাম করেছে। এটা শুনে জনৈক প্রহরী বলল, আমিরুল মুমিনীন! আজ আপনার ক্ষমার প্রবণতা কোথায়? এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার ভাতা চালু করে দিলেন।

হাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, মামুন বাগদাদে এলে যুহর পর্যন্ত আদালতে বসে লোকদের প্রতি ইনসাফ করতেন এবং মজলুমদের ন্যায় বিচার করে দিতেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বলেন, মামুন রশীদের দাবা খেলার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি বলতেন, এ খেলা মেধাকে সতেজ রাখে। তিনি এ খেলার নতুন নতুন দিক উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন, আমি কাউকে নিয়ে খেলতে চাইলে সকলে বাহানা দিত। আসলে তারা ভালো খেলতে জানত না।

হাখাত বলেন, মামুনের বন্ধু বলেন, তার অবয়ব এবং শরীরের রং একই মত। তবে হাঁটুর নীচের দিকের রং ছিল গাঢ় হলুদ বর্ণের।

ইসহাক মোওসূলী বলেন, মামুনের কথা হল– সেই সঙ্গীত উত্তম যে সঙ্গীতের মাধ্যমে মেহেরবানী এবং শিষ্টতার বাণী প্রচারিত হয়।

ইবনে আবু দাউদ বলেন, একবার রোম সম্রাট মামুনের কাছে ১০০ কেজি মেশ্‌ক আম্বর উপঢৌকন হিসেবে পাঠালে তিনি দ্বিগুণ উপঢৌকন পাঠানোর নির্দেশ দানে বললেন, যাতে তারা ইসলামের শানশওকত বুঝতে পারেন। আবু উবাদা বলেন, আমার জানা নেই আল্লাহ তা'আলা মামুনের চেয়ে বেশি দানশীলতা এবং দয়ার্দ্রতার গুণ দিয়ে আর কাউকে সৃষ্টি করেছেন কিনা।

ছুমামা বিন আশরাস বলেন, বাগ্মীতার দিক থেকে আমি জাফর বিন ইয়াহইয়া এবং মামুনের চেয়ে বড় আর কাউকে দেখিনি। সালাফী তওরিয়াত গ্রন্থে হাফয মাদায়েনী থেকে রেওয়ায়েত করেন, জনৈক হাবশী লোক মামুনের কাছে এসে নবুওয়তের দাবী করে বলল, আমি মূসা বিন ইমরান। মামুন বললেন, হযরত মূসা (আ.) হাত দিয়ে ডিম তৈরির মুজিযা দেখিয়েছেন। তুমিও যদি সেই মুজিযা দেখাতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব। লোকটি বলল, মূসা বিন ইমরানের সামনে ফিরাউন বলেছিল,

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰي

(অর্থাৎ আমি তোমাদের বড় রব)। এরপর তিনি মুজিযা দেখিয়েছেন। আপনি সেই দাবী করলে আমি মুজিযা দেখাব। অন্যথায় প্রয়োজন নেই।

মামুন বলতেন, প্রশাসকদের হটকারিতার কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

ইবনে আসাকির ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেন, মামুন প্রতি মঙ্গলবারে ফিকাহ শাস্ত্র নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য আলেমদের নিয়ে মজলিস করতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি একটি কাপড় পরে জুতা হাতে নিয়ে মজলিসের এক কোণে এসে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ মজলিস কি উম্মতের ইজতেমার জন্য না বিজয় গাঁথা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বের করার মজলিস? মামুন সালামের জবাব দিয়ে বললেন, প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টার জন্য নয়; বরং এ মজলিস এ জন্য যে, প্রথমে মুসলিম উম্মাহর কাজের দায়িত্ব আমার ভাইয়ের উপর ছিল। অতঃপর আমার এবং আমার ভাইয়ের মাঝে বিবাদ হওয়ায় এ দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। ইজতেমায় আমি মুসলমানদের মতামতের মোহতাজ। যাতে তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। তাদের ধারণা খিলাফত আমার হাত থেকে চলে গেলে ইসলামের ভিত্তি ধসে যাবে, মুসলমানদের কাজ গড়বড় হয়ে পড়বে, এতে বিভাদের সৃষ্টি হবে, জিহাদ ভ্রান্ত হয়ে যাবে, হজ্বের কাজ হবে না, সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে সাবধানতার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি। যাতে মুসলমানদের মধ্যে খিলাফতের বিষয়ে একজনকে রাজি করে তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আমি পৃথক হয়ে যাব। এরপর সে লোকটি সালাম দিয়ে চলে গেল।

মুহাম্মাদ বিন মুর্নযির আল-কিন্দী বলেন, একদা হারুন রশীদ হজ্জ করার পর কুফায় এসে সকল মুহাদ্দিসের আহ্বান করেন। আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস এবং ঈসা বিন ইউনুস ছাড়া সকলেই এসে উপস্থিত হন। হারুন তাদের ডেকে আনার জন্য আমীন এবং মামুনকে পাঠালেন। ইবনে ইদরীস তাদের দু'জনের সামনে একশ' হাদীস পাঠ করেন। হাদীস পড়া হলে মামুন বললেন, অনুমতি পেলে সবেমাত্র পাঠকৃত আপনার সকল হাদীস আমি মুখস্থ শুনিয়ে দেব। তিনি বললেন, শোনাও তো দেখি। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হুবহু হাদীসগুলো শুনিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস মামুনের প্রখর মুখস্থ শক্তি দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে গ্রীক দর্শনের অনেক প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থাদি মামুনের হস্তগত ছিল। যাহাবী সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দিয়েছেন।

ফাকেহী বলেন, মামুন সর্বপ্রথম কাবা শরীফকে সাদা রেশমের চাদর দ্বারা আচ্ছাদন করেন। খলীফা নাসেরের যুগ পর্যন্ত শ্বেত রেশম গেলাফের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ সবক্তগীন তার শাসনামলে হলুদ রেশমের গেলাফে কাবা শরীফ আচ্ছাদন করেন।

মামুনের বাণীগুলো হচ্ছে– লোকদের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে গবেষণা করার মধ্যে যতটুকু লাভ রয়েছে, জীবনী আলোচনায় ততটুকু নেই। দ্বিতীয় বাণী– যখন কোন বিপদ এসে যায় তখন এ বিপদ থেকে কেটে উঠা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তৃতীয় বাণী-সবচেয়ে ভালো মজলিস হচ্ছে যেখানে লোকেরা মানুষদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। মানুষ তিন ধরনের। এক. পেটুক, যে সর্বদা খায়, দুই. অসুস্থ, যাকে সবসময় ঔষধ খেতে হয়, এবং তিন. সেই অসুস্থ লোক যার অবস্থা সর্বদা অপ্রীতিকর।

মামুন বর্ণনা করেন, আমি এক ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে নিরুত্তর হইনি। একদা সে কুফাবাসীকে নিয়ে এসে কুফার প্রশাসকের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করল। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। তিনি তো বড় ইনসাফগার লোক। সে বলল, আমিরুল মুমিনীন সত্য বলেছেন। আর আমি মিথ্যা বলেছি। তবে এ শাসককে কেন আমাদের জন্যই শুধু নির্দিষ্ট করেছেন। কেন তাকে অন্য শহরে স্থানান্তর করছেন না? যাতে সে শহরটিকে তিনি ইনসাফে ভরে দিতে পারেন। যেমন আমাদেরকে ন্যায় বিচারেও সৎ শাসনে ভরে দিয়েছেন। আমি অবশেষে অপারগ হয়ে বললাম, তোমরা যাও। আমি তাকে পৃথক করে দিব।

মামুনের অনেক কবিতা রয়েছে। তিনি দাবা খেলার প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন।

মামুন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

বায়হাকী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ হাকেম থেকে শুনেছি। তিনি আবু আহমদ সায়রাফী এবং তিনি জাফর বিন আবু উসমান তায়ালাসী থেকে বর্ণনা করেন, আমি (জাফর বিন আবু উসমান) আরাফার দিন মামুনের পেছনে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। সালাম ফিরে লোকেরা তাকবীর পাঠ করতে লাগল। আমি মামুনকে দেখলাম। তিনি বললেন, চুপ কর। হযরত আবুল কাসেম (সা.)-এর সুন্নত হল আগামীকাল তাকবীর বলা। (রাবী বলেন) ঈদুল আযহার দিন আমি নামায পড়তে গেলাম। মামুন মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা দিলেন। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ
بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

আমি হাশিম বিন বাশীর থেকে বর্ণনা করছি। তিনি ইবনে শবরমা থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি বারা বিন আযেব থেকে, তিনি আবু বুরদা বিন দিনার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-থেকে রেওয়ায়েত করেন। নবী আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ঈদুল আযহার নামাযের আগে কুরবানী করবে সে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে পারবে। আর যে ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী করবে সে সুন্নতের পথ ধরে পৌঁছে যাবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ
بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

হে পৃথিবীর প্রতিপালক! আমাকে যোগ্যতা দাও।

হাকিম বলেন, আমি এ হাদীসখানা আবু আহমদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে লিপিবদ্ধ করিনি। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নির্ভরযোগ্য। আমার মনে তার প্রতি কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু আমি আবুল হাসান এবং দারা কুতনীকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, আমাদের দৃষ্টিতে জাফরও বিশুদ্ধ। আমি বললাম, শায়খ আবু আহমদ? বললেন, আমি উযীর আবুল ফজল জাফর বিন ফরাত থেকে, তিনি আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রুদবারী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক তারিখী থেকে রেওয়ায়েত করেন। তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর বললেন, আমার থেকে হযরত তায়ালাসী হাদীস বয়ান করেছেন এবং তার থেকে ইয়াহইয়া বিন মুঈন। তিনি বলেন, মামুন খুতবায় এ হাদীসটি পড়েন।

সূলী বলেন, আমার কাছে হযরত তায়ালাসী ইয়াহইয়া বিন মুঈনের বরাত দিয়ে বয়ান করেন, বাগদাদে আরাফার দিন, সেদিন শুক্রবার ছিল মামুন খুতবা দেন। সালাম ফেরানোর পর লোকেরা তাকবীর দেয়। মামুন তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং লাফ দিয়ে মেহরাবের লাঠি হাতে নিয়ে বললেন, এটা কিসের আওয়াজ? অসময়ে কেন তাকবীর দিচ্ছ? আমাকে হাশিম বিন বশীর, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) জমরাতুল উকবা পর্যন্ত তালবীয়া পাঠ করতেন। আর দ্বিতীয় দিন যুহর পর্যন্ত তালবীয়া এবং তাকবীর বলতেন।

সূলী বলেন, আবুল কাসেম– আহমদ বিন ইবরাহীম মওসূলীর বরাত দিয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি মামুনের কাছে এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বালবাচ্চা। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে তার সৃষ্ট বালবাচ্চাদের উপকার করবে। মামুন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, চুপ কর আমি হাদীসের দিক থেকে তোমার চেয়ে বড় আলেম। আমার নিকট ইউসুফ বিন আতীয়া সাফায়ী বর্ণনা করেন। তিনি সাবিত থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বালবাচ্চা, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তার বালবাচ্চাদের উপকার করে।

ইবনে আসাকিরও এ হাদীসটি অভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা আবু ইয়ালা মওসূলী স্বরচিত মসনদ গ্রন্থে ইউসুফ বিন আতীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সূলী বলেন, মাসীহ বিন হাতিম আল-আকলী আমার কাছে বর্ণনা করেন, আব্দুল জব্বার বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি মামুনের খুতবা শুনেছি। তিনি লজ্জার উপর বয়ান রাখছিলেন। তিনি এর অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বললেন, হাশিম আমার নিকট বয়ান করেন। তিনি মানসুর থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু বকরাহ থেকে, তিনি ইমরান বিন হুসাইন থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লজ্জা হল ঈমান, আর ঈমান হল জান্নাত, বেলজ্জা হল বাড়াবাড়ি, আর বাড়াবাড়ি হল জাহান্নাম। ইবনে আসাকির এটি ইয়াহইয়া বিন আকতাম আল মামুন থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন তামীম ইয়াহইয়া বিন আকতামের

বয়াত দিয়ে বলেন, একদিন মামুন আমাকে বললেন, ইয়াহইয়া! আমার মন চাইছে যে, আমি হাদীস বর্ণনা করব। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীনের চেয়ে এ কাজ করার বেশি হকদার আর কে আছে? তিনি মিম্বর আনতে বললেন, মিম্বর আনা হল। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। সর্বপ্রথম এ হাদীসটি তিনি বয়ান করেন। বলেন, হাশিম আমাকে, তিনি আবুল জাহাম থেকে, তিনি যহরী থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জাহান্নামে ইমরাউল কায়েস কবিদের পতাকাবাহী হবে। অতঃপর তিনি আরো তিনটি হাদীস বর্ণনা করার পর মিম্বর থেকে নেমে এসে আমাকে বললেন, ইয়াহইয়া! আমার এ মজলিসটি কেমন লাগল? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আপনার মজলিসটি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন, তোমার কসম, এ মজলিসে লোকদের মাঝে কোন মিষ্টতা ছিল না। এ মজলিস তালিযুক্ত কাপড় পরিহিতদের মজলিস ছিল। যারা কলম কালি নিয়ে এসেছিল।

খতীব বলেন, আবুল হাসান আলী বিন কাসেম আমার নিকট ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী থেকে বর্ণনা করেন, মামুন মিসর জয় করলে জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, সেই প্রতিপালকের শোকর, যিনি হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দুশমনদের পরাজিত করেছেন এবং ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরবাসীকে আপনার অনুগত করে দিয়েছেন। সাবাশ! আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচার সন্তান। মামুন বললেন, এখনও আমার একটি অভিপ্রায় বাকী থেকে গেছে, আর তা হল– আমি একই সভায় বসে ইয়াহইয়ার মত বরেণ্য মুহাদ্দিসদের সাথে মতবিনিময় করব, তারা বলবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট– এ বিষয়ে আপনি কি বর্ণনা করতে পারেন? আমি বলব, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামা এবং হাম্মাদ বিন যায়েদ। তারা সাবিত বানানী থেকে, তিনি আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেন, যে দু'সন্তান অথবা এর চেয়ে বেশি সন্তান লালন পালন করবে, তারা তার সামনে লালিত পালিত হবে এবং তার সামনে মারা যাবে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে এভাবে থাকবে– এ কথা বলে তিনি (সা.) দু'টি আঙুল ফাঁক করে দেখালেন।

খতীব বলেন, এ রেওয়ায়েতটি ভুল। আর ভুলটি হল মামুন হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ মামুন ১৭০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর হাম্মাদ বিন সালামা ১৬৭ হিজরীতে এবং হাম্মাদ বিন যায়েদ ১৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হাকিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন ইসমাঈল আমার নিকট মুহাম্মাদ বিন সহল বিন আসকার থেকে বর্ণনা করেন, একদিন মামুন আযান দেবার জন্য

দাঁড়ালেন। আমরাও তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে এক মুসাফির যার হাতে কালির দোয়াত ছিল এসে বলল, আমিরুল মুমিনীন! আমি মুহাদ্দিস। মামুন বললেন, তুমি একি বলছ? তোমার অমুক অধ্যায়টি স্মরণ আছে? এরপর মামুন হাদীস বয়ান করতে শুরু করলেন। পরিশেষে মামুন লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা তিনদিন হাদীস পড়ে মুহাদ্দিস বলতে লেগেছ।

ইবনে আসাকির বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইয়াহইয়া বিন আকতাম থেকে বর্ণনা করেন, আমি একদিন রাতে মামুনের পার্শ্বে শুয়ে ছিলাম। গভীর রাতে পিপাসার কারণে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করলাম। মামুন বললেন, ইয়াহইয়া! কি হয়েছে? আমি বললাম, পিপাসা লেগেছে। এ কথা শুনে তিনি এক গ্লাস পানি এনে আমাকে পান করালেন। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি খাদেমকেও ডাকলেন না, কোন গোলামকেও জাগালেন না। তিনি বললেন, আমাকে আমার বাবা, তিনি আমার দাদা থেকে তিনি উকবা বিন আমের থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কাওমের সরদার হবেন তার খাদেম।

খতীব এ রেওয়ায়েতটি মামুনের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট হারুন রশীদ, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কাওমের সরদার হবেন তার খাদেম।

ইবনে আসাকির আবু হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেন, আমি মামুনের থেকে শুনেছি, তিনি আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমার বাবা আমাকে, তিনি আমার দাদা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। নবী আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, কাওমের গোলাম এ কাওমের মধ্য থেকেই হবে।

মুহাম্মাদ বিন কাদামা বলেন, যখন মামুন এ সংবাদ পেলেন যে, আমার থেকে আবু হুযায়ফা এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন, তখন তিনি আবু হুযায়ফাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিলেন।

মামুনের যুগে ২০০ হিজরীতে আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী বনূ আব্বাসের জনসংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার।

মামুনের যুগে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– সুফিয়ান বিন আয়নাহ, হযরত ইমাম শাফী (র.), আঃ রহমান বিন মাহদী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাতান, ইউনুস বাকের (মাগাযীর বর্ণনাকারী), হযরত ইমাম আবু হানীফা

(র.)-এর ছাত্র আবু মতীহ বলখী, দানশীল মারুফ কারখী, আল-মুবতাদা গ্রন্থের লেখক ইসহাক বিন বশীর, ইমাম মালিক (র.)-এ গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র এবং মিসরের কাযী ইসহাক বিন ফরাত, আবু উমর শিবানী, ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র আললাগবী আশহাব, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ছাত্র হাসান বিন যীয়াদ লুলুয়ী, হাম্মাদ বিন উসামা, হাফেজ রুহ বিন উবাদা, যায়েদ বিন হিব্বান, আবু দাউদ তায়ালাসী, গাযী বিন কায়েস– ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র, প্রসিদ্ধ দানশীল আবু সুলায়মান দারানী, আলী রেযা বিন মূসা কাযেম, আরবের ইমাম ফারা, কায়তাবা বিন মিহরান, নাহুবিদ কতরব, ওয়াকেদী, আবু উবায়দা, মুআম্মার বিন মুছনা, নযর বিন শামীল, সাইয়্যেদা নফীসা, কুফী নাহুবিদ হিশাম, ইয়াযিদী, ইয়াযিদ বিন হারুন, বসরার কাযী ইয়াকুব বিন ইসহাক হাযরামী, আঃ রাজ্জাক, আবুল আতাহীয়া, আবু আসেম, আঃ মালিক বিন মাজশুন, আব্দুল্লাহ বিন হাকাম, আবু যায়েদ আনসারী, আসমায়ী প্রমুখ।

আল-মুতাসিম বিল্লাহ

আল-মুতাসিম আবু ইসহাক মুহাম্মাদ বিন হারুন রশীদ ১৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহাবীর মতে ১৭৮ হিজরীর শাবান মাসে ভূমিষ্ঠ হন। সূলী বলেন, মারদাহ নামক জননীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি কূফায় জন্ম নেন। তিনি ছিলেন বাঁদি। হারুনের কাছে মারদাহ ছিলেন অধিক প্রিয়।

মুতাসিম স্বীয় পিতা এবং মামুনের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার থেকে ইসহাক মওসূলী, হামদুন বিন ইসমাঈল প্রমুখ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বড় বীর বাহাদুর, শক্তিধর এবং সাহসী ছিলেন। তবে লেখাপড়া জানতেন না।

সূলী বলেন, লেখাপড়া বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সর্বদা মুতাসিমের সাথে একজন লোক থাকত। লোকটির মৃত্যুর পর হারুন মুতাসিমকে বললেন, এখন তো তোমার গোলাম মারা গেছে। তিনি বললেন, জ্বি হযরত! মৃত্যু তাকে লেখাপড়া থেকে অবকাশ দিয়েছে। হারুন বললেন, পড়ালেখা তোমার খুব তেঁতো লাগে। অতএব তুমি তা বর্জন কর এবং পড়ো না।

কথিত আছে, এরপর থেকে তিনি অল্প অল্প করে লেখাপড়া করতে থাকেন। যাহাবী বলেন, মুতাসিম যদি খলকে কুরআন সংক্রান্ত বিষয়ে ওলামাদের বেতন-ভাতা সংকোচিত না করতেন তাহলে তিনি হতেন সবচেয়ে বড় প্রতাপান্বিত খলীফা।

সূলী বলেন, মুতাসিমের অনেক গুণাবলী রয়েছে। তার জীবনের সাথে

গাণিতিক 'আট' শব্দটি সংযুক্ত থাকায় তাকে 'মুছাম্মিন'ও বলা হত। তিনি বনূ আব্বাসের অষ্টম খলীফা। হযরত আব্বাসের অষ্টম ঔরসজাত তিনি। হারুন রশীদের অষ্টম সন্তান। আট বছর, আট মাস, আট দিন রাজত্ব করেন। ১৭৮ হিজরীতে জন্ম এবং ২১৮ হিজরীতে মৃত্যু হয়। ৪১ বছর জীবিত ছিলেন। আটটি যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। আটজন শত্রুকে নিধন করেন। আটজন পুত্র সন্তান এবং আটজন কন্যা সন্তান রেখে যান, তার আটটি চূড়া ছিল। রবিউল আউয়াল মাসের আট দিন বাকী থাকতেই মুতাসিম মৃত্যুর মুখে পতিত হন।

তার অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী এবং কবিতা রয়েছে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লে আর কাউকে হত্যা করতেন না। ইবনে আবু দাউদ বলেন, মুতাসিম হাতের কবজি আমার পানে প্রসারিত করে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার কবজি কাটো, আর তিনি বলছিলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। জোরে কাটো। আমি দেখলাম তার কবজিতে বর্শার আগাতও বসল না। শুধু দাগ পড়েছে।

নাকতুয়া বলেন, মুতাসিম অনেক শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মানুষের হাতের হাড় দু'আঙ্গলের চাপে ভেঙে ফেলতে পারতেন। বর্ণিত আছে, খলীফাদের মধ্যে মুতাসিম সর্বপ্রথম তুর্কীদের দাপ্তরিক কাজে নিয়োগ করেন এবং তিনি অনারব বাদশাহদের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তার পরিত্যক্ত গোলামের সংখ্যা দশ হাজারেও বেশি।

ইবনে ইউনুস বলেন, কবি দা'বল মুতাসিমের কুৎসা ও অপবাদসূচক কবিতা রচনার প্রেক্ষিতে তার ভয়ে মিসর পালিয়ে যায়। অতঃপর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে পলায়ন করে।

মামুনের পর ২১৮ হিজরীতে তিনি বাইআত নেন। তিনি মামুনের পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। তিনি স্বীয় জীবনে খলকে কুরআন সংক্রান্ত মাসয়ালাটির পরীক্ষা নেন। তিনি সকল উল্লেখযোগ্য শহরের প্রত্যেক শিক্ষককে ছাত্রদের এ মাসয়ালা শিক্ষা দেবার নির্দেশ দান করেন। তিনি এ মাসয়ালার কারণে লোকদের অনেক কষ্ট দেন এবং অধিকাংশ ওলামাকে হত্যা করেন। ২২০ হিজরীতে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-কে প্রহার করা হয়।

২২০ হিজরীতে মুতাসিম খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ থেকে সুরমন রায়-এ স্থানান্তর করেন। এ স্থানান্তরের কারণ হলো– তিনি সমরকন্দ, ফারগানাহ প্রভৃতি থেকে তুর্কীদের সংগ্রহ করে তাদের পেছনে অনেক খরচ করেন। স্বর্ণের মালা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। রেশমের কাপড় পরানো হয়। তারা অশ্বারোহণে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে ঘুরে জনগণের অসুবিধার সৃষ্টি করত। ফলে বাগদাদবাসী

এসে মুতাসিমকে বলল, আপনি তাদের নিষেধ না করলে আমরা তাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। মুতাসিম বললেন, কিভাবে এবং কোন হাতিয়ার দিয়ে লড়বে? তারা বলল, তীর দ্বারা। তিনি বললেন, তীরের মোকাবিলা করা আমার শক্তি নেই। অতঃপর তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন।

২২৩ হিজরীতে মুতাসিম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের তীব্রতা সকল বাদশাহর আক্রমণ অপেক্ষা অধিক তীব্রতর। এ আক্রমণে রোমানরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোমানরা এবং তাদের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। উমরিয়া তরবারীর জোরে বিজিত হয়। এ যুদ্ধে ত্রিশ হাজার রোমান সমাধিস্থ হয় এবং সমসংখ্যক বন্দী হয়। কথিত আছে, যে সময় মুতাসিম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন সে সময় জ্যোতিষীরা মুতাসিমকে বলেছিল, এ যুদ্ধে আপনি পরাজিত হবেন। কিন্তু তিনি বিজিত হন। এ জন্য কবি আবু তামাম জ্যোতিষিদের বাণীকে ব্যঙ্গ করে তার এ কাব্যটি রচনা করেন, "সে বাণী আজ কোথায়! কোথায় জ্যোতিষির দল! যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।"

২২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের বৃহস্পতিবারে পরলোক গমন করেন, যখন তার শত্রুরা লুণ্ঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়।

কথিত আছে, তিনি মৃত্যুর সময় এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

তিনি অন্তিম মুহূর্তে বলেন, সকল আক্রমণের পরিসমাপ্তি হবে, কোন আক্রমণই অনন্তকাল চলবে না। কেউ কেউ বলেন, তিনি শেষ সময় এ কথা বলেছিলেন, আমাকে এ সৃষ্টি জগত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারো মতে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি আপনাকে নয়; বরং নিজেই নিজেকে ভয় পাচ্ছি এবং আপনার কাছে রহমতের আশা করছি, নিজের কাছে নয়।

মুতাসিম ক্রমাগত পশ্চিম দিকে এতটুকু অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, যে রাজ্য-গুলো বনূ উমাইয়্যা বিজয়ের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল অথচ সেগুলো বনূ আব্বাসের অধীনে ছিল না সেগুলো জয় করার।

সূলী আহমদ বিন খাসীব থেকে বর্ণনা করেন, একদা মুতাসিম আমাকে বলেন, বনূ উমাইয়্যার শাসনকালে আমরা কেউ বাদশাহ ছিলাম না। অথচ আমাদের শাসনকালে স্পেন তাদের শাসনাধীন। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে কি পরিমাণ অস্ত্র লাগতে পারে? অতঃপর তিনি স্পেন আক্রমণের জন্য সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে

লাগেন। ইতোমধ্যেই মৃত্যুর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তার অসুস্থতা বেড়ে যায়।

সূলী বলেন, আমি মুগীরা বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, মুতাসিমের দরজায় যত শাহানশাহ উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি যতগুলো বিজয় অর্জন করেছেন কোন বাদশাহর যুগে তা হয়নি। আযারবাইজান, তাবরিস্তান, সীসতান, আশয়াসা, ফারগানা, তখারিস্তান, সিফাহ এবং কাবেলের রাজাদের বন্দী করে তার দরবারে হাযির করা হয়। সূলী বলেন , তার আংটিতে এ লিখাটি অঙ্কিত ছিল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ

ইবরাহীম বিন আব্বাস বলেন, মুতাসিম সাহিত্যপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতেন। তিনিই প্রথম বাদশাহ যার রান্নাঘরে সর্বদা পাকশাক হত এবং দৈনন্দিন এ বাবদ এক হাজার দিনার খরচ হত। আবুল আলীয়া বলেন, মুতাসিম বলতেন, খায়েশ ও লোভকে জয় করতে পারলে আবেগ পরাজিত হবে। ইসহাক বলেন, তিনি বলতেন, যে নিজের সম্পদ এবং জ্ঞান দ্বারা সত্যকে তালাশ করবে সে অবশ্যই সত্যের সন্ধান পাবে।

মুহাম্মাদ বিন আমর রুমী বলেন, মুতাসিমের 'আজিব' নামক এক গোলাম ছিল। সে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তার প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি জান যে, আমি আমার ভাইদের চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানি। কারণ আমিরুল মুমিনীন হারুন রশীদ আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। ফলে খেলাধুলা প্রিয় ছিলাম। কেউ পড়ালেখার কথা বললে আমি তা শুনতাম না। এরপরও আমি আজিব গোলামকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি, যা আমি আবৃত্তি করব আর তুমি শুনে তোমার মতামত জানাবে। যদি ভালো হয় তবে তা প্রচার করব। আর খারাপ হলে তা ছুঁড়ে ফেলব। অতঃপর তিনি একখানা চমৎকার কবিতা পাঠ করলেন। আমি তার খিলাফতের কসম করে বললাম, অকবি খলীফাদের মধ্যে এ কবিতা অনন্য। তিনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিলেন।

সূলী বলেন, আব্দুল ওহেদ বিন আল-আব্বাসী আল-রিয়াশী বলেছেন, একদা রোম সম্রাট হুমকি দিয়ে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। মুতাসিম পত্র পাঠান্তে ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, লিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমি তোমার পত্র পড়েছি। এর জবাব নিজ চোখেই দেখতে পাবে, শোনার প্রয়োজন নেই। কাফেরের দল অচিরেই জানতে পারবে তোদের ঠিকানা কোথায়।

মুতাসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

সূলী বলেন, আমি আলায়ী থেকে তিনি আব্দুল মালিক বিন যহাক থেকে তিনি হিশাম বিন মুহাম্মাদ থেকে তিনি মুতাসিম থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা হারুন রশীদ থেকে, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মানসুরের দাদা থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-অমুকের সন্তানকে যেতে দেখে রাগত চেহারা নিয়ে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন–

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ

লোকেরা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটা কোন বৃক্ষ? আমাদের বলুন। আমরা তা থেকে নিজেকে দূরে রাখব। তিনি (সা.) বললেন, সেই বৃক্ষ থেকে বনূ উমাইয়্যা উদ্দেশ্য। যখন তারা বাদশাহ হবে অত্যাচার করবে। আমানতের খিয়ানত করবে। অতঃপর স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর পেটে হাত রেখে বললেন, চাচা! আল্লাহ তা'আলা আপনার ঔরসে এমন এক সন্তানের জন্ম দিবেন যার হাতে বনূ উমাইয়্যা ধ্বংস হবে। গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসটি মওজু। কারণ রাবীদের মধ্যে হযরত আলায়ী কলঙ্কিত।

ইবনে আসাকির বলেন, কাসিমের বাবা আলী বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেন, একদা ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন মাআয মুতাসিমকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। গিয়ে তিনি তাকে বলেন, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করবেন। মুতাসিম বললেন, এটা কি করে হবে– আমি আমার পিতা হারুন রশীদ থেকে শুনেছি, তিনি তার পিতা মাহদী থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি হযরত আব্বাস (রা.) রেওয়ায়েত করেন, যে বৃহস্পতিবারে টিকা দিবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং সেদিনই সে মারা যাবে।

তার শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– ইমাম বুখারীর শিক্ষক হযরত হুমায়দী আবু নাঈম, আল ফজল বিন ওকীল, আবু আসান আল-হিন্দী, কালূন আল-মাকরী, খুলাদ মাকরী, আদম বিন আবু আয়াস, আফফান, কাবানী, আব্দান আল-মুরুযী, আব্দুল্লাহ বিন সালেহ, ইবরাহীম বিন মাহদী, সুলায়মান বিন হরব, আলী বিন মুহাম্মাদ মাদায়েনী, আবু উবায়েদ, কাসেম বিন সালাম, কুররাহ বিন হাবীব, মুহাম্মাদ বিন ঈসা, আসবাগ বিন ফারাজ, আবু উমর মুহাম্মাদ বিন সালাম, সানীদ, সাঈদ বিন কাসীর বিন আফীর, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী প্রমুখ।

আল-ওয়াছেক বিল্লাহ

আল-ওয়াছেক বিল্লাহ হারুন আবু জাফর ভিন্ন মতে আবুল কাসিম বিন মুতাসিম বিন রশীদ ১৯৬ হিজরীর শাবান মাসের ২০ তারিখে কারাতীস নামক রোমান জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার জননী ছিলেন বাঁদি। পিতার খিলাফত কালে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হন। ২২৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখে তখতে আরোহণ করেন। ২২৮ হিজরীতে তিনি আশনাস নামক তুর্কী এক লোককে সাম্রাজ্যের নায়েব মনোনীত করেন। নায়েব জওহর খচিত মুকুট পরতেন। আমার (গ্রন্থকারের) মতে তিনি প্রথম বাদশাহ যিনি সর্বপ্রথম নায়েব মনোনীত করেন। তাছাড়া তার পিতার শাসনামল থেকেই প্রশাসনিক কাজে তুর্কীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২৩১ হিজরীতে বসরার গভর্নরের নিকট একটি পত্র পাঠিয়ে মামুন এবং মুয়াজ্জিনদের খলকে কুরআনের বিষয়ে পরীক্ষা নেন। তিনি তার পিতার অনুসরণ করতেন। অবশেষে এ বিতর্কিত মাসয়ালা থেকে তাওবা করে সরে আসেন।

২৩১ হিজরীতে তিন আহমদ বিন আল-মুনযার খাজায়ীকে যিনি আহলে হাদীস এবং সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী ও অসৎ কাজে বাধা দানকারী তাকে হত্যা করেন। ঘটনাটি এরূপ– বাগদাদ থেকে সমরাহ পর্যন্ত আহমদকে বন্দী করে এনে খলকে কুরআন সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কুরআন শরীফ মাখলুক নয়। কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দিদার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রেওয়ায়েত দ্বারা দিদারের কথা প্রমাণিত। তিনি একখানা হাদীসও শোনালেন। ওয়াছেক বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আহমদ বললেন, আপনিই মিথ্যাবাদী। তিনি বললেন, আফসোস! তুমি আল্লাহ তা'আলাকে সীমাবদ্ধ, শরীরবিশিষ্ট এক স্থানে বন্দী এবং চর্ম চোখে তাকে অবলোকন করার কথা ভাবছ। অথচ তা স্পষ্ট কুফর। সে সময় ওয়াছেকের পার্শ্বে এক দল মুতাযিলা মুফতী বসেছিলেন। তারা আহমদকে হত্যার ফতোয়া দেন। ওয়াছেক তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। আহমদকে চামড়ার গালিচায় বসিয়ে দেয়া হল। অতঃপর তিনি তাকে শহীদ করে দেন। এরপর তার কর্তিত মস্তক বাগদাদের অলিতে গলিতে ঘোরায়ে এক স্থানে লটকিয়ে দেবার এবং মৃত দেহখানা সররমন রায় শহরে শূলেতে ঝুলে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। তাকে তাই করা হয়েছিল এবং তার শাসনামলে তাকে এভাবেই রাখা হয়। মুতাওয়াক্কিল বাদশাহ হওয়ার পর তার লাশ সমাহিত করেন।

আহমদকে শূলেতে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় লাশ পাহারার জন্য একজন পুলিশ নিয়োগ করা হয়। নির্দেশ মোতাবেক পুলিশ বর্শা দ্বারা তার মুখ কেবলা দিক থেকে

ফিরিয়ে দিত। এ পুলিশ বলে, একদিন তিনি কেবলামুখি হয়ে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করেন। এ ঘটনাটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত রয়েছে।

২৩১ হিজরীতে রোম থেকে এক হাজার ছয় শ' মুসলমান কয়েদী মুক্তি পায়। ইবনে দাউদ বলেন, এদের মধ্যে যারা খলকে কুরআনের পক্ষে তাদেরকে দু'দিনার দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। আর যারা পক্ষে না তাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

খতীব বলেন, আহমদ বিন দাউদ ওয়াছেককে খলকে কুরআনের মাসয়ালা বুঝাত এবং এর প্রতি লোকদের দাওয়াত দিত। মৃত্যুর অগে সেও এ আকীদা থেকে ফিরে আসে। কথিত আছে, একদা জনৈক ব্যক্তিকে ওয়াছেকের নিকট ধরে নিয়ে আসা হয়। সে সময় ওয়াছেকের কাছে ইবনে দাউদও ছিল। লোকটি ইবনে দাউদকে বলল, তোমরা যে মাসয়ালার প্রতি লোকদের আহ্বান করছ তা কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জানা ছিল না? যদি জানা থাকে তবে কেন তিনি এদিকে লোকদের আহ্বান করেননি? ইবনে দাউদ বললেন, জানা ছিল। বন্দী লোকটি বলল, জানা থাকার পরও তিনি তা করেননি। অথচ তোমরা তা করছ। একথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর হাসতে হাসতে অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি বারবার বলতে থাকেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বিষয়টিকে অবৈধ বলেছেন, আমরা তাকে বৈধ বলে বসে আছি। তিনি লোকটিকে তিন শ' দিনার দিয়ে মুক্ত করে দেবার নির্দেশ দেন এবং ইবনে দাউদের প্রতি রুষ্ট হন। কথিত আছে, লোকটি আঃ রহমান, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আযদী, আবু দাউদ এবং নাসায়ীর উস্তাদ।

ইবনে আবী দুনিয়া বলেন, ওয়াছেকের বর্ণ লালচে, দাড়ি সুন্দর এবং চোখে একটি বিন্দু সদৃশ্য চিহ্ন ছিল।

ইয়াহইয়া বিন আকতাম বলেন, তিনি হযরত আলীর পরিবারের সাথে যত সুন্দর আচরণ করেছেন ততটুকু আর কেউ করেনি। কথিত আছে, ওয়াছেক উঁচু মাপের আরবী সাহিত্যিক এবং কবি ছিলেন। উপহারস্বরূপ একজন গোলামকে মিসর থেকে তার কাছে পাঠানো হয়। তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একদিন তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগ করেন। ইত্যবসরে তিনি শুনতে পেলেন, সে আরেক গোলামকে বলছে, আল্লাহর কসম! কালই ওয়াছেক আমার সাথে কথা বলতে চাইবেন। কিন্তু আমি বলব না। একথা শুনে তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- "ওহে! আমার কষ্টকে নিয়ে তুমি গর্ব করছ? তুমি এক জালেম গোলাম হয়ে এসেছ। যদি ভালোবাসা না থাকত আভিজাত্যপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলতাম। যদি এ প্রেমের বাঁধন মুক্ত হও তবে দেখবে।" এ কবিতাটি সাহিত্যের রসে পূর্ণ।

সূলী বলেন, ইলমে আদব (সাহিত্য) এবং ফজিলতের দৃষ্টিকোণ থেকে মামুন

তার চেয়েও ছোট। মামুন তাকে সম্মান করতেন এবং তার ছেলের উপর তাকে প্রাধান্য দিতেন। ওয়াছেক তৎকালীন যুগের বড় আলেম এবং উঁচু মাপের কবি ছিলেন। তিনি খলীফাদের মধ্যে সুর সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন।

ফজল ইয়াযেদী বলেন, বনূ আব্বাসের মধ্যে তিনি মামুনের চেয়েও বড় মাপের কবি। আসল কথা হল, মামুন ইলমে আদবের পাশাপাশি সূচনা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। আর ওয়াছেক শুধু সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষ।

ইবনে ফাহাম বলেন, তার দস্তরখানটি ছিল স্বর্ণের। এর চারটি পাট ছিল। প্রতিটি পাট বহনের জন্য বিশজন লোকের প্রয়োজন হত। এ দস্তরখানের পেয়ালা, গ্লাস, বাটি সবই ছিল স্বর্ণের। একদিন ইবনে দাউদ তাকে বলল, স্বর্ণের জিনিস ব্যবহার করা নিষেধ। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলো ভেঙে বাইতুল মালে জমা দেবার নির্দেশ দেন।

হুসাইন বিন ইয়াহইয়া বলেন, একদা ওয়াছেক স্বপ্নে দেখেন, তিনি আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছেন। সে সময় জনৈক ব্যক্তি বলছে, যার অন্তর মুররত নয় আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করবেন না। সকলে তিনি সভাসদের নিকট মুররতের ব্যাখ্যা চাইলেন। কেউ তা পারল না। আবু মুহলিমকে ডাকা হল। তিনি বললেন, মুররত চাটিয়াল ময়দান বা মরুভূমিকে বলা হয়, যেখানে ঘাস জন্মায় না। অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান রয়েছে তিনি তাকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর ওয়াছেক মুররত শব্দযুক্ত একটি কবিতা পড়লেন। আর আবু মুলহিম অভিন্ন অর্থবোধক মুররত শব্দযুক্ত একটি কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করলেন। এ জন্য তিনি তাকে এক লাখ দিনার পুরস্কার দিলেন।

হামদুন বিন ইসমাঈল বলেন, খলীফাদের মধ্যে ওয়াছেক কষ্টের প্রতি এবং বিরোধীদের ক্ষেত্রে বেশি ধৈর্যশীল। আহমদ বিন হামদুন বলেন, একদিন তার উস্তাদ হারুন বিন যিয়াদ তার কাছে এলে তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করলেন। তা দেখে লোকেরা হারুনের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইনি সর্বপ্রথম আমার মুখে আল্লাহর যিকির তুলে দিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহর রহমত-এ সমর্পণ করেছেন।

তিনি ২৩২ হিজরীর যিলহজ মাসের ২৪ তারিখে সরমন রায়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, (অর্থ) "সকল সৃষ্টি মৃত্যুর আওতাধীন। মৃত্যু বাদশাহ-ফকীর কাউকে ছাড়বে না তার মৃত্যুর পর মুতাওয়াক্কিলের বাইআত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার লাশ নির্জনে পড়ে থাকায় বাজপাখি এসে লাশের চোখ তুলে নিয়ে যায়।

তার শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন– মাসহাদ, খলফ বিন হিশাম, বায়যার মাকরী, ইসমাঈল বিন সাঈদ, ওকেদীর লেখক মুহাম্মাদ বিন সাদ, ইমাম শাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ বিন আরাবী, আলী বিন মুগীরা প্রমুখ।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ

আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জাফর আবুল ফজল বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২০৬ হিজরী অথবা ২০৭ হিজরীতে শুজা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াছেকের পর ২৩২ হিজরীতে তিনি তখতে আরোহণ করেন। মসনদে বসেই তিনি নবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি ধাবিত হতে শুরু করেন এবং মুহাদ্দিসদের সহযোগিতা করতে থাকেন।

২৩৪ হিজরীতে তিনি সাম্রাজ্যের সকল হাদীস বিশারদদের সামরাহ শহরে সমবেত করে তাদের পুরস্কার দেন এবং দিদারে মাওলা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতে বলেন। এ কাজের জন্য তিনি আবু বকর বিন আবু শায়বাকে জামে বিসাফায় এবং তার ভাই উসমানকে জামে মানসুরে নিয়োগ করেন। যাদের ক্লাসে প্রতিদিন আনুমানিক বিশ হাজার লোক বসত। তার এ খিদমতে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা মুতাওয়াক্কিলের জন্য দোআ করতে থাকে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অনেকেই এ মন্তব্য করে– খলীফা তিন জন। এক. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যিনি মুরতাদদের হত্যা করেন। দ্বিতীয়. হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয, যিনি দুনিয়া থেকে অত্যাচার মুক্ত করেছেন। তিন. মুতাওয়াক্কিল, যিনি মৃত সুন্নতকে জীবিত করেছেন।

আবু বকর বিন জিনাদা তার শানে লিখেছেন, আজ সুন্নত যে সম্মানের পর্যায়ে গেছে তা আর কখনও অপমানিত হবে না। সুন্নতের মিনার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে বিদআতের সৌধ ধসে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুতাওয়াক্কিলকে ক্ষমা করুন। তিনি আমাদের প্রতিপালকের প্রতিনিধি এবং নবী (সা.)-এর চাচার বংশীয়। তিনি বনূ আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে অনন্য। তিনি দ্বীন চলে যাবার পূর্বেই দ্বীনকে একত্রিত করেছেন। মুরতাদদের শিরচ্ছেদ করেছেন। আমাদের রব তার হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং সকল অনিষ্টতা থেকে তাকে রক্ষা করুন।

এ বছর ইবনে দাউদ প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তার কর্মের ফল দেখান। এ বছর ইরাকে প্রচণ্ড মরু সাইমুমে কুফা, বসরা এবং বাগদাদের জন-জীবন লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এরপর দামেশকে তীব্র ভূকম্পনে নগরীর ঘরবাড়ি ধসে পড়ায় পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়। ২৩৫

হিজরীতে খ্রিস্টানদের গলায় মাফলার বাঁধার নির্দেশ দেয়া হয়। ২৩৬ হিজরীতে হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কবর শরীফ এবং এর আশপাশের মাকবারাগুলো ধ্বংস করে সেখানে চাষাবাদের হুকুম দেন এবং লোকদেরকে এর যিয়ারত থেকে বিরত থাকার ফরমান জারি করেন। পূর্বে এগুলো জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। এতে জনসাধারণ মর্মাহত হয়ে তাকে নাসবী (খারেজী) উপাধি দেয়।

২৩৭ হিজরীতে অত্যাচারের অপরাধে মিসরের প্রধান বিচারপতি আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবু নায়েছের দাড়ি কেটে বিশটি চাবুকাঘাত করা হয়। এ বছর আসকালান শহর আগুনে ভস্ম হয়ে যায়। এ বছর ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি এসে পৌছুতে পারেননি। ২৩৮ হিজরীতে রোমানরা দাময়াত আক্রমণ করে শহরময় লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে ছয় শ' মুসলমানকে বন্দী করে সমুদ্র পথে পাচার করে।

২৪০ হিজরীতে খালাতবাসী আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। ইরাকের উপর থেকে ডিম বর্ষিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় তেরোটি গ্রাম মাটিতে দেবে যায়। ২৪১ হিজরীতে অনেক তারকারাজি ঝরে পড়ে এবং গভীর রাত পর্যন্ত আসমানে তারকাগুলো উড়ে বেড়ানোর মত মনে হতে থাকে। ২৪২ হিজরীতে তওনিস, রায়, খোরাসান, নিশাপুর, তবরিস্তান এবং আস্ফাহানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পাহাড়ের চূড়াগুলো উড়তে থাকে এবং মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মিসর অঞ্চলে আসমান থেকে দশমন ওজনের পাথর বর্ষিত হয়। ইয়ামনের পর্বতগুলো প্রকম্পিত হওয়ায় চাষাবাদের ক্ষেতগুলো স্থানান্তরিত হয়। হলব শহরে রমযান মাসে একটি সাদা প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাণীটি স্পষ্ট ভাষায় বলে, হে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। এভাবে সে চল্লিশ বার আওয়াজ দিয়ে উড়ে যায়। দ্বিতীয় দিন এসে আবার একই আওয়াজ দেয়। লোকেরা রাজধানীতে এ সংবাদ সরবরাহ করে এবং এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঁচ শ' লোক সাক্ষ্য দেয়। এ বছর ইবরাহীম বিন মুতহার টাঙ্গায় চড়ে বসরা থেকে হজ্জ আদায় করে। লোকেরা এ ধরনের নতুন গাড়ি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়।

২৪৩ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল দামেশক যান এবং সেখানকার পরিবেশ দেখে ভালো লাগায় সেখানে প্রাসাদ বানিয়ে থেকে যাবার ইচ্ছা করলে ইয়াযিদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাহলাবী বলল, আমার মনে হয় নেতা এখানে থাকলে ইরাকের চেয়েও শামবাসী বেশি খুশি হবে। যদি আপনি এখানে অবস্থান করেন তাহলে ইরাকবাসীকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর এতে করে তাদের সাহায্যকে আপনি বর্জন করছেন। এ কথা শুনে দু'তিন সপ্তাহ পর তিনি ফিরে আসেন।

২৪৪ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল তার ছেলেদের উস্তাদ ইয়াকুব সাকীতকে তার পুত্রদ্বয় মুতায এবং মুঈদকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে মুতায এবং মুঈদ বেশি প্রিয় না ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন? ইয়াকুব বললেন, এদের চেয়ে হযরত আলীর গোলাম কানবার বেশি প্রিয়। এ কথা শুনে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ইয়াকুবকে শুয়ে দাও। অতঃপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার পেটে লাফাতেই থাক। কেউ কেউ বলেন, তিনি তার জিহ্বা টেনে বের করায় তার মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনি ইয়াকুবের দিয়ত তার আওলাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

২৪৫ হিজরীতে ব্যাপক ভূমিকম্প হয়। এতে শহর, নগর, দুর্গ এবং পুল ধ্বংস হয়। ইনতাকিয়ার একটি পাহাড় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আকাশ থেকে একটি ভয়ঙ্কর আওয়াজ দেয়া হয়। মিসরও ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বালিশ অঞ্চলের অধিবাসীরা মিসরের দিক থেকে বজ্র নিনাদে একটি শব্দ শুনতে পায়। এতে এক হাজার লোক প্রাণ হারায়। মক্কা শরীফের নহরগুলো শুষ্ক হয়ে পড়ে। তিনি আরাফাত থেকে মক্কায় পানি সরবরাহের জন্য এক লাখ দিনার খরচ করেন।

তিনি ছিলেন দানশীল, তার মত কোন খলীফা কবিদের এত বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন দেননি। একদিন তিনি দু'টি মতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলী বিন জাহাম কবিতার একটি চারণ পড়ল। তিনি উপহারস্বরূপ একটি মতি তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। আলী কুড়িয়ে নিয়ে তা ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তিনি বললেন, উপহারের মূল্য কি কম ভাবছ? আল্লাহর কসম, এর দাম এক লাখের চেয়েও বেশি। আলী বলল, না, তা ভাবছি না। আরো কিছু কবিতা স্মরণ করছি, যা আবৃত্তি করে দ্বিতীয় মতিটিও নিতে পারি। অতঃপর সে আরেকটি কবিতা শোনায়ে দ্বিতীয় মতিটিও নিয়ে নেয়।

মাসউদী বলেন, তিনি শরাব পান করতেন। তার চার হাজার বাঁদি ছিল। আলী বিন জাহাম বলেন, তিনি মুতাযের মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সালামা কর্তৃক প্রণীত 'আল-মুহান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, শুরুর দিকে হযরত যিননুন মিসরী শিশুর জন্মের অবস্থা (শীর্ষক বিদ্যা-অনুবাদক) প্রকাশ করলে মিসরের আমীর হযরত ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন আবুল হাকাম বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে মন্তব্য করেন, তিনি একটি নতুন বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন– যা সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নয়। আমীরে মিসর তাকে ডেকে এ বিদ্যার ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অত্যন্ত সুন্দর এবং স্পষ্ট করে এর জবাব তুলে ধরেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার কথা মেনে নেন। অতঃপর তিনি পত্র মারফত মুতাওয়াক্কিলকে বিষয়টি অবহিত করেন। খলীফা তাকে হাজির হওয়ার ফরমান

জারি করেন। তিনি সেখানে হাজির হওয়ার পর খলীফা তাকে দারুণ সমাদরের সাথে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত যিননুন মিসরীর প্রসঙ্গ এলে খলীফা বলতেন, তাকে সলফে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

মুতাওয়াক্কিল তার ছেলেদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুনতাসির, তারপর মুতায, অতঃপর মুঈদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুতাযের মাকে অধিক ভালোবাসার কারণে মুতাওয়াক্কিল মুতাযকে প্রথম উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। এতে মুনতাসির ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এদিকে মুতাওয়াক্কিলের অবাধ্য কতিপয় তুর্কী লোক মুনতাসিরের সাথে যোগ দেয়। ২৪৭ হিজরীর শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখে রাতে মুতাওয়াক্কিল যখন ক্রীড়া-কৌতুকের মজলিসে বসে ছিলেন তখন পাঁচজন লোক ভিতরে প্রবেশ করে মুতাওয়াক্কিলের সাথে তার মন্ত্রী ফাতাহ বিন খাকানকেও হত্যা করে।

জনৈক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, অল্প ক'দিন সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে কাজ করেছি- এর কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুতাওয়াক্কিল বলতেন, ফাতাহ বিন খাকান ছাড়া আমার চলবে না। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। আল্লাহর কুদরতে তারা উভয়ে একই স্থানে একই সময়ে নিহত হন। তার হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে কবিরা অনেক শোক গাথা রচনা করেছেন।

ইবনে আসাকির বলেন, একবার মুতাওয়াক্কিল স্বপ্নে দেখেন যে, আসমান থেকে আমার কাছে এক প্রকার চিনির মোরব্বা এসে পড়ে। এতে লিখা ছিল- জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ তখতে আরোহণের পর আমাকে কি নামে ডাকবে তা নিয়ে লোকেরা চিন্তা ফিকির করতে লাগল। কেউ মুনতাসির কেউ অন্য নামের প্রস্তাব করল। অবশেষে আহমদ বিন দাউদকে নিজের স্বপ্নের কথা জানালাম। লোকেরা মুতাওয়াক্কিল নামটি পছন্দ করল।

হিশাম বিন আম্মার কর্তৃক বর্ণিত, আমি মুতাওয়াক্কিলকে বলতে শুনেছি (তিনি বলেন), হায় আমি যদি মুহাম্মাদ বিন ইদরীসের যুগ পেতাম। তবে তাকে দেখতাম এবং তার নিকট কিছু পড়তাম। কারণ আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি তিনি বলেন, লোক সকল! মুহাম্মাদ বিন ইদরীস সত্যের সওগাত। পেছনে তোমরা এক নেক্কার আলেমকে ছেড়ে এসেছ। তার আনুগত্য কর হিদায়েত পাবে। অতঃপর মুতাওয়াক্কিল বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ বিন ইদরীসের উপর রহম করুন। লোকদের মাঝে তার মাযহাবকে সংরক্ষণ করুন এবং তাঁর এ মাযহাব থেকে আমাদেরকে ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করুন।

আমার (গ্রন্থকারের) মতে এ কথাটি অলাভজনক। কারণ মুতাওয়াক্কিল শাফী মাযহাবের অনুসারী। খলীফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি শাফী মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন। আহমদ বিন আলী বসরী বলেন, একবার মুতাওয়াক্কিল সকল ওলামায়ে কেরামকে একত্রিত করেন। সকলে সমবেত হলে তিনি মজলিসে আসার সময় খলীফার সম্মানার্থে আহমদ বিন মুআদ্দাল ছাড়া তামাম ওলামায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে যান। ফলে (আহমদ বিন মুআদ্দালের প্রতি ইশারা করে) মুতাওয়াক্কিল উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি আমার বাইআত গ্রহণ করেননি? উবায়দুল্লাহ বললেন, আমিরুল মুমিনীন! তার দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তিনি অবশ্যই আপনার বাইআতের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা শুনে আহমদ বললেন, আমার দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কোনই ভিন্নতা নেই। আমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে আযাব থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। কারণ নবী আকরাম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে যে, আমি তার সম্মানে দাঁড়াব সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিবে। এ কথা শুনে মুতাওয়াক্কিল তার কাছে এসে বসে পড়েন।

মাহলাবী রেওয়ায়েত করেন, একবার মুতাওয়াক্কিল আমাকে বলেন, হে মাহলাবী! পূর্ববর্তী খলীফাগণ জনসাধারণের উপর শুধু এজন্য কঠোরতা করতেন যেন তাদের প্রতি প্রভাব ও দাপট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমি তাদের উপর নম্রতা করি এজন্য যে, যাতে তারা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আমার আনুগত্য করে।

ফাতাহ বিন খাকান কর্তৃক বর্ণিত, একদা আমি মুতাওয়াক্কিলকে গভীর চিন্তা মগ্ন অবস্থায় দেখে তাকে বললাম, আমিরুল মুমিনীন! এত কি ভাবছেন? আল্লাহর কসম! পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বেশি সুখী কেউ নেই। তিনি বললেন, সেই আমার চেয়ে বেশি সুখী যে একখানা প্রাসাদ এবং একজন নেককার স্ত্রীর মালিক। এর সাথে প্রাচুর্য থাকলে আরো সহজ হবে। আবুল আয়না বলেন, জনৈক ব্যক্তি ফজল নাম্নী এক বাঁদি মুতাওয়াক্কিলকে উপহার দেয়, সে বাঁদি কাব্য চর্চা করত। মুতাওয়াক্কিল তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কবি? বাঁদি বলল, যে আমাকে বিক্রি করেছে এবং যে ক্রয় করেছে তাদের এটাই ধারণা ছিল। তিনি বললেন, কিছু শোনাও তো। সে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো, (যার অর্থ হচ্ছে) "৩৩ হিজরীতে ইমানুল হুদা খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। সে সময় তার বয়স ২৭ বছর। আমার বিশ্বাস সে বছরই তিনি শাসন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দু'আ কবুল করবেন না, যে আমার এ দু'আয় আমীন বলবে না।"

আলী বিন জাহাম বলেন, জনৈক ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলকে মাহবুবা নাম্নী এক বাঁদি

উপহার দেয়। সে তায়িফে লালিত পালিত হয় এবং সেখানেই বিদ্যা অর্জন ও সাহিত্য শিক্ষা করে। সে কাব্য চর্চা করত, তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। কোন এক কাজে তিনি তার প্রতি রুষ্ট হয়ে প্রাসাদের অন্যান্য জেননাদের তার সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন। একদিন আমি মুতাওয়াক্কিলের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি আজ স্বপ্নে মাহবুবার সাথে আপস করেছি। আমি বললাম, ভালোই হয়েছে। তিনি বললেন, চল, মাহবুবা কি করছে গিয়ে দেখে আসি। আমরা তার গৃহের নিকটবর্তী হলাম। সে উদ বাজিয়ে গাইছে– "আমি গোটা প্রাসাদে কাউকে দেখছি না, যাকে নিজের অভিযোগের কথা জানাব। কেউ আমার সাথে কথা বলে না। আমি এমন গুনাহ করেছি যার তাওবা কবুল হয় না। এমনকি কেউ নেই যে বাদশাহর কাছে আমার সুপারিশ করবে। কারণ তিনি স্বপ্নে আমার সাথে আপস করেছেন। এমন কোন প্রভাত নেই যে প্রভাতে তার বিচ্ছেদের দংশন আমাকে হত্যা করে না।" মুতাওয়াক্কিল আওয়াজ দিলেন। মাহবুবা বেরিয়ে এসে তার পদ চুম্বন করে বলল, জনাব রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি আমার সাথে সন্ধি করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমিও তাই দেখেছি। অতঃপর তিনি তাকে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেন। তিনি নিহত হওয়ার পর সে অধিকাংশ সময় কবিতা পড়ে কাটিয়ে দিত।

হযরত ইমাম আহমদ বলেন, একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম একজনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। আর অদৃশ্য থেকে কেউ বলছে, এক বাদশাহকে ইনসাফগার বাদশাহর দিকে উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। যিনি ক্ষমা পরায়ণতায় প্রসিদ্ধ এবং অত্যাচারী নন। পরদিন সকালে সরমন রায় থেকে বাগদাদ পর্যন্ত এ কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, মুতাওয়াক্কিল নিহত হয়েছেন।

আমর বিন শায়বান বলেন, মুতাওয়াক্কিল যে রাতে নিহত হন সে দিন আমি স্বপ্নে দেখলাম জনৈক ব্যক্তি এ কবিতাটি আবৃত্তি করছে– "হে আমর! শরীরের সাথে যে চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে পড়েছে তার জন্য অশ্রু প্রবাহিত কর, তুমি কি দেখনি, কতিপয় যুবক হাশেমী এবং ফাতাহ বিন খাকানের সাথে কি আচরণ করেছে! আল্লাহর কাছে তারা এ অত্যাচারের জন্য ফরিয়াদ করছে, উপরন্তু তারা আসমানের অধিবাসীদের নিকটও নালিশ জানাচ্ছে। অচিরেই এর ফলাফল অশুভ হবে। অকল্যাণের প্রতিদান অকল্যাণই হয়। জাফরের জন্য কাঁদ এবং তোমার খলীফার শোক গাথা আবৃত্তি কর। কারণ জিন এবং ইনসান উভয়ে তাদের জন্য কাঁদছে।"

অতঃপর দু'মাস পর মুতাওয়াক্কিলকে স্বপ্নে দেখে বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, কিছু দিন সুন্নত জীবিত করার জন্য

তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আবার বললাম, আর আপনার হত্যাকারীদের কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমি স্বীয় পুত্র মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। সে এখানে এলেই তাকে নিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব।

মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

খতীব বলেন, মুহাম্মাদ বিন শুজা আল-আহমর বর্ণনা করেন, মুতাওয়াক্কিল হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহর হাদীস রেওয়ায়েত করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে নমনীয়তা থেকে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, তাবারানী হাদীসটি জারীর থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকির বলেন, নযর বিন আহমদ আমার নিকট বর্ণনা করেন আলী বিন জাহাম বলেন, একদা আমি মুতাওয়াক্কিলের সাথে বসে ছিলাম। সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা চলছিল। তিনি বললেন, সুন্দর কেশরাজিও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মুতাসিম থেকে, তিনি মামুন থেকে, তিনি হারুন রশীদ থেকে, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কানের লতির নিচে জুলফ এমন ভাবে ঝুলিয়ে থাকত যেন মনে হয় সে জুলফে মতি জড়ানো রয়েছে। তিনি দেখতে সকলের চেয়ে সুন্দর ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব এবং হাশিমেরও জুলফ ছিল।

আলী বিন জাহাম বলেন, আমি মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি মুতাসিম থেকে, তিনি মামুন থেকে, তিনি রশীদ থেকে, তিনি মাহদী থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ এবং তার দাদা আলী এবং আলীর ছেলে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কানের লতির নিচে এমনই জুলফ ছিল।

তার শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরামগণ ইন্তেকাল করেন, আবু ছুর, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবরাহীম বিন মুনযির আল-খাযায়ী, ইসহাক বিন রাহুয়া, ইসহাক নদম, রুহুল মাকরী, যাহির বিন হরব, শাহনু, সুলায়মান, আবু মাসউদ, আসকারী, আবু জাফর নাকিলী, আবু বকর বিন শায়বা ও তার ভাই, কবি দেকুলজিন, আব্দুল মালিক বিন হাবীব, আব্দুল আযীয বিন ইয়াহইয়া, আব্দুল্লাহ বিন উমর ফাওয়ারেরী, আলী বিন মাদায়েনী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নাযীর, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইউসুফ, রাশীর বিন ওলীদ, ইবনে আবু দাউদ, আবু বকর, জাফর

বিন হরব, ইবনে কিলাব আল-মুকাল্লাম, কাযি ইয়াহইয়া বিন আকতাম, হারিস, ইবনুল সাকীত– ইমাম শাফেঈর ছাত্র, আহমদ বিন মানবাআ, যুননুন মিসরী, আবু তোরাব, আবু উমর, আল-মাকরায়ী, কবি ওয়াবল, আবু উসমান প্রমুখ।

আল-মুনতাসির বিল্লাহ

আল-মুনতাসির বিল্লাহ মুহাম্মাদ আবু জাফর (অথবা আবু আব্দুল্লাহ) বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ জায়শা নাম্নী রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুদর্শন, প্রতাপান্বিত, জ্ঞানী, সৎ কাজের অনুরাগী, জুলুম নিঃশেষকারী এবং আলী পরিবারের প্রতি দয়ার্দ্র ছিলেন, হযরত ইমাম হুসাইনের কবর শরীফ যিয়ারতের অনুমতি দেন এবং তার বংশধরদের নিকট ফিদকের বাগান হস্তান্তর করেন।

মুনতাসির তার পিতা নিহত হওয়ার পর ২৪৭ হিজরীর শাওয়াল মাসে খিলাফতের তখতে আরোহণ করে সর্বপ্রথম স্বীয় ভ্রাতাদ্বয় মুতায এবং মুঈদকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন– যাদেরকে মুতাওয়াক্কিল উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। প্রজাবৃন্দের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ ছড়িয়ে দেবার কারণে জনগণ তার প্রতাপের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তিনি উঁচু মাপের ধৈর্যশীল। তার চয়নকৃত বাণীর মধ্যে এটি একটি– ক্ষমার স্বাদ শাস্তি প্রদানের স্বাদের চেয়ে বেশি মিষ্টি, ভদ্র লোকদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ এক লজ্জাকর কাজ।

খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়ে তুর্কীদের সমালোচনা করেন, তাদের প্রতি খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার দোষ চাপিয়ে দেন এবং এ কারণে তাদের শাস্তি প্রদান করেন। ফলে তুর্কীরা হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ তিনি ধৈর্যশীল, সাহসী এবং জ্ঞানী, অবশেষে তারা মুনতাসিরের চিকিৎসকের নিকট ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ পাঠায়। চিকিৎসক খলীফার ঔষধে বিষ মাখিয়ে দেয়। এতে তার মৃত্যু হয়।

কেউ কেউ বলেন, ভুলক্রমে বিষ মিশ্রিত ঔষধ সেবনের ফলে চিকিৎসক নিজেই পরলোকগমন করে।

কেউ কেউ বলেন, অন্তিম মুহূর্তে খলীফা মুনতাসির বলেন, হে আমার জননী! দীন-দুনিয়া উভয় জগৎ আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার বাবার ইন্তেকালের কারণ আমি নিজেই।

মুনতাসির ২৪৮ হিজরীর রবিউল আখের মাসের ৫ তারিখে ২৪ বছর বয়সে প্রায় ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করে ইন্তেকাল করেন।

কথিত আছে, একদিন মুনতাসির খেলাধুলার জন্য বসে আছেন। তার বাবার খাযানা থেকে একখানা কার্পেট সেই মজলিসে পাঠানো হয়। কার্পেটের মাঝে জনৈক আরোহীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। আরোহীটি মুকুট পরিহিত ছিল। এর আশেপাশে ফার্সী ভাষায় কিছু লিখা ছিল। মুনতাসির ফার্সী ভাষায় পারদর্শী একজনকে ডেকে এর ভাবার্থ জানানোর জন্য বললেন, সে একবার পড়ে চুপ হয়ে গেল। তিনি আবার বললেন, এর ভাবার্থ কি? সে বলল, এর কোন অর্থ নেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, লিখা আছে–আমি শিরওয়া বিন কিসরা বিন হরমুয। আমি স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছি। কিন্তু ছয় মাসের বেশি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পাইনি, এ কথা শুনে স্বর্ণ খচিত থাকার পরও তিনি কার্পেটটি জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন।

লাতায়িফুল মাআরিফ গ্রন্থে ছালাবী লিখেছেন, মুনতাসির খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃত খলীফায় পরিণত হন। কারণ তার বাবা-দাদা সহ পাঁচজন সকলেই খলীফা ছিলেন। মুনতাসিরের ভাই মুতায এবং মুতামাদও প্রকৃত খলীফা ছিলেন। আমি (গ্রন্থকার) বলছি, মুসতাসিমও এমন খলীফা ছিলেন, যাকে তাতাররা শহীদ করে দেয়। তার বাবা-দাদা সহ পূর্বপুরুষও খলীফা ছিলেন।

ছালাবী বলেন, কিসরা বংশে যে বাদশাহ খালেস তিনি হলেন শিরওয়া, তিনি নিজ পিতাকে হত্যা করেন এবং ছয় মাসের বেশি জীবিত ছিলেন না। বনূ আব্বাসের মধ্যে খালেস খলীফা মুনতাসির, তিনিও নিজ পিতাকে হত্যা করেন এবং ছয় মাসের বেশি জীবিত ছিলেন না।

আল-মুসতায়িন বিল্লাহ

মুতাওয়াক্কিলের ভাই আল-মুসতায়িন বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২২১ হিজরীতে মুখারিক নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার লাবণ্যময় চেহারায় বসন্তের দাগ ছিল। তিনি ছিলেন তোতলা।

মুনতাসিরের ইন্তেকালের পর সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাবৃন্দ পরামর্শক্রমে মুসতায়িনকে খলীফা মনোনীত করেন। তিনি ২৮ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন এবং ২৫১ হিজরী পর্যন্ত তার খিলাফত ছিল।

ওসীফ এবং বাগা নামক দুই তুর্কী যারা মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তিনি তাদেরকে পৃথক করে দিলে তুর্কীরা ভয়ে সামরাহ থেকে বাগদাদে চলে যায়। অতঃপর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুসতায়িনের নিকট দূত পাঠিয়ে সামরাহ-এ ফিরে আসার অনুমতি চায়। তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করে তুর্কীদের বন্দী করার ইচ্ছা করলে তারা মুতায বিল্লাহর নিকট বাইআত গ্রহণ করে। মুতায বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসতায়িনের উপর হামলা করেন। মুসতায়িন নিহত হওয়ায় বাগদাদবাসী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ লড়াই কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে। হতাহত হয় অসংখ্য জনতা, যুদ্ধের দীর্ঘতর কারণে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়ে। অবশেষে মুসতায়িনের বাহিনী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে ২৫২ হিজরীতে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান। এ সন্ধিতে কাযি ইসমাঈল মুসতায়িনের প্রতি কঠোর শর্তাবলী আরোপ করে। অন্যান্য কাযিগণ আরোপিত কঠোর শর্তাবলীকেই সন্ধির শর্তসমূহ হিসেবে চুক্তিপত্রে মোহর এঁটে দেয়।

মুসতায়িন ওয়াসেত শহরে চলে যান। তিনি সেখানে নয় মাস যাবত এক আমীরের নযরবন্দী হিসেবে অবস্থান করেন। অতঃপর সেই আমীর তাকে সামরাহ-এ পাঠিয়ে দেয়। মুতায আহমদ বিন তুলুনকে এক লিখিত ফরমানের মাধ্যমে মুসতায়িনকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। প্রতি উত্তরে আহমদ জানায়- খলীফার বংশধর আমি কখনই হত্যা করব না। অতঃপর এ কাজের জন্য সাঈদ হাজেবকে নিয়োগ করা হয়। ২৫২ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৩ তারিখে যখন তার বয়স ৩১ বছর সে তাকে হত্যা করে।

মুসতায়িন সৎ, জ্ঞানী, সাহিত্যিক এবং বাগ্মী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তিন শেলাইবিশিষ্ট জামা ও লম্বা টুপি পরিধান করেন।

তার খিলাফতকালে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন- আবদ বিন হামীদ, আবু তাহের বিন আল-সরাহ হারেস বিন মিসকীন, আবু হাতিম, জাখাত প্রমুখ।

আল-মুতায বিল্লাহ

২৩২ হিজরীতে আল-মুতায বিল্লাহ মুহাম্মাদ ভিন্ন মতে যাবের আবু আব্দুল্লাহ বিন মুতাওয়াক্কিল বিন রশীদ কাবীহা নামক রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুসতায়িনকে অপসারণের পর ২৫২ হিজরীতে ১৯ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। ইতোপূর্বে এত অল্প বয়সে কেউ খিলাফত পাননি। তিনি টগবগে যুবক ছিলেন।

মুতাযের হাদীসের উস্তাদ আলী বিন হরব বলেন, আমি তার চেয়ে সুন্দর খলীফা আর দেখিনি। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি ঘোড়াকে স্বর্ণের অলংকার পরান। পূর্ববর্তী খলীফাগণ স্ব স্ব ঘোড়ার গলায় হাল্কা রৌপ্যের অলংকার পরাতেন।

মসনদে আরোহণের বছর ওয়াছেক কর্তৃক নিযুক্ত আশনাস নামক রাষ্ট্রের ডেপুটি কর্মকর্তা মারা যায়। তার পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার দিনার রেখে যায়- যা মুতায হস্তগত করেন। তার মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন তাহেরকে নায়েব মনোনীত করেন। তিনি সর্বদা নিজের কাছে দু'টি তলোয়ার বেঁধে রাখতেন। কিছুদিন পর তাকে অপসারণ করে তদস্থানে নিজের ভাই আবু আহমদকে নিয়োগ করেন। তিনি সোনার মুকুট পরতেন এবং দু'টি তলোয়ার বহন করতেন। তাকেও অপসারিত করে ওয়াসেত শহরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মদ্যপ বাগাকে নায়েবের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেও শাহী মুকুট পরত। সে এক বছর পর মুতাযের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার কর্তিত মস্তক মুতাযের সামনে হাজির করা হয়।

এ বছর রযব মাসে তিনি তার ভাই মুঈদ বিল্লাহকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। বেত্রাঘাত করান এবং বন্দী করে রাখেন। এতে মুঈদ পরলোক গমন করলে মুতায ভয় পেয়ে যান। হত্যার অপরাধে যেন অভিযুক্ত না হন সে জন্য তিনি কাযীদের ডেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু এতে কোন আছর হলো না।

মুতায তুর্কীদের বিশেষ করে সালেহ বিন ওসীফকে দেখে দারুণ ভয় পেতেন। একদিন তুর্কীরা অর্থের বিনিময়ে সালেহকে হত্যার কথা জানালে মুতায তার মায়ের কাছে কিছু অর্থ চাইলে তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সে সময় কোষাগারে কোন অর্থকড়ি ছিল না। ঘুষ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তুর্কীরা সালেহ বিন ওসীফ এবং মুহাম্মাদ বিন বাগাকে সাথে নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে মুতাযকে বেরিয়ে আসতে বলে, তিনি অসুস্থ বেরিয়ে আসতে পারবেন না- এ কথা জানিয়ে দেন। তারা কোলাহল করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করে। মুতাযের পা ধরে বাইরে নিক্ষেপ করে। তাকে মারতে মারতে মুখ লাল করে দেয়া হয়। গরমের সময় ছিল, তুর্কীরা তাকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারা মুতাযকে তার বাইআত থেকে সরে যাবার জন্য চাপ দেয়। অতঃপর কাযী বিন আবু শিওয়ারিবকে ডাকা হয়। তার সামনে তিনি নিজ বাইআত থেকে সরে যান। তারপর মুহাম্মাদ বিন ওয়াছেক- যাকে মুতায বাগদাদে পাঠিয়ে দিয়েছিল তিনি বাগদাদ থেকে রাজধানী সামরাহ-এ এসে পৌঁছলে তিনি তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তার হাতে বাইআত করেন।

এ ঘটনার পাঁচ দিন পর এক দল লোক এসে গোসল করানোর জন্য মুতাযকে হাম্মামে নিয়ে যায়। গোসলের পর তার পিপাসা লাগে। তাকে পানি দেয়া হয়নি। হাম্মাম থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বরফের পানি খাওয়ানো হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে

ইন্তেকাল করেন। তিনিই প্রথম খলীফা যিনি পিপাসায় কাতর হয়ে ২৫৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৮ তারিখে পরলোক গমন করেন।

প্রথমে মুতাযের জননী কাবীহা তাদের ভয়ে আত্মগোপন করে ছিল। পরে রমযান মাসে বেরিয়ে এসে সালেহ বিন ওসীফকে অনেক ধন-দৌলত অর্থাৎ তের লাখ দিনার এবং দুটি জামা। তন্মধ্যে একটি জামায় জমরুদ এবং অপরটিতে মতি ও ইয়াকুত জড়ানো ছিল। এ দু'টি জামার আনুমানিক মূল্য দুই হাজার দিনার। এত সম্পদ দেখে ইবনে ওসীফ বলল, এত সম্পদ থাকার পরও পঞ্চাশ হাজার দিনারের জন্য এ নারী তার আপন ছেলেকে হারিয়েছে। ইবনে ওসীফ তার কাছ থেকে এগুলো নিয়ে তাকে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেয়। কাবীহা মুতামাদের খিলাফত পর্যন্ত সেখানেই ছিল। অতঃপর সে সামরাহ ফিরে আসে এবং ২৬৪ হিজরীতে পরলোক গমন করে।

মুতাযের যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তারা হলেন– সারী সাকতী, হারুন বিন সাঈদ, মুসনাদের লেখক দারমী, আকবী প্রমুখ।

আল-মুহতাদী বিল্লাহ

আল-মুহতাদী বিল্লাহ খালীফাতুস সালেহ মুহাম্মাদ আবু ইসহাক ভিন্ন মতে আবু আব্দুল্লাহ বিন ওয়াছেক বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ ওরদাহ নাম্নী বাঁদির গর্ভে ২১০ হিজরীর পর তার দাদার শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫৫ হিজরীর রযব মাসের ১৯ তারিখে তখতে খিলাফত প্রাপ্ত হন। মুতায সর্বপ্রথম তার বাইআত করেন এবং নিজ খিলাফত তার উপর অর্পণ করেন। মুতাযের সামনে তাকে বসানো হয়। মুতায কাযীর সামনে সাক্ষ্য দেন। কাযী বলেন, মুতায খিলাফত পরিচালনায় অপারগ। মুতায কাযীর কথা স্বীকার করেন। মুহতাদী এ কথা শুনে বাইআতের জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে মুতায সর্বপ্রথম বাইআত করেন। অতঃপর তিনি মজলিসের মধ্যভাগে এসে উপবেশন করেন।

মুহতাদী সুদর্শন, ইবাদত গুজার, দানশীল, বুদ্ধিমান, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী চালু করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর এবং সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার কোন সাহায্যকারী ছিল না। খতীব বলেন, মুহতাদী খলীফা হওয়া থেকে আরম্ভ করে নিহত হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রোযা রাখতেন।

হাশিম বিন কাসিম বলেন, আমি একদিন রমযান মাসে মুহতাদীর কাছে বসে ছিলাম, আমি উঠে আসার ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে বসিয়ে দিলেন। ইফতার করে তিনি নামায পড়ালেন। অতঃপর আবার খানা চাইলেন। এক ডালা ভর্তি খানা

এলো। এতে ছিল ময়দার রুটি, এক বাটি সিরকা এবং যয়তুন তেল। তিনি আমাকে খেতে বললেন। আমি খেতে আরম্ভ করলাম। আমার মনে হল আরো খানা আসবে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি রোযা ছিলে না? আমি বললাম, ছিলাম। তিনি বললেন, আগামীকাল রোযা রাখবে না? আমি বললাম, রমযান শরীফের রোযা কেন রাখব না? তিনি বললেন, ভালো করে খাও, তবে আর কোন খানা আসবে না। আমার কাছে এছাড়া আর কোন খানা নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। তিনি বললেন, এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বনূ উমাইয়্যার খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের জীবন নিয়ে চিন্তা করেছি। তিনি স্বল্প ভোজন এবং জনগণের চিন্তার কারণে পাতলা ছিলেন– যা তুমি জান। অতঃপর আমি নিজ খান্দানের প্রতি দৃষ্টি ফেরায়ে আমি দারুণ মর্মাহত হয়েছি। লোকেরা আমাদের বনূ হাশিম বলে। অথচ তারা যা ছিল না আমরা তা গ্রহণ করেছি। যা তুমি দেখছ।

জাফর বিন আব্দুল ওহেদ বলেন, মুহতাদীর সাথে আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে আমি বললাম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) এ কথাই বলেছেন এবং আপনার বাবা এবং দাদা এ মাসয়ালার উপরই কাজ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমদের উপর রহম করুন। আমার পিতার সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করা জায়েয হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা করতাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, সর্বদা সত্য কথা বলবে। যে সত্য কথা বলে সে আমার দৃষ্টিতে অধিক প্রিয়।

তাফতুয়া বলেন, জনৈক হাশেমী বর্ণনা করেন, আমরা মুহতাদীর কাছে একখানা পোশাক বক্স দেখেছি। যাতে তিনি একটি জামা এবং একটি কম্বল রাখতেন। রাতে তিনি এ দু'টো পরে নামায আদায় করতেন।

মুহতাদী লোকদের ক্রীড়া-কৌতুক ও খেলাধুলা করতে নিষেধ করেন। এর সামগ্রীগুলো ফেলে দেন। গান বাজনা হারাম ঘোষণা করেন। প্রশাসকদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই বিচারালয়ে বসতেন। তিনি নিজেই কেরানীদের কাছ থেকে হিসাব নিতেন। সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে অবকাশে থাকতেন। রুসার একটি দলকে বেত্রাঘাত করেন। রাফেযী হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে দারুণ ঘৃণায় তিনি জাফর বিন মাহমুদকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেন।

মুতাযের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য মূসা বিন বাগা রায় থেকে একদল সৈন্যসহ খিলাফতের রাজধানী সরমন রায়ে সালেহ বিন ওসীফকে হত্যা করার জন্য আসে। মূসার আগমন সংবাদ পেয়ে জনগণ ওসীফকে লক্ষ্য করে বলল, হে

ফিরাউন তোমার জন্য এক মূসা এসে পড়েছে। মূসা এসে খলীফার নিকট অনুমতি চাইল। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সে সময় তিনি আদালতে বসে ছিলেন। মূসা তার উপর জনতাকে লেলিয়ে দিল। তার সৈন্যরা খলীফাকে একটি দুর্বল ঘোড়ায় উঠিয়ে প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। খলীফা বললেন, মূসা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল, আল্লাহর কসম, আমার উদ্দেশ্য ভালো, আপনি আমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি সালেহ বিন ওসীফের পক্ষপাতিত্ব করবেন না। মুহতাদী শপথ করলেন। মূসা সদলবলে খলীফার বাইআত করল। অতঃপর সালেহ বিন ওসীফের কৃত অপরাধের শাস্তি প্রদানের জন্য তাকে ডাকা হয়। সে আত্মগোপন করে। মুহতাদী তার সাথে সন্ধি করার চেষ্টা শুরু করেন। এতে জনতার কথা বলার সুযোগ হলো যে, সালেহ কোথায় আত্মগোপন করেছে তা খলীফা জানেন। আমিরুল মুমিনীনকে অপসারণের চক্রান্ত হয়। এটা জানতে পেয়ে মুহতাদী একদিন সকালে তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, আমাকে মুসতায়িন এবং মুতায ভেবো না। আল্লাহর কসম! আমি রাগান্বিত হলে জীবনের কোন মায়া নেই। এটা আমার তলোয়ার, এটা আমার হাতে থাকা অবস্থায় হত্যা করেই যাব; দ্বীন, শরম এবং তাকওয়া বলতে কিছু জিনিস রয়েছে। খলীফাদের সাথে শত্রুতা মানে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করা। আমার কাছে সালেহ-এর কোন সংবাদ নেই। এ কথা শুনে লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। মূসা বিন বাগা সালেহকে ধরে আনতে পারলে দশ হাজার দিনার পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারল না।

গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরমের কারণে এক যুবক একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে ঢুকে পড়ে। সেখানে সালেহকে দেখে সে চিনতে পারে। যুবকটি এসে মূসাকে জানিয়ে দেয়। সে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে তার মাথা কেটে আনে। এতে মুহতাদী দারুণ মর্মাহত হন। মূসা বাকিয়ালের সাথে সন-এ গমন করলে মুহতাদী মূসাকে হত্যা করার জন্য বাকিয়ালের নিকট লিখিত ফরমান পাঠান। বাকিয়াল তা মূসার সামনে পেশ করলে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে-ই মুহতাদীকে হত্যা করার জন্য ফিরে এল। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। একদিনেই নিহত হল চার হাজার তুর্কী, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত খলীফার বাহিনী পরাজিত হল। তিনি বন্দী হলেন। তাকে মেরে ফেলা হল।

মুহতাদী ২৫৬ হিজরীর রযব মাসে নিহত হন। এ হিসাবে তিনি পনেরো দিন কম এক বছর খিলাফতের তখতে সমাসীন ছিলেন। তুর্কীরা যখন মুহতাদীকে আক্রমণ করে তখন প্রজাবৃন্দ মসজিদগুলোতে এ কথাটি লিখে ঝুলিয়ে দেয়-"হে মুসলমানগণ! উমর বিন আব্দুল আযীযের মত ন্যায়পরায়ণ খলীফাকে সাহায্য কর এবং তার বিজয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর।"

আল-মুতামাদ আলাল্লাহ

আল-মুতামাদ আলাল্লাহ আবুল আব্বাস (আবু জাফর) আহমদ বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন রশীদ ২২৯ হিজরীতে ফিতয়ান নাম্নী রোমান বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুতামাদ নিহত হওয়ার সময় তিনি জুসিকে বন্দী ছিলেন। তাকে বের করে লোকেরা তার হাতে বাইআত করে। তিনি স্বীয় ভ্রাতা মোফিক তলহাকে পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর নিয়োগ করেন। পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে মিসর এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। তার লকব মফুয ইলাল্লাহ রাখা হয়। তিনি আরাম আয়েশ, খেলাধুলা এবং মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়লে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়ে তার ভাই তালহার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মুতামাদের খিলাফতকালে বসরা এবং তার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলো দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা শহরে নারকীয় তাণ্ডব চালায়। লুণ্ঠন করে শহরময় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের লড়াই হয়। এরপর ইরাকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এতে সহস্রাধিক মাখলুকের প্রাণহানি ঘটে। মহামারীর পর ভূমিকম্পেও সহস্রাধিক পশু-প্রাণীর জীবন সাঙ্গ ঘটে।

এদিকে ২৭০ হিজরী পর্যন্ত দস্যুদের সাথে লড়াই চলতে থাকে। এ বছর দস্যু সরদার বাহবুদ আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন নিহত হয়। সে রিসালতের দাবী করে বলত, আমি আলেমুল গায়েব। সে ১৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা করেছিল। একদিনে বসরায় সে ৩ লাখ মুসলমান হত্যা করে। সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত মুআবিয়া, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়শা (রা.)কে গালি দিত। এক এক উলুবিয়া নারীকে ২/৩ দিরহামে নিলামে বিক্রি করত। একেক দস্যুর কাছে দশ জন উলুবিয়া নারী বাঁদি হিসেবে ছিল। এ অসৎ লোকটি নিহত হলে তার কর্তিত মাথা বর্শায় গেঁথে বাগদাদের পথে পথে ঘোরানো হয়। এতে করে লোকেরা আনন্দ করে এবং দস্যুদের সাথে লড়াইরত মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তালহাকে ধন্যবাদ জানায় এবং কবিগণ তার প্রশংসায় কাব্য রচনা করে।

সূলী বলেন, এ যুদ্ধে আনুমানিক এক কোটি লোক জড়িয়ে পড়ে। ২৬০ হিজরীতে ইরাকে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে এক বস্তা গমের দাম এক শ'দিনারে গিয়ে পৌঁছে। এ বছর রোমানরা লুলু শহর দখল করে নেয়। ২৬১ হিজরীতে পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকার এবং তারপর ভাই তালহাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। জাফরকে শাম, জাযিরা এবং আরমেনিয়ার গভর্নর পদে নিয়োগ

দেন। আর তালহাকে ইরাক, বাগদাদ, হিজায, ইয়ামন, ফারিস, ইস্পাহান, রায়, খুরাসান, তবরিস্তান, সিজিস্তান এবং সনদের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি দু'জনের জন্য পৃথক দু'টি পতাকা নির্বাচন করেন। সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতিকে ডেকে উভয়ের মাঝে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন যে, জাফরের অবর্তমানে তালহার রায় চূড়ান্ত। এ চুক্তিপত্র প্রধান বিচারপতি ইবনে আবু শাওয়ারিব খানায়ে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেন।

২৬৬ হিজরীতে রক্ত ঝরিয়ে দেয়ারে বকর জনপদটি দখল করে নেয়। ফলে জাযিরাবাসী এবং মওসূলবাসী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ বছর গ্রাম্য লোকেরা কাবা শরীফের গেলাফ চুরি করে নিয়ে যায়।

২৬৭ হিজরীতে আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হিজাবী খুরাসান, সিজিস্তান এবং কারমান দখল করার পর ইরাক দখলের পাঁয়তারা করলে তার গোলামরা তাকে হত্যা করে।

মুতামাদের ভাই মুফিক (তালহা) ২৬৪ হিজরীতে সৈন্য বাহিনীসহ মুতামাদের উপর আক্রমণ করে। এতে মুতামাদ মর্মাহত ও হতাশ হন। অবশেষে ২৬৯ হিজরীতে মিসরের ডেপুটি প্রশাসক ইবনে তুলুনের সাথে মুতামাদের পত্রাদি বিনিময়ের মাধ্যমে যে কথা হয় তার ভিত্তিতে ইবনে তুলুন সসৈন্যে এবং মুতামাদ সামরাহ থেকে দামেশকের উদ্দেশে রওয়ানা করেন। এ সংবাদ পেয়ে মুফিক লিখিতভাবে ইসহাক বিন কানদাজকে জানালো যে, যে কোনভাবে মুতামাদকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসহাক নাসীবীন শহর থেকে মুতামাদের উদ্দেশে যাত্রা করে। মওসূল এবং হাদীসার মধ্যবর্তী স্থানে উভয়ের সাক্ষাত হলে ইসহাক বলল, আমিরুল মুমিনীন! আপনার ভাই আপনার দুশমনদের সাথে লড়াই করছে। আর আপনি খিলাফতের রাজধানী ছেড়ে কোথায় চলেছেন? শত্রুরা জানতে পেলে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে আপনার বাপ-দাদার সাম্রাজ্য দখল করে নিবে। আর সে সময় আপনার কিছুই করার থাকবে না।

ইসহাক মুতামাদের গতিবিধির উপর সর্বদা নযর রাখার জন্য বিশ্বস্ত কিছু লোক নিযুক্ত করেছিল। সে মুতামাদকে জানালো, এ স্থান আপনার জন্য নিরাপদ নয়। এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। মুতামাদ বললেন, আমার কাছে শপথ কর যে, তোমরা আমাকে কষ্ট দিবে না এবং আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে না? ইসহাক শপথ করল। অতঃপর তিনি সামরাহর দিকে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে মুফিকের কেরানী সাদ বিন মুখাল্লাদের সাথে সাক্ষাত হয়। ইসহাক মুতামাদকে সাদের নিকট হস্তান্তর করে। সে অন্যত্র চলে যায়। সাদ তাকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে বাধা

দেয়। সে তাকে আহমদ বিন খাসীবের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং পাঁচ'শ অশ্বারোহী মুতামাদকে রাজধানীতে প্রবেশ না দেবার জন্য নিযুক্ত রাখে। সংবাদ পেয়ে মুফিক ইসহাককে বৃত্তি ও জায়গীর প্রদান করে এবং যুল সানাদাইন উপাধি দেয়। আর সাদকে যুল ওয়াযারাতাইন উপাধি দেয়।

মুতামাদ সাদের হাতে গৃহবন্দী ছিলেন। তার কোন কাজ করার ইখতিয়ার ছিল না। তিনি নিজের এ অপারগতা ও অসহায়ত্বকে উপজীব্য করে একটি কবিতা রচনা করেন– "আশ্চর্য! আমি বাদশাহ, অথচ আমার ইখতিয়ারে কোন জিনিস নেই। আমি বাদশাহ হয়েও আমার লোকবল কম।"

তিনি প্রথম খলীফা যিনি নিপতিত হন, তার উপর লোকের পাহারা বসানো হয় এবং তার অপবাদ ছড়ানো হয়। অতঃপর মুতামাদ মধ্যস্থতায় আসেন। এ খবর পেয়ে ইবনে তুলুন বিচারক এবং আমীর উমরাহদের ডেকে বলল, মুফিক আমিরুল মুমিনীনকে বন্দী করে রেখেছেন। অতএব তার বাইআত থেকে পৃথক হওয়া উচিত, কাযী বাকার বিন কীতীয়াহ ব্যতীত সকলেই সমর্থন জানাল। কাযী বাকার বললেন, তোমরাই প্রথমে আমার সামনে মুতামাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ফরমান পেশ করেছ– যার কারণে তাকে উত্তরাধিকার বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বয়ং মুতামাদের নিকট থেকে তার পৃথকীকরণের হুকুমনামা না দেখাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি দিব না। এর জবাবে ইবনে তুলুন বলল, এ মুহূর্তে মুতামাদ বন্দী এবং গযবে নিপতিত, এজন্য তিনি ফরমান লিখতে পারবেন না। কাযী বাকার বললেন, আমি এ অবস্থায় কোন হুকুম দিতে পারি না। ইবনে তুলুন বলল, পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ যে, কাযী বাকার এত অনন্য ও অদ্বিতীয় বিচারক, এজন্য তোমার অহংকার হয়েছে। আসলে তোমার বিবেক বৃদ্ধতার দংশনে ক্ষত-বিক্ষত। এ কথা বলে ইবনে তুলুন কাযী বাকারকে বন্দী করল এবং যতগুলো উপহার সামগ্রী তাকে দেয়া হয়েছিল সবগুলো জব্দ করা হল। এর আনুমানিক মূল্য ছিল দশ হাজার দিনার। কথিত আছে, এ কথা জানতে পেয়ে মুফিক বলল, তোমরা মিম্বরে আরোহণ করে ইবনে তুলুনকে অভিশাপ দাও।

২৭০ হিজরীতে মুতামাদ সামরাহ-এ ফিরে আসেন। এ সময় তার সাথে সর্বদা একদল সৈন্য থাকত, যা দ্বারা মনে হত তিনি পূর্ণ স্বাধীন। এ বছর ইবনে তুলুনের ইন্তেকাল হয়। মুফিক তদস্থলে স্বীয় পুত্র আবুল আব্বাসকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে। আবুল আব্বাস একদল সৈন্যসহ মিসরে যায়। এদিকে খামারিয়া বিন আহমদ বিন তুলুন আগেই বাবার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে মিসরবাসীর ললাটে বিজয় চুম্বন করে। এ বছর বাগদাদে দজলা নদীর বাঁধ ফেটে যাওয়া বাগদাদ নগরী প্লাবিত হয়। এতে করে

সাত হাজার ঘর-বাড়ি ধসে পড়ে। এবছর রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে তরতূস আক্রমণ করে। এতে মুসলমানরা জয়লাভ করে। এ যুদ্ধে প্রচুর গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এ বছর আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ নিজেকে ইমাম মাহদী দাবী করে। সে এ আকীদার উপর অটল থেকে ২৭৮ হিজরীতে হজ্ব পালন করতে গেলে কেনানা গোত্রের লোকেরা তার অনুসরণ করে।

সূলী বলেন, ২৭১ হিজরীতে হারুন বিন ইবরাহীম আল-হাশেমীর নির্দেশে বাগদাদে শুধু পয়সার প্রচলন ঘটে। এ ব্যবস্থা কিছুদিন চালু থাকে। ২৭৮ হিজরীতে নীলনদ শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ বছর মুফিকের পরলোক গমনে মুতামাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস নসীব হয়। এ বছর কূফায় কারমাহ নামক একটি দলের আবির্ভাব ঘটে। এরা ছিল পথভ্রষ্ট ও ফাসিক। তারা ফরয গোসলকে নাজায়েয এবং মদ পানকে জায়েয বলত। তারা আযানের মধ্যে এ শব্দটি বৃদ্ধি করেছিল- ان محمد بن الحنفية رسول الله তারা বছরে দু'দিনকে ফরয সাব্যস্ত করত, বাইতুল মুকাদ্দিসে হজ্ব করত এবং তাকেই কেবলা বানিয়েছিল। এরূপে শরীয়তে তারা অনেক জিনিসের কম বেশি করে। তাদের মতবাদটি জাহেল, বর্বর ও অসভ্য লোকেরা গ্রহণ করে।

২৭৯ হিজরীতে আবু ফজল বিন মুফিকের প্রতি সেনা বাহিনীর আনুগত্য এবং নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার কারণ মুতামাদ নিজ ছেলেকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারণ করে আবুল ফজল বিন মুফিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং তাকে মুতাযাদ উপাধি দেন। এ বছর মুতাযাদ মিথ্যা গল্প, নোবেল-নাটক, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর কয়েক মাস পর ২৭৯ হিজরীর রযব মাসের ১৯ তারিখ সোমবারে ২৩ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তাকে বিষ খাওয়ানো হয়। কারো মতে রাতের আঁধারে তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে

মুতামাদের যুগে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করেন- হযরত ইমাম মুসলিম, হযরত আবু দাউদ, হযরত তিরমিযী, হযরত ইবনে মাজা, রাবীহুল জায়যী, রবীহুল মুরাদী, ইউসুফ বিন আব্দুল আলী, যাবের বিন বাকার, আবুল ফজল আর-রিয়াশী, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যাহলী, হাজ্জাজ বিন শায়ের আজালী আল-হাফেজ, কাযীউল কুযযাত ইবনে আবু শাওয়ারিব সূসী আল-মাকরী, উমর বিন শায়বা, আবু যরআ আর-রাযী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম, কাযী বাকার, দাউদ যাহেরী, ইবনে দারাহ, বাকা বিন মুখাল্লাদ, ইবনে কুতায়বা, আবু হাতিম আর-রাযী প্রমুখ।

আল-মুতাযদ বিল্লাহ

আল-মুতাযদ বিল্লাহ আহমদ আবুল আব্বাস বিন মুফিক তলহা বিন মুতাওয়াক্কিল বিন মুতাসিম বিন হারুন রশীদ ২৪২ হিজরীর যিলকাদা মাসে, সূলীর মতে ২৪৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সাওয়াব অথবা হরজ অথবা যরার নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় চাচা মুতামাদের পর ২৭৯ হিজরীতে তিনি খিলাফতের তখতে উপবেশন করেন।

বনূ আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে মুতাযদ সুদর্শন, সাহসী, নির্ভীক, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। বীরত্বের কারণে তিনি একাই বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেন। তিনি রেগে গেলে খুব কম ক্ষমা করতেন। অপরাধীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতেন। তিনি ঝানু রাজনীতিবিদ ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন হামদুন বলেন, একদা মুতাযদ শিকার করতে যান। আমিও সঙ্গে ছিলাম। ক্ষীরা বা শশার ক্ষেত অতিক্রম করার সময় ক্ষেতের পাহারাদাররা ফরিয়াদ জানাল। মুতাযদ বললেন, কি হয়েছে? তারা বলল, তিনজন গোলাম এসে আমাদের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। অতঃপর তিনি গোলামদের ডেকে এনে ক্ষেতের এক পার্শ্বে হত্যা করেন। কয়েক দিন পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য করে বলতো লোকেরা আমার প্রতি কেন সন্তুষ্ট নয়? বললাম, আপনি রক্ত পিপাসু তাই। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি খিলাফতের তখতে উপবেশন করার পর থেকে কোনো দিন অবৈধ রক্তপাত করিনি। বললাম, আহমদ বিন তয়্যবকে কেন হত্যা করেছেন? তিনি বললেন, সে আমাকে বক্রতার দিকে আহ্বান করতে চাইছিল। বললাম, সেই তিন গোলামকে কেন হত্যা করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, অনুসন্ধান ছাড়া আমি তাদের হত্যা করিনি, তারা হত্যাকারী এবং চোর ছিল।

কাযী ইসমাঈল বলেন, আমি মুতাযদের কাছে গিয়ে দেখলাম তার পেছনে কয়েকজন রোমান সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। চলে আসার সময় তিনি বললেন, কাযী সাহেব! খারাপ ধারণা করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি আজ পর্যন্ত কখনই হারাম কাজের জন্য কোমরের দড়ি খুলিনি। একদিন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমার দিকে এক টুকরো কাগজ নিক্ষেপ করেন। এতে লিখা রয়েছে– কতিপয় আলেম এক স্থানে একত্রিত হয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালের ফতোয়া দিয়েছে। বাদশাহর অবর্তমানে তারা এর উপর আমল করবে। আমি বললাম, তারা বেদ্বীন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা বেদ্বীন না মিথ্যাবাদী? বললাম, যারা মদকে মোবাহ এবং মুতাআকে মোবাহ মনে করে না এবং যারা

মুতাআকে মোবাহ এবং গানকে মোবাহ বলে না এরা কি পথভ্রষ্ট নয়? আর যে আলেমদের ত্রুটি নিয়ে উপহাস করবে সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা পাবে না। এ কথা শুনে মুতাযদ সঙ্গে সঙ্গে কাগজটি পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

মুতাযদ প্রতিটি রণাঙ্গনে অব্যর্থ ও সফল। লোকেরা তাকে ভয় পেত। ফলে নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিতে পারত না; বরং অনেক ফেতনা এমনিতেই প্রতিহত হয়। তিনি খারাজ হ্রাস এবং শুল্ক মওকুফ করেন। তিনি সুশাসন ও ন্যায় বিচারের সুবাতাস বয়ে দেন। প্রজাদের উপর আরোপিত অত্যাচার বিদূরিত করেন। বনূ আব্বাসের খিলাফতের ভিত্তি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বনূ আব্বাসের খিলাফতের ইমারতকে রক্ষা করায় তিনি দ্বিতীয় সাফফাহ নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি পথে ঘাটে গান বাজনা পথ নাট্য করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি লোকদের ঈদুল আযহার নামায পড়াতেন। তিনি প্রথম রাকাআতে ছয় তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে এক তাকবীর বলতেন। তবে তিনি নিজে কোন খুতবা পড়তেন না।

২৮০ হিজরীতে তিনি কায়রো যান এবং আফ্রিকার গভর্নরের সাথে তার লড়াই হয়। এ বছর দেবল থেকে সূর্যগ্রহণের সংবাদ আসে। এ বছর শাওয়াল মাসে দেবলে সূর্যগ্রহণ লাগে। ফলে আসর পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এরপর কালো আধার নেমে আসে– যা প্রথম রাত পর্যন্ত ছিল। এরপর ভূমিকম্প হয়। এতে শহরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। বিধ্বস্ত ভবনের নিচ থেকে আনুমানিক লক্ষাধিক বনী-আদমকে উদ্ধার করা হয়।

২৮১ হিজরীতে রোমের মুকুরিয়া শহর বিজিত হয়। এ বছর রায় এবং তবরিস্তানে পানির সংকট দেখা দেওয়ায় এক রিতল পানির মূল্য দাঁড়ায় এক দিরহাম, লোকেরা দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত প্রাণী খেতে শুরু করে। এ বছর তিনি মক্কার দারুন নদওয়া ভেঙে মসজিদে হারামের পার্শ্বে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

২৮২ হিজরীতে মুতাযদ কাবীহার রেওয়াজসমূহ নিষিদ্ধ করেন। নওরোজের দিন আগুন জ্বালানো এবং লোকদের গায়ে পানি ছিটানোর প্রথা রহিত করেন। এটা ছিল অগ্নিপূজকদের রীতি। এ বছর তিনি কতর আল-নাদা বিনতে খামারুয়া বিন আহমদ বিন তুলুনকে বিয়ে করেন। সে রবিউল আউয়াল মাসেই পৃথক হয়ে যায়। বিয়ের সময় কতর আল-নাদা পৃত্যালয় থেকে চার হাজার কমরবন্দ এবং দশ সেন্দুক ভর্তি মনিমুক্তা নিয়ে স্বামীর ঘরে আসেন।

২৮৩ হিজরীতে গর্ভের বাচ্চাকেও মিরাছ প্রদানের নির্দেশ দেন। এ লক্ষ্যে

তিনি পৃথক একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এ আইনটি জনতার অভিনন্দন কুড়ায় এবং তারা খলীফার জন্য দু'আ করে।

২৮৪ হিজরীতে মিসরে এক প্রকার গভীর লাল বর্ণের প্রকাশ ঘটে। এতে মানুষের চেহারা এবং দেয়ালগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে যায়। ফলে তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'আ করলে এ লাল বর্ণটি আসর থেকে রাত পর্যন্ত থাকে।

ইবনে জারীর বলেন, ২৮৪ হিজরীতে মুতাযদ মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর প্রতি অভিশাপ বর্ষণের জন্য ফরমান জারি করতে চাইলে তার উযীর ওবাইদুল্লাহ বাধা দিয়ে বললেন, এতে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হবে। কিন্তু তিনি তার কথা শুনলেন না। আহকাম জারি করলেন। হুকুম নামায় তিনি হযরত আলী (রা.)-এর প্রশংসা এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর দোষত্রুটি বিধৃত করেন। এটা দেখে কাযী ইউসুফ বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনার এ কাজে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। আপনি এমনটি করবেন না। তিনি বললেন, এর উপায় হিসেবে আমার নিকট আমার তলোয়ার রয়েছে। কাযী সাহেব বললেন, আর আপনি আলী পরিবারের জন্য কি উপায় বের করবেন? তাদের বিচরণ তো জ্ঞানের শেষ সীমানা পর্যন্ত। তারা যদি তাদের অধিকারের কথা শুনে লোকদের হাতে তলোয়ার তুলে দেয়? এ কথা শুনে তিনি স্বীয় ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করেন।

২৮৫ হিজরীতে বসরায় এক প্রকার হলুদ বর্ণের অন্ধকার দেখা দেয়। অতঃপর তা ক্রমান্বয়ে সবুজ এবং কালো বর্ণ ধারণ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আকাশ থেকে দেড়শ' দিরহাম ওজনের একটি চাদর পড়ে। প্রবল ঝড়ে পাঁচ শতাধিক বৃক্ষ উপড়ে যায়। তারপর আসমান থেকে সাদা-কালো পাথর বর্ষিত হয়।

২৮৬ হিজরীতে বাহরাইনে আবু সাঈদের আবির্ভাব ঘটে, সে হজরে আসওয়াদ উপড়ে ফেলে। খলীফার সৈন্যদের সাথে তার লড়াই হয়। তারা পরাজিত হলে সে বসরা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ তার হস্তগত হয়।

খতীব এবং ইবনে আসাকির আবুল হুসাইন আল-খারীবী থেকে রেওয়ায়েত করেন, একদা মুতাযদ কাযী আবু হাযিমের নিকট বলে পাঠালেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কর্জ নিয়েছে। আমি আপনার আদালতের মাধ্যমে আমার পাওনা ফিরে পেতে চাই। কাযী সাহেব বলে পাঠালেন, আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার হায়াত দারাজ করুন। আপনার স্মরণ আছে যে, আপনি আমার কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পণের পর বলেছিলেন, আজ থেকে আদালতের এ কর্তব্য

তোমার উপর বর্তাবে। অতএব সাক্ষী ছাড়া আপনার অভিযোগ কিভাবে বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নেয়া যেতে পারে? তিনি জানিয়ে দিলেন যে, অমুক অমুক আমার সাক্ষী। কাযী সাহেব তাদের পাঠিয়ে দিতে বললেন। খলীফার সাক্ষীদ্বয় কাযীর সামনে এসে ভয়ে বিষয়টি অস্বীকার করলে কাযী সাহেব খলীফার অভিযোগ খারিজ করে দেন।

ইবনে হামদুন নাদীম বলেন, মুতাযদ তার খাস বাঁদি এবং বিশেষ করে তার প্রিয়তমা দারীরাহকে নিয়ে উপসাগরে ষাট হাজার দিনার ব্যয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর দারীরাহ পরলোক গমন করায় তিনি দারুণ ব্যথিত হন।

২৮৯ হিজরীতে মুতাযদ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে রবিউল আখের মাসের ২২ তারিখ সোমবারে ইন্তেকাল করেন।

মাসউদী বলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় একজন ডাক্তার এসে তার নাড়ীতে হাত দিলে তিনি জোরে লাথি দেন। এতে ডাক্তারের মৃত্যুর পরই তার মৃত্যু হয়।

মুতাযদ অনেক কবিতা জানতেন। তিনি চার পুত্র এবং এগারো জন কন্যা রেখে যান। তার শাসনামলে নিম্ন বর্ণিত ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন– ইবনুল মাওয়াযী আল-মালেকী, ইবনে আবীদদুনিয়া, কাযী ইসমাঈল, হারেছ বিন আবু উসামা, আবুল আইনা মুবাররদ, আবু সাঈদ, কবি নাহতারী প্রমুখ।

আল-মুকতাফী বিল্লাহ

আল-মুকতাফী বিল্লাহ আবু মুহাম্মদ আলী বিন মুতাযদ ২৬৪ হিজরীর রবিউল আখের মাসের মাঝামাঝিতে জীজক নামক তুর্কী বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৃষ্টান্তহীন সুদর্শন ছিলেন। পিতা মুতাযদের খিলাফতকালেই তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হন। পিতার অসুস্থতার সময় ২৮৯ হিজরীর রবিউল আখের মাসের ১৯ তারিখে আসর নামাযের পর লোকেরা তার বাইআত করে।

সূলী বলেন, খলীফাদের মধ্যে তার নামটি হযরত আলী ছাড়া আর কারো ছিল না। ইমাম হাসান বিন আলী, হাদী এবং মুকতাফী ব্যতীত 'আবু মুহাম্মাদ' কারো কুনিয়ত ছিল না। মুতাযদের মৃত্যুর সময় মুকতাফী রাক্কা শহরে অবস্থান করছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে উযীর আবুল হাসান কাসিম বিন উবায়দুল্লাহ তার পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। তাকে খবর দেয়া হলে তিনি জমাদিউল আখের মাসের ৭ তারিখে দজলা নদী দিয়ে জাহাজ যোগে বাগদাদ এসে পৌছান। তার

আগমনে বাগদাদবাসী খুশি হয়ে তাকে স্বাগত জানায়। তিনি তখত নসীন হওয়ার পর তার পিতা লোকদের কাছ থেকে যেসব ঘর-বাড়ি দখল করেছিল তিনি সেগুলো ভেঙে তদস্থলে মসজিদ নির্মাণ করেন। যেসব বাগান এবং দোকান নেয়া হয়েছিল তিনি তা মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন। এতে তিনি জনতার চোখে মহানুভবতায় পরিণত হন। লোকেরা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

এ বছর বাগদাদে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এর প্রকোপ কয়েক দিন পর্যন্ত থাকে। বসরায় তীব্র ঝড়ের কারণে অনেক বৃক্ষ উপড়ে পড়ে। যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী ইতিহাসে বিরল। ইয়াহইয়া বিন যাকরুয়া কারমতীর সাথে শাহী সৈনিকদের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ২৯০ হিজরীতে সে মারা গেলে তদস্থলে তার ভাই হুসাইন 'আমিরুল মুমিনীন মাহদী' উপাধি ধারণ করে নেতৃত্ব দেন। তার চেহারায় একটি দাগ ছিল। সেও ২৯১ হিজরীতে নিহত হন।

২৯১ হিজরীতে ইনতালিয়া প্রচুর মালে গনীমতসহ বিজিত হয়। ২৯৩ হিজরীতে দজলা নদী ফুলে-ফেঁপে এমন তরঙ্গের সৃষ্টি করে যার আকস্মিক আঘাতে বাগদাদের অধিকাংশ অংশ ধসে পড়ে। সেদিন বাগদাদের রাজপথে ২১ হাত পানি জমা হয়।

সূলী বলেন, আমি মুকতাফীর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, আল্লাহর কসম! আমি সেই সাত শ' দিনারের জন্য দারুণ ভীত– যা মুসলমানদের সম্পদ আমি ব্যয় করেছি। আমার ভয় হচ্ছে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা যেন এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করেন। এ ভুলের জন্য আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তিনি ২৯৫ হিজরীর যিলকাদা মাসের ২২ তারিখ রবিবার রাতে যুবক কালেই ইন্তেকাল করেন। আট ছেলে এবং আট মেয়ে রেখে তিনি মারা যান।

তার যুগে যেসব ওলামা হযরত মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা হলেন– আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল, ইমামুল আরাবী কানবাল মাকরী, মুফতী আবু আব্দুল্লাহ বুসানজী, মুসনাদের লেখক বায়যার, আবু মসনদ আল-কুযী, কাযী আবু হাযিম, সালেহ জুযাহ, মুহাম্মাদ বিন নসরুল মরুযী, আবু হুসাইন নূরী, আবু জাফর তিরমিযী প্রমুখ।

আব্দুল গাফের কর্তৃক প্রণীত তারীখে নিশাপুর গ্রন্থে মুকতাফীর খিলাফতের তখতে উপবেশন সংক্রান্ত ইবনে আবীদ দুনিয়ার একখানা রেওয়ায়েত আমি দেখেছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে আবীদদুনিয়া মুকতাফীর যুগে জীবিত ছিলেন।

আল-মুকতাদার বিল্লাহ

২৮২ হিজরীর রমযান মাসে গারীব নামক রোমান অথবা তুর্কী বাঁদির গর্ভে আল-মুকতাদার বিল্লাহ আবুল ফজল জাফর বিন মুতাযদ জন্মগ্রহণ করেন। অন্তিম শয্যায় মুকতাফীকে পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মুকতাদার সে সময় বালেগ হওয়ায় তিনি তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুকতাদার তেরো বছর বয়সে খিলাফতের তখতে সমাসীন। তিনিই বয়সের দিক দিয়ে সর্ব কনিষ্ঠ খলীফা। উযীর আব্বাস বিন হাসান তাকে বাচ্চা ভেবে তার বাইআত থেকে সরে দাঁড়ানোর মতামত ব্যক্ত করলে লোকেরা সমর্থন জানিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মুতায-এর প্রস্তাব করে। জানতে পেয়ে আব্দুল্লাহ বিন মুতায বলল, রক্ত ঝরার আশঙ্কা না থাকার শর্তে আমি খিলাফত গ্রহণ করব। সংবাদ পেয়ে মুতাকাদ বিপুল পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে আব্দুল্লাহকে সন্তুষ্ট করায় আব্দুল্লাহ খিলাফত প্রত্যাখ্যান করে।

জনগণ এ প্রক্রিয়া মেনে না নেয়ায় ২৯২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের বিশ তারিখে ফুটবল খেলারত অবস্থায় জনতা মুকতাদারের উপর আক্রমণ করে বসলে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেন। লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন মুতাযাদকে ডেকে আনলে সামরিক অফিসারগণ, বিচারকমণ্ডলী, রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শহরের অভিজাত শ্রেণীর নাগরিকরা তার হাতে বাইআত করেন এবং তাকে গালিব বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন জ াররাহকে উযীর এবং আবুল মুছনা আহমদ বিন ইয়াকুবকে কাযী পদে নিয়োগ দানে নতুন খলীফার নামে আহকাম জারি হতে থাকে।

মাআফী বিন যাকারিয়া জারীরী বলেন, মুকতাদারকে অপসারণ করে ইবনে মুতাযের বাইআত গ্রহণের পর লোকেরা মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারীর নিকট এলে তিনি নতুন উযীর এবং কাযীর নাম জানতে চাইলেন। তারা বলল, মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন জাররাহ হলেন উযীর, আর আবুল মুছনা আহমদ বিন ইয়াকুব হলেন কাযী। তিনি বললেন, এ কাজ পূর্ণতা পায়নি। তারা বলল, আপনি কি এদের যোগ্য মনে করছেন না?

বাইআতের পর ইবনে মুতায মুকতাদারকে দারুল খুলাফা ছেড়ে দেবার কথা বলে পাঠালে মুকতাদার বললেন, বিনা চেষ্টায় কেন তা ছেড়ে দিব? মুকতাদার তার পক্ষের কতিপয় লোককে অস্ত্র সজ্জিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইবনে মুতাযের বাহিনীতে ভীতি ছড়ায়ে দিলেন। ইবনে মুতায তার উযীর ও কাযীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। বাগদাদে কতলে আম (গণহত্যা) আরম্ভ হল। সেসব ফকীহ এবং আমীরগণ মুকতাদারকে অপসারণ করেছিল তাদের বন্দী করে ইউসুফের নিকট সোপর্দ করা

হলে তিনি তাদের মধ্য থেকে চারজন বাদে যাদের মধ্যে কাযী আবু উমর ছিল সকলকে হত্যা করেন। ইবনে মুতাযকে বন্দী করে জিন্দানখানায় পাঠানো হয়। কয়েক দিন পর সে লাশ হয়ে বেরিয়ে আসে।

অতঃপর মুকতাদার আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন ফরাতকে উযীর নিয়োগ করেন। তিনি মাজলুমদের পাশে দাঁড়ান, ইনসাফের প্রসার ঘটান এবং মুকতাদারকে ইনসাফ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে মুকতাদার সাম্রাজ্যের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব আবুল হাসানের উপর অর্পণ করে তিনি খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ বছর তিনি ইহুদী ও খৃস্টানদের সেবা গ্রহণ না করার ফরমান জারি করেন। এ বছর পশ্চিমাঞ্চলে মাহদী নামক এক প্রতারকের আবির্ভাব ঘটে। সে ইমামত দখল করে এবং খিলাফতের দাবী তোলে, লোকেরা তার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে এবং দূর-দূরান্ত থেকে জনতার ঢল এসে তার পতাকা তলে সমবেত হয়। ধীরে ধীরে পশ্চিমাঞ্চলীয় জনপদগুলো তার কজায় আসতে থাকে এবং তার ভূখণ্ডের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সে ইমাম মাহদীর দাবী করে। অবশেষে অফ্রিকার গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ বিন আগলিব পালিয়ে মিসর হয়ে ইরাক পাড়ি জমান। এরপর মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রশাসন বনূ আব্বাসের হাত থেকে মাহদীর দখলে চলে যায়।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং বনূ আব্বাসের জন্য একটি মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ক্রান্তিকাল। এ হিসাব মোতাবিক বনূ আব্বাসের সাম্রাজ্য মুসলিম বিশ্ব হিসেবে ১৬০ বছরের চেয়ে কিছু বেশি সময় তাদের হতে পরিচালিত হয়ে আসে। এরপর মুসলিম জাহানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো তাদের হাতছাড়া হতে থাকে।

যাহাবী বলেন, বয়সে ছোট হওয়ার কারণে মুকতাদার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনেক ভুল-ভ্রান্তির জন্ম দেন।

৩০০ হিজরীতে দায়নুর শহরে একটি পাহাড় ধসে পড়ে এবং এর নীচ থেকে এত পানি বের হয় যা দ্বারা কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়। এ বছর মাদী খচ্চর পুরুষ খচ্চরে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৩০১ হিজরীতে আলী বিন ঈসাকে উযীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি অত্যন্ত ঈমানদারী, ইনসাফ এবং তাকওয়ার সাথে কাজ করতেন। তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ করে আহকাম জারি করেন। তিনি শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক বাজার গড়ে তোলেন। এ বছর আবু উমরকে দ্বিতীয় বার কাযী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছর মুকতাদার

সর্বপ্রথম অশ্বারোহণে স্বীয় প্রাসাদ থেকে শামাসীয়া শহরে গমন করেন এবং জনতার সামনে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটান। এ বছর হুসাইন হাল্লাজ মারুফ মানসুর (মানসুর হাল্লাজ-অনুবাদক) উটের পিঠে চড়ে বাগদাদ আসেন। তিনি নিজেকে আনাল্লাহ (আমি আল্লাহ) দাবী করতেন। বাগদাদে এর প্রসার ঘটে। তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে জানা যায় কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ সম্পর্কে তার কোনই ধারণা নেই। এ আকীদা বহনের জন্য তাকে বন্দী করা হয়। অবশেষে ৩০৯ হিজরীতে কাযী আবু উমরের ফতোয়া মোতাবিক তাকে শূলেতে চড়ানো হয়।

৩০১ হিজরীতে মাহদী চল্লিশ হাজার বারবার সৈন্য নিয়ে মিসর আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করে। পথিমধ্যে নীল নদে প্রবল উত্তাল থাকার কারণে তারা ইস্কান্দারীয়ায় ফিরে গিয়ে সেখানে ফেতনা ফাসাদের জন্ম দেয়। তাদের প্রতিহত করার জন্য শাহী ফৌজ পাঠানো হয়। বরকা অঞ্চলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হলে শাহী বাহিনী পরাজিত হয় এবং মাহদী ইস্কান্দারীয়া এবং ফিউম পদানত করে।

৩০২ হিজরীতে মুকতাদার তার পাঁচ পুত্রের খতনা করেন। এ বাবদ তিনি ছয়লাখ দিনার খরচ করেন। পুত্রদের সাথে তিনি অগণন ইয়াতিম শিশুর খতনা করান এবং তাদের প্রতি অনেক করুণা করেন।

এ বছর মুকতাদার সর্বপ্রথম মিসরের জামে মসজিদে নামায পড়ান।

৩০৪ হিজরীতে বাগদাদে যাবযাব নামক একটি ভয়ঙ্কর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে, সে রাতে দ্বি-তলায় উঠে বাচ্চাদের খেয়ে ফেলত এবং নারীদের নিতম্বে আঘাত করত। লোকেরা তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য থালাবাসন বাজাত। এ ঘটনা অনেক দিন পর্যন্ত চলে।

৩০৫ হিজরীতে রোমান সাম্রাজ্য মুকতাদারের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে এবং সন্ধি করার জন্য উপঢৌকনসহ কতিপয় লোক তার কাছে পাঠানো হয়। মুকতাদার রোমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শামাসীয়া তোরণ থেকে দারুল খুলাফা পর্যন্ত এক লাখ ষাট হাজার বর্ম পরিহিত সৌন্য দাঁড় করিয়ে দেন। তাদের পেছনে ষাট হাজার সেবক এবং সাত শ' প্রহরী নিয়োগ করেন। দারুল খুলাফায় দেয়ালগুলোতে গৌরচন্দ্রিকা খাতে আটচল্লিশ হাজার যবনিকা দ্বারা সুসজ্জিত করেন। বাইশ হাজার কার্পেট বিছিয়ে দেন। একশ' শিকারী পাখি শিকলে বেঁধে নিজের সামনে রাখেন।

এ বছর ওমানের বাদশাহ মুকতাদারের নিকট উপঢৌকন পাঠায়। এর মধ্যে

ছিল কালো বর্ণের একটি পাখি- যে তোতা পাখি বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাবে পার্সী ও হিন্দী ভাষায় কথা বলত।

৩০৬ হিজরীতে মুকতাদারের মা একটি চিকিৎসালয় গড়ে তোলেন। যার বার্ষিক খরচের পরিমাণ চার হাজার দিনার। এ বছর মুকতাদারের অবহেলার কারণে সাম্রাজ্যের সকল বন্দোবস্ত শাহী হারামের হাতে চলে যায়। মুকতাদারের মা প্রতি জুমুআয় ইজলাসের আহ্বান করতে থাকেন। এতে কাযীগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিত হওয়ার ফরমান জারি করেন। এ বছর কাসিম মুহাম্মাদ বিন মাহদী মিসরের অধিকাংশ জনপদ দখল করে নেয়।

৩০৮ হিজরীতে বাগদাদে খাদ্যশস্যের দারুণ সংকট দেখা দেয়। ফলে প্রজাবৃন্দ অভাব-অনটনে নিপতিত হয়। কথিত আছে, বাগদাদে প্রশাসক হামেদ বিন আব্বাসের অত্যাচারে জনগণ অস্থির হয়ে লুটপাট আরম্ভ করলে লড়াই বেধে যায়। ক্ষিপ্ত জনতা জেলখানায় আগুন ধরিয়ে দিলে কয়েদীরা পালিয়ে যায়। সাম্রাজ্যের উযীরকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য গোলযোগপূর্ণ হয়ে উঠলে বাগদাদ পর্যন্ত কোন শস্য পৌঁছাত না।

এ বছর আল-কাসিম জাযীরা কাসতাত শহর দখল করে নিলে মিসরবাসী বিচলিত হয়ে উঠে। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

৩১১ হিজরীতে তিনি এ আদেশ দেন যে, মুতাযদের ফরমান মোতাবিক গর্ভস্থ বাচ্চাকে অবশ্যই সম্পদের ভাগ দিতে হবে। ৩১২ হিজরীতে খোরাসানের আমীরের হাতে ফারগানা বিজিত হয়। ৩১৪ হিজরীতে রোম সাম্রাজ্যের মালতীয়া অঞ্চল তলোয়ার দ্বারা জয় হয়। এ বছর দজলা নদীর পানিতে মওছুল শহর প্লাবিত হয়। ৩১৫ হিজরীতে রোমানরা দিময়াত শহরে লুটপাট করে। এবং জামে মসজিদে বাঁশি বাজায়। এ বছর দিলাম গোত্রের লোকেরা রায় এবং জাবাল শহরে হামলা করে গভর্নরকে হত্যা এবং বাচ্চাদের যবেহ করে।

৩১৬ হিজরীতে কারমাতী দারুল হিজরত নামক একটি ভবন তৈরি করায় বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে সে অনেক জনপদ দখল করে। তার সহচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তার সৈন্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খিলাফতের ভিত্তি কেঁপে উঠে। মুকতাদার তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য কয়েক বার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে তারা ফিরে আসে। তাদের ভয়ে হজ্জ বন্ধ হয়ে যায়। মক্কাবাসী মক্কা শরীফ ছাড়িয়ে পালিয়ে

যায়। রোমনরা খাল্লাত আক্রমণ করে সেখানকার জামে মসজিদের মিম্বর বের করে তদস্থলে ক্রুশদণ্ড স্থাপন করে।

৩১৭ হিজরীতে মুনিস ভেবেছিল মুকতাদার আমাকে বাদ দিয়ে হারুন বিন গারীবকে আমীরুল উমারা বানাতে চান- এজন্য সে বিদ্রোহ করে। মুহাররম মাসে শুক্লা পক্ষে এশার পর সকল সৈন্য ও আমীরকে নিয়ে দারুল খুলাফা আক্রমণ করে। এ দৃশ্য দেখে মুকতাদারের প্রাণ উড়ে যায়। সে সময় তিনি স্বীয় জননী, খালা এবং স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়েন। তার ঘর থেকে ছয় লাখ দিনার লুট করে নেয়। লোকেরা তার অপসারণের উপর সাক্ষ্য দেয়। মুনিস এবং আমীরগণ মুহাম্মাদ বিন মুতাযদকে আল-কাহির বিল্লাহ লকব দিয়ে তার বাইআত গ্রহণ করেন। আবু আলী বিন মুকালার উপর উযীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। এটা ছিল জুমআর দিন। রবিবারে আলকাহির বিল্লাহ ইজলাস করেন। সোমবারে উযীর এ সংবাদ সকল রাজ্য প্রশাসকদের নিকট সরবরাহ করে। সেদিন সৈন্যরা তাদের বেতন-ভাতাদি প্রার্থনা করে। সে সময় মুনিস উপস্থিত ছিল না। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সৈন্যরা দিরহানকে হত্যা করে, মুনিসের ভবনে হামলা চালায় এবং মুকতাদারের অনুসন্ধান করে। অবশেষে তারা মুকতাদারকে কাঁধে করে দারুল খুলাফায় নিয়ে আসে এবং আল কাহির বিল্লাহকে ধরে এনে তার সামনে পেশ করে। সে সময়-আল-কাহির কাঁদছিলেন। অন্তর আল্লাহ আল্লাহ করছিল। মুকতাদার তাকে বললেন, ভাই' ভয় পেয়ো না। তোমার কোনো অপরাধ নেই। তুমি আমার কোন অসম্মান করনি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কিছুই বলব না, এ ঘটনা অবলোকনে লোকেরা নীরব নিস্তব্ধ হয়। পূর্বের উযীরকেই আবার নিয়োগ করেন। রাজ্যগুলেতে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়। মুকতাদার খলীফার আসনেই অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সৈন্যদের পুরস্কৃত করেন।

এ বছর মুকতাদার হাজীদের সাথে মানসুর দালমীকে পাঠান। যিনি হাজীদের নিরাপদে মক্কা শরীফে পৌছে দেয়। ৮ যিলহজ্জ তারাখে আল্লাহর দুশমন আবু তাহির কায়মতী মক্কায় গিয়ে মসজিদে হারামের হাজীদের হত্যা করে এবং লাশগুলো যমযম কূপে ফেলে দেয়। লৌহদণ্ডের আঘাতে হজরে আসওয়াদ ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এবং খানায়ে কাবার দেয়াল থেকে তা পৃথক করে ফেলে। এগারো দিন পর্যন্ত হজরে আসওয়াদ এভাবেই পড়ে ছিল। অতঃপর সে তা নিয়ে চলে যায়। বিশ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত সেটি তার কবজায় ছিল। পঞ্চাশ হাজার দিনারের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দেবার কথা হলেও পরবর্তীতে সে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি

জানায়। অবশেষে মতির খিলাফত কালে হজরে আসওয়াদটি আনা হয়।

কথিত আছে, হজরে আসওয়াদটি মক্কা শরীফ থেকে দারুল হিজরাতে নিয়ে যাবার সময় যে উট একে বহন করেছে সে উটই মারা গেছে। এভাবে পথিমধ্যে চল্লিশটি উট মারা যায়। আর ফিরিয়ে আনার সময় হজরে আসওয়াদ বহনকারী দুর্বল উটটি মোটাতাজা হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন রবী বিন সুলায়মান বলেন, কারামতের এ বছরে আমি মক্কা শরীফে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কাবা শরীফের সাদের নালা খুলে ফেলার জন্য সাদে উঠলে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আমি দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! আপনি বড়ই সহনশীল। কিন্তু এ জুলুম আমার মোটেও সহ্য হয় না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সাদ থেকে পড়ে মারা গেল।

কারমতী কাবার দরজায় উঠে এ কবিতাটি পাঠ করে-"আমি আল্লাহর সাথে রয়েছি, আল্লাহর কসম! আমিই সৃজনশীলতাকে সৃষ্টি করি এবং ধ্বংস করি।" এরপর এ জালেম লোকটি বেশি দিন অবকাশ পায়নি, সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ বছর বাগদাদে একটি বড় ফিতনা সৃষ্টি হয়। এর কারণ হল- ইরশাদ হচ্ছে,

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থ-" অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিবেন।"-এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে। হানাবিলা সম্প্রদায়ের দাবী এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আরশে পাকে সমাসীন করাবেন। আর অপর পক্ষের বক্তব্য হল-এর অর্থ এটা নয়। এ থেকে রাসূলের শাফাআত উদ্দেশ্য। এ ফিতনায় অনেক লোক প্রাণ হারায়।

৩১৯ হিজরীতে কারমতী কুফায় এসে ধমক দিলে বাগদাদবাসী বাগদাদ দখলের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। লোকেরা এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে অত্যন্ত বিনয় জড়িত ক্রন্দনের সাথে প্রার্থনা করে। এ বছর দিলাম গোত্রের লোকেরা দিনুর অঞ্চল দখল করে সেখানকার অনেক লোককে বন্দী এবং হত্যা করে।

৩২০ হিজরীতে মুনিস বারবার জাতি নিয়ে গঠিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুকতাদারকে আক্রমণ করতে এলে তিনিও সসৈন্যে ময়দানে আসেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জনৈক বারবার ফৌজের বর্শার আঘাতে মুকতাদার যমীনে পড়ে গেলে সে তার তলোয়ার ধারা খলীফার মাথা কেটে ফেলে। তার কর্তিত মস্তক বর্শার আগায়

গেঁথে তার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং তার লাশটি উলঙ্গ করে দূরে ফেলে দেয়। লোকেরা খড়কুটো ও বর্জ্য দ্বারা তার লজ্জা স্থান ঢেকে দেয় এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। এটা ৩২০ হিজরীর শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ সোমবারের ঘটনা।

মুকতাদার বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি শাহওয়াত এবং শরাব থেকে অপারগ ছিলেন। তার সাথে অপচয় পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করত। নারীরা তার উপর পেরেশান ছিল। তিনি তাদের মাঝে খিলাফতের সকল জওহর বিলিয়ে দেন। তিনি এতিমদের তিনগুণ বেশিদান করতেন। অনন্য ও অদ্বিতীয় একটি জওহরের তসবীহ তিনি এক দারোগাকে দান করেন। তার নিকট রোমান, সাকালাবী এবং হাবশী গোলাম ছাড়াও এগারো হাজার হিজড়া গোলাম ছিল।

মুকতাদারের বারো পুত্রের মধ্যে রেজা, মুত্তাকী এবং মতি-এ তিনজন খলীফা হন। আব্দুল মালিকের চার পুত্র খলীফা হয়েছিলেন– যার দৃষ্টান্ত বিরল। এটা যাহাবীর অভিমত। তবে আমার (গ্রন্থকারের) মতে আমার যুগ পর্যন্ত মুতাওয়াক্কিলের পাঁচ জন আওলাদ আল-মুসতাইন আব্বাস, আল-মুতাযদ দাউদ, মুসতাকফী সুলায়মান, আল-কায়িম হামযা এবং আল-মুসতানজিদ ইউসুফ খলীফা হন- যার উপমা নেই।

লতীফাহ লাতাইফুল মাআরিফ ছাআলাবীর মধ্যে রয়েছে, মুতাওয়াক্কিল এবং মুকতাদার ছাড়া কারো নাম জাফর ছিল না। উভয়ে নিহত হন। মুতাওয়াক্কিল সোমবার রাতে, আর মুকতাদার সোমবার দিনে মারা যান।

তার শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– মুহাম্মাদ বিন আবু দাউদ যাহির, কাযী ইউসুফ বিন ইয়াকুব, শাফী মাযহাবের শায়েখ ইবনে শারীহ, যিনদ, দানশীল আবু উসমান জিরী, আবু বকর দাইযী, জাফর কারয়ানী, কবি ইবনে বাসাস, সুনানের লেখক নাসায়ী, সুনানের লেখক হাসান বিন সুফিয়ান, মুতাযালাদের শায়েখ জায়া জায়ায়ী নাহুবিদ ইয়ামুত বিন মারযা, ইবনে জাল্লা, মুসনদের লেখক আবুল আলী মওসূলী, মিশরের সম্মানিত কারী ইশনানীল মাকরী বিন ইউসুফ, মিসরের প্রখ্যাত কারী ইবনে ইউসুফ, মুসনাদের লেখক আবু বকর রুয়ানী, ইমাম ইবনে মুনযির, ইবনে জারীর তাবারী, নাহুবিদ যিজাজ, ইবনে খুযা ইমা, ইবনে যাকারিয়া তয্যাব, বিনানুল জামাল, আবু বকর বিন আবু দাউদ সিজি স্তানী, নাহুবিদ ইবনে সারাজ, আবু আওয়ানা, মুসনাদের লেখক আবুল কাসিম বাগবী, আবু উবায়দা বিন হারবুয়া, মুতাযালাদের শায়েখ কা'বী, কাযী আবু উমর, কাদামা প্রমুখ।

আল-কাহির বিল্লাহ

আল-কাহির বিল্লাহ আবু মানসূর মুহাম্মাদ বিন মুতাযদ বিন তলহা বিন মুতাওয়াক্কিল ফিতনাহ নামক বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুকতাদার নিহত হওয়ার সময় লোকেরা তাকে এবং মুহাম্মাদ বিন মুকতাফীকে নির্বাচন করে। তারা খিলাফত গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে ইবনে মুকতাফীর নিকট গেলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, খিলাফতে আমার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার চাচা কাহির খিলাফতের বেশি হকদার। কাহির খিলাফত গ্রহণ করলে বাইআত হয়ে যায়। ৩১৭ হিজরীতে তাকে আল-কাহির উপাধি দেয়া হয়।

তিনি খিলাফতে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম মুকতাদারের আওলাদদের উপর জরিমানা আরোপ করেন এবং এতে তারা অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে, মুকতাদারের মা ধুঁকেধুঁকে ইন্তেকাল করেন।

৩২১ হিজরীতে সেনা বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে মুনিস এবং ইবনে মুকালাহসহ কতিপয় লোক কাহিরকে খিলাফতচ্যুত করে ইবনে মুকতাফীকে তখতে বসানোর চেষ্টা চালায়। জানতে পেয়ে কাহির একটি ফাঁদ পাতেন। তিনি তার বিরোধী সকলকে বন্দী করে হত্যা করেন। এবং ফৌজদের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে হাত করে নেন। এভাবে তিনি প্রজাদের অন্তরে মর্যাদার আসন করে নেন। তিনি তার লকবের সাথে 'আল-মুনতাকিম মিন আ'দায়াদ্বীনিল্লাহ'— এতটুকু বৃদ্ধি করেন।

এ বছর তিনি গায়িকা বাঁদিদের রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মদ দূরে ফেলে দেন। গায়কদের বন্দী করেন। হিজড়াদের নির্বাসনে পাঠান। খেলাধূলার সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। যারা উত্তেজনাকর গান গাইত এবং যারা ঠাণ্ডা সঙ্গীত পরিবেশন করত না তাদের বিক্রি করে দেবার নির্দেশ দেন। অথচ তিনি নিজেই অসম্ভব রকম গান শুনতেন এবং মদ পান করে বুদ হয়ে থাকতেন।

৩২২ হিজরীতে দায়লম আলী বিন বুয়ার সহযোগিতায় ইস্পাহানের উপর আক্রমণ চালায়। সে সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। খলীফার নায়েবের সাথে মিলে মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুবকে পরাজিত করে এবং ইবনে বুয়া পারস্যের দিকে দৃষ্টি দেয়। তার বাবা-মা ছিল হতদরিদ্র। তারা মৎস্য শিকার করত। একদিন সে স্বপ্নে দেখল, তার পেশাবের রাস্তা দিয়ে এক খণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়ে পৃথিবী আলোকিত করে ফেলেছে। সে নিজেই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করল এ ভাবে যে, তার আওলাদ বাদশাহ হবে। আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমানা যুদ্ধের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হবে।

ইবনে বুয়া অনেক মাল জমা করে এবং অধিকাংশ শহর তার পদানত হয়। খোরাসান এবং পারস্য খিলাফত থেকে বেরিয়ে ইবনে বুয়ার অধীনে চলে যায়। এ বছর কাহির ইসহাক বিন ইসমাঈলকে কূপের মধ্যে লটকিয়ে হত্যা করেন। তার অপরাধ ছিল- সে খিলাফত লাভের আগে কাহিরের এক বাঁদিকে কাহিরের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছিল।

এ বছর ইবনে মুকালা আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে এসে সেনা বাহিনীতে এ অপপ্রচার চালায় যে, সৈন্যদের বন্দী করে রাখার জন্য কাহির ভূগর্ভস্থ কক্ষ নির্মাণ করেছেন। এ কথা শুনে তারা কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে কাহিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি পালিয়ে যান এবং ৩২২ হিজরীর জামাদিউল আখের মাসের ছয় তারিখে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের হাতে তিনি বন্দী হন।

জনগণ আব্বাস মুহাম্মাদ বিন মুকতাদারের নিকট বাইআত করে এবং আর-রাযী বিল্লাহ উপাধি দিয়ে তার উপর খিলাফত চাপিয়ে দেয়। অতঃপর লোকেরা উযীর, আবুল হাসান বিন কাযী আবু উমর, হাসান বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল শাওয়ারিব, আবু তালিব বিন বহলুলকে কাহিরের নিকট পাঠায়। তারা তাকে বলল, এখন আপনি কি করতে চান? তিনি বললেন, তোমরা আমার বাইআত করেছ। আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নই। তোমরা আমার আনুগত্য করবে এবং অন্যদেরকেও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর জবাবে উযীর কাহিরকে অপসারণের অভিমত ব্যক্ত করে চলে যায়।

কাযী আবুল হাসান বলেন, আমি রাযীর নিকট গিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিতে তার আমানত ফরয। রাযী বললেন, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হল। আমি সেখান থেকে চলে আসার পর কাহিরের চোখে সীসা ঢেলে দেয়া হয়, ফলে তিনি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যান।

মাহমুদ ইস্পাহানী বলেন, দুশ্চরিত্র এবং রক্ত ঝরানোর প্রতি অসম্ভব নেশার কারণে কাহিরকে অপসারণ করা হয়। তিনি পদচ্যুত হতে অসম্মতি জানালে তার চক্ষুদ্বয় খুলে নেয়া হয়।

সূলী বলেন, কাহির ছিলেন রক্ত পিপাসু, দুশ্চরিত্র, স্বতন্ত্র মেজাজ এবং মদ্যপায়ী। প্রহরী পছন্দ না হলে তিনি তার বংশের পর বংশ হত্যা করতেন। তিনি বর্শা হাতে নিলে কাউকে না কাউকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না।

আলী বিন মুহাম্মাদ খুরাসানী বলেন, একদা আমি কাহিরের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন। সে সময় তার সামনে বর্শা রাখা ছিল। তিনি আমাকে বনূ আব্বাসের খলীফাদের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে বললেন। আমি

বলতে লাগলাম, সাফফাহ রক্ত পিপাসু ছিলেন। তার দেখাদেখি তার প্রশাসকবৃন্দও তার অনুসরণ করে। তথাপি তিনি ছিলেন দানশীল। মানসুর সর্বপ্রথম আব্বাস এবং আবু তালিব উভয় বংশে অনৈক্যের জন্ম দেন– যা পূর্বে ছিল না। তিনি কবিদের সভাসদের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম সুরিয়ানী এবং অনারব ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি যেমন– কালীলাহ, দিমনাহ, উকলীদস, গ্রীক দর্শনের বিপুল বই পুস্তক ইত্যাদি অনুবাদ করান। সেগুলোর প্রতি লোকদের আকর্ষণ প্রবল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দেয়। ফলে সে সময় মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধি বৃত্তিক এ নাজুক মুহূর্তে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মাগাযী এবং সীরাতের গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। মানসুর প্রথম খলীফা যিনি আরবে গোলামদের বিচারকদের পদে নিয়োগ করেন। মাহদী অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, দানশীল এবং ইনসাফগার ছিলেন। তার বাবা যেটুকু আত্মসাদ করেছিলেন তিনি তা লোকদের ফিরিয়ে দেন। হত্যাযজ্ঞ ঠেকাতে তিনি জীবনভর অসম্ভব রকম চেষ্টা করেছেন। তিনি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার উন্নয়নমূলক কাজ করেন। হাদী জালেম এবং অহংকারী। তার কর্মকর্তারা তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর কাজ করত। হারুন রশীদ জীবনের অধিকাংশ সময় হজ্ব এবং জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। তিনি মক্কা যাবার পথে বিশ্রামাগার এবং পানির বড় বড় হাউজ নির্মাণ করেন। আযনা, তারতুস, মাসীসা, মারআশ প্রভৃতি জনপদ আবাদ করেন। তিনি জনসাধারণের প্রতি অনেক ইহসান করেন। তার যুগে মক্কাবাসী উরুজ করত। তিনি প্রথম খলীফা যিনি বনূ আব্বাসের খলীফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম দাবা এবং তাস খেলেন। আমীন বড়ই উদার এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি স্বাদে-গন্ধে লিপ্ত হওয়ায় ফিতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়েন। মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনে প্রভাবিত হন। তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র, উদার এবং ধৈর্যশীল। মুতাসিম মামুনের পদাঙ্কক অনুসরণে চলতেন। তবে অনারব বাদশাহদের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধ করেন এবং অনেক বিজয় ছিনিয়ে আনেন। ওয়াছেক বাবার অনুসরণে চলেন। মুতাওয়াক্কিল মামুন এবং মুতাসিমের বিপরীত ছিলেন। এমনকি আকীদাগত দিক থেকেও। তিনি মুনাযারা (বিতর্ক) বন্ধ করে দেন। অপরাধীদের শাস্তি নির্ধারণ করেন। হাদীস পঠন ও শ্রবণের নির্দেশ দেন। খলকে কুরআনের বিরোধিতা করেন। অতঃপর আমি অবশিষ্ট খলীফাদের বিবরণ পেশ করলাম। তিনি বললেন, তুমি বাস্তব ও স্বচ্ছ বর্ণনা বিধৃত করেছ।

মাসউদী বলেন, কাহির মুনিসের অনেক সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। খিলাফত থেকে অপসারিত হওয়ার পর অন্ধ হয়ে গেলে জনগণ তাদের হারানো সম্পদ

ফিরিয়ে দেবার চাপ দিলে তিনি তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তারা বিভিন্নভাবে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। অবশেষে রাযী বিল্লাহ তাকে ডেকে এনে বললেন, আজ আমজনতা নিজেদের অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে পেতে চায়। আমার নিকট এমন কোনো ভাণ্ডার নেই যা দিয়ে তাদের দাবী মেটাতে পারব। ভালো হবে যদি তুমি বলে দাও যে, সেই ধনরাজ কোথায় গোপন করে রেখেছ? কাহির বললেন, বাগানে পুঁতে রেখেছি। (কাহির শখ করে বাগানটি লাগিয়েছিলেন। এতে ছিল বারোটি নদী এবং প্রাসাদসমূহ) বাগান খনন করলে পাবে। রাযী এ বাগানের সৌন্দর্যে বিমোহিত ছিলেন। তিনি বাগান খনন করতে চাইছিলেন না। ফলে রাযী বললেন, একটি নির্দিষ্ট স্থানের কথা বল। কাহির বললেন, আমি অন্ধ নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিতে পারব না। তবে কয়েক জায়গায় খনন করো ধনরাজির সন্ধান পাবে। রাযী বাধ্য হয়ে খননকার্য আরম্ভ করেন। প্রাসাদের ভিত্তিমূল্যে খনন করা হয়। বৃক্ষ নিধন হয়। কিন্তু ধন-সম্পদের কোন হদিস মিলল না। আবার কাহিরকে বলা হল, সর্বশেষ সম্পদ তুমি কোথায় রেখেছ? কাহির বললেন, আমার কাছে মূলত কোন সম্পদই নেই। এ বাগানে তুমি সুখের জীবন অতিবাহিত করবে, আর আমি দেখব, তা যেন না হয় সে জন্য বাহানা করে বাগানের লাবণ্য বিনষ্ট করেছি। এ কথা শুনে রাযী ভীষণ লজ্জা পেয়ে চলে যান এবং ৩৩৩ হিজরীতে তাকে বন্দী করা হয়। অতঃপর আবার তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

কাহির ৩৩৯ হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি আব্দুস সামাদ, আবুল কাসিম, আবুল ফজল এবং আব্দুল আযীয নামক চার পুত্রের জনক।

হানাফী মাযহাবের শায়খ ইমাম তোহাবী, ইবনে দরীদ, আবু হাশিম বিন হায়া প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তার যুগে ইন্তেকাল করেন।

আর-রাযি বিল্লাহ

আর-রাযী বিল্লাহ আব্বাস মুহাম্মাদ বিন মুকতাদর মুতাযদ বিন তলহা বিন মুতাওয়াক্কিল ২৯৭ হিজরীতে জুলুম নামক এক রোমান বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাহিরকে অপসারণ করার পর তিনি তখতে উপবেশন করেন। মসনদে আরোহণের পর তিনি ইবনে মুকালাকে নির্দেশ দেন যে, কাহিরের ভুলত্রুটিগুলো পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করে মানুষদের তা শুনিয়ে দাও।

৩২২ হিজরীতে মুরওয়াদিজের সিপাহসালার দিলম ইস্পাহানে মারা যায়। তার রাজ্যের সীমানা এতই সম্প্রসারিত হয়েছিল যে, লোকেরা বলত, দিলম বাগদাদ

আক্রমণের ইচ্ছা করছে। দিলম বলত, আরব সাম্রাজ্য ভেঙ্গে আজমী সাম্রাজ্য গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।

এ বছর আলী বিন বুয়া রাযীর নিকট বলে পাঠালো যে, যে শহরগুলো আমার করতলগত সেগুলোর জন্য বার্ষিক এক কোটি দিরহাম কর আমাকে দিতে হবে। রাযী সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিলে ইবনে বুয়া সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রজাদের উপর বল প্রয়োগ করা ছেড়ে দেয়।

এ বছর মাহদীর দাবীদার পশ্চিমাঞ্চলে পঁচিশ বছর রাজত্ব করার পর মারা যায়। সে মিসরের ফাতেমী খলীফাদের একজন। কথিত আছে, সে হযরত আলীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত, সে ইমাম মাহদীর দাবী করে বলত, আমি হযরত আলীর বংশধর। মূলত তার দাদা অগ্নিপূজক ছিল।

কাযী আবূ বকর বাকলানী বলেন, মাহদী দাবীদার লোকটির লকব ছিল উবায়দুল্লাহ। তার দাদা অগ্নিপূজক। সে পশ্চিমাঞ্চলে এসে মাহদীর দাবী করে বলে, আমি হযরত আলীর বংশধর। কিন্তু কোনো আলেম তাঁর দাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। বস্তুত সে ছিল গোপন শয়তান। ইসলামকে মিটিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য। তার আওলাদেরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা মদ এবং যিনাকে বৈধ ঘোষণা করে। রাফেযী সম্প্রদায়ের মতকে তারা প্রাধান্য দিত। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আল-কায়িম বিআমরিল্লাহ আবুল কাসিম মুহাম্মাদ তার স্থানে স্থলাভিসিক্ত হয়।

এ বছর মুহাম্মাদ বিন আলী নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করে। সে মৃতকে জীবিত করার কথা বলে। তাকে হত্যা করে তার লাশ শূলেতে উঠানো হয়। তার সাথে তার সহচরদেরও হত্যা করা হয়। এ বছর আবু জাফর শাজারী নামক জনৈক প্রহরী ১৪০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করে। জীবিত থাকা কালে তার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। এ বছর থেকে ৩২৭ হিজরী পর্যন্ত বাগদাদের অধিবাসীদের হজ্জ্ব পালন বন্ধ হয়ে যায়।

৩২৩ হিজরীতে রাযী শাসনভার নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তার দুই ছেলে আবুল ফজল এবং আবু জাফর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ বছর জামাদিউল আউয়াল মাসে এক প্রকার বিশেষ অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে গিলে ফেলে। এটি আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ বছর যিলকাদা মাসের সকল রজনীতে আকাশের বড় বড় নক্ষত্রগুলো ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে।

৩২৪ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন আমীর রায়েক ওয়াসেত এবং এর পার্শ্ববর্তী

শহরগুলো দখল করে নেয়। শহরগুলোতে মুহাম্মাদের ফরমান জারি হয়। উযীরগণকে বরখাস্ত করা হয়। রাজ্যের সকল মাল তার কাছে এসে জমা হতে থাকে। বায়তুল মাল শূন্য হয়ে পড়ে। রাযী খেলার তাসে পরিণত হন। নামমাত্র খিলাফত তার হাতে থাকে।

২২৫ হিজরীতে মুসলিম সাম্রাজ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রথমে বিদ্রোহীরা শহরগুলো দখল করে। তারপর প্রশাসকবৃন্দ। অধিকৃত শহর, নগর ও জনপদ থেকে কেন্দ্রীয় কোষাগারে খারাজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদ এবং এর পার্শ্ববর্তী জনপদ ছাড়া রাযীর হাতে আর কোন কিছুই রইল না। এরপরও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাযীর হাতে ছিল না, ছিল ইবনে রায়েকের ইখতিয়ারে। এ সময় খিলাফত নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে। এতে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আব্বাসীয় রাজত্ব নামেমাত্র দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে উমাইয়্যা বংশীয় স্পেনের বাদশাহ আমীর আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদের সাহস বেড়ে যায়। তিনি নিজের নামের সাথে আমীরুল মুমিনীন নাসিরুদ্দীনীল্লাহ উপাধি লাগিয়ে দাবী করে বলেন, আমিই খিলাফতের বেশি হকদার। স্পেনের অধিকাংশ তার পদানত ছিল। তিনি সাহসী, জিহাদ প্রিয় মুজাহিদ এবং স্বচ্ছ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুতাগাল্লেবীনদের শেকড় উপড়ে ফেলেন এবং সত্তরটি দুর্গ জয় করেন।

এটা ছিল দারুণ বিস্ময়ের যুগ। পৃথিবীতে মুসলিম দুনিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিন ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন নাম ধারণ করে তিন জনই খিলাফতের দাবী করেন। রাযী বাগদাদে, আমীর আব্দুর রহমান স্পেনে এবং মাহদী কায়রোয়ানে।

৩২৬ হিজরীতে বুহকিম আলী বিন রায়েককে আক্রমণ করে। আলী আত্মগোপন করে। বুহকিম বাগদাদে প্রবেশ করলে রাযী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তাকে আমীরুল উমারা খিতাব দেন। অনেক সম্মান এবং মর্যাদা প্রদানের পর তাকে বাগদাদ এবং খুরাসানের আমীর নিযুক্ত করেন।

৩২৭ হিজরীতে আবু আলী উমর বিন ইয়াহইয়া স্বীয় বন্ধু কারমাতীকে এ মর্মে পত্র লিখল যে, জনপ্রতি পাঁচ দিনার আদায়সাপেক্ষে হাজীদের রাস্তা খুলে দাও এবং হজ্ব করার অনুমতি দাও। সে অনুমতি দিল, লোকেরা হজ্ব আদায় করতে লাগল। এটাই প্রথম বর্ষ যে বছর হাজীদের থেকে ট্যাক্স আদায় করা হয়।

৩২৮ হিজরীতে দজলা নদীর পানি ফুলে ১৯ হাত খাড়া হয়ে যায়। এতে গোটা বাগদাদ প্লাবিত হয়। মানুষ এবং প্রাণিকুল ডুবে যায়। ভবনগুলো ভেঙে পড়ে।

৩২৯ হিজরীতে রাযী অসুস্থ হয়ে পড়লে রবিউল আউয়াল মাসে ৩১ বছর ৬ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি দানশীল, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, বাগ্মী এবং ওলামা মাশায়েখ প্রিয় ছিলেন। বাগবীর নিকট তিনি হাদীস শরীফ শ্রবণ করেন।

খতীব বলেন, রাযীর অনেক ফাযাইল রয়েছে। তিনিই সর্বশেষ খলীফা যার কবিতাগুলো প্রেমের রসে সিক্ত। তিনি শেষ খলীফা যিনি সেনা বাহিনীর ভাতা নির্ধারণের রীতিনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি আখেরী খলীফা যিনি জুমআর খুতবা পাঠ করেন। তিনি সর্বশেষ খলীফা যিনি সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ সভায় বসতেন। তিনি শেষ খলীফা যিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের রীতি অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদান করতেন। তিনি আখেরী খলীফা যিনি সময় অনুপাতে নিজের পোশাক নির্ধারণ করেন।

আবুল হাসান ইবনে জারকাবী বর্ণনা করেন, ঈদের রাতে ইসমাঈল খাতবী রাযীর নিকট গেলে রাযী তাকে বললেন, আমি আগামীকাল ঈদের নামায পড়াব, নামাযের পর কোন দু'আটি করব? ইসমাঈল বললেন, আমিরুল মুমিনীন! কুরআন শরীফে এ দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে–

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ الخ

এ দু'আটি পড়বেন। রাযী বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। এ দু'আটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর চার শত দিনার এবং একটি গোলাম তাকে উপহার দিলেন।

তার খিলাফতকালে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– তাফতুয়া, ইবনে মুজাহিদ, আল-মাকরী বিন কাস হানাফী, আল-আকদ-এর লেখক ইবনে আবদ, শাফী মাযহাবের শায়েখ ইসতাখরী, ইবনে মানবুয আবু বকর প্রমুখ।

আল-মুত্তাকীলিল্লাহ

আল-মুত্তাকীলিল্লাহ আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুকতাদার বিন মুতাযদ বিন মুফিক তলহা বিন মুতাওয়াক্কিল স্বীয় ভ্রাতা রাযীর মৃত্যুর পর খিলাফতের তখতে আসীন হন। সে সময় তার বয়স ৩৪ বছর। তার মায়ের নাম খুলুব, ভিন্ন মতে যহরা। তার মা বাঁদি ছিলেন। তিনি কথার খিলাফ করতেন না। বাঁদি ব্যবহার করতেন না। অনেক রোযা রাখতেন এবং ইবাদত করতেন। তিনি কখনই শরাব

স্পর্শ করেননি। তিনি বলতেন, কুরআন শরীফ ছাড়া কোন ঐশী গ্রন্থ আমার প্রয়োজন নেই।

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি নিয়ে পূর্ব থেকে তিনি জড়িত থাকায় রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব ছিল আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন আলী আল-কুফীর উপর। এ ক্ষেত্রে তিনি হলেন নামসর্বস্ব। তিনি যে বছর মসনদে আরোহণ করেন সে বছর মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজ ভারী বর্ষণ এবং বজ্রপাতের আওয়াজে ভেঙে যায়। এ গম্বুজকে বাগদাদের মুকুট মনে করা হতো। মূলত এটি খলীফা মানসুর নির্মাণ করেন। এ জন্য বনূ আব্বাসের খলীফাদের নিকট এর একটি আলাদা গুরুত্ব ছিল। এ গম্বুজের উচ্চতা ৮০ গজ এবং নিম্নাংশের দৈর্ঘ্যতা ২০ গজ। গম্বুজের উপরাংশে বর্শা হাতে এক অশ্বারোহীর ছবি অঙ্কিত ছিল। এ ছবির বৈশিষ্ট্য হল যে দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণের জন্য আসত এ ছবির মুখ এমনিতেই সে দিকে ঘুরে যেত।

এ বছর বুহকিম তুর্কী নিহত হওয়ায় তার স্থানে কুর্তগীনকে আমীরুল উমারা নিয়োগ করা হয়। মুত্তাকী বুহকিমের যে সম্পদ বাগদাদে ছিল তা ক্রোক করে নেন। এর মূল্য দুই লাখ দিনারের বেশি।

এ বছর ইবনে রায়েক আক্রমণ করে। কুর্তগীন প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করলে ইবনে রায়েক তার স্থানে আমীরুল উমারা হয়ে যায়।

৩৩০ হিজরীতে বাগদাদে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এক বস্তা গমের মূল্য দাঁড়ায় ৩১৬ দিনার। এ দুর্ভিক্ষে লোকেরা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে। ইতিপূর্বে বাগদাদে এমন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব আর কখনই হয়নি।

এ বছর আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াযিদী হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে খলীফা মুত্তাকী এবং ইবনে রায়েক পরাজিত হয়ে মওছুলে চলে যান। ফলে বাগদাদ এবং দারুল খুলাফা লুণ্ঠিত হয়। খলীফা তাকরীয়ত শহরে পৌছুলে সেখানে সাইফুদ্দৌলা আবুল হাসান আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন হামদান এবং তার ভাই হাসানের সাথে সাক্ষাত হয়। ইবনে রায়েককে ধোঁকায় ফেলে হত্যা করা হয়। তদস্থলে খলীফা হাসান বিন হামদানকে নাসিরুদ্দৌলা উপাধি দিয়ে সাইফুদ্দৌলা এবং নাসিরুদ্দৌলা দুই ভাইকে নিয়ে খলীফা বাগদাদ রওনা করেন। খবর পেয়ে ইয়াযিদী ওসেত শহরে পালিয়ে যায়।

যিলকাদা মাসে ইয়াযিদী কর্তৃক বাগদাদ আক্রমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জনগণের মাঝে ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাগদাদের অভিজাত লোকেরা চারিদিকে পালিয়ে যায়। খলীফা নাসিরুদ্দৌলাকে নিয়ে বাগদাদ থেকে বের হন।

ওদিকে সাইফুদ্দৌলা মাদায়েনের কাছে ইয়াযিদীর মোকাবিলা করে। তীব্র লড়াই হয়। অবশেষে ইয়াযিদী পরাজিত হয়ে ওসেতে পালিয়ে যায়। সাইফুদ্দৌলা সেখান থেকেও তাকে বিতাড়িত করলে সে বসরায় গিয়ে অবস্থান করে।

৩৩১ হিজরীতে রোমানরা আরযান শহরে চড়াও হয়ে সেখানে গণহত্যা চালায়। আরযানের গির্জায় একটি রুমাল ছিল। এ রুমাল সম্পর্কে খ্রিস্টানদের আকীদা ছিল- হযরত ঈসা (আ.) এ রুমাল দ্বারা নিজের চেহারা মোবারক মুছেছিলেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ শর্তে রুমালটি হস্তান্তর করা হয় যে, তারা সকল বন্দীকে মুক্তি দেবে।

এ বছর ওসেত-এ উমারা সাইফুদ্দৌলার উপর আক্রমণ চালায়। সাইফুদ্দৌলা প্রথমে বরীদ অঞ্চলে পালিয়ে যায়। অতঃপর বাগদাদে ফেরার ইচ্ছা করে। ভাই-এর পলায়নে আতঙ্কিত হয়ে নাসিরুদ্দৌলা মওসুলে চলে যায়। ওদিকে তওযুন ওয়াসেতা থেকে বাগদাদে এলে সাইফুদ্দৌলা মওসুলে চলে যায়। তওযুন রমযান মাসে বাগদাদে আসে। মুত্তাকী তাকে আমীরুল উমারা খেতাব দেয়। কিছু দিন পর উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় তওযুন আবু জাফর বিন শিরযাদকে বাগদাদে ডেকে পাঠায়। সে ওয়াসেতা থেকে বাগদাদ পৌছুলে তারা দুই জন মিলে বাগদাদ পদানত করে। মুত্তাকী ইবনে হামদানের নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লিখলে সে এক সুবিশাল বাহিনী নিয়ে এসে পড়ায় ইবনে শিরযাদ ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। মুত্তাকী সপরিবারে তাকরীয়ত অঞ্চলে চলে যান। নাসিরুদ্দৌলা আরবী এবং কুর্দীদের নিয়ে গঠিত সুশিক্ষিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তরযুনের মোকাবিলায় রওয়ানা দেয়। আকবারা নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হয়। ইবনে হামদুন প্রতিহত করতে না পেলে খলীফাকে নিয়ে মওসুলে চলে যায়। পথিমধ্যে তওযুন আবার আক্রমণ করে। নাসীবীনের কাছে তারা পরাজিত হয়। খলীফা অপারগ হয়ে মিসরের আমীর আখশাদের সাহায্য চেয়ে পত্র লিখায় বনূ হামদুন রাগান্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে খলীফা তওযুনকে সন্ধি করার প্রস্তাব দিলে সে তা গ্রহণ করে এবং সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

একদিকে সন্ধির প্রক্রিয়া চলছে অন্যদিকে মিসরের আমীর আখশাদ খলীফা নিজের সাহায্যার্থে যাকে আহ্বান করেছিলেন তিনি মিশর থেকে আসার পথেই সন্ধির কথা জানতে পান। অবশেষে তিনি রুকায় এসে খলীফার সাথে সাক্ষাতকরত আরয করলেন, আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার গোলাম এবং গোলামের পুত্র গোলাম। এ সন্ধি পরিত্যাজ্য, মর্মান্তিক এবং বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা হিসেবে স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। আপনি আমার সঙ্গে মিসরে চলেন-

আপনার মঙ্গল হবে। আপনি সেখানে নিশ্চিন্ত মনে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। আখশাদ মিসরে ফিরে গেলেন।

৩৩৩ হিজরীর মুহারম মাসের চার তারিখে মুত্তাকী রুকা থেকে বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তওযুন খলীফাকে স্বাগত জানাতে বাইরে আসে। আনবার ও হাইয়াব- এর মধ্যবর্তী স্থানে তাদের সাক্ষাত হয়। তওযুন ঘোড়া থেকে নেমে মাটি চুম্বন করে খলীফার বাহনের রেকাব নিজ হাতে নিয়ে চলতে থাকে। মুত্তাকী বারবার তাকে ঘোড়ায় চড়ার কথা বললেও সে তা মানল না। এভাবে সে খলীফার জন্য স্থাপিত শিবির পর্যন্ত এল। মুত্তাকী সেখানে আরাম করে বসলেন। তওযুন খলীফা এবং ইবনে মুকালা-যে খলীফার সাথে ছিল দু'জনকেই সে বন্দী করে খলীফার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলে তাকে বাগদাদে পৌছে দেয়। সেখানে তার আংটি, চাদর ও লাঠি ছিনিয়ে নেয়া হয়।

অতঃপর তওযুন বাগদাদে এসে আব্দুল্লাহ বিন মুকতাফীর নিকট খিলাফতের বাইআত করে এবং তাকে মুসতাকফী বিল্লাহ লকব দেয়া হয়। মুত্তাকী নিজেও ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার বাইআত গ্রহণ করেন। এটা ৩৩৩ হিজরীর মুহাররম মাসের বিশ তারিখ ভিন্নমতে সফর মাসের ঘটনা।

কাহির এ সংবাদ শুনে খুশি হয়ে এ কবিতাটি পাঠ করেন- "আমি এবং ইবরাহীম দু'জনে বৃদ্ধ এবং অন্ধ। দুই বৃদ্ধের জন্য একাকীত্বই শ্রেয়। তাওযুনের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা সেনাপতিত্ব তার আনুগত্য করবে। আমরা দু'জনে অন্ধ হয়েছি, আমাদের সাথে তৃতীয় জনের প্রয়োজন।" কিছুদিন পর মুসতাকফীও তাদের অন্তর্ভুক্ত হন।

এরপর এক বছর না যেতেই তাওযুন ইহধান ত্যাগ করে। সনদপার নিকটবর্তী এক দ্বীপে মুত্তাকীকে বন্দী রেখে ২৫ বছর পর ৩৫৭ হিজরীর শাবান মাসে তিনি মুক্তি পান।

হামদী বিখ্যাত এক চোরের নাম। ইবনে শিরযাদ বাগদাদ দখলের পর সে হামদী চোরের সম্পদের উপর মাসিক পঁচিশ হাজার দিনার কর দণ্ড আরোপ করে। এ লোকটি জোসনা রাতে মশাল হাতে নির্দিধায় মানুষের ঘরে প্রবেশ করে চুরি করত। ৩৩৩ হিজরীতে দায়লামী বাগদাদের দারোগা থাকা অবস্থায় সে তাকে ধরে এনে বেত্রাঘাত করে।

মুত্তাকীর যুগে যে সব ওলামা ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- আবু ইয়াকুব নহরযুরী, খলীফা জুনাইদ বাগদাদী, কাযী আব্দুল্লাহ মুহামলী, আবু বকর ফরগানী, হাফেজ আবুল আব্বাস বিন উকাদাহ, ইবনে ওলাদ প্রমুখ।

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুকতাফী বিন মুতাযদ ইমলাহুন্নাস নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুত্তাকী অপসারিত হওয়ার পর ৩৩৩ হিজরীর সফর মাসে ৪১ বছর বয়সে তিনি খিলাফত লাভ করেন। এ বছরেই তওযুন পরলোক গমন করলে তারই সহচর আবু জাফর বিন শিরযাদের মধ্যে সাম্রাজ্য দখলের লোভ সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে সে ফৌজদের প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ করে। খলীফা তাকে খিলআত প্রদান করেন। এরপর আহমদ বিন বুয়া বাগদাদে এলে ইবনে শিরযাদ আত্মগোপন করে। ইবনে বুয়া বিনা বাধায় দারুল খুলাফায় প্রবেশ করে খলীফার সামনে গিয়ে বসে পড়ে। খলীফা তাকে মা'যাদ্দৌলা লকব সহ খিলআত প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তার দ্বিতীয় ভাই আলীকে ইমাদুদ্দৌলা এবং তৃতীয় ভাই হাসানকে রুকনদ্দৌলা উপাধি দেন। আর তিনি ইমামুল হক লকব ধারণ করে ফরমান জারি করেন।

কিছুদিন পর প্রশাসন মাযাদ্দৌলার হাতে জিম্মি হয়ে পড়লে সে খলীফার দৈনিক খরচের জন্য পাঁচহাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। মাযাদ্দৌলা দায়লামীদের মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রথম নায়েব। সে-ই সর্বপ্রথম খারাজ আদায়ের জন্য লোক নিয়োগ করে। সে লোকদের মাঝে সন্তরণ বিদ্যার খাহেশ পয়দা করে। সে নৌকা চালনা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করে।

কিছুদিন পর খলীফা সম্পর্কে মাযাদ্দৌলার খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। ৩৩৪ হিজরীর জামাদিউল আখের মাসের কোনো একদিন দরবার বসল, সভাসদবর্গ স্ব স্ব আসনে উপবেশনরত। তখত অলংকৃত করে বসে আছেন খলীফা মুসতাকফী। দায়লামী সম্প্রদায়ের দু'জন লোক তখতের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে চুমু দিবে ভেবে খলীফা তাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করলে হাত ধরে টেনে তারা খলীফাকে নিচে ফেলে দিল। অতঃপর তারা তার পাগড়ি দিয়ে খলীফাকে বেঁধে রেখে অন্দর মহল অবাধে লুণ্ঠন করে।

ওদিকে মাযাদ্দৌলা স্বীয় আলয়ে অবস্থান করে। তারা মুসতাকফীকে পায়ে হেটে আপন কক্ষে নিয়ে যায়। অতঃপর তাকে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে বলে এবং তার চক্ষুদ্বয় খুলে নেয়। সে সময় তার খিলাফতের বয়স হয়েছিল এক বছর চার মাস।

এরপর লোকেরা ফজল বিন মুকতাদরের নিকট বাইআত করলে অপারগ হয়ে তিনি তার উপর খিলাফত সোপর্দ করেন। অতঃপর মুসতাকফীকে বন্দী করা হয়। ৩৩৮ হিজরীতে তিনি জেলখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মুসতাকফীর ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি ছিলেন শীআ।

আল-মতি বিল্লাহ

আল-মতি বিল্লাহ আবুল কাসেম আল-ফজল বিন মুকতাদর বিন মুতাযদ ৩০ হিজরীতে মাশগালা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ৩৩৪ হিজরীতে তিনি মসনদে আরোহণ করেন। মাযাদ্দৌলা দৈনিক ভাতা হিসেবে একশ দিনার খলীফার জন্য নির্ধারণ করে দেয়।

এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে এবং পশুর বিষ্ঠা খেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা চালায়। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকেই পথের ধারে মরে পড়ে থাকত। জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য অনেকেই কুকুরের গোশ্‌ত খেত, রুটি, বাগান এবং জমি বিক্রয় হত। মাযাদ্দৌলার জন্য এক বস্তা আটা কেনা হয়। আর দামেশকে এক বস্তার বাজার দর ১৯ দিনার, এ বছর মাযাদ্দৌলা এবং নসিরুদ্দৌলার মধ্যে লড়াই হয়। মতি মাযাদ্দৌলার সাথে রণাঙ্গনে গমন করেন। ফেরার পথে মতি বন্দীদের সাথে ছিলেন।

এ বছর মিসরের আমীর আখশীদ মৃত্যুবরণ করে। তার আসল নাম মুহাম্মাদ বিন তফ্‌হ ফারগানী। আখশীদের অর্থ শাহানশাহ। ফারগানের সকল বাদশাহকে এ লকবে ভূষিত করা হত। যেমন তরিস্তানের বাদশাহদের ইস্পাহান্দ, জুরজানের সূল, তুর্কীদের খাকান, আশরুসানের আফসীন এবং সমরকন্দ বাদশাহদের লকব সামান, আখশীদ অত্যন্ত সাহসী লোক ছিলেন, কাহিরের যুগে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ হন। তার আট হাজার গোলাম ছিল।

এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্তা কায়েম উবায়দী মারা যায়, তদস্থলে তদীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত পুত্র মানসুর বিল্লাহ নিযুক্ত হয়। সে তার পিতা থেকেও বেশি অভিশপ্ত ছিল। সে নবীদের শানে গালি দিত। সে আলেমদের হত্যা করে।

৩৩৫ হিজরীতে মাযাদ্দৌলা মতির নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে দারুল খুলাফায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। এ বছর মাযাদ্দৌলা আব্বাসীয় খিলাফতের দরবারে অনুরোধ জানায় যে, তার ভাই ইমাদুদ্দৌলাকে তার সহযোগী হিসেবে তাকে দেয়া হোক। এবং তার মৃত্যুর পর তার ভাইকে যেন তার স্থলাভিসিক্ত করা হয়। মতি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইমাদুদ্দৌলা এ বছরেই মারা যাওয়ায় মতি তার আরেক ভাই রুকনদ্দৌলাকে তার সহকারী বানিয়ে দেন।

৩৩৯ হিজরীতে হজরে আসওয়াদ স্ব স্থানে স্থাপন করা হয় এবং এর চারিপাশে সাত হাজার সাত'শ সাড়ে সত্তর দিরহাম ওজন সমপরিমাণ রৌপ্য দিয়ে বাঁধাই করা হয়।

মুহাম্মাদ বিন নাফে খাযায়ী বলেন, হজরে আসওয়াদ স্থাপনের পূর্বে আমি খুব ভালো করে দেখেছি যে, এর উপরটি কালো এবং বাকী অংশ সাদা এটি লম্বায় এক হাত।

৩৪১ হিজরীতে একটি কওমের আবির্ভাব ঘটে যারা মৃত্যুর পর পুনঃজন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ দাবী করেছিল যে, আমার মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর রুহ দেয়া হয়েছে। তার স্ত্রী দাবী করত তার মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর রুহ দেয়া হয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর রুহের দাবী করত আরেকজন। জনতার হাতে তারা প্রহৃত হয়।

এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্তা মানসূর উবায়দী তার প্রবর্তিত মানুরীয়া শহরে ইন্তেকাল করেন। তার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ছেলে সাদ 'মযদ্দীন' লকব ধারণ করে তখত নসীন হয়ে কাহেরা শহরের গোড়াপত্তন করেন। মানসূর নেককার লোক ছিলেন। তার পিতার সময় যারা অত্যাচারিত হয়েছিল তিনি তাদের খুঁজে বের করেন। লোকেরা তাকে বন্ধু ভাবাপন্ন মনে করতো। তার ছেলে সাদও নেককার ছিলেন। তার সময় গোটা পশ্চিমাঞ্চল তার অধীনে চলে আসে।

৩৪৩ হিজরীতে খুরাসানের শাসনকর্তা মতির নামে খুতবা পাঠ করেন। এ খবর পেয়ে মতি তাকে খিলআত প্রদান করেন। ৩৪৪ হিজরীতে মিসরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে অনেক ভবন বিধ্বস্ত হয়। এর স্থায়িত্ব ছিল তিন ঘণ্টা। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য লোকেরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে।

৩৪৬ হিজরীতে সমুদ্রের পানি আশি হাত উঁচু হয়ে যায়। ফলে পর্বতগুলো দ্বীপে পরিণত হয়। রায় এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ভূমিকম্প হয়। ফলে তালকান শহর সমূলে বিধ্বস্ত হয়। এতে ত্রিশজন লোক ছাড়া শহরের সকলে নিহত হয়। রায়-এর উপকণ্ঠে দেড় শত গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। হালওয়ানের অধিকাংশ ধসে পড়ে। মৃত মানুষের হাড়ে সয়লাব হয়ে যায় নগর-জনপদ। মাটি ফেটে ঝ রনাধারার সৃষ্টি হয়। রায়-এর একটি পাহাড় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। জাগায় জ াগায় যমীন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এবং গর্তের সৃষ্টি হয়। এ সব ফাটল এবং গহ্বর থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি বের হয়। আবার কোনগুলো থেকে শুধু ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। এটি ইবনে জাওযী কর্তৃক বর্ণিত।

৩৪৭ হিজরীতে আবার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানীর ফলে পৃথিবীতে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ৩৫০ হিজরীতে মাযাদ্দৌলা বগদাদে এক সুবিশাল প্রসাদ নির্মাণ করে। এর ভিত ছিল ছত্রিশ হাত নিচে প্রথিত। গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এ বছর আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন শাওয়ারিব বিচারপতির দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। এ বছর রোমানরা আফরিতশ দ্বীপটি দখল করে নেয়, যা ২৩০ হিজরী থেকে মুসলমানরা শাসন করত। এ বছর স্পেনের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীনিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তদস্থলে তার ছেলে তখতে আরোহণ করেন।

৩৫১ হিজরীতে (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْكُفْرِ) শীআরা মসজিদের দরজায় দরজায় এ কথাগুলো লিখেছিল– (হযরত) মুআবিয়া (রা.)-এর উপর অভিশাপ। যারা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হক ফিদকের বাগান আত্মসাৎ করেছে তাদের প্রতি লানত। যারা ইমাম হাসান (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পার্শ্বে সমাহিত হতে দেয়নি তাদের উপরও অভিশাপ। যারা হযরত আবু যর (রা.)-কে বহিষ্কার করেছে তাদের প্রতিও লানত। রাতে কোন এক ব্যক্তি এ লেখাগুলো মিশে দেয়। সকালে মাযাদ্দৌলা আবার এগুলো লিখতে চাইলে উযীর মাহলাবী বলল, কথাগুলো এমন হওয়া উচিত যে, নবী পরিবারের উপর অত্যাচারকারীদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর উপর স্পষ্টভাবে অভিশাপ বর্ষণের কথা লিখতে বলল, বস্তুত তাই লিখা হল।

৩৫২ হিজরীতে মাযাদ্দৌলা আশুরার দিন দোকান-পাট বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। বাবুর্চিদের রান্নাবান্না করতে নিষেধ করে। মেয়েরা মাথার চুল খুলে নিজের মুখে আঘাত করে হায় হোসেন বলে মাতম করে। বাগদাদে এটাই প্রথম দিন যে দিন সর্বপ্রথম সেখানে বিদআত হয়। কিছু দিন তা চালু ছিল। সংবাদ পেয়ে খলীফা মতি জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে মাযাদ্দৌলার বাসবভনে হাওজায় আরোহণ পূর্বক আসে। এ কথা জানতে পেয়ে মাযাদ্দৌলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে তিনবার চুমু দিয়ে খলীফাকে কষ্ট করে এসে জানাযায় শরীক হতে বারণ করেন। ফলে খলীফা প্রাসাদে ফিরে যান। এ বছর ১২ যিলহজ্জ তারিখে জাঁকজমকভাবে বাঁশি বাজিয়ে ঈদ করা হয়।

৩৫৩ হিজরীতে সাইফুদ্দৌলার জন্য ২৪/২৫ হাত উঁচু তাঁবু নির্মাণ করা হয়। ৩৫৪ হিজরীতে মাযাদ্দৌলার বোন ইন্তেকাল করে। এ বছর রোমান সম্রাট ইয়াকুব মুসলমানদের শহরের পার্শ্বে কায়সারীয়া শহর আবাদ করেন।

৩৫৬ হিজরীতে মাযাদ্দৌলার অন্তর্ধানে তার ছেলে বখতিয়ারকে "আযযাদ্দৌলা" উপাধি দিয়ে তদস্থলে নিয়োগ করা হয়। ৩৫৭ হিজরীতে কারমতী দামেশক দখল করে। সিরিয়া ও মিসরের লোকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়। আবার মিসর আক্রমণের পরিকল্পনা করলে বনূ উবায়েদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিহত করার আগেই তারা মিসর দখল করে। এদিকে শীআরা আকলীম, মিশর এবং ইরাকে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা খুতবা থেকে বনূ আব্বাসের নাম বাদ দেয়।

কালো কাপড় পরতে মানা করে। খতীবদের সাদা কাপড় পরতে আদেশ করে এবং এ শব্দগুলো দিয়ে খুতবা পাঠ করে–

اللهم صلى على محمد المصطفي وعلي على المرتضي وعلي فاطمة البتول وعلي الحسن وعلي الحسين سبط الرسول وصل علي الائمة اباء امير المنومنين المعز با لله

৩৫৯ হিজরীতে মিসরে আযানের মধ্যে حي علي خير العمل-এ শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়। এ বছর জামে আযহারের ভিত্তি দেয়া হয়। আর তা ৩৬১ হিজরীর রমযান মাসে শেষ হয়।

এ বছর ইরাকে একটি তারকা বিকট আওয়াজে পতন হয়। এবং পৃথিবীময় সূর্যের ন্যায় আলো ছড়িয়ে পড়ে।

৩৬২ হিজরীতে ইখতিয়ার খলীফার উপর কর আরোপ করে। এ কথা শুনে খলীফা মতি, ইখতিয়ারকে বললেন, তুমি যদি এটাই চাও যে তাহলে আমি স্বেচ্ছায় নিজ গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকব এবং সর্বস্ব বর্জন করব। এরপরও মতি খলীফার প্রতি চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে খলীফা নিজ গৃহের আসবাবপত্র বেচে চার লাখ দিরহাম মতির হাতে তুলে দেন। এ কথা জনতার মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। তারা বলতে থাকে খলীফাকেও কর দিতে হচ্ছে। এ বছর ইখতিয়ারের গোলাম নিহত হওয়ায় তার উযীর আবুল ফজল শিরাযী এর বদলাস্বরূপ বাগদাদের এক দিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে অনেক ঘর-বাড়ি, সম্পদরাজি এবং বনী আদম পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এই অভিশপ্ত উযীরও আগুনে পুড়ে মরে। এত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বাগদাদে আর কখনই হয়নি।

৩৬৩ হিজরীতে মতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন শায়বান হাশিমীকে কাযীউল কুযযাতের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জানান। মতি শর্তাবলীর দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রস্তুত করেন। এ পদের কোনো পারিশ্রমিক তিনি নিবেন না। কোন প্রকার খিলাফত গ্রহণ করবেন না। শরীয়ত বিরোধী সুপারিশও তার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কেরানীর জন্য মাসিক তিন শ'দিনার, পুলিশের জন্য দেড় শ'দিনার, আহকাম জারিকারীর একশ 'দিরহাম, কোষাগার এবং দফতরীর জন্য সাত শ'দিরহাম বেতন দেয়া হয়। তিনি যে ফরমান জারি করেন তা নিম্নরূপ–

আমিরুল মোমিনীন আব্দুল্লাহ আল-ফজল আল-মতিবিল্লাহর পক্ষ হতে মুহাম্মদ স্বপদে থাকাকালীন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সকল শহর, নগর ও জনপদের বিচার

ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন। তিনি বিচারক ও বিচারপতিদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে বিচারক নিয়োগ দিতেন। শরীয়তসম্মতভাবে যেন বিচারকার্য পরিচালিত হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতেন। নেক নিয়ত, আমানতদার, পরহেযগার, শরীয়তের পাবন্দ, মুত্তাকী, আলেম, জ্ঞানবান, নরম কাপড় যে পরিধান করে না। সাদ কাপড় পরে, স্বচ্ছ লেনদেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারী, কুরআন সম্মত ফায়সালা দানকারী, সুন্নতে রাসূল (সা.)-এর পথপ্রদর্শক, ইজমায়ে উম্মত মিমাংসাকারী, আইম্মায়ে রাশেদীনের অনুসারী, ইনসাফ ও ন্যায়বিচরকারী। গরীবরা তার অত্যাচারকে ভয় পাবে না– তিনি এমন লোকদের নিয়োগ দিতেন।

৩৬৩ হিজরীতে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে মতির কথায় জড়তার সৃষ্টি হয়। ইখতিয়ার তার প্রহরী সবক্তগীন মারফত বলে পাঠায় যে, তিনি যেন খিলাফতের দায়িত্ব তদীয় পুত্র আল-তয়েলিল্লাহ-এর উপর অর্পণ করেন। তিনি তাই করেন। ৩৬৩ হিজরীর যিলকাদা মাসের ২৩ তারিখ বুধবারে মতি তার পুত্র তয়ে-এর উপর খিলাফত অর্পণ করেন।

মতি ২৯ বছর কয়েক মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অতঃপর প্রধান বিচারপতি শায়খুল ফাযেল লকব দিয়ে মতিকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

যাহাবী বলেন, মতি এবং তার ছেলে বনূ যুয়ার হাতে খেলার তাসে পরিণত হয়েছিল। মুকতাফী লিল্লাহ পর্যন্ত এ অবস্থাই ছিল। তারপর এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

মতি তার ছেলেকে নিয়ে ওসেত গমন করেন। সেখানে ৩৬৪ হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে শাহীন বলেন, আমি খুব ভালো করে তাহকীক করেছি যে, মতি সেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন। খতীব বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলতেন, জনতার বন্ধুর অন্তর্ধান হলে তখন তার অভাব অনুভূত হত।

মতির যুগে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন–

খারকী শায়খে হাম্বলী, আবু বকর শিবলী, ইবনে কাযী, আবু রাযা, আবু বকর সূলী, হাছিম বিন কালীব, আবু লতীব, আবু জাফর, আবু নসর ফারাবী, আবু ইসহাক মরুযী, আব্দুল কাসেম, দিনূরী, আবু বকর যবয়ী, আবুল কাসিম তুনুখী, ইবনে হুদা, আবু আলী বিন আবু হুরায়রা, আবু উমর, মাসউদী, ইবনে দরসতুয়া, আবু আলী তাবারী, ফাকেহী, কবি মুতানাব্বী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাবান, আবু আলী আল-কানী, আবুল ফরাহ প্রমুখ।

আত্-তয়েলিল্লাহ

আত্-তয়েলিল্লাহ আবু বকর আব্দুল করীম বিন মতি হাযার নামক বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪৩ বছর বয়সে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। খিলাফত লাভের পর দিন খিলাফতের চাদর উড়ে ফৌজ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি অশ্বারোহণে বের হন। সেদিনই সবক্তগীনকে শাহী পোশাক এবং ঝাণ্ডা প্রদান করা হয় এবং নাসরুদ্দৌলা উপাধি দেয়া হয়।

কিছুদিন পর আযযুদ্দৌলা এবং সবক্তগীনের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। সবক্তগীন তুর্কীদের সাথে নিয়ে তার সাথে মরণপণ লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়।

৩৬৩ হিজরীতে হারামাইন শরীফাইনে আল-মুআযযাল উবায়দীর নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

৩৬৪ হিজরীতে সবক্তগীনকে প্রতিহত করার জন্য আযদুদ্দৌলা আযযুদ্দৌলার সাহায্যার্থ বাগদাদে আসে। আযদুদ্দৌলার নিকট বাগদাদ নগরী পছন্দ হওয়ায় তিনি বাগদাদে নিজের বলয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, তিনি ফৌজদের উপঢৌকন দিয়ে হাত করেন। তারা আযযুদ্দৌলার উপর চড়াও হয়। আযযুদ্দৌলা দরজা লাগিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। আযদুদ্দৌলা তায়ে-এর রাজ্যগুলোতে এ বার্তা পাঠিয়ে দিল যে, আযদুদ্দৌলা সাম্রাজ্যের নতুন নায়েব নিযুক্ত হয়েছেন। এ জন্য তায়ে এবং আযদুদ্দৌলা উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। এতে আযদুদ্দৌলার জয় হওয়ায় খুতবা থেকে তায়ে-এর নাম উঠিয়ে দেয়া হয়। ২০ জমাদিউল আখের থেকে ৩৬৪ হিজরীর ১০ রজব পর্যন্ত কোথাও কোনো খুতবায় তার নাম পঠিত হয় নি।

এ বছর রাফেযীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মিসর, শাম, ইরাক এবং পশ্চিমাঞ্চলে তারা এতই শক্তিশালী হয় যে, তারা তারাবীহ-র নামায বন্ধ করে দেয়।

৩৬৫ হিজরীতে রুকনদ্দৌলা বিন বুয়া তার পদানত রাজ্যগুলো তিন সন্তানের মধ্যে বন্টন করে দেন। পারস্য এবং কারমান আযদুদ্দৌলাকে, রায় এবং ইস্পাহান মুঈদদ্দৌলাকে এবং হামদান ও দিনুর ফখরুদ্দৌলাকে দেয়া হয়।

এ বছর রযব মাসে আযযুদ্দৌলার বাসভবনে ইজলাস বসে। সেখানে কাযীউল কুযযাত বিন মারুফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নির্দেশ করেন যে, আযযুদ্দৌলাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি এ মজলিসে এসে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করুন কিভাবে বিচারকার্য সম্পাদন হচ্ছে।

এ বছর আযদুদ্দৌলা এবং আযযুদ্দৌলার মধ্যে লড়াই হয়। এতে আযযুদ্দৌলার এক তুর্কী গোলাম বন্দী হয়। এজন্য তিনি দারুণ মর্মবেদনায়

ভোগে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন, শোকের কবিতা আবৃত্তি করেন। বাইরে বেরুনো ছেড়ে দেন। কান্না ছাড়া আর কোনো কাজ তার ছিল না। এমনকি ইজলাসও বর্জন করেন। গোলামকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আযদুদ্দৌলার নিকট বার্তা পাঠালেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে আযযুদ্দৌলা বন্দী গোলামের পরিবর্তে দু'জন বাঁদী প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে একজনকে এক লাখ দিনারে ক্রয় করা হয়েছিল। যাবার সময় তিনি দূতকে বলে দেন যে, আযদুদ্দৌলা বন্দী গোলামের পরিবর্তে যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবে। এতে আমার অনুমতি রইল। যদি আমাকে দুনিয়াও ছেড়ে যেতে হয়। পরিশেষে আযদুদ্দৌলা গোলামকে ফিরিয়ে দেন।

এ বছর কুফায় আযযুদ্দৌলার নামের পরিবর্তে আযদুদ্দৌলার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এ বছর মিসরের শাসনকর্তা আলমুযালিদ্বীনিল্লাহ উবায়দী পরলোকগমন করেন। তদস্থলে তদীয় পুত্র আযীয নিযুক্ত হন।

৩৬৬ হিজরীতে উমাইয়্যা বংশীয় স্পেনের বাদশাহ আল-মুসতানসির বিল্লাহ আল-হাকিম বিন নাসিরুদ্দীনিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তার শূন্য আসনে তদীয় পুত্র মুয়ীদ বিল্লাহ হিশাম সমাসীন হন।

৩৬৭ হিজরীতে আবার আযযুদ্দৌলা এবং আযদুদ্দৌলার মধ্যে যুদ্ধ হয়। আযদুদ্দৌলা জয় লাভ করেন। আযযুদ্দৌলা বন্দী হলে তাকে হত্যা করা হয়। খলীফা আযদুদ্দৌলাকে শাহী পোশাক, জওহরের তাজ এবং স্বর্ণের মালা নিজ হাতে তার গলায় পরিয়ে দেন। সাথে প্রদান করা হয় তলোয়ার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দু'টি পতাকা। যা ওলী-এ-আহাদদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আজ পর্যন্ত আযদুদ্দৌলা ছাড়া এভাবে আর কাউকে খলীফা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়নি। এছাড়াও তার জন্য উত্তরাধিকারের একটি প্রতিশ্রুতি পত্র প্রণয়ন করা হয়। যা হাযেরীনে মজলিসের সামনে পড়ে শোনানো হয়। এটা শুনে উপস্থিত জনতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ আজ পর্যন্ত ওলী-এ-আহাদ বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে এ রেওয়াজ চলে আসছিল যে, খলীফার পুত্র বা তার নিকটাত্মীয়রাই ওলী-এ-আহাদ হবে। এ প্রতিশ্রুতি পত্র আযদুদ্দৌলার হাতে প্রদানের সময় খলীফা বললেন, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। এ অনুযায়ী কাজ করবে।

৩৬৮ হিজরীতে খলীফার পক্ষ হতে এ ফরমান জারী করা হয় যে, সকাল, সন্ধ্যা ও ঈশার সময় আযদুদ্দৌলার বাসভবনে ডংকা বাজানো হবে এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে খতীবগণ খুতবার মধ্যে তার নাম পাঠ করবে।

ইবনে জাওযী বলেন, এটা এমন এক বিষয় যা ইতোপূর্বে কখনই দেয়া হয়নি।

ওলী-এ-আহাদরাও ডংকা বাজানোর অনুমতি পেতেন না। একবার মাযাদ্দৌলা মদীনাতু সালামে ডংকা বাজানোর অনুমতি প্রার্থনা করলে খলীফা মতি তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ আযদুদ্দৌলাকে সেই অনুমতি দেয়া হয়। আর এভাবেই খিলাফতের বন্ধন আস্তে আস্তে কমজোর এবং দুর্বল হতে থাকে।

৩৬৯ হিজরীতে মিসরের ওলী আযীযের দূত বাগদাদ আসে এবং তয়ে-এর নিকট আযদুদ্দৌলা আবেদন করে যে, তার লকবের সাথে তাজুল মিল্লাত লকবটি বৃদ্ধি করে তার খিলআত নবায়ন করা হোক। তার আবেদন গৃহীত হয়। তয়ে তখতে উপবেশন করেন। তার আশেপাশে এক শ'লোক তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে রাখা হয় হযরত উসমান গনী (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত পবিত্র কুরআন শরীফ। কাঁধে চাদর শরীফ, হাতে লাঠি এবং গলায় ঝোলানো হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহৃত তলোয়ার। আযদুদ্দৌলা কর্তৃক প্রেরিত পর্দাটি টানানো হয়- যাতে লোকেরা আযদুদ্দৌলার পূর্বে তয়েকে দেখতে না পায়। তুর্কী এবং দায়লামী বংশীয় লোকেরা বিনা অস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকে। দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ এবং সভাসদবৃন্দ। এরপর আযদুদ্দৌলাকে আহ্বান করা হয়। তার আগমন মুহূর্তে পর্দা সরে যায়। তিনি খলীফার খিদমতে যমীন চুম্বন করেন এবং সামরিক অফিসারবৃন্দ এবং অগণন ফৌজ দেখে ঘাবড়ে যান। তয়ে বললেন, সংশয় সংকোচ করো না। আল্লাহ তা'আলার শান কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় না? আযদুদ্দৌলা বললেন, নিশ্চয়ই আপনি ইহধামে আল্লাহর খলীফা। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে সামনে এগুতে থাকেন এবং সাত বার যমীন চুম্বন করেন। তয়ে বললেন, সামনে এসো, তিনি এগিয়ে যান এবং পদচুম্বন করেন। তয়ে তাকে আসনে বসার নির্দেশ দেন। কিন্তু খলীফার সামনে চেয়ারে বসা তার সাহসে কুলায় না। তিনি বারবার বলার পরও তিনি বসলেন না। অবশেষে তিনি কসম করলে তিনি আসনে চুম্বনপূর্বক উপবেশন করলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কাজ করার জন্য যত লোক আমাকে দিয়েছেন এবং আমার অধীনে যতগুলো রাজ্য রয়েছে এগুলো দেখভালের জন্য আমি তোমাকে মনোনীত করছি। তুমি তা গ্রহণ কর। আযদুদ্দৌলা বললেন, আমার মওলা আমিরুল মুমিনীনের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দান করুন এবং এতে তিনি আমাকে সহায়তা দান করুন। আমি তা গ্রহণ করছি। অতঃপর খলীফা তাকে শাহী পোশাক পরিয়ে দেন।

(গ্রন্থকার) বলেন, একটু লক্ষ করে দেখুন, খলীফা তয়ে কিভাবে খিলাফতের কাজকে দুর্বল করে ফেলেছেন। এ খলীফার যুগে খিলাফতের কাজ যতটুকু ক্ষীণ ও

শক্তিহীন হয়ে পড়ে তা আর কোন খলীফার যুগে হয়নি। আর সে সময় সাম্রাজ্যের নায়েব আযদুদ্দৌলার যতটুকু শক্তি ছিল কোন সময় কোন নায়েবের এতটুকু শক্তি কখনই ছিল না। আমার যুগে অবস্থা এমন চরমে গিয়ে পৌছে যে, খলীফা স্বয়ং নায়েবকে মাসের শুরুতে নতুন মাসের শুভেচ্ছা জানাতে আসতেন। অধিকাংশ সময় নায়েব পরামর্শ সভায় বা ইজলাসে মধ্যমণি হয়ে বসত। অতঃপর সভাকক্ষে খলীফার আগমন ঘটলে নায়েব তার আসন থেকে নেমে আসত এবং আবার দু'জনে একই স্থানে গিয়ে উপবেশন করত। খলীফা সাধারণ প্রজার ন্যায় সভাকক্ষ ত্যাগ করতেন এবং তার নায়েব পূর্বের মতই বসে থাকত। কারো জন্য কোন যবনিকার ব্যবস্থা ছিল না। একদা জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করলেন, সাম্রাজ্যের ডেপুটি সুলতান কোন যুদ্ধে গমন করলে খলীফা প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে তাকে সঙ্গ দিতেন। সকল বীরত্ব, সাহসিকতা এবং সম্মান ও মর্যাদার সবটুকুই ছিল নায়েবের প্রাপ্য। খলীফা ছিলেন সরদারের মতো, যিনি নায়েবের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

৩৭০ হিজরীতে আযদুদ্দৌলা হামদান থেকে বাগদাদে এলে তয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাগদাদ থেকে বাইরে আসেন, যা আজ পর্যন্ত আর কখনই হয়নি। কোন খলীফা কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে বের হননি। তয়ে-এর যুগে আযদুদ্দৌলা তয়ের নিকট দূত পাঠাতেন, আর খলীফা দূতের আগমনে দাঁড়িয়ে যেতেন।

৩৭৬ হিজরীতে আযদুদ্দৌলার ইন্তেকাল হলে তদস্থলে তদীয় পুত্র সিমসামুদ্দৌলাকে শামসুল মিল্লাত লকব দিয়ে নিয়োগ করা হয় এবং খলীফা তাকে সাতটি খিলআত, একটি মুকুট এবং দু'টি পতাকা প্রদান করেন।

৩৭৩ হিজরীতে আযদুদ্দৌলার ভাই মুঈদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। ৩৭৫ হিজরীতে সিমসামুদ্দৌলা বাগদাদের আশেপাশে উৎপন্ন কাপড় শিল্পের উপর করারোপের ইচ্ছা করেন। এ করের পরিমাণ ছিল বার্ষিক দশ লাখ দিরহাম। বিষয়টি জানতে পেয়ে জনতার দল মনসুর জামে মসজিদে সমবেত হয়ে এখানে জুমআর নামায পড়তে না দেয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সিমসামুদ্দৌলা তার ইচ্ছা প্রত্যাহার করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

৩৭৭ হিজরীতে সিমসামুদ্দৌলার উপর তার ভাই শরফুদ্দৌলা আক্রমণ করে। সিমসামুদ্দৌলা পরাজিত হয়। শরফুদ্দৌলা ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেলে। সকল ফৌজ শরফুদ্দৌলার পতাকা তলে সমবেত হয়। অতঃপর শরফুদ্দৌলা বাগদাদে প্রবেশের সময় তয়ে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি তাকে ডেপুটি সুলতান

নিয়োগ করেন এবং একটি মুকুট পরিয়ে দেন। এরপর একটি আহাদ নামা লিখে শরফুদ্দৌলার সামনে পাঠ করা হয়। সে সময় তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

৩৭৮ হিজরীতে শরফুদ্দৌলা মামুনের মত সৈন্যদের ব্যবহৃত শস্যাগার নির্মাণ করেন। এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। বসরায় প্রচণ্ড তাপদাহে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। অবিরাম লু হাওয়া বইতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসে। দজলা নদীর তোড়ে যমীন প্লাবিত হয়। অনেক জাহাজ ডুবে যায়।

৩৭৯ হিজরীতে আযদুদ্দৌলা ইন্তেকাল করে এবং তার ভাই আবু নসরকে নিজের স্থানে বসিয়ে দিয়ে যায়। তয়ে সমবেদনা জানানোর জন্য তার বাসভবনে যান, আবু নসর কয়েক বার তার খিদমতে যমীন চুম্বন করে। অতঃপর সে তয়ে-এর নিকট গেলে তিনি রাষ্ট্রের কর্মকর্তাবৃন্দের সামনে এমন সাতটি খিলআত প্রদান করেন, যার মধ্যে উন্নতমানের কালো উবা (আরব দেশের বিশেষ এক ধরনের পোশাক- অনুবাদক) এবং কালো পাগড়ি, গলায় মাল্য এবং হাতে কংকন পরিয়ে দেয়া হয়। প্রহরীগণ তলোয়ার নিয়ে সামনে দিয়ে মার্চ করে। আবু নসর যমীন চুম্বন করে। আসনে উপবেশন করে। আহাদনামা পাঠ করা হয়। তয়ে তাকে 'বাহাউদ্দৌলা যিয়াউল মিল্লাত' উপাধি দেন।

৩৮১ হিজরীতে বাহাউদ্দৌলা তয়েকে বন্দী করে। এ ঘটনাটি এমন– তয়ে বাহাউদ্দৌলার এক প্রিয়জনকে বন্দী করেন। খলীফা ছায়াময় শীতল স্থানে উপবেশনরত। বাহাউদ্দৌলা যমীন চুম্বন করে চেয়ারে বসে। ঠিক এ মুহূর্তে বাহাউদ্দৌলার লোকেরা এসে পড়ে। তারা তয়েকে টেনে তখত থেকে নিচে নামিয়ে দেয় এবং কাপড় দিয়ে বেঁধে প্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে এ ঘটনা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। বাহাউদ্দৌলা তয়েকে লিখে জানালো যে, আপনি স্বপদ থেকে সরে গিয়ে তদস্থলে আপনার ছেলে কাদেরবিল্লাহকে তখত প্রদান করুন। এ পত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর ছিল। এটা ২৮১ হিজরীর ১৯ শাবানের ঘটনা। সে সময় কাদের বিল্লাহ বাতীহা শহরে ছিলেন। তাকে ডেকে এনে তার হাতে বাইআত করা হয়। তয় তাদের বিল্লাহর নিকট অতি সমাদরের সাথেই থাকতেন।

তয়ে ৩৯৩ হিজরীর ঈদুল ফিতরের শেষ রাতে নশ্বর জাহান ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। কাদের বিল্লাহ তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। শরীফ রেযা তাঁর শোক গাঁথা লিখতে গিয়ে বলেন, "তয়ে আবু তালিবের বংশধরের মধ্যে অধিক বক্র ছিলেন। তার শাসনামলে লোকদের মন থেকে ভয়-ভীতি উঠে যায়। এমনকি কবিগণও তার সমালোচনামূলক শ্লোক রচনা করত।"

তার যুগে নিম্ন বর্ণিত ওলামা হযরত ইন্তেকাল করেন- হাফেজ ইবনে সানা, ইবনে আদী, কাবীর, নাহুবিদ সিরানী, আবু সোহেল, আবু বকর রাযী হানাফী, ইবনে খালুয়া, ইমামুল লোগাত যহরী, দেওয়ানুল আদবের লেখক আবু ইবরাহীম ফারাবী, কবি রিফা, আবু যায়েদ আল-উমুরী শাফী, দারকী, আবু বকর আবহারী শায়খুল মালিকী, ইমামুল হানাফীয়া আবুল লায়ছ সমরকন্দী, নাহুবিদ আবু আলী আল-কারসী, ইবনে হাল্লাব মালিকী।

আল-কাদের বিল্লাহ

আল-কাদের বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইসহাক বিন মুকতাদার মওসুমা তামান্না অথবা দিমনা নামক বাঁদীর গর্ভে ৩৩৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তয়ে অপসারিত হওয়ার পর তিনি তখতে আরোহণ করেন। তয়ে অপসারিত হওয়ার সময় তিনি বাগদাদে ছিলেন না। ১০ই রমযানে তাকে ডেকে আনা হয়। ১১ই রমযানে সাধারণ পরিষদের সামনে তিনি মসনদে উপবেশন করেন। কবিগণ তার শানে কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি শরীফ রেযা বলেন, "হে বনূ আব্বাস! আজ আবার খিলাফতের মর্যাদাকে আবুল আব্বাস পুনর্জীবন দান করলেন। ঐক্যের মাধ্যমে এ শক্তিকে যুগ যুগ ধরে কায়েম রাখতে হবে।"

খতীব বলেন, কাদের বিল্লাহ অত্যন্ত সাধু, সুবিবেচক, ঝানু রাজনীতিবিদ, তাহাজ্জুদ গুজার এবং সদকা-খয়রাতকারী ছিলেন, তিনি সুপথ প্রাপ্ত হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি আল্লামা আবু বশর হারবী শাফীর নিকট ফিক্হ অর্জন করেন

فضائل صحابه تكفير معتزله قائلين خلق القرآن

একটি কিতাব লিখেন- যা প্রতি জুমআয় মুহাদ্দিসদের সামনে মাহদী জামে মসজিদে পাঠ করা হত। (ইবনুস সালাহ, তবকাতুস শাফীয়াহ)।

যাহাবী বলেন, খিলাফত লাভের প্রথম বর্ষের শাওয়াল মাসে একটি আড়ম্বরপূর্ণ সভার আহ্বান করা হয়। এতে কাদের বিল্লাহ এবং বাহাউদ্দৌলা প্রতিজ্ঞা রক্ষাকরণের শপথ করে এবং কাদের বিল্লাহ নিজের প্রাসাদ ছাড়া গোটা সাম্রাজ্য তার উপর সোপর্দ করেন।

এ বছর মক্কা শরীফের শাসনকর্তা আবুল ফুতুহ আল-হাসান বিন জাফর উলুবী লোকদের থেকে নিজের বাইআত নিয়ে রাশেদ বিল্লাহ লকব ধারণ করে। খিলাফত তার হস্তগত হয়। মিসরশাহীর শাসন মক্কায় পরাভূত হয়। কিছুদিন পর আবুল ফুতুহ দুর্বল হয়ে পড়লে মিশরের বাদশাহ আযীয উবায়দীর বশ্যতা মেনে নেয়।

৩৮২ হিজরীতে উযীর আবু নসর করখ অঞ্চলে একটি ভবন নির্মাণ করে। এর নাম রাখা হয় 'দারুল ইলম'। এতে একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা কায়েম করা হয়। বিপুল পরিমাণে ক্রয়কৃত গ্রন্থাদি এতে ছিল। ওলামাদের বিদ্যা অর্জনের জন্য এটি ওয়াকফ করা হয়। ৩৮৪ হিজরী ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়ামনের লোকেরা হজ্ব করতে গিয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসে। কারণ এ বছর ট্যাক্স ছাড়া হজ্ব করতে যেতে বাধা দেয়া হয়। এ বছর শুধু মিসরবাসীরাই হজ্ব করতে পারে।

৩৮৭ হিজরীতে সুলতান ফখরুদ্দৌলার তিরোধানে তার চার বছরের শিশু তদস্থলে নিয়োগ হয়। কাদের বিল্লাহ তাকে মাজদুদ্দৌলা উপাধি দেন।

যাহাবী বলেন, ৩৮৭/৩৮৮ হিজরীতে নয় জন বাদশাহ পরলোক গমন করেন। এদের মধ্যে মা-ওরাউন নহরের বাদশাহ মানসুর বিন নূহ, রায় এবং জাবালের 'শাসক ফখরুদ্দৌলা এবং মিসরের আযীয উবায়দী অন্তর্ভুক্ত। কবি আবু মানসুর আব্দুল মালিক এই নয় জনকে নিয়ে একটি শোক গাঁথা রচনা করেছেন।

যাহাবী বলেন, ৩৮৬ হিজরীতে মিসরশাহী আযীয মৃত্যুবরণ করে। সে তার বাবার থেকে প্রাপ্ত রাজ্যের সাথে হামস, হামাত এবং হলব শহরত্রয় জয় করে অন্তর্ভুক্ত করে। মওসুল এবং ইয়ামনে তার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। তার রাজ্যে তার নামে পয়সা চালু করা হয়েছিল। পতাকায় তার নাম লিখা থাকত, মার মৃত্যুর পর তদস্থলে তদীয় পুত্র মানসুর আল-হাকিম বিআমরিল্লাহ উপাধি নিয়ে সমাসীন হয়।

৩৯০ হিজরীতে সিজিস্তানে স্বর্ণের খনি বের হলে লোকেরা মাটি খনন করে স্বর্ণ উত্তোলন করে। ৩৯৩ হিজরীতে দামেশকের নায়েব আসওয়াদ পশ্চিমাঞ্চলীয় এক লোককে ধরে গাদার পিঠের উপর তুলে ঘোরানো হয়। সে সময় ঘোষক বলতে থাকে– এ হলো সে ব্যক্তি যে (হযরত) আবু বকর (রা) এবং (হযরত) উমর (রা)-কে ভালোবাসে। এরপর তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাকে হত্যাকারী এবং এই বাদশাহকে কিয়ামত দিবসে অপমান করুন।

৩৯৪ হিজরীতে বাহাউদ্দৌলা শরীফ আবু আহমদ হুসাইন বিন মূসাকে কাযি-উল-কুযযাতের সাথে হজ্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসহ শিরাজ নগরী পর্যন্ত তার এলাকা বৃদ্ধি করে দেয়। কিন্তু কাদের বিল্লাহ এতে অনুমোদন না দেয়ায় সে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

৩৯৫ হিজরীতে হাকিম মিসরে একদল ওলামাকে হত্যা করে। মসজিদের দেয়ালে দেয়ালে এবং পথ-প্রান্তরে সে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-দের কুৎসা লেখে।

সে হুকুম জারি করে– সাহাবীদের গালি দাও। কুকুর লালন-পালনকারীদের হত্যা কর। ফাকাআ (নিশামুক্ত শরতে) এবং মালুখীয়া (এক প্রকার ঔষধ) নিষিদ্ধ করে। চামড়াহীন মাছ খেতে নিষেধ করা হয়। এরপরও কেউ তা বিক্রয় করলে তাকে হত্যা করো।

৩৯৬ হিজরীতে হাকিম মিশর এবং হারামাইন শরীফাইনে (মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ) এ ফরমান জারি করে, যে কোনো স্থানে বা মজলিসে আমার নাম উচ্চারিত হলে শ্রবণকারী আমার সম্মানার্থ দাঁড়িয়ে যাবে এবং সিজদা করবে।

৩৯৮ হিজরীতে বাগদাদে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব হয়। দীর্ঘদিন এ লড়াই চলতে থাকে। এতে শায়েখ আবু হামেদ আসফারানী নিহত হন। রাফেযীরা বাগদাদে হে হাকিম! হে মানসুর! বলে চিৎকার করতে থাকে। এতে কাদের বিল্লাহ রাগান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি এ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। তিনি একদল অশ্বারোহী ফৌজ সুন্নতের অনুসারীদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। যারা অত্যন্ত নির্মমভাবে শিয়াদের গর্দান উড়িয়ে দেয়।

এ বছর হাকিম বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নির্মিত কামামার গীর্জা ভেঙে ফেলে। মিসরের সকল গির্জা ধ্বংস করে। খ্রিস্টানদের গলায় এক হাত লম্বা ও পাঁচ রিতিল ওজনের ক্রুশ পরার নির্দেশ দেয়। ইহুদীদের গলায় লাল বর্ণের একই ওজনের ক্রুশ পরার এবং কালো পাগড়ি বাঁধার হুকুম দেয়। এ কারণে অনেক ইহুদী ও খ্রিস্টান মুসলমান হয়। কিছুদিন পর সে আবার এ আইন বাতিল করে গির্জা পুনর্নির্মাণ এবং যারা অপারক হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে স্বধর্মে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়।

৩৯৯ হিজরীতে বসরার কাযী আবু আমরকে অপসারণ করে আবুল হাসান বিন শাওয়ারিবকে কাযী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছর স্পেনের উমাইয়্যা বংশীয় সুলতান দুর্বল হয়ে পড়ায় রাষ্ট্র শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং তার ব্যবস্থাপনা হাতছাড়া হয়ে যায়।

৪০০ হিজরীতে দজলা নদীর পানি এতটাই কমে যায়, যা ইতোপূর্বে আর কখনই হয়নি। ফলে দজলার চর ভাড়া দেয়া হয়। ৪০২ হিজরীতে হাকিম খেজুর ও আঙুর বিক্রি করে দেয় এবং অনেক আঙুরের গাছ ধ্বংস করে। ৪০৪ হিজরীতে রাত-দিন যে কোনো মুহূর্তে মেয়েদের রাস্তায় বেরুতে মানা করে। এ ফরমান তার মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল।

৪১১ হিজরীতে হাকিম মিসরের হালওয়ান নামক গ্রামে নিহত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার উপর লানত বর্ষণ করুন, তদস্থলে তার পুত্র আল-যাহের লি

আযাযুদ্দীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করে সমাসীন হয়।

৪২২ হিজরীর যিলহজ মাসের এগারো তারিখ সোমবার রাতে কাদের বিল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

তার শাসনামলে বর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– আবু আহমদ আসকারী আদীব, রুমানী নাহুবিদ, আবুল হাসান, মাসরজসী, আবু আব্দুল্লাহ মরযুবানী, মুঈদুদ্দৌলার উযীর সাহেব বিন উবাদা, হাফেজ দারা কুতনী, ইবনে শাহীন, আবু বকর আওদী ইমামুশ শাফীয়া, ইউসুফ, ইবনে সিরানী, ইবনে রুলাক আল-মিসরী, ইবনে আবী যায়েদ আল-মালিকী, কওতুল কুবের লেখক আবু তালিব আল-মালী, ইবনে বাত্তা আল-হাম্বলী, ইবনে শামউন খাতায়ী, খাতেমিল লগবী, আওফু আবু বকর, ইবনে গালবুন আল-মাকরী, কাশমিহনা, মাআনী বিন যাকারিয়া আন-নাহরুয়ানী, ইবনে খুওয়ায মিন্দাদ, ইবনে জনা, সহীদ-এর লেখক জওহরী, আল-জামালের লেখক ইবনে ফারেস, ইবনে মান্দাত আল-হাফেজ ইসমাঈল শায়খে শাফীয়াহ, আসবানা বিনিল ফারাজ শায়খে মালিকীয়া, বদিউয্যামান (যিনি সর্বপ্রথম মাকামাত লিখেছেন), ইবনে লাল, ইবনে আবী যাযনীন, আবু হায়ান আত্-তাওহিদী, কবি আলওয়াদ, আল-ফারিবিনের লেখক আল-হারবী, কবি আবুল ফাতাহ আল-বাস্নী, হালিমী শায়খে শাফীয়াহ, ইবনুল ফারিয, আবুল হাসান আল-কালবেসী, কাযী আবু বকর বাকলানী, আবু তবীব সালুকী, ইবনে আকফানী, আল-খুত্ব-এর লেখক ইবনে নাযাতাহ, সামিরী শায়খে শাফিয়াহ, মুসতাদরাকের লেখক হাকীম ইবনে কুজ, শায়েখ আবু হামেদ, ইবনে ফুরাক, শরীফ রেজা, আবু বকর আর-রাযী, হাফেজ আব্দুল গেনা বিন সাঈদ, ইবনে মারদুয়া, হাফতুল্লাহ বিন সালামা, ইবনুল বাওয়াব, আব্দুর রহমান, মুহামেলী, আবু বকর আল-কাফাল, ইবনুল ফুখার, আলী বিন ঈসা প্রমুখ।

আল্লামা যাহাবী এছাড়াও অসংখ্য মনীষীর নাম উল্লেখ করেছেন।

আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ

আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন আল-কাদের বিল্লাহ ৩৯১ হিজরীর যিলকদ মাসের মাঝামাঝিতে উম্মে ওলাদ মাসুমা বদরুদ্দোজা ভিন্ন মতে কতরুননিদা নামক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার জীবদ্দশায় ওলীয়ে আহাদ ছিলেন। তিনিই তাকে কায়েম বি আমরিল্লাহ খেতাব দেন। পিতার ইন্তেকালের পর ৪২২ হিজরীতে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে আছীর (রহ.) বলেন, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, সংযমী, ইবাদতকারী,

দানশীল, আলেম, আল্লাহর উপর ভরসাকারী, ধৈর্যশীল, সুসাহিত্যিক, সদা প্রফুল্ল, ইনসাফকারী এবং অভাব পূরণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কোনো কিছু চাইলে তিনি কাউকে বঞ্চিত করতেন না।

খতীব বলেন, মুসলিম সাম্রাজ্যে বসাসীরী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিংস্র হয়ে উঠে। তাকে প্রতিহত করার মত কেউ ছিল না। আরবে আযমে সকলেই তার ভয়ে কাঁপত। তার থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'আ করা হতো। সে লোকদের সম্পদ আত্মসাত করতো। গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতো। কায়িম তাকে প্রতিহত করেন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে প্রীতিকর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে সম্পর্কে চিড় ধরলে বসাসীরী দারুল খুলাফা লুণ্ঠন এবং খলীফাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করে। ফলে খলীফা রায়ের শাসনকর্তা আবু তালিব মুহাম্মাদ বিন মাকয়ালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রায়ের শাসনকর্তা টগর বেগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে ৪৪৭ হিজরীতে এসে বসাসীরীর বাসগৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে রহবা শহরে পালিয়ে যায়। তুর্কীরা বসাসীরীর পতাকা তলে সমবেত হয়। সে খলীফার বিরুদ্ধে মিসর শাসনকর্তার সাহায্য চাইলে সে তাকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করে। অতঃপর সে গটর বেগের ভাই টপালকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানায়। সে তাকে লোভ দিয়ে এ মর্মে পত্র লেখে যে, আমি বিজিত হলে তোমাকে রায়ের শাসনকর্তা বানাব। লোভে পড়ে টপাল টগর বেগের উপর আক্রমণ করলে বসাসীরী ৪৫০ হিজরীতে বাগদাদের দিকে কুজ করে। খলীফা বাগদাদের বাইরে এসে তার সাথে লড়াই করেন। মানসূর জামে মসজিদে মিসর শাসনকর্তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। আযানে حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ শব্দগুলো বৃদ্ধি করা হয়। সে সময় খলীফা নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়া সর্বত্র তার নামে খুতবা পঠিত হতে থাকে। এক মাস পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। যিলহজ মাসের শেষ দিকে সে খলীফাকে বন্দী করে গানায় নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখে।

ওদিকে টগর বেগ তার ভাইকে পরাজিত এবং হত্যা করে গানার প্রশাসককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক খলীফাকে দারুল খুলাফায় পৌঁছে দেবার জন্য পত্র লেখে। সে তাই করে। ৪৫১ হিজরীর যিলকদ মাসের পাঁচ তারিখে খলীফা এসে পৌঁছেন। সে সময় তিনি অত্যন্ত খোশ হাল অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর টগর বেগ সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে বসাসীরীর উপর হামলা করে। যুদ্ধে বসাসীরী পরাজিত হয়। সে তাকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তকখানা বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়।

খলীফা দারুল খুলাফায় ফিরে এসে জায়নামাযে ঘুমাতেন। দিনে রোযা রাখতেন, রাতে নামায পড়তেন। যারা তাকে কষ্ট দিত তিনি তাদের ক্ষমা করে

দিতেন। তিনি তার লুণ্ঠিত সম্পদ মূল্য প্রদান ছাড়া ফেরত নিতেন না। তিনি বলতেন, সর্ব বিষয়ের সওয়াব আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নিব। তিনি বালিশে মাথা রাখতেন না। কথিত আছে, তার প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় খেলাধুলার কোন আসবাবপত্র পাওয়া যায়নি। এটা তার বুযুর্গীর উন্নত দলিল।

বর্ণিত আছে, বসাসীরী তাকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি এ দু'আটি লিখে কাবা গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবার জন্য মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেন– "বান্দা মিসকিনের পক্ষ হতে মহান আল্লাহর দরবারে, হে ত্রিভুবনের শাহানশাহ! আপনি মনের গোপন অভিব্যক্তি সম্পর্কেও অবগত। অন্তরের অবস্থা আপনার সামনে দিবাকরের ন্যায় ভাস্বর। হে মাবুদ! আপনার অপার জ্ঞানভাণ্ডার নিজের সৃজনশীলতার ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। ইলাহী! আপনার এ বান্দা আপনার নেয়ামত অস্বীকার করেছে, কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি। নিয়ামতরাজির উপর নির্ভর করেনি। আপনার হুকুম মানার ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়েছে। ফলে আমার উপর এক বিদ্রোহীকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে– যাদের সাথে আমাদের দুশমনী, হে প্রতিপালক! সাহায্য হ্রাস পেয়েছে এবং অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। হে পালনকর্তা! আপনিই প্রত্যেক বিষয়ে অবিসংবাদিত, পরিজ্ঞাত, নিয়ন্ত্রক এবং বিচারক। আপনারই সমীপে ফরিয়াদ, প্রত্যাবর্তন এবং পানাহ চাইছি। হে দয়াময়! আপনার মাখলূক আমার উপর প্রভুত্ব করছে। আমি আপনার কাছেই ফরিয়াদ করছি। আমি আপনার ইনসাফ প্রার্থী। আপনি আমার উপর থেকে অন্ধকারের যবনিকা অপসৃত করুন। আপনার দয়া ও মমতার দুয়ার অবারিত করুন। আমাদের মাঝে ইনসাফ করুন। আপনিই খাইরুল হাকেমীন।"

৪২৮ হিজরীতে মিসর শাসনকর্তা আয-যাহের উবায়দী আট বছর চার মাস রাজত্ব করে মারা যায়। তার স্থানে তদীয় পুত্র আল-মুসতানসির সাত বছরের জন্য কায়েম থাকে।

যাহাবী বলেন, তার শাসনামলে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়– যার তীব্রতা একমাত্র ইউসুফ (আ.)-এর যুগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হয়। লোকেরা একে অপরকে কেটে ভক্ষণ করতো। সে সময় একটি রুটি পঞ্চাশ দিনারে বিক্রি হয়।

৪৪৩ হিজরীতে মুআয বিন নাদিস খুতবা থেকে উবায়দীদের নাম বাদ দিলে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বনূ আব্বাসের নাম পঠিত হতে থাকে।

৪৫১ হিজরীতে গাযনার বাদশাহ সুলতান ইবরাহীম মাহমুদ বিন সবক্তগীন এবং টগর বেগের ভাই খুরাসানের শাসনকর্তা জাফর বেগ বিন সালজুকের মধ্যে

তুমুল যুদ্ধ হয়। পরে উভয়ের মাঝে সন্ধি হয়। এর এক বছর পর জাফর বেগ ইন্তেকাল করে। তদস্থলে তদীয় পুত্র তখত নশীন হয়।

৪৫৪ হিজরীতে খলীফা নিজ কন্যাকে টগর বেগের সাথে বিয়ে দেন- যা কখনই এমনটা হয়নি। বনূ আব্বাস স্ববংশীয় ছাড়া কোথাও (কন্যা) বিয়ে দেয়নি। এমনকি বনূ যুয়া, যারা খলীফাদের উপর হুকুমত চালিয়েছে তাদেরকেও বনূ আব্বাস কন্যা দেয়নি। আর আমার (গ্রন্থকারের) যুগে খলীফা তার মেয়েকে ডেপুটি সুলতানের গোলামের সাথে বিয়ে দেন।

৪৫৫ হিজরীতে টগর বেগ খলীফার মেয়েকে নিয়ে বাগদাদে এসে মাওয়ারিছ এবং খারাজ ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর বাগদাদের উপর দেড় লাখ দিনার ট্যাক্স বসিয়ে রায়ে চলে যায়। সেখানে পৌছে সে মারা যায়। আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তার শূন্য পদে তার ভাতিজা খুরাসানের শাসনকর্তা ইরসালান অধিষ্ঠিত হয়। খলীফা তার কাছে খিলাআত পাঠান।

যাহাবী বলেন, ইরসালান সর্বপ্রথম বাগদাদে মিম্বরে আরোহণপূর্বক নিজের উপাধি সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে। সে অন্যান্য সুলতানের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় খ্রিস্টানদের অধিকাংশ শহর, নগর, জনপদ দখল করে নেয়। সে নিযামুল মুলূককে উযীর নিয়োগ করে। উমায়দুল মুলূকসহ সভাসদদের বরখাস্ত করে। সে শাফী' মাযহাবের মদদদাতা। হারামাইন শরীফাইনের ইমাম এবং আবুল কাসিম আল-কুশায়রীকে অত্যন্ত সমাদর ও সম্মান করত। সে মাদরাসায়ে নিযামিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে। বর্ণিত রয়েছে যে, সর্বপ্রথম ফিকহ্-এর জন্য এ মাদরাসার ভিত্তি দেয়া হয়।

৪৫৮ হিজরীতে দুই চেহারাবিশিষ্ট এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এ বছর আকাশে চাঁদের সমান একটি তারকা দেখা দেয়। এ থেকে তীব্র তাপদাহ নির্গত হয়। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা ভীষণ ভয় পায়। দশরাত পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। পরে তা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়।

৪৫৯ হিজরীতে মাদরাসা নিযামিয়ার কাজ সমাপ্ত হয়। শিক্ষক হিসেবে শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী নিয়োগ পান। চারিদিক থেকে ছাত্ররা আসতে থাকে। ইত্যবসরে শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী চলে যান। তার স্থানে ইবনে সবাগ সাহেবে কামেল দরস দিতে শুরু করেন। অতঃপর লোকেরা শায়খ আবু ইসহাক শিরাজীকে বুঝিয়ে নিয়ে এলে পরে তিনি দরস-তদরিসের কাজ আরম্ভ করেন।

৪৬০ হিজরীতে রমলায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়। এতে রমলা সমূলে বিধ্বস্ত হয়। পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়। ৪৬১ হিজরীতে দামেশকের জামে মসজিদে

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কারুকার্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত সাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

৪৬২ হিজরীতে মক্কার আমীরের দূত এসে সুলতান আল্‌ব আরসালানকে এ সংবাদ দেয় যে, মক্কা শরীফে মুসতানসিরের নামে খুতবা বন্ধ হয়ে বনূ আব্বাসের নামে খুতবা পড়া আরম্ভ হয়েছে আযান থেকে حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ শব্দগুলো বাদ পড়েছে। এ কথা শুনে সুলতান দূতকে খুশি হয়ে ত্রিশ হাজার দিনার এবং খিলআত প্রদান করে। সে সময় মিসরীয় সালতানাত দুর্ভিক্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল। মানুষ মানুষের গোস্ত খেত। স্বর্ণের সমপরিমাণে খাদ্য ক্রয় করতে হত। একটি কুকুর পাঁচ দিনার এবং একটি বিড়াল তিন দিনারে বিক্রি হত। কথিত আছে, জনৈক নারী এক ঝুড়ি মনি-মুক্তা নিয়ে কায়র থেকে এই উদ্দেশ্যে বের হয় যে, সে এক ঝুড়ি মনি-মুক্তার বিনিময়ে এক ঝুড়ি খাদ্য চায়। কিন্তু সে তা পায়নি।

৪৬৩ হিজরীতে বনূ আব্বাস ও সুলতান আল্‌ব আরসালানের শক্তি এবং মুসতানসিরের সালতানাতের পতন দেখে লোকেরা বনূ আব্বাসের নামে খুতবা পাঠ করতে থাকে। এ বছর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে রোমানরা মুসলমানদের নিকট পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে সুলতান আরসালান স্বয়ং সেনাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং রোম সম্রাটকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। অতঃপর মোটা অংশের মুক্তিপণ নিয়ে সম্রাটকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পঞ্চাশ বছর মেয়াদী উভয়ের মাঝে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ৪৬৪ হিজরীতে ছাগলের মাঝে মরণ ব্যাধি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পালের পর পাল ছাগল মরে সাফ হয়ে যায়।

৪৬৫ হিজরীতে আল্‌ব আরসালান নিহত হয়। তার জায়গায় পুত্র মুলক শাহ অধিষ্ঠিত হয়। তাকে জালালুদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সে নিযামুল মুলককে কলমদানি এবং দোয়াত উপহার দেয়। অতঃপর সে তাকে আতা বেগ যার অর্থ আমীরুদ্দৌলা উপাধি দেয়। ইনি প্রথম ব্যক্তি যাকে তিনি সর্বপ্রথম উপাধি প্রদান করেন।

৪৬৬ হিজরীতে দজলা নদীর ত্রিশ হাত খাড়া পানিতে বাগদাদ প্লাবিত হয়। এতে প্রচুর জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। লোকেরা জাহাজে আশ্রয় নেয়। দু'টি জুমআর নামায জাহাজেই হয়। খলীফা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। এক লাখের বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ায় বাগদাদ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

৪৬৭ হিজরীতে পঁয়তাল্লিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর তিনি শাবান মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।

তার খিলাফত কালে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– আবু বকর

ইয়ুরকানী, আবুল ফজল ফালকী, ছাআলাবী, কুদদারী শায়খে হানাফীয়া, ইবনে সীনা দার্শনিক, কবি মিহয়ার, আবু নাঈম, আবু যায়েদ, তাহযীবের লেখক বুকুয়ী মালিকী, আবুল হাসান বসরী মুতাযানী, মক্কী, শায়খ আবু মুহাম্মাদ জুবিনী, মাহদী সাহেবে তাফসীর, আকলিলী, ছুমানিনী, ইরশাদের লেখক আবু আমর দাদানী জালিল, সালিম রাযী, আবুল আলা মুফযী, আবু উসমান ছাবুনী, ইবনে বাত্তাল বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার, কাযী আবু তয়্যব তাবারী, ইবনে শায়তী মাকরী, মাদরদী শাফী, ইবনে বাব শাদ, শিহাব বিন বুরহান নাহুবিদ, ইবনে হাযাম যাহেরী, বায়হাকী, ইবনে সায়্যোদাহ, আবু ইয়ালা বিন ফারার শায়খে হানাবালা, শাফী হাযালী, শায়খে বাগদাদী ইবনে রাশীক, উমদাহ বিন আব্দুল বার প্রমুখ।

আল-মুকতাদী বি আমরিল্লাহ

আল-মুকতাদী বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন কায়িম বি আমরিল্লাহ গর্ভে থাকাকালীন তার পিতার মৃত্যু হয়। বাবার ইন্তেকালের ছয় মাস পরে তিনি এক দাসীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। দাদার মৃত্যুর পর তিনি ১৯ বছর তিন মাস বয়সে খিলাফতে আসীন হন, তাকে মুকুট পরানোর অনুষ্ঠানে শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী, ইবনে সবাআ এবং ওমানী উপস্থিত ছিলেন।

তার খিলাফতকালে শহরগুলোতে অনেক নেক কাজ হয়। খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধি পায়। তার খিলাফত ছিল পূর্ববর্তী খিলাফতের বিপরীত। বাগদাদে গান-বাজনা নিষিদ্ধ হয়। গায়কগায়িকাদের বাগদাদ থেকে বের করে দেয়া হয়। পর্দা বিনষ্ট না হওয়ার জন্য হাম্মামের সিঁড়িগুলো ভেঙে ফেলেন। বনূ আব্বাসের মধ্যে তার খিলাফত ছিল অত্যন্ত দ্বীনদার, অতিশয় নেককার এবং প্রতাপান্বিত। তার খিলাফতের প্রথম বছর থেকেই পবিত্র মক্কা শরীফে উবায়দীদের নামে খুতবা পাঠ করা হতে থাকে।

এ বছর নিযামুল মুলুক তারকা বিশেষজ্ঞদের সমবেত করে সূর্যাস্তের পর থেকে নববর্ষের সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। আগে সূর্যোদয় থেকে দিনের শুরু হতো।

৪৬৮ হিজরীতে দামেশ্‌কে মুকতাদীর নামে খুতবা দেয়া আরম্ভ হয়। আযান থেকে حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ শব্দগুলো বাদ পড়ে। এতে লোকেরা খুশি হয়। ৪৬৯ হিজরীতে আবু নসর বিন উসতাদ আবুল কাসিম কাশিরী আশআরী বাগদাদের মাদরাসা নিযামিয়ায় এসে ওয়াজ করেন। এতে হানাবেলারা রাগান্বিত হওয়ায় এক বড় ফিত্‌নার সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষের দল ভারি হতে থাকে। ফলে এক দল আরেক

দলের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এ বছর গোড়া হাম্বলী হওয়ার কারণে মুকতাদীর উযীর ফখরুদ্দৌলা বিন জহিরকে বরখাস্ত করা হয়।

৪৭৫ হিজরীতে মুকতাদী সুলতানের নিকট আবু ইসহাক শিরাজীকে পাঠিয়ে উমায়েদ আবুল ফাতাহ- এর অভিযোগ দায়ের করেন। ৪৭৬ হিজরীতে দুর্ভিক্ষ উঠে যাওয়ায় শহরগুলোতে ফসলাদি উৎপাদিত হয়। এ বছর মুকতাদী আবু শুজা মুহাম্মাদ বিন হাসানকে কলমদানী, দোয়াত এবং যহিরুদ্দীন লকব প্রদান করেন। আমার মতে এ শব্দে এটাই প্রথম লকব।

৪৭৭ হিজরীতে কওনীয়া এবং আকসার শাসনকর্তা সসৈন্যে সিরিয়ায় গমন করেন এবং ইনতাকীয়া শহর দখল করেন। যা ৩৫৮ হিজরী থেকে রোম সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। সুলতান মুলক শাহ এ কাজের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান।

যাহাবী বলেন, রোমান সাম্রাজ্যের শহরগুলোর শাসনকর্তারা সালজুক বংশীয়।

৪৭৮ হিজরীতে বাগদাদে অন্ধকার নেমে আসে, বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ থেকে বালু মাটি বর্ষিত হয়। কিছু কিছু স্থানে চড়ক পড়ে। এ দুর্যোগ দেখে লোকেরা ভেবেছিল কিয়ামত বুঝি সমাগত। ইমাম আবু বকর তরতুসী স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে আমালী নামক গ্রন্থে এর বিবরণ পেশ করেন।

৪৭৯ হিজরীতে সুবতা ও মুরাকিশের শাসনকর্তা ইউসুফ বিন তাশফীনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুকতাদী তাকে তার অধীনস্থ রাজ্যগুলো প্রদানকরত আমিরুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি তার নিকট খিলআত এবং পতাকা প্রেরণ করেন। এতে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফকীহগণ আনন্দিত হন। ইউসুফ মুরাকিশ শহরের প্রবর্তন করেন। এ বছর সর্বপ্রথম সুলতান মুলক শাহ বাগদাদে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় অবস্থান করে এবং খলীফার সাথে পোলো খেলে ইস্পাহানে ফিরে যায়। এ বছর থেকে হারামাইন শরীফাইন উবায়দীদের নাম রহিত করে খুতবায় খলীফার নাম পাঠ করা হয়।

গাযানার শাসনকর্তা আল-মুঈদ ইবরাহীম বিন মাসউদ বিন মাহমুদ সবক্তগীন ৪৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করলে তদস্থলে তার ছেলে জালালুদ্দীন মাসউদ তখত নশীন হয়। ৪৮৩ হিজরীতে তাজুল মুলক মুসতাওয়াফিদ্দৌলা বাগদাদের বাবুল আবয্যারে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আবু বকর শাশী এখানে শিক্ষকতা শুরু করেন।

৪৮৪ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা গোটা সাকলীয়া উপদ্বীপ দখল করে নেয়। মুসলমানরা ২০০ হিজরীতে এ দ্বীপটি পদানত করেছিল। আগলিবের বংশধররা খলীফার পক্ষ হতে এটি শাসন করতো। তাদের থেকে উবায়দী মাহদীরা এটি দখল

করে এবং ফিরিঙ্গীরা তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। এ বছর মুলক শাহ বাগদাদে এসে একটি বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এর আশেপাশে আমীর-উমারাগণ নিজেদের বাস ভবন তৈরি করে। অতঃপর মুলক শাহ ইস্পাহানে ফিরে যায়।

৪৮৫ হিজরীতে সুলতান মুলক শাহ আবার বাগদাদে এসে খলীফাকে অতিসত্বর বাগদাদ ছেড়ে চলে যাবার সংবাদ দেয়। খলীফা কিছুটা সময় প্রার্থনা করেন। সে তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর খলীফা সুলতান মুলক শাহ্-এর উযীরের নিকট সময় চাইলে সে মাত্র দশ দিন সময় দেয়। কিন্তু দশ দিন অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লোকেরা এটাকে খলীফার কারামত হিসেবে উল্লেখ করে।

কথিত আছে, খলীফা মুকতাদী সময় লাভের দিনগুলোতে রোযা রাখতে শুরু করেন। ইফতারের মুহূর্তে ছাই-এর উপর বসে সুলতান মুলক শাহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতেন। আল্লাহ পাক তার দু'আ কবুল করেন।

সুলতান মুলক শাহ-এর মৃত্যু সংবাদ তার স্ত্রী গোপন রেখে আমীর-উমারাদের নিকট থেকে তার পাঁচ বছরের শিশু সন্তান মাহমুদের জন্য উত্তরাধিকারের (ওলী আহাদের) শপথ নেয়। অতঃপর সে তাকে সুলতান মনোনীত করার জন্য খলীফার নিকট আবেদন জানায়। খলীফা তা মঞ্জুর করেন এবং তাকে নাসিরুদ্দীন ওয়া দুনিয়া উপাধি দেন। কিছু দিন পর মাহমুদের ভাই বরকিয়ারুক হামলা চালায়। খলীফা তাকে সুলতান বানিয়ে রুকনদ্দৌলা উপাধি দেয়। এটা ৪৮৭ হিজরীর মুহাররম মাসের ঘটনা।

এ ঘটনার পর দিন শামসুন নাহার নামক বাঁদীর বিষ প্রয়োগে খলীফা মুকতাদী ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতকালে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- আব্দুল কাহের জুরজানী, আবুল ওয়ালীদ বাজী, আবু ইসহাক শিরাজী বিখ্যাত নাহুবিদ, শামেলের লেখক ইবনে সবাআ, ইমামুল হারামাইন আল-মুতাওয়াল্লী, আদ-দামগানী হানাফী, ইবনে ফাযাল মুজাশায়ী, বুযুদী শায়খে হানাফী প্রমুখ।

আল-মুসতাযহার বিল্লাহ

আল-মুসতাযহার বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুকতাদী বিল্লাহ ৪৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার মৃত্যুর পর ষোলো বছর বয়সে তিনি তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে আছীর (র.) বলেন, তিনি অত্যন্ত কোমল মতি, উন্নত চরিত্র, নেককার এবং সদা লাস্যমান। অনেক বিষয়ে তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। যা তার ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডারের অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি দানশীল, উদার এবং ওলামা প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এই খলীফার খিলাফতে অসুন্দরের কোনো নমুনা পাওয়া যাবে না। খিলাফতের দিনগুলো তার যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সর্বদা উদ্বিগ্ন অবস্থায় কেটেছে। খিলাফত লাভে প্রথম বছর মিসরের শাসনকর্তা মুসতানসির উবায়দীর মৃত্যুর পর তার ছেলে তখত নসীন হয়। এ বছর রোমানরা বলনসীয়াহ শহর দখল করে নেয়।

৪৮৮ হিজরীতে সমরকন্দের বাদশাহ আহমদ খা নিহত হয়। লোকটি বদ্‌দ্বীন ছিল। উমারাগণ তাকে বন্দী করে এবং মুফতীগণ তাকে হত্যার ফতোয়া দেন। তার স্থানে উমারাগণ তার চাচাত ভাইকে উপবেশন করায়।

৪৮৯ হিজরীতে একমাত্র শনিগ্রহ ছাড়া সকল গ্রহপুঞ্জ ও নক্ষত্ররাজি বুরজে হুতে মীন রাশি জমা হলে জ্যোতিষিরা ঐকমত্য হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করল– অচিরেই হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের মত তুফান হবে। কিন্তু একটি প্লাবন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। হাজীগণ বাইতুল্লাহ শরীফে সমবেত হলে অধিকাংশ হাজী এ প্লাবনে ভেসে যায়।

৪৯০ হিজরীতে খুরাসানের শাসনকর্তা সুলতান আরসালান আরগোয়ান বিন আলব আরসালান সালজুকী নিহত হয়। সুলতান বুরকীয়ারুক তার রাজ্যগুলো পদানত করে। এবং শহরের লোকেরা এসে তার সাথে মিলিত হয়। এ বছর হলব, ইনতাকিয়া, মুরাহ এবং শিরাজ শহরে এক মাস পর্যন্ত উবায়দীদের নামে খুতবা পড়া হয়। এরপর আবার আব্বাসীয়দের নামে খুতবা পাঠ আরম্ভ হয়। এ বছর ফিরিঙ্গীরা এসে সর্বপ্রথম তায়কীয়া শহর দখল করে তাদের মন্ত্রী মোওয়াফেক শহরে কুফর জারি করে। তারা পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে লুটতরাজ করে। ফিরিঙ্গীরা প্রথমে সিরিয়ায় অবস্থান করেছিল। কুসতুনতুনিয়া পানিপথে ফৌজী বাহিনী নিয়ে আসে। বাদশাহ এবং প্রজাবৃন্দের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তারা গ্রহণ করে। কথিত আছে, সালজুকীদের শক্তি ও প্রতিপত্তি দেখে মিসরের বাদশাহর পত্র কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে তারা সিরিয়ায় হামলা চালায়। লোকেরাও তাদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

৪৯২ হিজরীতে ইস্পাহানে বতনিয়্যরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ বছর ফিরিঙ্গীরা দেড় মাস দুর্গে আবদ্ধ থাকার পর বাইতুল মুকাদ্দীস দখল করে এবং আলেম-ওলামা, ইবাদতকারী ও দানশীলদের এক বড় জামাতাকে হত্যা করে। নিহতদের

সংখ্যা আনুমানিক সত্তর সহস্রাধিক, সত্যবাদিদের ধ্বংস করে। ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলে। বাকীরা বাগদাদে পালিয়ে যায়। এ অত্যাচারের বিবরণ শুনে যে কোন চক্ষু অশ্রু ঝরাবে। কবিরা কবিতার তুলিতে এ পৈচাশিকতার করুণ কাহিনী তুলে ধরেছে। সুলতানগণ অপারক হয়ে সম্মিলিতভাবে ফিরিঙ্গীদের উপর হামলা চালিয়ে বাইতুল মুকাদ্দিস ছিনিয়ে নেয়।

এ বছর মিসরে এত অন্ধকার নেমে আসে যে, আপন হাত পর্যন্ত দেখা যেত না। আকাশ থেকে অবিরাম বালু বর্ষিত হয়। এ অবস্থা দৃষ্টে লোকেরা ভাবে, ধ্বংসের সময় সমাগত প্রায়। অতঃপর কিছুটা আলোর কণা দেখা দেয়। এরপর পূর্ণ উজ্জ্বলতা বিকশিত হয়। আসর থেকে মাগরিবের পর পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ মান ছিল।

এ বছর ফিরিঙ্গী এবং স্পেন শাসনকর্তা ইবনে নাশিকীনের মধ্যে লড়াই হয়। মুসলমানরা জয়লাভ করে। অনেক ফিরিঙ্গী নিহত ও বন্দী হয়। বিপুল পরিমাণে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। অনেক বড় বড় বীর বাহাদুর ফিরিঙ্গীরা পরপারের যাত্রী হয়।

৫০৭ হিজরীতে মওসুলের বাদশাহ মওদুদ ফিরিঙ্গীদের বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দীস যান। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। অতঃপর মওদুদ দামেশকে এসে জামে মসজিদে জুমআর নামায পড়ে বেরুনের সময় জনৈক বাত্ নীর অতর্কিত আক্রমণে আহত হন এবং সে দিনেই তিনি মারা যান। ফিরিঙ্গীদের বাদশাহ দামেশকের শাসনকর্তার নিকট এ মর্মে পত্র লিখল– তোমাদের এক আদনা গোলাম তোমাদের ঈদের দিন তোমাদের বাদশাহকে আল্লাহর ঘরে হত্যা করেছে। লজ্জার কথা যে, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৫১১ হিজরীতে প্রাকৃতিক প্লাবনে বোখার এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো ডুবে যায়। এতে অনেক জানমালের ক্ষতি হয়। এ বছর সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু হয়। তদস্থলে তার ছেলে মাহমুদ চৌদ্দ বছর বয়সে সুলতান হয়।

৫১২ হিজরীতে খলীফা মুসতাযহার বিল্লাহ তের রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে পঁচিশ বছর খিলাফত পরিচালনার পর জগতের মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। ইবনে আকীল শায়খে হানাবালা তাকে গোসল করান এবং তার ছেলে আল-মুসতারশিদ জানাযায় নামায পড়ান। এর অল্প কিছুদিন পর জাওয়ান নাম্নী খলীফার দাদী ইন্তেকাল করেন। যাহাবী বলেন, আমার জানা মতে একমাত্র মুকতাদীর দাদী ছাড়া কেউ নাতির খিলাফতকাল দেখে যেতে পারেনি। মুকতাদীর দাদী, নাতি এবং নাতির ছেলের যুগেও জীবিত ছিলেন। মুসতাযহার কবিতা জানতেন। তার অনেক কবিতা প্রসিদ্ধতা অর্জন করেছে।

সালাফী বলেন, আবুল খাত্তাব বিন জাররাহ আমার নিকট বর্ণনা করেন, আমি রমযান মাসের একদিন নামাযের ইমামতি করলাম। মুসতাযহারের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেরাতে সূরা ইউসুফের মধ্যে إِنَّ ابْنَكَ سُرِّقَ (নিশ্চয়ই আপনার ছেলে চুরি করেছেন) তিলাওয়াত করলাম। সালাম ফিরিয়ে মুসতাযহার বললেন, এটাই অধিকতর সঠিক কেরাত। কারণ এর মাধ্যমে পয়গম্বরগণ ভ্রম থেকে দূরে বুঝায়।

তার যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন– আবুল মুতফার সামআনী, নাসরুল মুকাদ্দাসী, আবুল ফরজ, রুয়ানী, খতীব তিবরিযী, কিয়ার হারায়ী, ইমাম গাযালী, মুসতাযহারের প্রশংসামূলক জীবনী লেখক শাশী, আয়বরদী আল-লগবী প্রমুখ।

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ আবু মানসুর আল-ফজল বিন-আল-মুসতাযহার বিল্লাহ ৪৮৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ৫১২ হিজরীর রবিউল আখের মাসে তিনি তখ্‌তে সমাসীন হন। তিনি বীর, সাহসী, বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। খিলাফতের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। খিলাফতের দেহে পুনর্জীবন দান করেন। খিলাফতকে সুসংহত ও সুদৃঢ়করণে বিস্তর অবদান রাখেন। শরীয়তের আরকানগুলো মজবুত করেন। তিনি স্বশরীরে যুদ্ধ করতেন। কয়েকবার হালা, মওসুল এবং খুরাসান যুদ্ধে গমন করেন। শেষে হামদানের নিকটবর্তী রণাঙ্গনে তার ফৌজরা পরাজিত হয় এবং তাকে বন্দী করে আযারবাইজানে পাঠানো হয়।

তিনি আবুল কাসিম বিন বয়ান এবং আব্দুল ওহাব বিন হাবতীল্লাহ আস-সুবতীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে উমর বিন মক্কী আল-আহওয়াযী, তার উযীর আলী বিন তারাদ, ইসমাঈল বিন তহের আল-মওসুলী তার থেকে রেওয়ায়েত করেন। (এটা ইবনে সাআনীর বর্ণনা)

তার ইলম ও মর্যাদার ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইবনে সাল্লাহ তার স্বরচিত তবকাতে শাফীয়াহ গ্রন্থে লেখেন, আবু বকর আশ্-শাশী তার নামানুসারে একখানা ফিকাহ্ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তিনি 'উমদাতুত দুনিয়া ওয়াল আখেরা' খেতাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইবনে সুবকী তবকাতে শাফীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, মুসতারশিদ বিল্লাহ আবেদ এবং দানবীর ছিলেন, পশমের পোশাক পরতেন। ইবাদত করার জন্য নিজ আলয়ের একটি স্থান নির্ধারণ করেছিলেন।

পিতার খিলাফতকালে তার বাবা তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে তার নাম খোদিত পয়সা চালু করেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে বনূ আব্বাসের সকল খলীফার মধ্যে থেকে তিনি অগ্রজ। অধিকাংশ লেখক তার কাছে ভুল সংশোধন করতো। তার সাহসিকতা, প্রতিপত্তি, বীরত্ব, অগ্রগামিতা ছিল দিবাকরের ন্যায় ভাস্বর। তবে তার শাসনামল ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিরোধিরা তার উদয়াচলকে বিষণ্ন করে তুলেছিল। এ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিপন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি নিজেই রণাঙ্গনে গমন করেন। সর্বশেষ তিনি ইরাকে গিয়ে পরাজিত হয়ে বন্দী হন এবং শাহাদাতের শরাব পান করেন।

যাহাবী বলেন, ৫২৫ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ বিন মুলক শাহ নিহত হন। তার ছেলে দাউদ সুলতান হয়। কিছুদিন পর তার চাচাত ভাই মাসউদ বিন মুহাম্মাদ দাউদের উপর হামলা করে। উভয়ের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। অবশেষে সালতানাতের অংশীদারিত্বের উপর সন্ধি হয়। বাগদাদে খুতবায় মাসউদের নাম পাঠ করা হতে থাকে। কয়েক দিন পর মাসউদ এবং খলীফার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মাসউদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। খলীফাও তার ফৌজ নিয়ে যাত্রা করেন। কিন্তু খলীফার সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। অধিকাংশ সিপাহী খলীফার সঙ্গ বর্জন করে। ফলে মাসউদ জয়লাভ করে। খলীফা একদল অভিজাত লোকসহ বন্দী হন। হামদানের নিকটবর্তী এক দুর্গে তাদের কয়েদ করে রাখা হয়।

এ খবর জানার পর বাগদাদের আবালবৃদ্ধবণিতা গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। সেদিন মানুষ এতটাই স্তব্ধ হয়ে যায় যে, সেদিন নামায এবং খুতবা বন্ধ ছিল। ইবনে জাওযী বলেন, সেদিন বাগদাদে ভূমিকম্প হয়েছিল। যা পাঁচ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রতিদিন পাঁচ ছয় বার করে ভূকম্পন হতো। এতে লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করে।

সুলতান সিনজর স্বীয় ভাতিজা মাসউদের নিকট দূত পাঠিয়ে বলল, তুমি খলীফার কাছে যাও। নিজেকে পাপী বলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অন্ধকার, বিদ্যুৎ এবং ভূমিকম্পে সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও বিষণ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো আসমান এবং যমীনের ভয়ংকর আলামত– যা দেখার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। ফলে মসজিদগুলোতে নামায এবং খুতবা না হওয়া কতই না গজব ও বিপজ্জনক কথা। তুমি অবিলম্বে আমিরুল মুমিনীনের খিদমতে হাযির হও। তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদার

সাথে দারুল খুলাফায় পৌঁছে দাও, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা করত। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে তুমি সেবার চাদর শরীরে জড়াও। মাসউদ সুলতান সিনজরের কথা মান্য করে। সে যমীনে খিদমত চুম্বন করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর সুলতান সিনজর খলীফাকে সসম্মানে নিয়ে আসার জন্য মাসউদের কাছে দূতসহ একদল সৈন্য পাঠায়। এ সৈন্য দলের মধ্যে সতের জন বাতেনী (সম্প্রদায়ের লোক-যারা খিলাফত বিরোধী) ঢুকে পড়ে। যা সুলতান এবং মাসউদ কেউ জানত না। কেউ কেউ বলেন, মাসুদ নিজেই তাদের লেলিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে তারা খলীফার তাবুতে ঢুকে অভিজাত লোকগুলোসহ খলীফাকে হত্যা করে। বাকী ফৌজরা যখন এ কথা জানতে পারল তখন সব শেষ হয়ে গেছে। পরিশেষে তাদের বন্দী করে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর লানত বর্ষণ করুন।

প্রজাবৃন্দ এ কথা জানতে পেয়ে কিয়ামত দিবসের মতো শোরগোল শুরু করে। এ খবর বাগদাদে পৌঁছলে হাশরের দৃশ্য নেমে আসে। জনতা উলঙ্গ শরীরে কাপড় পরতে পরতে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। নারীরা খোলা চুলে শোক গাথা গাইতে থাকে। কারণ মুসতারশিদ বীরত্ব, ইবাদত এবং নমনীয় মেজাজের কারণে সকলের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন। ৫২৯ হিজরীর যিলকদ মাসের ষোলো তারিখ সোমবারে তিনি শহীদ হন।

মুসতারশিদের কবিতাগুলোর মধ্যে একটি হলো- বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন- "এটা বিস্ময়ের কোন কারণ নয়, যদিও কুত্তা বাঘের উপর বিজয় অর্জন করে। কারণ ওয়াহ্শী হযরত হামযা (রা.) এবং ইবনে মুলজেম হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করেছিল।"

পরাজিত হওয়ার মুহূর্তে লোকেরা মুসতারশিদকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যাহাবী বলেন, মুসতারশিদ তার বাবার শান অনুযায়ী ঈদুল আযহায় সুন্দর একটি খুতবা পাঠ করেন। উযীর জালালুদ্দীন আল-হাসান বিন আলী বিন সদকাহ খলীফা মুসতারশিদের প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেছেন।

৫২৪ হিজরীতে মুসতারশিদের যুগে মওসুলে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়। এ বছর মিসরের শাসনকর্তা আল-আমর বিআহকামিল্লাহ মানসুর নিহত হলে তার চাচাত ভাই হাফেজ আব্দুল মজিদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাসির ওলী হয়।

মুসতারশিদের শাসনামলে বর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন- শামসুল আইম্মা আবুল ফজল ইমামে হানাফীয়া, আবুল ওফা বিন আকীল হাম্বলী, কাযী-উল-কুয্যাত আবুল হাসান আল-দামগানী বিন বিলমাতুল মাকরী, আইম্মাতুল আজালের

লেখক তগরায়ী, আবু আলী সিদ্‌ফী হাফেজ, আবু নসর কুশায়রী বিন কাত্তা আল-লগবী, মহিউস্‌সুন্নাহ আল-বাগবী, ইবনুল হায আল-মাকরী, মাকামাতের লেখক হারীরী, আমছালের লেখক ময়দানী, আবুল ওলীদ বিন রুশদ আল মালিকী, ইমাম আবু বকর তরতুসী, আবুল হুজ্জাজ সয়কতী ইবনে সায়্যেদ যাতলুসী সী, আবু আলী আল-ফারুকী শাফী বিন খাত্‌-তুরুত, ইবনে বাযশ, কবি জাফর, আব্দুল গাফ্‌ফার প্রমুখ।

আর-রাশেদ বিল্লাহ

আর-রাশেদ বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর বিন মুসতারশিদ ৫০২ হিজরীতে এক বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, জন্মের সময় তার পায়খানার রাস্তা বন্ধ ছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শক্রমে স্বর্ণের রাগ দ্বারা পায়খানার রাস্তা চিরে দিলে পরবর্তীতে তা ভালো হয়ে যায়।

৫১৩ হিজরীতে তার পিতা মুসতারশিদ তার শাসনামলে তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ৫২৯ হিজরীর যিলকাদা মাসে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

রাশেদ ছিলেন মিষ্টভাষী, সাহিত্যিক, কবি, বীর, প্রাজ্ঞ, দানশীল, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ এবং ঝগড়া ফাসাদকে ঘৃণাকারী।

সুলতান মাসউদ বাগদাদে আসার সময় খলীফা মওসুলে চলে যান, মাসউদ বাগদাদে এসে বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ওলামাদের সমবেত করে অনেক লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র তাদের সামনে তুলে ধরল। রাশেদ এই অত্যাচার করেছেন, অমুকের অমুকের সম্পদ গ্রাস করেছেন, রক্তের শরাব পান করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা ফতোয়া দিন যে, এ খলীফাকে অপসারণ করা নায়েবে সালতানাতের জন্য জায়েয কিনা? এ মুহূর্তে তার ইমামত কি সহীহ হবে? সুলতানগণ তদস্থলে অন্য খলীফা নির্বাচন করেছেন।

ওলামাগণ তাকে অপসারণের ফতোয়া দিয়ে দেন। মজলিসে ওলামাদের মধ্যে কাযী শহর ইবনে কুরখীও উপস্থিত ছিলেন। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তার চাচা মুহাম্মাদ বিন মুসতাযহারকে আল-মুকতাফা লি আমরিল্লাহ উপাধি দিয়ে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এটা ৫৩০ হিজরীর যিলকদ মাসের ষোলো তারিখের ঘটনা।

সংবাদ পেয়ে রাশেদ বিপুল অর্থ-সম্পদের লোভ দিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে আজারবাইযান চলে যান। সৈন্যরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অতঃপর হামদান গিয়ে সেখানেও নারকীয় তাণ্ডব চালায়। অনেক লোককে হত্যা, অনেককে শূলেতে

চড়ানো এবং বহু আলেমের দাড়ি কামিয়ে দেয়া হয়। এরপর ইস্পাহান অবরোধ করে শহরে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

৫৩২ হিজরীর রমযান মাসের ষোলো তারিখে এক আযমী লোক তার তাঁবুতে ঢুকে ছোরা দিয়ে তাকে হত্যা করে। তার সাথে খলীফার সহচরদেরও সে হত্যা করে। খবর পেয়ে বাগদাদবাসী এক দিন মাতম করে।

উম্মাদ কাতেব বলেন, রাশেদ ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর লাবণ্য এবং দানশীলতার সর্ব শেষ ব্যক্তিত্ব।

চাদর এবং ছড়ি মৃত্যু পর্যন্ত রাশেদের কাছেই ছিল। মৃত্যুর পর সেগুলো মুকতাফীর নিকট পৌছে যায়।

আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহ

৪৮৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আল-মুসতাযহার বিল্লাহ এক হাবশী বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাশেদকে অপসারণের পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি খিলাফতের তখতে বসেন।

আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহ উপাধি ধারণ করার কারণ হলো তিনি খলীফা হওয়ার ছয় দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি (সা.) তাকে বলছেন, অচিরেই তুমি খিলাফত পাবে। তুমি আল-মুকতাফী লি আমরিল্লাহ লকব ধারণ করবে। ফলে তিনি তাই করেন।

মুকতাফী তখতে আরোহণ অন্তে ইনসাফ ও সুবিচারের মাধ্যমে গোটা বাগদাদ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেললে সুলতান মাসউদ দারুল খুলাফার সকল আসবাবপত্র যেমন চতুষ্পদ প্রাণী, গৃহের সহজ-সরঞ্জাম স্বর্ণ, রৌপ্য, পর্দা ইত্যাদি নিয়ে নেয়। খিলাফতের আস্তাবলে চারটি অশ্ব এবং আটটি গাধা ছাড়া আর কিছুই সে রেখে যায়নি। কথিত আছে, বাইআতের সময় মুকতাফীর সাথে মাসউদের এমন শর্তই ছিল।

অতঃপর ৫৩১ হিজরীতে সুলতান মাসউদ কয়েকটি বাগান ছাড়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সকল জিনিসপত্র নিজের অধীনে নেয়, এর পরও সে খলীফার নিকট থেকে এক লাখ দিনার নিয়ে আসার জন্য স্বীয় উযীরকে পাঠায়। মুকতাফী বললেন, বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, তোমরা জান মুসতারশিদ নিজের সকল সম্পদ নিয়ে মাসউদের কাছে চলে গিয়েছিলেন। এতে যে অবস্থা হয় তা দুনিয়াবাসী অবগত। তারপর রাশেদ খলীফা হয়ে যা করেছেন তা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। এরপরও যা

ছিল ঘরের জিনিসপত্রসহ মাসউদ নিজেই সেগুলো নিয়ে গেছে। মাসউদ উক্ত দুই খলীফার ধনাগারও লুণ্ঠন করেছে। এখন আমি তোমাকে কোথা থেকে সম্পদ এনে দিব? বর্তমানে শুধু এতটুকুই বাকী রয়েছে যে, নিজের ঘর-বাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে একটি দানাও আদায় করব না।

এ কথা শুনে মাসউদ নিজের অভিপ্রায় প্রত্যাহার করে। কিন্তু সে সম্পদ আরোহণের জন্য লোকদের উপর কঠোরতা আরোপ করতে থাকে। ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্সের বড় বড় বোঝা চাপিয়ে দেয়।

এ বছর রমযান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আহলে বাগদাদ রোযা রাখে, সন্ধ্যায় ৩০ তারিখেও চাঁদ দেখা গেল না। যা ইতোপূর্বে হয়নি।

৫৩৩ হিজরীতে বিহতারাহ শহরে এক লক্ষ আশি হাজার ফুট পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে অনেক মানুষ হতাহত হয়। শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর মাটি ফেটে কালো পানি বেরিয়ে আসতে থাকে।

এ বছর শহরগুলো খলীফার নিয়ন্ত্রণে আসে। মাসউদ দুর্বল, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুলতান সিন্‌জর-এরও একই অবস্থা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকে অপমানের মাধ্যমে মুকতাফীকে সম্মানিত করেন এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। খিলাফতের সীমানার মধ্যে খলীফার প্রতাপ বৃদ্ধি পায় এবং বনূ আব্বাসের রাজত্বের সংশোধনের সূত্রপাত হয়। (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ)

৫৪১ হিজরীতে মাসউদ বাগদাদে এসে মুদ্রা প্রস্তুতকারী কারখানার ভিত্তি দেয়। এ কারখানায় মুদ্রা তৈরির কারিগরদের খলীফা বন্দী করেন। মাসউদ খলীফার প্রহরীকে গ্রেফতার করায় খলীফা রাগান্বিত হয়ে পড়েন। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদসমূহের দরজা বন্ধ ছিল। অবশেষে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বছর ইবনে উবাবী ওয়াজের মজলিসে বসে আসেন। সুলতান মাসউদ সেই মাহফিলে হাযির ছিল। ইবনে উবাবী সুলতান কর্তৃক জনগণের উপর অত্যাচারের বিবরণদানে মাসউদকে বললেন, শুল্ক আদায়কারী অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করে। আর আপনি সেই আদায়কৃত কর একই রাতে গায়কদের দিয়ে দেন। অথচ আপনাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

মাসউদ এ নসীহত গ্রহণ করে শহরময় এলান করে জানিয়ে দেয় যে, আর কেউ করারোপ করবে না। এ ঘোষণাটি কাষ্ঠফলকে লিখে তা অত্যন্ত শান-

শওকতের সাথে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করানোর পর তা এক জায়গায় পুঁতে দেয়া হয়। এ ফলকটি আন-নাসর লিদ্বীনিল্লাহর যুগ পর্যন্ত প্রথিতই ছিল। কিন্তু তিনি এই বলে তা তুলে ফেলেন– অনারবদের রীতি আমার প্রয়োজন নেই।

৫৪৩ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা দামেশক অবরোধ করলে হলবের শাসনকর্তা নূরুদ্দীন মাহমুদ বিন জঙ্গী এবং তার ভাই তাদের মোকাবিলা করেন। আলহামদু লিল্লাহ মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করে। নূরুদ্দীন জঙ্গী ফিরিঙ্গীদের সাথে লড়াই করতেই থাকে। অবশেষে তিনি সকল শহর, নগর, জনপদ উদ্ধার করেন– যা মুসলমানদের হাত থেকে ফিরিঙ্গীরা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

৫৪৪ হিজরীতে মিসরের শাসনকর্তা আল-হাফিজ আদ্দীনিল্লাহ মারা যায়। তদস্থলে তার পুত্র আয-যাহের ইসমাঈল উপবেশন করে। এ বছর বাগদাদে ভূমিকম্প এবং দশবার বন্যা হয়। সে সময় হিলওয়ানের একটি পাহাড় ভেঙে পড়ে।

৫৪৫ হিজরীতে ইয়ামনে রক্তের বৃষ্টি হয়। কয়েক দিন পর্যন্ত যমীন লাল হয়ে ছিল। লোকদের কাপড় লাল হয়ে যায়। ৫৪৭ হিজরীতে সুলতান মাসউদ মারা যায়।

মুকতাফীর উযীর ইবনে হুবায়রাহ বলেন, মাসউদ জনসাধারণ এবং মুকতাফীর প্রতি জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করলে প্রকাশ্যে এর মোকাবিরা করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। ফলে আমি এবং মুকতাফীর মধ্যে পরামর্শ হয় যে, একমাস অবিরাম আমরা মাসউদের জন্য বদদু'আ করব। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) রিআল এবং যাকওয়ান (দু'টি আরব কবিলার নাম অনুবাদক)-এর জন্য একমাস বদদু'আ করেছিলেন। আমরা জমাদিউল আউয়াল মাসের ২৯ তারিখ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বদদু'আ করতে শুরু করলাম। এক মাস পূর্ণ হলে মাসউদ মারা যায়।

মাসউদের পরলোক গমনের পর সেনাবাহিনী মুলক শাহ–এর বিষয়ে একমত হয়। ফলে মুলক শাহ সুলতান মনোনীত হয়। কিন্তু খাস বেগ তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। অতঃপর খাস বেগ তার ভাই মুহাম্মাদকে খুযস্তান থেকে ডেকে এনে তার উপর সালতানাত সোপর্দ করে। সে দিন থেকে মুকতাফী মুক্ত-স্বাধীন খলীফা হিসেবে পরিণত হন। সাম্রাজ্যের সর্বত্রই খলীফার আহকাম জারি হয়। সুলতান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাদরাসা নিযামিয়া থেকে অপসারণ করেন। ইত্যবসরে ওয়াসেতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গোলযোগের সংবাদ পেয়ে খলীফা নিজেই সসৈন্যে তাদের দমনকরত হিল্লা এবং কুফা পদাবনত করে বাগদাদে ফিরে আসেন। সেদিন বাগদাদ নগরী অপরূপ সাজে সুসজ্জিত হয়েছিল।

৫৪৮ হিজরীতে তুর্কীরা সুলতান সিনজারের উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। তারা তাকে অপমান করে এবং তার রাজত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে রাজত্ব ছাড়া নবাবের মত তখনও তার নাম খুতবায় পঠিত হতো। অবশেষে সে অনুতপ্ত হলে নামেমাত্র সুলতান উপাধি দিয়ে ঘোড়া চালকের সমান তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়।

৫৪৯ হিজরীতে আয-যাহের বিল্লাহ উবায়দী নিহত হওয়ায় তার ছেলে আল-ফায়েয ঈসা তদস্থলে সমাসীন হয়। ঈসার বয়স অল্প হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কাজে সে অনেক ভুল-ত্রুটি করে ফেলে। সুযোগ দেখে মুকতাফী নূরুদ্দীন জঙ্গীকে মিসর অধিকার করার জন্য লিখিতভাবে জানান। নূরুদ্দীন জঙ্গী সে সময় ফিরিঙ্গীদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। কারণ দামেশ্‌কে অনেক শহর এবং দুর্গ তিনি জয় করেছিলেন। এতে সাম্রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপরও রোমান শহরগুলো তিনি দখল করেছিলেন। তার বীরত্বের কাহিনী দূর প্রাচ্যের লোকদের অন্তরেও গেঁথে গিয়েছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে মুকতাফীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মিসরে গমন করেন। খলীফা তাকে মুলকুল আদেল উপাধিতে ভূষিত করেন।

এ সময় মুকতাফীর শান-শওকত বেড়ে যায়। বিরোধিরা তার প্রভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি জিহাদের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতিহত করেন এবং তার সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়তেই থাকে। তিনি ৫৫৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ছয় তারিখ রবিবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

যাহাবী বলেন, মুকতাফী খলীফাদের মুকুট, আলেম, সাহিত্যিক, ধৈর্যশীল, বাহাদুর, চরিত্রবান, বিশ্বস্ত এবং খিলাফত পরিচালনায় দক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আইম্মাদের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তার খিলাফতকালে সততা, সুবিচার এবং আমানত খেয়ানতের কোন দৃষ্টান্ত নেই।

মুকতাফী স্বীয় উস্তাদ আবুল বারাকাত বিন আবুল ফরজ বিন আস্‌সিন্নীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইবনে সুমআনী বলেন, আর কিছু (হাদীস) তিনি তার ভাই মুসতারশিদের সাথে আবুল কাসিম বিন বয়ানের থেকেও শুনেছেন। আর তার নিকট থেকে তার ইমাম আবু মানসুর আল-জাওয়ালিকা লাগবী এবং তার উযীর ইবনে হুবায়রাহ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মুকতাফী কাবা শরীফের একটি নতুন দরজা নির্মাণ করেন। নিজের দাফনের জন্য আকীক পাথরের শববাহী খাট তৈরী করেন, তিনি নেক স্বভাব, সাম্রাজ্যের গর্ব, দ্বীনদার, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ অভিমত পোষণকারী এবং রাজনীতিবিদ খলীফা ছিলেন।

তিনি খিলাফতকে পুনর্জীবন দান করেন। খিলাফতের রীতিনীতি পুনরায় জারি করেন। রাষ্ট্রীয় কাজ তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। রণাঙ্গনে স্বশরীরে উপস্থিত হতেন। তার খিলাফতকালে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর বরকত দান করেছিলেন।

আবু তালিব আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সমী' হাশেমী স্বরচিত 'মানাকিবুল আব্বাসিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ইনসাফ এবং নেক কাজের কারণে মুকতাফীর যুগ ছিল সবুজ-শ্যামল। তিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ সময় ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি দ্বীনের কাজ, কুরআন তিলাওয়াত এবং ইল্‌ম অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন। খলীফা মুতাসিমের পর এমন নরম দিল, চরিত্রবান, বীর, সাহসী এবং নির্ভীক কোন খলীফা অতিবাহিত হননি মুসতাকফী ছাড়া। তার বীরত্ব, সাহসিকতা এবং নির্ভিকতার মধ্যে ইবাদত এবং পরহেযগারের সংমিশ্রণ ছিল। তার সৈনিকরা যেখানেই যেত সেখানেই সর্বদা বিজয় ছিনিয়ে আনত। তিনি কোথাও পরাজিত হতেন না।

ইবনে জাওযী (র.) বলেন, মুকতাফীর খিলাফত কালে বাগদাদ এবং ইরাক আবার খলীফার হাতে আসে। সে সময় কোন লোক ঝগড়া করত না। মুকতাযদের যুগ থেকে মুকতাফীর খিলাফতের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাগদাদ এবং ইরাক নামমাত্র খলীফার অধীনে ছিল, নায়েবে সালতানাতই প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ হয়ে জেঁকে বসেছিল। মুকতাফীর নায়েব হলেন খুরাসানের শাসনকর্তা সুলতান সিনজর এবং শামের শাসনকর্তা নূরুদ্দীন জঙ্গী। মুকতাফী অত্যন্ত দানশীল, দয়ার্দ্র, হাদীসের উপর আমলকারী, তিনি নিজে আলেম এবং আলেমদের মর্যাদা দানকারী।

একদা মুকতাফী ইমাম হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য আবু মানসুরকে আহ্বান জানালেন। তিনি এসে এভাবে সালাম দিলেন–

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

(আসসালামু আলা আমিরিল মুমিনীনা ওয়া রাহমাতুল্লাহ)। সে সময় তবীব ইবনে তিলমিয নাসরানী দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবু মানসুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, শায়খ! এটাই কি সালামের রীতি? ইমাম আবু মানসুর খলীফাকে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! এ সালাম সুন্নতে নববী (সা.)। অতঃপর তিনি এর সমর্থনে একখানা হাদীস পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, কোন ইহুদী এবং খৃস্টান ইলম অর্জন করতে পারবে না– যদি কেউ এ কথার উপর কসম করার পর

তা ভেঙ্গে দেয় তাহলে সে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে না। কারণ তাদের ভেতর কোন ঈমান নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে সীল এঁটে দিয়েছেন। মুকতাফী বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ইবনে তিলমিয যদিও জ্ঞানী এবং সুসাহিত্যিক তথাপি (খৃস্টান হওয়ার কারণে- অনুবাদক) তার মুখে পাথরের লাগাম লাগান।

তার শাসনামলে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- ইবনুল আবরাশ নাহুবী,ইউসুফ বিন মুগীছ, জালালুল ইসলাম বিন মুসলিম আশ-শাফী, তাহযীবের লেখক আবুল কাসিম ইস্পাহানী, ইবনে বুরজান, মারযী মালিকী, যমখশরী, ইমামে হানাফী রিশা তঙ্গ, ইবনে আতীয়া, আবুস সাআদাত বিন শাজ্জারী, ইমাম আবু বকর বিন আরাবী, কবি নাসিহুদ্দীন আরজানী, কাযী আয়ায, হাফেজ আবু লায়দ বিন দাবাগ, আবুল আসআদ হাত্তার রহমান আলকাশিরী, ইবনে আলাম আল-ফরশ আল-মাকরী, কবি রিফা, শহর সিতানী, কবি কিসরানী, ইমাম গাযালীর ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবুল ফজল বিন নাসের আল-হাফেজ, আবুল কারাম শহরুযী আলমাকরী, কবি আলওয়া, ইবনুন নখল ইমাম শাফীয়া প্রমুখ।

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফ্ফর ইউসুফ বিন আলমুকতাফী ৫১৮ হিজরীতে গিরজিস্তানের তাউস নামক বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৪৭ হিজরীতে মুকতাফী তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। মুকতাফীর মৃত্যুর পর তার নিকট বাইআত করা হয়।

মুসতানজিদ ইনসাফ, সুবিচার এবং নমনীয় স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি অনেক শুল্ক ক্ষমা করে দেন। ইরাকের সমস্ত কর মাফ করেন। বখাটে ও সন্ত্রাসী লোকদের সাথে তিনি কঠোর আচরণ করতেন। জনৈক লোক মানুষের ক্ষতি করতো। তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। আরেক লোক তার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার দিনার দেয়ার প্রস্তাব দিলে খলীফা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, এ লোকটিকে বন্দী করতে পারলে আমিই দশ হাজার দিনার পুরস্কার দিব।

ইবনে জাওযী (র.) বলেন, মুসতানজিদ বিল্লাহ উজ্জ্বল প্রাজ্ঞতা, নির্ভুল অভিমত, সঠিক বিচার, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং দয়ার্দ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উপমাহীন পদ্য এবং বাকবিদগ্ধ গদ্য রচনা করেন। ইলম এবং বীরত্বে তার দক্ষতা প্রসিদ্ধ। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

খিলাফত লাভের প্রথম বছর অর্থাৎ ৫৫৫ হিজরীতে মিসর শাসনকর্তা আল-ফায়েয মারা গেলে তার ছেলে আযদ্বলিদ্দীনিল্লাহ তখতে উপবেশন করেন। তিনি হলেন উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলীফা।

৫৬২ হিজরীতে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী আমীর আসাদউদ্দীনকে দুই হাজার অশ্বারোহী দিয়ে মিসরে পাঠান। আসাদউদ্দীন দুই মাস মিসর অবরোধ করে রাখেন। মিসরের শাসনকর্তা ফিরিঙ্গীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। দিময়াত থেকে সাহায্য এসে পৌঁছালে আসাদউদ্দীন সাঈদ শহরে চলে যান। সেখানে মিসরীদের সাথে যুদ্ধ হয়। শত্রু বাহিনীর তুলনায় নিজের সৈন্য সামান্য হওয়ার পরও আসাদউদ্দীন বিজয় অর্জন করেন, সহস্রাধিক ফিরিঙ্গী ভূগর্ভস্থ কক্ষে শায়িত হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি সাঈদ শহরের খারাজ মাফ করে দেন। অতঃপর ফিরিঙ্গীরা ইস্কান্দারিয়া আক্রমণ করতে চাইলে তা আগেই আসাদউদ্দীনের ভাতিজা সালাহুদ্দীন ইউসুফ বিন আইয়ুব দখল করে নিয়েছিলেন। ফিরিঙ্গীরা চার মাস ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করে রাখে। সংবাদ পেয়ে আসাদউদ্দীন ধেয়ে এলে তারা পালিয়ে যায়। তিনি সসৈন্যে সিরিয়ায় ফিরে আসেন।

৫৬৪ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা বিশাল বাহিনী নিয়ে মিসর হামলা করে। মিসরের শাসনকর্তা ভীত হয়ে কাহেরা শহরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য চেয়ে পত্র পাঠায়। আসাদউদ্দীন সাহায্যার্থ এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে তারা পালিয়ে যায়। মিসরের শাসনকর্তা তাকে কলম, দোয়াত এবং খিলআত প্রদান করেন। তিনি তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু জীবন তাকে ছাড় দেয়নি। ৫৬৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর মিসরের শাসনকর্তা তার ভাতিজা সালাহুদ্দীন ইউসুফ বিন আইয়ুবকে উযীর নিয়োগ করে মুলকুন নাসের উপাধি দেয়। সালাহুদ্দীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত এখানেই মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। ৫৬৬ হিজরীর রবিউস সানী মাসের আট তারিখে খলীফা মুসতানজিদ ইন্তেকাল করেন।

যাহাবী বলেন, মুসতানজিদ অসুস্থ অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে আকাশ লাল হয়ে ছিল। যার আলো এবং লাল বর্ণ দেয়ালে দেখা যেতো।

তার শাসনামলে বর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– মুসনাদ আল-ফিরদৌসের লেখক দায়লামী, আল-বয়ান শাফীয়ার লেখক উমরানী, ইবনে বায়যারী শাফী, উযীর ইবনে হুবায়রাহ, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.), ইমাম আবু সাঈদ সুমআনী, ইবনে নাজীব সহ্‌রওয়ার্দী (র.), আবুল হাসান বিন হাযীল আল-মাকরী প্রমুখ।

আল-মুসতাযা বি আমরিল্লাহ

আল-মুসতাযা বি আমরিল্লাহ আল-হাসান বিন আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ ৫৩৬ হিজরীতে আরমেনীয় গোযযা নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তখতে আরোহণ করেন।

ইবনে জাওযী বলেন, তিনি সরকার প্রধান হওয়ার পর সকল শুল্ক মওকুফ করে দেন। এতে করে জুলুমের গতি রুদ্ধ হয়। চারিদিকে ইনসাফের শীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। আমি নিজের জীবনে কখনই এমনটা দেখিনি। হাশেমী, উলুববী, ওলামায়ে মুদাররিসীন এবং ইমামদের পেছনে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন, তিনি সর্বদা অর্থ ব্যয় করতেন। তার দৃষ্টিতে অর্থের কোনো মূল্য ছিল না। তিনি অত্যন্ত নম্র ও দয়ার্দ্র ছিলেন। তিনি খলীফা হওয়ার সময় সকল সুলতানদের খিলাআত প্রদান করেন। মাখযিন ওয়ারযী বলেন, সে সময় তিনি লোকদের মাঝে এক হাজার তিন শ'রেশমের কাবা (আলখেল্লা) বন্টন করেন। বাগদাদে তার নামে খুতবা পাঠ করা হলে তিনি অনেক দিনার সদকা করে দেন। রুহ বিন হাদীসীকে কাযী-উল-কুযযাত মনোনীত করে তাকে সতেরোটি গোলাম দান করেন।

ইবনে জাওযী বলেন, তিনি অধিকাংশ লোক থেকে পর্দা করতেন। খাদেম ছাড়া তিনি সওয়ার হতেন না এবং সেবকগণ ব্যতীত তার কাছে কেউ যেতে পারত না।

কবি হায়েস বায়েস তার শানে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। তার খিলাফত কালে উমাইয়্যা বংশীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মিসরে তার নামে খুতবা দেয়া এবং মুদ্রায় তার নাম খোদাই করা হয়। লোক মারফত এ সংবাদ বাগদাদে পৌছুলে একাধিক বাতির সমাহারে তীব্র আলোর ঝলকানিতে বাজার ঝলমল করে উঠে। ইবনে জাওযী বলেন, আমি এ ঘটনাকে নিয়ে 'আল-নসর আলাল মিসর' নামে পৃথক একটি বই লিখেছি।

যাহাবী বলেন, ৫৬৭ হিজরীতে বাগদাদে রাফেযীদের প্রভাব একেবারেই নিঃশেষিত হয়। লোকদের নিরাপত্তা নসীব হয় এবং সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ইয়ামন, বুরকা, তুরিয, মিসর এবং উসওয়ান পর্যন্ত তার নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে। অধিকাংশ বাদশাহ তার ফরমানগত হয়ে পড়ে।

উবাদ কাতেব বলেন, ৫৬৭ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন বিন আইয়ুব মিসরের জামে মসজিদে আনুগত্যের উপর বয়ান করেন। প্রথম জুমআয় মিসরে তিনি বনূ আব্বাসের নামে খুতবা পাঠ করেন। এতে বিদআত নিস্তেনাবুদ হয় এবং শরীয়ত স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় জুমআয় তিনি বনূ আব্বাসের নামে কাহেরায় খুতবা প্রদান

করেন। এরপর আশুরার দিন মিসরের শাসনকর্তা আল-আযদ বিল্লাহ মারা যায়। সালাহুদ্দীন তার সকল পরিত্যক্ত সৌখিন আসবাবপত্র হস্তগত করেন। এরমধ্যে মূল্যবান এবং পছন্দনীয় জিনিসগুলো রেখে তিনি সবগুলো বিক্রি করে দেন। এগুলো বিক্রি করতে সময় লেগেছিল দশ বছর। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এ সুসংবাদ দিয়ে শিহাবুদ্দীন আল-মুযাফফর বিন আল-আল্লামা বিন আবী উসরুনকে বাগদাদে প্রেরণ করেন এবং আমাকে (উবাদ কাতেব) খোশ খবরী নামা লিখার নির্দেশ দেন। আমি লিখলাম," আল্লাহ তা'আলা সত্যকে জয়যুক্তকারী। তিনি সত্যকে প্রকাশ এবং ভ্রষ্টতাকে ধ্বংস করেছেন। তার করুণায় আমরা কৃতজ্ঞ, শহর, নগর, জ নপদের এমন কোন মিম্বর নেই যেখানে আমাদের ইমাম মুসতাযা বি আমরিল্লাহ আমিরুল মুমিনীনের নামে খুতবা পড়া হয়নি। সকল মসজিদ ইবাদতকারী এবং দানশীলদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। বিদআতের মারকাযগুলো ভেঙে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের জন্য যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদেরকে আল-হাদ এবং রাফেযদের উৎখাত করার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা তাদের ধ্বংস করতে পেরেছি। (হে আল্লাহ!) আব্বাসীয় রাজত্ব সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক আমাদের দিন।

এ পত্রসহ দূত বাগদাদে পৌঁছুলে খলীফা সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং সালাহুদ্দীনকে খিলআত এবং মর্যাদাবান বস্তু আর উমাদ কাতেবের জন্য খিলআত ও একশ' দিনার পাঠিয়ে দেন।

ইবনে আছীর বলেন, সুলতান সালাহুদ্দীন মিসরের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিলে আযিদ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান সালাহুদ্দীনকে খুলাফায়ে বনু আব্বাসের নামে খুতবা পাঠ করতে বললেন। কিন্তু তিনি মিসরবাসীর অবাধ্যতার আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নূরুদ্দীন জঙ্গী খুতবা পাঠের আবার তাকীদ দিলেন। ফলে তিনি আমীর-উমারাদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে মতামত তুলে ধরল। ইত্যবসরে আমিরুল আলিম নামক মিসরের জনৈক আজমী লোক এসে বলল, আমি সর্বপ্রথম এ কাজ শুরু করব, অতএব মুহাররম মাসের প্রথম জুমআয় সে ইমামের পূর্বে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলীফার জন্য দু'আ করে। লোকেরা বাধা দিল না। দ্বিতীয় জুমআয় সালাহুদ্দীন আযীদের নামীয় খুতবা বর্জনের নির্দেশ দেয়। হুকুম তামিল করা হল। লোকেরা কোনই কথা বলল না। সে সময় আযিদের অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। অবশেষে সে আশুরার দিন মারা যায়।

৫৬৯ হিজরীতে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী উপহারস্বরূপ খলীফার নিকট একটি গাধা প্রেরণ করেন। এর শরীরে অক্ষরিক দাগ ছিল। একে উতাবী গাধা বলা হত। এ বছর দজলা ও ফোরাতের পানিতে বাগদাদ প্লাবিত হয়। এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর ইন্তেকালে তার ছেলে মুলকুস সালেহ ইসমাঈল তখত নসীন হন। এ বছর ফিরিঙ্গীরা হামলা করতে এলে অনেক ধনদৌলত দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়। এ বছর উমাইয়্যা বংশীয় হিতাকাঙ্ক্ষীরা বনূ উমাইয়্যার সালতানাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সুলতান সালাহুদ্দীনের আমীরগণও এ চক্রান্তে যোগ দেয়। সংবাদ পেয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন তাদের সকলকে বন্দী করে শূলেতে চড়ান।

৫৭২ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন মিসর এবং কাহেবার পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এ কাজ বাহাউদ্দীনের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। ইবনে আছীর বলেন, এ প্রাচীর ছিল উনত্রিশ হাজার তিন শত হাত। এ বছর তিনি জাবালে মুকতমে একটি দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর শেষ তিনি দেখে যেতে পারেননি। এ বছর তার ইন্তেকাল হয়। তার ভাতিজা সুলতান মুলকুল কামেল এ কাজ সমাপ্ত করেন। এ বছর সুলতান সালাহুদ্দীন হযরত ইমাম শাফী (র.)-এর কবরে মাযার তৈরি করেন।

৫৭৪ হিজরীতে বাগদাদে অন্ধকার নেমে আসে এবং আকাশে আগুনের মিনার দেখা দেয়। ৫৭৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষে মুসতাযা ইন্তেকাল করেন।

তার খিলাফতকালে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– নাহুবিদ ইবনে খুশাব, মুলকুল নাজ্জাত আবু নাজ্জার আল-হাসান বিন সাফী, হাফেজ আবুল আল্লামা হামদানী, নাহুবিদ নাসিহুদ্দীন বিন দিহান, ইমাম শাফী (রা.)-এর আওলাদ হাফেজ আল-কাবীর আবুল কাসিম বিন আসাকির, কবি হায়েস বায়েস, হাফেজ আবু বকর বিন খায়রু প্রমুখ।

আন-নাসর লিদ্দীনিল্লাহ

আন-নাসর লিদ্দীনিল্লাহ আহমদ আবুল আব্বাস বিন আল-মুসতাযা বি আমরিল্লাহ ৫৫৩ হিজরীর রযব মাসে যুমরাদ নামক তুর্কী বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৭৫ হিজরীর যিলকদ মাসের চাঁদনী রাতে তিনি তখতে আরোহণ করেন।

মুহাদ্দিসীনদের একটি জামাত তাকে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করেন। সেই মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে আবুল হুসাইন আব্দুল হক আল-ইউসুফী এবং আবুল হাসান আলী বিন আসাকির আলবাহাতী প্রমুখ অন্যতম। তিনি নিজেও এক

জামাতকে হাদীস বর্ণনা করার ইজাযত দেন। তার শাসনামলে লোকেরা তার থেকে সনদ ছাড়া রেওয়ায়েত করাকে গর্বের বিষয় মনে করত। যাহাবী বলেন, এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনো খলীফা খিলাফতের কাজ পরিচালনা করেননি। তিনি ৪৭ বছর তখত নসীন ছিলেন। তিনি সারা জীবন ইয্যত এবং সম্মানের সাথে বেঁচে ছিলেন। তিনি সকল শত্রুদের মূলোৎপাটন করেন। সকল সুলতান প্রকাশ্যে তার আনুগত্য ঘোষণা করে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সাহস কারো ছিল না। তার উপর হামলা করার ধৃষ্টতাও কেউ দেখায়নি। যদি কেউ হামলা করেছে তো সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোন বিরোধী চক্র মাথা তুললে সাথে সাথে তা দমন করা হয়। কেউ তার অনিষ্ট করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিতেন। তিনি স্বীয় পিতামহের মত কল্যাণধর্মী কাজে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। প্রজা হিতৈষী মানব ছিলেন। প্রত্যেক শহরে সংবাদ সরবরাহের কাজে একাধিক লোক নিয়োগ ছিল। তারা সকল সুলতানের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় লিখে জানাত। তিনি রাজনৈতিক কূটচাল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিলেন অবিসংবাদিত।

খলীফা আন-নাসর গায়েবের খবর জানতেন না। একবার খাওয়ারিযম শাহীর দূত একটি মোহর আটানো পত্র নিয়ে বাগদাদে আসে। খলীফা তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও। পত্রের বিষয়বস্তু আমার অজানা নয়। দূত ফিরে গেল।

যাহাবী বলেন, লোকদের ধারণা খলীফার বশে জিন ছিল। খুরাসান এবং মাওরাউন নাহারের বাদশাহ খাওয়ারিযম লোকদের উপর অত্যাচার করত, প্রতাপশালী রাজাদের হাত করেছিল, শহরের পর শহর লুণ্ঠন করত এবং মুসলিম বিশ্বে বনূ আব্বাসের নাম খুতবা থেকে বাদ দেয়। সে বাগদাদ দখলের জন্য হামদান শহরে পৌঁছুলে ২০ দিন ধরে বিরামহীন বরফ বর্ষিত হয়। ফলে সে আর সামনে এগুতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে তার সাথীরা মন্তব্য করল, খলীফার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশে যাত্রা করেছে বিধায় আল্লাহ তা'আলা এ গযব নাযিল করেছেন। অবশেষে সে ফিরে যায়।

আন-নাসর যখন লোকদের শাস্তি দিতেন তখন দারুণ কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর কাউকে দান করলে নিশ্চিতভাবে তার দুস্থতা ও দরিদ্রতা কেটে যেত। জনৈক ব্যক্তি ভারত থেকে খলীফার জন্য একটি তোতা পাখি এনেছিল। পাখিটি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে পারত। বাগদাদে পৌঁছে সেদিন রাতে পাখিটি মারা যায়। সকালে লোকটি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে খলীফার খাদেম এসে বলল, পাখিটি কোথায়? সে বলল, মারা গেছে। খাদেম

বলল, বলত কতটুকু পুরস্কার পাবার আশায় তুমি খলীফার জন্য পাখিটি এনেছিলে? সে বলল, পাঁচ শ' দিনারের আশা ছিল। খাদেম তার কাঙ্ক্ষিত অর্থ তাকে দিয়ে বলল, এগুলো খলীফা তোমাকে দিয়েছেন। তুমি ভারত গমনের পর থেকেই খলীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন।

একবার সদরে জাঁহার সাথে অনেক মুফতী বাগদাদে অসেন। এদের মধ্যে একজন ফকীহ তার নিজের ঘোড়ায় চড়ে স্বীয় বাসস্থান সমরকন্দ থেকে বাগদাদে আসার সময় তার স্ত্রী ঘোড়াটি রেখে যাবার অনুরোধ জানিয়ে বলল, এত সুন্দর ঘোড়াটি তুমি নিয়ে যেও না। খলীফা দেখলে কেড়ে নিবেন। মুফতী সাহেব বললেন, খলীফার এতটা দুঃসাহস হবে না। এর মধ্যেই বিষয়টি খলীফার কানে পৌঁছে যায়। তিনি তার শাহী বাবুর্চিকে বাগদাদে এলে সেই মুফতী সাহেবের ঘোড়াটি কেড়ে নেবার অদেশ দিলেন। তাই হল। শখের ঘোড়াটি হাত ছাড়া হওয়ায় ফকীহ দারুণ বেদনায় হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন, সদরে জাঁহা ফিরে যাবার সময় খলীফা সকল মুফতীর খিলআত প্রদান করেন। সেই মুফতী সাহেবও খিলআত প্রাপ্ত হন। খিলআত হিসেবে খলীফা তাকে তার অনিন্দ সুন্দর শখের প্রিয় ঘোড়াটি প্রদান করেন। প্রদানের সময় খলীফা তাকে বলেন, তোমার ঘোড়াটি কেড়ে নেবার মত দুঃসাহস এই খলীফার না থাকলেও তাঁরই এক নিম্নস্তরের গোলাম তা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ কথা শুনে মুফতী সাহেব বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়েন এবং খলীফার কারামতের কায়িলে পরিণত হন।

আল-মুফিক-আব্দুল লতীফ বলেন, মানুষের অন্তরে খলীফার ভয় জেঁকে বসেছিল। বাগদাদের লোকদের মতই ভারত এবং মিসরের জনগণ তাঁকে ভীষণ ভয় পেত। খলীফা মুতাসিমের পর যে বীরত্ব, নির্ভীকতা ও সাহসীকতার অপমৃত্যু ঘটেছিল তিনি তা পুনর্জ্জীবিত করেন। অতঃপর তাঁর অন্তর্ধানে খিলাফতের সেই দুর্দমনীয় প্রতাপেরও মৃত্যু হয়। বড় বড় শক্তিধর বাদশাহ যেমন শাম এবং মিসরের সুলতানগণ আপন দরবারেও তাঁর দুর্জয় প্রতাপের কারণে ধীরে ধীরে খলীফার নাম নিত।

একবার সোনালী কাজ করা দিময়াতের বিখ্যাত চাদরের বোঝা নিয়ে বাগদাদ আসে। নগর শুল্ক আদায়কারীরা তার পণ্যের কর চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করে বলল, আমার কাছে এমন কিছু নেই যার শুল্ক দিতে হবে। খাজনা আদায়কারীরা তার পণ্যের বিবরণ দিতে লাগল। এরপরও সে অস্বীকার করল। অতঃপর খিলাফত

কর্তৃক অবহিতকরণ বিষয়টি সম্পর্কে তারা বলল, তুমি কি তোমার অমুক তুর্কী গোলামকে দিময়াত শহরে অমুক অপরাধের কারণে হত্যা করোনি এবং তাকে অমুক স্থানে দাফন দাওনি-যার কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানেনা। এ কথা শুনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং কর আদায় করল।

ইবনে বুখার বলেন, আন-নাসরের নিকট সুলতানগণ আসত। তারা খলীফার আনুগত্য প্রকাশ করত। যারা বিরুদ্ধাচারণ করত তারা অসামান্য অপদস্ত হত। অহংকারী ও নাফরমানকারীদের গর্দানের খুনে তার তলোয়ার রঞ্জিত হত। সর্বদা তার দুশমনদের পদযুগল প্রকম্পিত ছিল। তার বিজয়ের দুরন্ত অশ্বটি বনূ আব্বাসের রাজত্বের সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। চীন এবং স্পেনের শহরগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ করা হত। তিনি বনূ আব্বাসের সকল খলীফার মধ্যে কঠোর। তার বীরত্বে পর্বত শৃঙ্গ কেঁপে উঠত। তিনি চরিত্রবান, শক্তিশালী, বাগ্মী, স্পষ্টভাষী এবং সাহিত্যের জগতে অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর যুগটি ছিল আলোকিত ও গর্বিত।

ইবনে ওয়াসিল বলেন, আন-নাসর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাক, বীর, চিন্তাশীল, নির্ভুল অভিমত পেশকারী এবং ঝানু রাজনীতিবিদ। কূটনৈতিক তৎপরতায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর গুপ্তচররা মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রান্তে চষে ফিরত। সমাজের গুরুত্বহীন সংবাদও তারা যত্ন সহকারে বাগদাদে সরবরাহ করত। একদিন জনৈক ব্যক্তি তার বাড়িতে কতিপয় লোককে দাওয়াত দেয়। মেজবান নিজেই মেহমানের আগে হাত ধুয়ে ফেলে। গুপ্তচরেরা এ বিষয়টিও খলীফাকে জানিয়ে দেয়। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেন, মেহমানের আগে হাত ধোয়া আদবের খেলাফ। এ কথা শুনে লোকটি হতবিহবল হয়ে পড়ে।

ইবনে ওয়াসিল বলেন, আন-নাসর প্রজাদের অধিকারের ব্যাপারে ভালো ছিলেন না। তিনি অত্যাচারের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এমনকি তার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোক আপন ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর তিনি তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হস্তগত করেন। তার কাজ কিছুটা উল্টো ছিল। কখন কখন তার বাপ-দাদার বিরোধী আকীদা পোষণ করতেন। শীআ মতবাদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। একবার তিনি ইবনে জাওযীকে প্রশ্ন করে বসেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথা বুঝাতে সক্ষম না হওয়ায় ভাসা ভাসা কথায় জবাব দিয়ে বললেন, তার সাথে তার মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

ইবনে আছীর বলেন, আন-নাসরের চারিত্রিক গুণাবলী অনেক বেশি খারাপ ছিল। তার জুলমাত এবং ট্যাক্সের ভারে গোটা ইরাক বিধ্বস্ত হয়। তিনি লোকদের সম্পদ নিজের রক্ষিত মালের সাথে একিভূত করতেন। কেউ কোনো কথা বললে তিনি অবশ্যাই এর উল্টোটা বলতেন।

আল-মুফিক আব্দুল লতীফ বলেন, তার শাসনামলের মধ্যবর্তী যুগে তার মাঝে হাদীস সংগ্রহের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি দূর-দারাজ থেকে মুহাদ্দিসীনদের ডেকে এনে হাদীস শ্রবণ এবং তা বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করতেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ সুলতান এবং ওলামাদের হাদীস রেওয়ায়েতের ইজাযত দেন। তিনি একটি কিতাবে ৭০টি হাদীস লিখে হলব শহরে পঠিয়ে দেন। সেখানে লোকেরা সে হাদীসগুলো শ্রবণ করত। যাহাবী বলেন, আন-নাসর অনেক উলামা সাংসদকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দেন। তাদের মধ্যে ইবনে সাকীনা, ইবনে আহযর, ইবনে বুখার, ইবনুদ দিমগানী প্রমুখ।

আবুল মুযাফফর বলেন, ইবনে জাওযী প্রমুখ লিখেছেন, শেষ বয়সে আন-নাসরের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কেউ বলেন, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাড়ির লোকজন এবং স্বীয় উযীর ছাড়া আর কাউকে তিনি চিনতে পারতেন না। তিনি নিজের এক বাঁদিকে হাতের লেখা অনুশীলন করান, বাঁদিটি অবিকল খলীফার হাতের লেখার অনুরূপ লিখত। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর সেই বাঁদির দ্বারা হুকুম-আহকাম লিখাতেন। অথচ কেউ বুঝতেই পারত না এটা খলীফার লিখা নয়। শামসুদ্দীন জরযী বলেন, খলীফা আন-নাসর ৬২২ হিজরীর রমযানের শেষ শনিবারে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর লকব ছিল আল-মুলক আন-নাসর, ৫৭৭ হিজরীতে খলীফা তাকে জানান যে, তুমি জান আমার উপাধি আন-নাসর লিদ্দীনিল্লাহ। এ ক্ষেত্রে তোমার উপাধি আল-মুলক আন-নাসর হয় কিভাবে?

৫৮০ হিজরীতে তিনি আহকাম জারি করলেন-যে ব্যক্তি ইমাম মূসার শহীদ হওয়ার স্থানে এসে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। অধিকাংশ অপরাধীরা এসে সমবেত হতে লাগল। ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়।

৫৮১ হিজরীতে ইশ শহরে এক কানবিশিষ্ট একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। এ বছর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোতে খলীফার নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

৫৮২ হিজরীতে ৭ শত তারকা একত্রিত হতে দেখে জ্যোতিষীরা বলল, জামাদিউল আখের মাসের নবম রাতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসবে, এতে গোটা শহর বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কথা শুনে লোকেরা গর্ত খুঁড়ে বাংকার

তৈরি করে খাদ্য পানীয়সহ সেখানে অবস্থান নেয়, সে রাতটি তারা উদ্বেগের সাথে অতিক্রম করে। কওমে আদের মত জমকালো অন্ধকার নেমে আসবে বলা হলেও সে রাতের মৃদু হাওয়ায় কুপিও নেভেনি। ফলে জ্যোতিষীরা উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। অনেক কবি তাদের সমালোচনায় কবিতা রচনা করেন।

৫৮৩ হিজরীর প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিন শনিবারে সালে শামস এবং সালে ফারসীরও প্রথম দিন ছিল। এ বছর অনেক বিজয় অর্জিত হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী শাম মুলুকের অধিকাংশ শহরগুলো দখল করে নেন। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় বিজয় ছিল বাইতুল মুকাদ্দিস বিজয়। যা ফিরিঙ্গীরা ৯১ বছর শাসন করেছে। ফিরিঙ্গীরা এখানে যে গির্জা নির্মান করেছিল তিনি তা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটি 'মাদরাসা শাফীয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিমামা হযরত উমর (রা.)-এর অনুসরণে স্বস্থানে রেখে দেন। কারণ বাইতুল মুকাদ্দিস দখলের পর হযরত উমর (রা.)-ও তা সেভাবেই রেখে দেন। কবি মুহাম্মাদ বিন আস'দ বাইতুল মুকাদ্দিসের বিজয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

ইবনে বুরজান সূরা রোমের তাফসীরে লিখেছেন ৫৮৩ হিজরী পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দিস রোমানদের অধীনে থাকবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে। মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করবে এবং বাইতুল মুকাদ্দিস ইনশাআল্লাহ অনন্তকাল দারুল ইসলামে পরিণত হবে।

আবু শুমামা বলেন, ইবনে বুরজান এক আশ্চর্যজনক তাফসীর পেশ করেছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দিস বিজয়ের পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

৫৮৯ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ইন্তেকাল করেন। জনৈক দূত তার ব্যবহৃত একটি বর্শা, একটি ঘোড়া, একটি দিনার এবং কিছু দিরহাম নিয়ে বাগদাদে আসে। এছাড়া তার আর কোনো সম্পদ ছিল না। তার মৃত্যুর পর তদীয় ছেলে ইমামুদ্দীন উসমানুল মুলক আল-আযীয মিসরের, দ্বিতীয় পুত্র আল-মুলকল আফযল নূরুদ্দীন আলী দামেশকের এবং তৃতীয় পুত্র আল-মুলকল যাহের গিয়াছউদ্দীন গাজী হলবের সুলতান মনোনীত হন।

৫৯০ হিজরীতে সালজুল বংশীয় সর্বশেষ বাদশাহ সুলতান টগর-ল-বেগ শাহ বিন আরসালান বিন টগর-ল-বেগ বিন মুহম্মাদ বিন মুলক শাহ মারা যায়। যাহাবী বলেন, এ বংশে বিশ জন বাদশাহ অতিক্রম করে। এদের মধ্যে প্রথম বাদশাহ টগর-ল-বেগ। সে খলীফা কায়িস বিআমরিল্লাহর যুগে জীবিত ছিল। এ বংশের বাদশাহগণ ১৬০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৫৯২ হিজরীতে পবিত্র মক্কা নগরী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। লোকদের প্রতি লাল বালু বর্ষিত হয়। রুকনে ইয়ামনের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এ বছর খাওয়ারিজম শাহ খিলাফতের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়– যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৫৯৩ হিজরীতে বড় একটি নক্ষত্রের পতনে ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। লোকেরা কিয়ামত সমাগত ভেবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করতে থাকে।

এ বছর আল-মুলক আল-আযীয মিসরে মারা গেলে তদস্থলে তার পুত্র মানসূর তখত নসীন হয়। কিন্তু আল-মুলকল আদেল সাইফুদ্দীন আবু বকর বিন আইয়ূব তার উপর হামলা চালিয়ে তার মুকুট ও তখত ছিনিয়ে নেয়। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুলকল কামেল মিসরের বাদশাহ মনোনীত হয়।

৫৯৬ হিজরীতে নীল নদের পানি শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকেরা প্রকাশ্যে মৃত প্রাণী ভক্ষণ করত। এ দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা কবর থেকে লাশ তুলে তা ভক্ষণ করত। মিসরের গাছ পালা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চোখের পলকে জীবন প্রদীপ নিভে যায়। গ্রামের পর গ্রামে কোনো চুলায় আগুন জ্বলত না। বাড়িগুলো লাশে ভরে উঠে। যাহাবী এ দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দুর্ভিক্ষ ৫৯৮ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৫৯৭ হিজরীতে মিসর, শাম এবং জাযীরায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এতে বহু ভবন এবং দুর্গ বিধ্বস্ত হয় এবং বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রাম ধসে পড়ে।

৫৯৯ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষ রাতে আবার নক্ষত্র পতন ঘটে। ৬০০ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা নীল নদের পথ ধরে রাশেদের উপর হামলা করে। শহর দখলের পর তারা সেখানে লুটতরাজ এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়।

৬০১ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা কাসতানতানিয়া শহর দখল করে এবং সেখান থেকে রোমানদের বের করে দেয়। ইসলামের পূর্বে এ শহরটি রোমানদের অধীনে ছিল। ৬৬০ হিজরী পর্যন্ত শহরটি ফিরিঙ্গীদের কব্জায় থাকে। তারপর আবার রোমানদের হস্তগত হয়। এ বছর এক নারীর গর্ভে দু'মাথা এবং চার পাবিশিষ্ট সন্তান প্রসবিত হয়। কিন্তু সে জীবিত ছিল না।

৬০৬ হিজরীতে তাতারীদের তৎপরতা শুরু হয়। যার বিশদ বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব

৬১৫ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত রাজ্যের শহরগুলো দখল করতে থাকে। ৬১৬ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত শহর যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে। মুলকল

কামেল দারুণভাবে পরাজিত হয়। ফিরিঙ্গীরা দিমায়াতের জামে মসজিদ ভেঙে সেখানে গির্জা নির্মাণ করে।

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা মুলক মুআজ্জম কাযীউল কুযযাত রুকনদ্দীন যাহেরের নিকট বিষ মিশ্রিত কাবা পাঠিয়ে নির্দেশ জারী করে যে, এটি পরে তাকে ইজলাসে বসতে হবে। সে তা পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু হয়। লোকেরা তার মৃত্যুতে বেদনাহত হয়।

৬১৮ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত শহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়।

৬২১ হিজরীতে কাহেরা শহরে প্রাসাদের পার্শ্বে 'আল-কামেলা' নামক একখানা দারুল হাদীস নির্মিত হয়। আবুল খাত্তাব বিন ওহয়া এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

খলীফা মামুনের যুগ থেকে এ পর্যন্ত রেশমের শ্বেত কাপড়ের চাদর দ্বারা কাবা শরীফ আচ্ছাদিত করা হত। খলীফা আন-নাসরুদ্দীনিল্লাহ রেশমের সবুজ চাদরে কাবা শরীফ ঢেকে দেন। এরপর কালো পর্দা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে।

তার শাসনামলে অনেক বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের ইন্তেকাল হয়। তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন– রওযুল আনফ গ্রন্থের লেখক আবু যায়েদ আল-সুহায়লী, হাফেজ আবু মূসা আল-মাদানী, জামেউল কবীর গ্রন্থের লেখক আবুল কাসিম আল-বুখারী আল-উসমানী, বুরহান, হিদায়া গ্রন্থের লেখক মুরগনীয়ানী, ফতোয়ায়ে হানাফীর গ্রন্থকার কাযী খান, উলমে ফালসাফা গ্রন্থকার আবুল ওলীদ বিন রুশীদ, ডাক্তার আবু বকর বিন যহর, উস্তাদ কাতেব, ইবনে আযমীয়া মাকরী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, জামেউল উসূল এবং নিহায়াতুল গরব গ্রন্থকার ইবনে আছীর, ফখরুদ্দীন বিন আসাকির প্রমুখ।

আয্-যাহের বিআমরিল্লাহ আবু নসর

আয্-যাহের বিআমরিল্লাহ আবু নসর মুহাম্মাদ বিন আন-নাসের লিদ্দীনিল্লাহ ৫৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার শাসনামলে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হন। পিতার পর তিনি তখতে আরোহণ করেন।

বাহান্ন বছর বয়সে তিনি তখতনসীন হন। প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ রাজ্য জয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ক্ষেত শুষ্ক হয়ে গেছে। এখন আর সেখানে কি রোপণ করা যেতে পারে? তারা বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনার জীবন দীর্ঘায়ু করুন। তিনি বললেন, আসরের পর দোকান খুললে

সে কতটুকুর মুনাফা করতে পারে? তিনি প্রজাবৃন্দের সাথে করুণাসূচক আচরণ করেন। সকল ট্যাক্স ক্ষমা করেন। অত্যাচার প্রতিহত করণের ব্যবস্থা নেন এবং প্রচুর দান করেন। (আবু শামাহ)

ইবনে আছীর বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নীতিগুলো তিনি ছাড়া কোনো খলীফা অনুসরণ করেননি। তবে যদি এটা বলা হয়, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের পর সেই নীতি অনুসরণের কোনো খলীফা ছিল না- তাহলে সেটা হবে সবচাইতে বিশুদ্ধ অভিমত।

তার পিতা এবং পিতামহ যে ভূখণ্ড ও সম্পদ কুক্ষিগত করেছিলেন সেগুলো তিনি হকদারদের ফিরিয়ে দেন। সাম্রাজ্যের সকল কর তিনি মওকুফ করে দেন। তিনি খাজনা আদায়ে পুরাতন নীতি অনুসরণের আহকাম জারী করেন। প্রাচীন প্রথায় ইরাকের শুল্ক আদায়ের নির্দেশ দেন। পুরাতন খলীফাদের যুগে ইরাকে বিশ হাজার দিনার আদায় করা হত। তার পিতার যুগে আশি হাজারে উন্নতি হয়। তিনি পুরাতন হিসাব অনুযায়ী দশ হাজার ক্ষমা করে দশ হাজার আদায়ের নির্দেশ দেন। এরপরও প্রজাবৃন্দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সতেজ বৃক্ষের খাজনা আদায়ের হুকুম দেন।

এ ইনসাফের পরও রাষ্ট্রীয় ধনাগারে সম্পদ জমা দেওয়ার সময় ওজনে কম নিয়ে বেশি দেবার খলীফা কর্তৃক লিখিত নির্দেশ জারি হওয়ায় উযীর বলল, এভাবে ওজন দিলে পঁয়ত্রিশ হাজার দিনার জনগণের মাঝে চলে যাবে। খলীফা বললেন, পঁয়ত্রিশ কোটি দিনার চলে গেলেও কোনো আপত্তি নেই।

তার ন্যায়বিচারের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ওসেতা শহরের এক সরকারী অফিসারের নিকট এক লাখ দিনার ছিল। যা সে অন্যায়ভাবে উপার্জন করেছিল। দারুল খিলাফতের নির্দেশে সেগুলো হকদারদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়।

জনগণের মধ্যে যারা খাজনা অনাদায়ের দায়ে বন্দী ছিল তিনি দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে বিচারককে তাদের মুক্তি দেবার নির্দেশ দেন।

ঈদুল আযহার রাতে তিনি ওলামা এবং সাহাবাদের মধ্যে এক লাখ দিনার বণ্টন করেন। লোকেরা বলল, আপনার মত আর কোনো বাদশাহ এতটা ব্যয় করেনি। তিনি বললেন, সন্ধ্যার সময় আমি দোকান খুলেছি। পরপারের সওয়াব অর্জনের জন্য আমার হাতে যথেষ্ঠ সময় কোথায়? তিনি সরকার প্রধান হওয়ার পর সরকারী অফিসগুলোতে অসংখ্য কাগজের টুকরো পাওয়া যায়। লোকেরা বলল, কেন আপনি সেগুলো খুলে দেখছেন না? তিনি বললেন, দেখে কি হবে। সেগুলোতে কোনো না কোনো পরনিন্দা লিখা রয়েছে। (ইবনে কাসীর)

সুবত ইবনে জাওযী বলেন, খলীফা ধনাগারে প্রবেশ করলে খাদেম বলল, আপনার বাবার যুগে এ কোষাগার ধন-রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। জবাবে তিনি বললেন, আমি কোষাগার ভরপুর করার জন্য আসিনি। আল্লাহর পথে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে চাই। ধন-রত্ন সংগ্রহ ও জমা করা সওদাগরের কাজ।

ইবনে ওয়ায়েল বলেন, আয্-যাহের ন্যায়বিচার করতেন এবং শুল্ক মওকুফ করেন। তিনি জনগণের সাথে উঠা বসা করতেন। আর তার বাবা এ ক্ষেত্রে পর্দার সাহায্য নিতেন।

৬২৩ হিজরীর রযব মাসের তেরো তারিখে এ মহামতি খলীফার ইন্তেকাল হয়। তিনি নয় মাস কয়েক দিন খিলাফত পরিচালনা করেন। তিনি তার পিতার নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়েতের অনুমতি লাভ করেন। আর আবু সলেহ নসর বিন আব্দুর রাযযাক বিন শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

তার মৃত্যুর বছর দু'বার চন্দ্রগ্রহণ হয়। মওসুলের শাসনকর্তা তার প্রশংসা গাঁথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল-মুসতানসির বিল্লাহ জাফর

আল-মুসতানসির বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর বিন আয্-যাহের বিআমরিল্লাহ ৫৭৭ হিজরীর সফর মাসে জনৈক তুর্কী বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার পর ৬২৩ হিজরীর রযব মাসে তিনি তখতে আরোহণ করেন। তিনি প্রজাগণের মধ্যে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দেন। বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। ওলামা এবং দ্বীনদারদের উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। মসজিদ, মাদরাসা ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। দ্বীনকে শক্তিশালী করেন। শত্রুদের ধ্বংস করে দেন। সুন্নতের প্রসার ঘটান। ফিতনা দমন করেন। সুন্নতের উপর চলার তাকীদ দেন। জিহাদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা তৈরি করেন। ইসলামের সাহায্যার্থে ফওজী সমাবেশ ঘটান। অধিকাংশ দুর্গ দখল করেন।

মুফিক আব্দুল লতীফ বলেন, তিনি সুন্দর আখলাক গ্রহণের মাধ্যমে মসনদে আরোহণ করেন। তিনি বিদআত বন্ধ করেন। দ্বীনদার সভাসদ নিয়োগ, ইসলামকে শক্তিশালী, বিলুপ্ত প্রায় দ্বীনের কাজ পুনপ্রবর্তন এবং লোকদের অন্তরে সেকাজগুলোর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। মুখে মুখে তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। তার ত্রুটিগুলো দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে।

হাফেজ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম মুনযেরী বলেন, মুসতানসির নেককার এবং নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তিনি মাদরাসা আল-মুনতাসিরীয়া নামক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। এখানে মোটা অঙ্কের ভাতা প্রদানসাপেক্ষে আহলে ইলমদের আহ্বান জানানো হয়।

ইবনে ওয়াসেল বলেন, মুনতাসির দজলা নদীর তীরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধরনের উন্নত প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। তৎকালীন যুগে এহেন ছাত্র সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল দুনিয়াতে বিরল। এ প্রতিষ্ঠানে চার মাযহাবের চার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এতে একটি হাসপাতালও ছিল। ফকীহদের জন্য ছিল একটি বাবুর্চিখানা। পর্যাপ্ত ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা ছিল। ফকীহদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, যানবাহন, তেল, প্রদীপ, কাগজ ইত্যাদির সরবরাহ ছিল অফুরন্ত। এরপরও ফকীহদের এক দিনার করে মাসিক ভাতা প্রদান করা হত। তাদের জন্য হাম্মামখানাও নির্মাণ করা হয়। পূর্ববর্তী যুগে যার কোনই দৃষ্টান্ত ছিল না। খলীফার সেবায় নিয়োজিত থাকা বিশাল সৈন্যবাহিনী। তার বাবা ও দাদারও এত সুবিশাল বাহিনী ছিল না। তিনি নিজেও একজন সাহসী, নির্ভীক, বীর-বাহাদুর লোক ছিলেন। তাতাররা তার রাজ্যগুলোতে হামলা করলে তার বাহিনী রুখে দাঁড়ায়। ফলে তাতাররা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। খিফাজী নামক খলীফার একজন ভাই ছিল। সেও একজন নির্ভীক যোদ্ধা। সে বলত, আমি খলীফা হলে জীবন সাগর পাড়ি দিয়ে তাতারদের সাথে এক বিশাল ফৌজীবাহিনী নিয়ে লড়াই করে তাদের মূলোৎপাটন করতাম। কেড়ে নিতাম তাদের সকল ভূখণ্ড। মুনতাসিরের মৃত্যুর পর তার দুর্ভাগ্য তাকে নিদারুণভাবে জড়িয়ে ধরে। আত্মম্ভরিতা, মদ্যপান এবং কর্কশ স্বভাবের কারণে লোকেরা তার বাইআত গ্রহণ না করে মুসতানসিরের ছেলে আবু আহমদের হাতে বাইআত করে। আবু আহমদ ছিলেন শান্ত প্রকৃতির খলীফা।

যাহাবী বলেন, মাদরাসা মুসতানসারীয়ার বাজেট ছিল সত্তর মিছকাল। মাদরাসার ভিত্তি দেয়া হয় ৬২৫ হিজরীতে। আর একাজ সমাপ্ত হয় ৬৩১ হিজরীতে। এতে একটি গ্রন্থাগার ছিল। ১৬০ উট বহনযোগ্য গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ এ পাঠাগারে চার মযহাবের ২৪৮ জন ছাত্র জ্ঞান চর্চা করত। এতে হাদীস, নাহু (আরবী ব্যাকরণ), চিকিৎসা বিদ্যা এবং দর্শনের পৃথক অনুষদ ছিল। এদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাওয়া দাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও এ মাদরাসায় তিন শ' এতিম ছাত্র জ্ঞান অর্জন করত। যাহাবী এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ওকফকৃত গ্রাম এবং ভূখণ্ডের বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন। এ মাদরাসার শিক্ষাবর্ষ শুরু হত রযব

মাসে। বর্ষ শুরুর সময় বিচারপতিগণ, শিক্ষকমণ্ডলী, মন্ত্রী পরিষদ এবং সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হত।

৬২৮ হিজরীতে দামেশকের শাসনকর্তা মুলক আশরাফ দারুল হাদীস আশরাফীয়া নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দেয়। যা ৬৩২ হিজরীতে শেষ হয়।

৬৩২ হিজরীতে প্রচলিত স্বর্ণের ক্ষুদ্রাংশে নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে মুসতানসির চাদীর মুদ্রা তৈরি করেন। ৬৩৫ হিজরীতে কাযী শামসুদ্দীন আহমদ আল-জুফী দামেশকের বিচারক মনোনীত হন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম একটি ঘর নির্মাণ করেন। ইতোপূর্বে সাক্ষ্য দানের জন্য আদালতে হাযির হতে হত।

এ বছর দামেশকের শাসনকর্তা আশরাফ মারা যায়। এর দু'মাস পর মিসরের শাসনকর্তা কামেলও মারা যায়। তারপর মিসরে কামেলের ছেলে তখতে উপবেশন করে। তার উপাধি ছিল 'আদেল সুলতান'। কিছুদিন পর তাকে অপসারণ করে তার স্থলে তারই ভাই আস-সালেহ আইয়ূব নাজমুদ্দীনকে বসানো হয়।

৬৩৭ হিজরীতে শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম দামেশকের খতীব মনোনীত হন। এ বছর ইয়ামনে শাসনকর্তা নূরুদ্দীন উমর বিন আলী বিন রসূল আলতুর্কমানীর দূত খিলাফতের দরবারে এসে মিসরের সালতানাত প্রার্থনা করে।

৬৩৯ হিজরীতে মিসর শাসনকর্তা আস্-সালেহ প্রাসাদে একটি মাদরাসা এবং প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু ৬৫১ হিজরীতে তার গোলাম সেগুলো নষ্ট করে ফেলে।

৬৪০ হিজরীর জামাদিউল আখের মাসের শুক্রবারে মুসতানসির ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে কবিগণ শোক গাঁথা রচনা করেছেন।

মুসতানসিরের শাসনামলে যেসব ওলামা ইন্তেকাল করেছেন তাঁরা হলেন– ইমাম আবুল কাসিম আর- রাফী, জামালুল মিসরী, ইবনে মাযুর আন-নাহবী, ইয়াকুব আল-হুমুবী, আল-মিফতা গ্রন্থাকার সিকাকী, হাফেজ আবুল হাসান বিন কিত্তান, মুফিক আব্দুল লতীফ বাগদাদী, হাফেজ আবু বকর ইবনে নুকতা, তারীখ, ইনসাব এবং আসবুল গাবা গ্রন্থকার আযুদ্দীন আলী বিন আছীর, কবি ইবনে গানাবী, সাইফুল আমাদী, ইবনে ফুযলান, তায়িয়ার লেখক উমর বিন আল-ফরিয, আওয়ারিফুল মাআরিফ গ্রন্থের লেখক শিহাবুদ্দীন সহরওয়ার্দী, আল-মাওলুদুন নবী (সা.)-এর লেখক বাহামা বিন শাদ্দাদ আবুল আব্বাস উফী, আল্লামা আবুল খাত্তাব বিন ওহয়া, ইকতেফা ফীল মাগাযী গ্রন্থকার হাফেজ আবু রবী বিন মুসলিম, কবি ইবনে শুরা, জামালুল হাযরামী শায়খে হানাফী যিয়া বিন আছীর প্রমুখ।

আল-মুসতাসিম আবু আহমদ

আল-মুসতাসিম বিল্লাহ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আলমুসতানসির বিল্লাহ ইরাকের শেষ খলীফা। তিনি ৬০৯ হিজরীতে হাজের নামক বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি খিলাফতে আরোহণ করেন।

তিনি ইবনুল বুখার আল-মুঈদুত তওসী, আবু রুহুল হরবী, আন-নাজমুল বাদরায়ী, শরফুদ দিময়াতী প্রমুখদের নিকট থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করার সনদ ও ইযাজত লাভ করেন। দিময়াতী তাকে চল্লিশটি হাদীস লিখে দিয়েছিলেন-যে হাদীসগুলো আমি নিজেও দেখেছি। তিনি ছিলেন উদার, ধৈর্যশীল, স্বচ্ছ মন ও দ্বীনদার ব্যক্তি।

শায়খ কুতুবুদ্দীন বলেন, তিনি তার বাবা এবং দাদার মত সুন্নতের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে তাদের মত যুদ্ধের প্রতি সচেতনতা, সাবধানতা এবং বীরত্ব ছিল না। খলীফা মুসতানসিরের খুফাযী নামক এক ভাইয়ের মধ্যে সকল গুণাবলীর সমাবেশ ছিল। তিনি ছিলেন বীর এবং সচেতন। তদনীনতন যুগে তার সাহসিকতা ছিল প্রসিদ্ধ। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে খিলাফত দান করলে আমি সসৈন্যে জায়হুন সানার গাড়ি দিয়ে তাতারদের উপর আক্রমণ করে তাদের রাজ্য দখল করে নিতাম। খলিফা মুনতাসিরের মৃত্যুর পর বনু আব্বাসের মদ্যপ সভাসদবর্গা খুফাযীর ভয়ে তার হাতে বাইআত না করে নিজেদের প্রভাব অটুট রাখার হীন মানসে কুফাযীর চেয়ে তুলানামূলক নরম মেজাজের হীন মানসে মুসতাসিমের নিকট বাইআত গ্রহন করে। তিনি রাফেযী সম্প্রদায়ভুক্ত মুঈদুদ্দীন আনকামীকে উযীর নিয়োগ করেন। এই কমবখত লোকটি গোটা খিলাফত ধ্বংস করে ফেলে। সে খলীফাকে হাতে রেখে পর্দার আড়ালে তাতারদের সাথে মিলিত হয়। সে খিলাফতের গোপন সংবাদ পৌছে দিত। সে তাদের বাগদাদ আসার মতামত পেশ করে। বাগদাদ দখলের জন্য সেই তাদের উত্তেজিত করে। সে বনূ আব্বাসের রাজত্বের মূলোৎপাটনের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে থাকে। সে হযরত আলী (রা.)-এর আওলাদদের উপর খিলাফত অর্পণের চেষ্টা করেছিল। তাতারদের কোনো গুপ্ত সংবাদ বাগদাদে এসে পৌছুলে সে তা গোপন করে ফেলত। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হয়েছিল।

৬৪৭ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা দিময়াত শহর দখল করে নেয়। সে সময় সুলতান মুলকস সালেহ অসুস্থ ছিল। পরবর্তীতে শাবান মাসের মাঝামাঝিতে সে মারা যায়। এ ঘটনায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উম্মে খলীল মুসুমা শাজরুদ দারাজ নাম্নী তার এক বাঁদি মুলকুস সালেহের পুত্র শাহ মুলকল মুআয্যমকে দিময়াত শহরে ডেকে পাঠায়।

কিন্তু ৬৪৮ হিজরীর মুহাররম মাসে তার বাবার জনৈক গোলাম তাকে হত্যা করে। অতঃপর তাজরুদ্দ দারাজ্জ নায়েবে সালতানাত আযুদ্দীন আইবেগ তুর্কামানীর নিকট থেকে হলব নেয় এবং আমীরদের খিলআত ও উপহার প্রদান করে। আযুদ্দীন রবিউল আখের মাসের শেষ দিকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়। সে আল-মুআয উপাধি ধারণ করে। সে নিজেই জনগণের উপর অসন্তুষ্ট হয়। ফলে সৈন্যরা আট বছর বয়সী মুলকুল আশরাফ বিন সালাহুদ্দীন ইউসুফ বিন মাসউদুল কামেলের নিকট থেকে হলব নেয়। এভাবে এক রাজ্যে দুই সুলতান তখতে উপবেশন করে। দু'জনের নামেই খুতবা পাঠ করা হয় এবং দু'জনের নামে খোদিত মুদ্রা চালু থাকে।

৬৪৮ হিজরীতে মুসলমানরা আবার দিময়াত শহর ফিরিঙ্গীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। ৬৫২ হিজরীতে আদন শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। রাতে এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সাগরের দিকে ছুটে যায় এবং দিনে সাগর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ বছর মুআয মুলকুল আশরাফকে প্রতিহত করে নিজেই সুলতান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৬৫৪ হিজরীতে মদীনা শরীফেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আবু শামা বলেন, মদীনা শরীফ থেকে আমাদের নিকট এ মর্মে একটি পত্র আসে যে, জামাদিউল আখের মাসের ৩ তারিখ মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ শোনার পর কিছুক্ষণ পর পর ভূমিকম্প হতেই থাকে। পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। অতঃপর শক্ত পাথুরে যমীনে এবং নদীর পার্শ্বে ভয়ঙ্কর আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। আমরা মদীনা শরীফে ছিলাম। মনে হল আমাদের পার্শ্বেই কোথাও যেন আগুন ধরেছে। আমরা দেখলাম, একটি পাহাড় আগুন হয়ে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভবনগুলো জ্বলে উঠল। মক্কাবাসীও এ আলোর তীব্রতা অবলোকন করে। লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাযার শরীফে এসে সমবেত হয় এবং তাওবা ইসতেগফার পড়তে থাকে। এ অবস্থা এক মাসের বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল।

যাহাবী বলেন, মদীনা শরীফে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি অসংখ্য ও অগণিত লোকের সাক্ষ্য প্রদানে প্রমাণিত। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। এ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "বসরার উটগুলোর গর্দান দেখা যাবে এমন অগ্নিকাণ্ড হিজাযে না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।" যারা সে সময় বসরায় ছিল তাদের অধিকাংশরাই বলেছে যে, রাতে মদীনার সেই তীব্র আগুনের আলোতে বসরার উটগুলোর গর্দান দেখা গিয়েছিল।

৬৫৫ হিজরীতে মিসর সুলতান আল-মুআয আয়বেগোকে তার স্ত্রী শাজরুদ দার হত্যা করে। তারপর তার ছেলে আল-মানসুর তখতে আরোহণ করে।

এরই মধ্যে তাতারীদের বিশৃঙ্খলার আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা এবং তার মন্ত্রী পরিষদ প্রজাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন। মুসলিম সাম্রাজ্যের অভিশপ্ত উযীর আব্বাসীয় রাজত্ব ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতায় এবং উমাইয়্যা রাজত্ব প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে। সে তাতারীদের সাথে গোপনে আঁতাত করে। সে খলীফাকে ভুল পরামর্শ দানে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। খলীফা তার পরামর্শে তাতারীদের রসদ সরবরাহ এবং সম্মান প্রদান করেন। তার পরামর্শে খলীফা সৈন্য হ্রাস করেন। উযীর আলকামী সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেবার পর বাগদাদ দখলের আহ্বান জানায়। এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের শর্তে যে, সে হবে বাদশাহর নায়েব।

তাতারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মুফিক আব্দুল লতীফ লিখেছেন, ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশের লোক হওয়ায় তাতারীদের ভাষা অনেকটাই ভারতীয়দের ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাতার থেকে মক্কা চার মাসের পথ। তাতাররা তুর্কীদের মত চওড়া চেহারা, প্রশস্ত বক্ষ, পাতলা কোমর এবং বাদামী রঙের লোক ছিল। এরা দ্রুততার সাথে নিজেদের অভিমত তুলে ধরত এবং ক্ষিপ্রতার সাথে চলাফিরা করত। ভিনদেশের সংবাদ তারা পেয়ে যেত। কিন্তু তাদের রাজ্যের কোনো খবর কেউ জানতে পারত না, কারণ তাদের রাজ্যে ভিনদেশী গুপ্তচরের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। যার ফলে সেখানে সহজেই অপরিচিত লোকদের সনাক্ত করা যেত। এরা কোন যুদ্ধে গমন করলে নিজেদের ইচ্ছার কথা কাউকে জানাত না, গোপন করে রাখত। তারা হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাত, লোকেরা তাদের হামলা টের পেত যখন তারা শহরময় ছড়িয়ে পড়ত। তাদের কোনো সিপাহী একথা বিশ্বাস করত না যে, সে শত্রুর হাতে বন্দী হতে পারে। তাদের এ প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে শত্রুরা তাদের সামনে থেকে কোন দিকেই পালিয়ে যেতে পারত না। তারা শত্রুদের সকল পথ বন্ধ করে দিত। তাদের নারীরাও তাদের সাথে লড়াই করত। তারা অসি এবং তীর চালনায় পুরুষদের থেকে কম যেত না। তারা সকল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করত। কোন বিষয়ে তাদের বাছবিচার ছিল না। নির্বিচারে তারা আবালবৃদ্ধবনিতা হত্যা করতো। হত্যাযজ্ঞে তারা কোন প্রকার ছাড় দিত না। তারা বংশের পর বংশ মানব

হত্যা করত একটি সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার জন্য। তাদের ইচ্ছাই ছিল পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলা, সম্পদ ও রাজত্ব দখল তাদের ইচ্ছা ছিল না।

কতিপয় বর্ণনাকারীর বিবরণ হচ্ছে, তাতারীদের জনপদ ছিল চীনা সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত তৎকালীন যুগে তারা জঙ্গী, পামর ও ধর-পাকড়কারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি এরূপ– বিশাল চীনা সাম্রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই ছয় রাজ্যের একই বাদশাহ ছিল, তার নাম ইলকানে আকবর। সে তিমগাজ শহরে বসবাস করত। মুসলিম জাহানের মত তার ছয়টি রাজ্যের ছয়জন নায়েবের মধ্য থেকে একজনের নাম দুশ খান– যে চেঙ্গিস খানের ফুফুকে বিয়ে করেছিল। দুশ খান মারা যাওয়ার পর চেঙ্গিস খান কিশলু খানকে সাথে নিয়ে তার ফুফুকে দেখতে যায়। তার ফুফু কিশলু খানকে জানায়, দুশ খানের কোন সন্তান নেই। একজন্য চেঙ্গিস খান তখতে আরোহণ করুক। ফলে সে মসনদে উপবেশন করে এবং তার জয়কৃত জনপদগুলো এর সাথে একিভূত করে ফেলে। অতঃপর বিশাল উপহার সামগ্রীসহ কয়েকজন দূত কর্তৃক সে ইলকানে আকবরকে বিষয়টি অবহিত করে। এ সংবাদ পেয়ে ইলকানে আকবর গর্জন করে উঠল। তার অনুমোদন ছাড়া চেঙ্গিস খানের তখত গ্রহণের বিষয়টি তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত চেঙ্গিশ খানের ঘোড়াগুলো এবং দূতদের সে হত্যা করে। খবর পেয়ে চিঙ্গিস খান এবং কিশলু খান ইলকানে আকবরের বিরুদ্ধে শপথ করে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সকল তাতারী তাদের পতাকা তলে এসে সমবেত হয়। তাদের শক্তিমত্তা ও সৈন্যসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইলকানে আকবর তাদের দুর্দমনীয় প্রতাপ দেখে বিচলিত হয়ে উঠে। লোক পাঠিয়ে সে তাদের শাসিয়ে নেয়। কিন্তু কোনো কাজ হল না। অবশেষে উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রচণ্ড তীব্রতার সাথে শুরু হয় মরণপণ লড়াই। অনেক প্রাণহানি ও রক্তপাতের পর ইলকানে আকবর পরাজিত হয়। চেঙ্গিস খান এবং কিশলু খান তার গোটা সাম্রাজ্য পদানত করে নেয়। তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। চেঙ্গিস খান এবং কিশলু খান উভয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। অতঃপর তারা চীনের শাকু শহর অস্ত্রের মুখে দখল করে নেয়। এরই মধ্যে কিশলু খান মারা গেলে তার ছেলে তদস্থলে বসে। প্রথমে কৌশলে তার শক্তি দুর্বল করার পর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং চেঙ্গিস খান একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত হয়। তাতারীরা প্রথম থেকেই তাকে নিবিড় সঙ্গ দিয়ে আসছিল। তারা চেঙ্গিস খানের ভীষণ আনুগত্যশীল ছিল। তারা তাকে আল্লাহ ভাবতে বসে। তারা আনুগত্যের সীমানা পেরিয়ে তার তাঁবেদারী করতে থাকে।

৬০৬ হিজরীতে চেঙ্গিস খান সর্বপ্রথম নিজ রাজ্য থেকে মামালিকে তরক, ফারগানা এবং খোরাসানের শাসনকর্তা খাওয়ারিজম শাহ মুহাম্মাদ বিন তশ-এর উপর হামলা চালায়- যার বিবরণ পূর্বে বিধৃত হয়েছে। খাওয়ারিজম শাহ অনেক বড় বড় বাদশাহর সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু তাতারীদের তার রাজ্যের দিকে আসতে দেখে সমরকন্দ পালিয়ে যায়। ৬১৫ হিজরীতে তাতারীরা বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক লুটতরাজ করে। অতঃপর চেঙ্গিস খান বিপুল উপঢৌকন সম্ভারসহ খাওয়ারিজম শাহ-এর নিকট দূত পাঠায়। দূত গিয়ে খাওয়ারিজম শাহকে বলল, ইলকানে আযম (চেঙ্গিস খান) আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং বলেছে, আপনি আমার শান-শওকত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। আমাদের মাঝে আপোসকামিতার কল্যাণ আমি দেখতে পাচ্ছি। অতএব আমাদের মধ্যে পুনঃমিলনের সন্ধি হওয়া প্রয়োজন। আপনি আমার কাছে আমার আওলাদ অপেক্ষা প্রিয়। আপনি সর্ব বিষয়ে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। আপনি জানেন আমি গোটা চীন দখল করে নিয়েছি। যেখানে সিপাহী ও ঘোড়ার কোনো ঘাটতি নেই। সেখানে রয়েছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি। সকল জিনিসের মালিক হওয়ার কারণে চীনা লোকেরা অন্য দেশের সাথে দোস্তীপাতে না। যদি ভালো মনে করেন তাহলে বন্ধুত্বের শপথ গ্রহণ করুন এবং পদানত রাজ্যগুলোতে ব্যবসায়ীদের অবাধে যাতায়াতের অনুমতি দিন।

খাওয়ারিজম শাহ তার প্রস্তাব গ্রহণ করায় চেঙ্গিস খান আনন্দিত হয়। সন্ধি পত্রের ক্ষমতাবলে ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা এসে যায়। এ মিত্রতা অনেক দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

খাওয়ারিজম শাহ-এর মামু মাওরাউন নাহার- যার বিশ হাজার অশ্বারোহী সিপাহী ছিল। তার জনপদে অবস্থানরত চীনা ব্যবসায়ীদের মতিগতি নিরক্ষণ করে খাওয়ারিজম শাহকে এ মর্মে পত্র লিখল যে, চেঙ্গিস খানের দেশ থেকে আমার শহরে আগত লোকেরা পোশাক-আশাকে ব্যবসায়ী। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য গুপ্তচরবৃত্তি। তোমার অনুমতি পেলে তাদেরকে চোখে চোখে রাখব।

খাওয়ারিজম শাহ তাকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে তাদেরকে বন্দী করে এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। চেঙ্গিস খান সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠিয়ে খাওয়ারিজম শাহকে জানিয়ে দিল- আপনি প্রথমে ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অতঃপর এ ব্যাপারে কৌশলের ফাঁদ পাতলেন। প্রতিটি অবস্থায় কৌশল ভাল নয়, আর যখন তা হবে মুসলিম বাদশাহ কর্তৃক তখন সেটা হবে অত্যন্ত লজ্জাজনক। আপনার মামু যা করেছে সে সম্পর্কে

আপনি অবগত না থাকলে এবং যদি সে আপনার অনুমতি ছাড়া এ কাজ করে থাকে তবে তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। অন্যথায় আমার তলোয়ার আপনাকে যা দেখাবে তা আপনার অজানা নয়।

এ কথা শুনে খাওয়ারিজম শাহ-এর চৈতন্য লোপ পায় এবং দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে। সে তড়িঘড়ি করে চেঙ্গিস খানের দূতদের হত্যা করে– এর ফলাফল হয় ভয়ঙ্কর। দূতের এক ফোঁটা রক্তের পরিবর্তে বইয়ে দেয়া হয় মুসলমানদের এক সাগর রক্ত। চেঙ্গিস খান সসৈন্যে ধেয়ে আসে। তারা খুনের নেশায় পাগল হয়ে জীহুন সাগর পাড়ি দিয়ে হামদান শহরে পৌঁছে। তাতারীদের ভয়ে সে হামদানের বুরজে আশ্রয় নেয়। তাতারীরা তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং একে একে তার সকল সাথীদের হত্যা করে। খাওয়ারিজম শাহ একা কোনো রকম জীবন নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপে পালিয়ে যায়। সেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। নির্জন দ্বীপে সাহায্যকারীর অভাবে সে মারা যায়। তার সাথে পরনের যে কাপড় ছিল সেগুলোই হয় তার কাফন এবং এগুলো পরায়েই তাকে ৬১৭ হিজরীতে সেখানেই দাফন করা হয়। তার সকল রাজ্য তাতারীরা দখল করে নেয়।

সিলবত ইবনে জাওযী বলেন, ৬১৫ হিজরীতে তাতারীরা সর্বপ্রথম মাওরাউন নাহার শহরে আত্মপ্রকাশ করে এবং বোখারা ও সমরকন্দ দখল করে নেয়। এর অধিবাসীদের হত্যা করে। অতঃপর খাওয়ারিজম শাহকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারপর সাগর পার হয়ে চেঙ্গিস খান খুরাসান শহর লুণ্ঠন করে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়।

ইবনে আছীর স্বরচিত "আল-কামিল" ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, এই রক্তপাগল তাতারদের নারকীয় পৈচাশিকতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। দুনিয়ার কোন সৃষ্টির সামনে এহেন মুসিবত আর কখনই আসেনি। বিশেষত মুসলমানদের সামনেতো নয়-ই। যদি কেউ এ কথা বলে, আবহমান কাল থেকে আজ পর্যন্ত এত মুসিবত আর কখনই আসেনি– তবে তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক। ঐতিহাসিকগণ তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম।

ঐতিহাসিকগণ বাইতুল মুকাদ্দিসে বখত নসর কর্তৃক বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনকে অধিক বর্বর হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই অভিশপ্ত চেঙ্গিস খান কর্তৃক মুসলমানগণ অত্যাচারিত হওয়ার মাত্রা বখত নসরের জুলুমের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বখত নসর কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দিসের ঘটনা আর চেঙ্গিস খানের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন অভিন্ন ছিল না। মুসলমানরা তাদের দেশেই এই অভিশপ্ত লোকটির দ্বারা অত্যাচারিত হয় এবং তার হাতে যত মুসলমান নিহত

হয় বখত নসরের হাতে তত বনী ইসরাঈল নিহত হয়নি। এ দুর্ভাগ্যটি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে এবং টর্নেডোতে রূপ নেয়। তাতারীরা ছিল এমন এক ঝড়ো হাওয়া যা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বইয়ে বেড়াত। তারা চীন থেকে বেরিয়ে তুর্কীস্তানের কাশআর, শাগরীক ইত্যাদি শহর ধ্বংস করে বোখারা ও সমরকন্দ এসে পৌছে। তারা সেখানে লুটতরাজ করে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক খুরাসানে গমনকরত সেখানেও তারা ধ্বংস ও হত্যার সফল স্বাক্ষর রেখে যায় ও হামদান শহরে গিয়ে লুট, ধ্বংস ও হত্যার রাজ্য কায়েম করে। এরপর ইরাক সীমান্তে হানা দিয়ে আযারবাইজানে যাত্রা করে। এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে তারা নিদারুণ নিষ্ঠুরতার চিহ্ন রেখে যায়। একই বছরে তারা বর্ণিত সকল রাজ্য মাটির সাথে মিসিয়ে দেয়। ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত অনেক কম।

তাতারীরা আযারবাইজান থেকে দর বন্দ, শিরাওয়া, লান, লিকয, কিফজান, গজনী, সিজিস্তান, কারমান প্রভৃতি শহর একের পর এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। যার নজির ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাদশাহ ইস্কিন্দার দুনিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ড শাসন করত। সেও তাতারীদের ক্ষিপ্রতার তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। বাদশাহ ইস্কিন্দারের দখলকৃত রাজ্যসমূহে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সময় লেগেছিল কমপক্ষে দশ বছর। আর বাদশাহ ইস্কিন্দার রাজ্য জয় করতে গিয়ে শুধু হত্যা ও ধ্বংসের পথকেই বেছে নেয়নি। শক্তি প্রদর্শন ছাড়াও সে বহু রাজ্য জয় করেছে। অনেক জনপদে তার তলোয়ার বনী আদমের খুনে রঞ্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে চেঙ্গিস খান এক বছরেই রক্তের সাগর বইয়ে দিয়ে সকল রাজ্য জয় করে এবং রাজ্যসমূহে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে তাদের কোনো সাহায্য ও রসদের প্রয়োজন ছিল না। সকালের উদিত সূর্যকে তারা সিজদা করত– এটা ছিল তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি। তাদের কাছে কোনো জিনিস হারাম ছিল না। সকল প্রাণী এমন কি মানুষের গোশতও তারা ভক্ষণ করত। তাদের মধ্যে কোনো বিয়ের ব্যবস্থা ছিল না। একটি নারী কয়েকজন পুরুষকে সন্তুষ্ট রাখত।

৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খান দুই লাখ সৈন্য নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে। খলীফার সৈন্যরা তার মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ায় লুটেরার দল ১০ই মুহাররমে বাগদাদে প্রবেশ করে। খলীফা মুসতাসিমের অভিশপ্ত উযীর খলীফাকে তাতারীদের সাথে সন্ধি করার পরামর্শ দিয়ে বলল, আপনার সিপাহসালাররা তাতারীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমি তাদের সাথে লোক মাধ্যমে সন্ধির আলোচনা করছি। এ কথা বলে বিশ্বাসঘাতক উযীর নিজেই তাদের কাছে গিয়ে নিজের নিরাপত্তা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করে খলীফার নিকট ফিরে এসে বলল, তাতারদের বাদশাহ

স্বীয় কন্যাকে আপনার ছেলে আমীর আবু বকরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। তার ইচ্ছে আপনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকুন। সালজুকদের মত নায়েবে সালতানাতের পদ নিয়ে তারা ফিরে যেতে চায়। তাদেরকে সন্তুষ্ট করাই মঙ্গলজনক। এছাড়া মুসলমানদের রক্তপাত এড়ানোর আর কোনোই পথ ও পন্থা নেই। এরপরও আপনার ইখতিয়ার রয়েছে যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন। তবে হালাকু খানের কাছে গমনের এটাই সুবর্ণ মুহূর্ত।

এ কথা শুনে খলীফা গোটা সভাসদবর্গ নিয়ে হালাকু খানের নিকট গিয়ে একটি তাঁবুর মধ্যে সকলের সাথে বসেন। এদিকে খলীফার উযীর আগেই পৌছেছিল। সে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করার জন্য সর্বপ্রথম ওলামা এবং ফুকাহাদের আহ্বান জানায়। তারা সেখানে পৌছা মাত্র তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর মুসলিম উম্মাহর একটি প্রতিনিধি দলকে অভিন্ন কৌশলে ডেকে এনে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। এভাবে যখন সকল ওলামা, উমারা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দকে শেষ করার পর রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। নর পিচাশ তাতারীদের অসিগুলো খাপমুক্ত হয়ে ঝলসে উঠে, সৃষ্টি হয় রক্তের সাগর। লাগাতার চল্লিশ দিন তাদের তলোয়ারগুলো খাপবদ্ধ হয়নি। লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের জীবন প্রদীপ নিভে যায়, যারা কূপ অথবা অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে ছিল একমাত্র তারাই প্রাণে রক্ষা পায়। আর ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় খলীফা ধাক্কা এবং লাথি খেতে খেতেই ইন্তেকাল করেন।

যাহাবী বলেন, আমার মতে বেচারা মুসতাসিমের ভাগ্যে দাফন জোটেনি। তার সাথে তার অনেক আওলাদ এবং আত্মীয়-পরিজন নিহত হয়। আবার কাউকে কাউকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। ইতোপূর্বে এমন ফ্যাসাদ মুসলমানদের ভাগ্যে আর কখনই আসেনি। বিশ্বাসঘাতক উযীর চক্রান্ত করে সফল হয়নি। সে তাতারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পরেই মৃত্যু এসে উযীরকে নিয়ে যায়। কবিগণ বাগদাদ সম্পর্কে অনেক শোকগাঁথা রচনা করেছেন।

বাগদাদে পঠিত সর্বশেষ খুতবাটি খতীব সাহেব এভাবে আরম্ভ করেছিলেন- সকল প্রসংশা সেই প্রতিপালকের যিনি মজবুত ইমারত ধ্বংস করে দিয়েছেন। যিনি শহরবাসীর মূলোৎপাটনের ফরমান জারি করেছেন এবং আজ পর্যন্ত যিনি তলোয়ার খাপবদ্ধ করাননি।

হালাকু খান বাগদাদে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর ইরাকে তার নায়েব মনোনীত করে। ইবনে আলকামী হযরত আলী (রা.)-এর পরিবার থেকে কাউকে খলীফা মনোনয়ন নিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। তাতারীরা তাকে কুত্তার মত ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। আদনা গোলামের মত সে তাদের সাথে মিলে থাকা অবস্থায় মারা যায়।

আল্লাহ তা'আলা এ কমবখতের উপর যেন রহম না করেন এবং এ নেমক হারামের গুণাহ যেন ক্ষমা না করেন।

এরপর হালাকু খান দামেশকের শাসনকর্তা নাসিরের নিকট পর পর তিনটি পত্র পাঠিয়ে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়।

৬৫৭ হিজরীর প্রারম্ভে পৃথিবী খলীফার শাসনমুক্ত ছিল। সে সময় তাতাররা আমিদ শহরের দিকে ধাবিত হয়। তখন মিসরের শাসনকর্তা আল-মানসুর আলী বিন মাআয বয়সে অনেক ছোট। তাকে পরিচালিত করত তার বাবার গোলাম আমীর সাইফুদ্দীন কতনুল মাআযী, সুলতান কামালুদ্দীন আদিমী তাতারীদের প্রতিহত করার জন্য আমীর সাইফুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করলে সে সকল উমারা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমবেত করে। সেখানে শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালামও উপস্থিত ছিলেন। তার নিকট ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি বললেন, দুশমন আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা পৃথিবীর সকলের জন্য ওয়াযিব। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের রণ প্রস্তুতির জন্য বাইতুল মাল শূন্য করে দেওয়াও বৈধ। এ জন্য উন্নত মানের অশ্ব, অস্ত্রসহ সমর সামগ্রী ক্রয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তোমরা এবং জনসাধারণ একই বরাবর। ফৌজদের কাছে কোনো রসদ না থাকায় তা জনসাধারণের নিকট থেকে সম্পদ গ্রহণ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

এর কয়েক দিন পর আমীর সাইফুদ্দীন ওলামাদের নিকট বলল, এ মুহূর্তে বাদশাহ তো শিশু হয়ে আছেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলও। ফলে এখন একজন সাহসী ও নির্ভীক বাদশাহর তখতে আরোহণ করা প্রয়োজন। যিনি জিহাদ করবেন। আমীর সাইফুদ্দীনই অবশেষে বাদশাহ মনোনীত হয়। সে আল-মুলকুল মুযাফফর উপাধি ধারণ করে।

৬৫৮ হিজরীর শুরুর দিকে কোনো খলীফা নির্ধারিত হয়নি। তাতাররা ফোরাত নদী পাড়ি দিয়ে হলব শহরে এসে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর তারা দামেশকে গমন করে। এদিকে তাতারীদের মোকাবিলা করার জন্য শাবান মাসে মিসরী সৈন্যরা এগিয়ে এলে আল-মুলকুল মুযাফফরও সসৈন্যে এগিয়ে যায়। তার সিপাহসালারের নাম রুকনদ্দীন বিবরস। সে সময় তাতারীরা জালুত নদীর উপর ছিল। ৬৫৮ হিজরীর রমযান মাসের পনেরো তারিখ শুক্রবারে উভয় বাহিনীতে তুমুল লড়াই হয়। এতে তাতারীরা পরাজিত এবং মুসলমানগণ বিজিত হয়।

এ যুদ্ধে অনেক তাতার সৈন্য নিহত হয়। আর বাকীরা পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করে। আল-মুযাফফর দামেশকে অবস্থান করছিলেন। তার কাছে এ বিজয় সংবাদ পৌছানো হয়। জনতার দল আনন্দে নেচে উঠে। লোকেরা মুযাফফরের

জন্য দু'আ এবং তাকে ভালোবাসতে থাকে। সিপাহসালার রুকনুদ্দীন বিবরস তাতারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাদেরকে হলব ইত্যাদি শহর থেকে বের করে না দেয়া পর্যন্ত মুসলিম সিপাহসালার তাদের ধাওয়া করতেই থাকে।

সুলতান মুযাফফর রুকনুদ্দীন বিবরসকে এ বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য হলব শহর প্রদানের ওয়াদা করেছিল। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর নিয়ত পরিবর্তন হয়। এ খবর বিবরস জানার পর তার ব্যথিত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাতারীদের অবশিষ্টাংশ উৎখাত করার জন্য মুযাফফর হলবে গমন করে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে বিবরসের বিষণ্নতা ও তার বিরুদ্ধাচরণের কথা জানতে পেয়ে সে পথ পরিবর্তন করে মিসরে চলে যায় এবং অত্যন্ত গোপনভাবে বিবরসের বিরুদ্ধেষড়যন্ত্র করতে লাগে। এদিকে বিবরসও মিসরে আসে। উভয়ে নিজ নিজ হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। অবশেষে ৬৫৮ হিজরীর যিলকদ মাসের ষোলো তারিখে আমীর-উমারাদের সমর্থন নিয়ে বিবরস মুযাফফরকে হত্যা করে। সে আল-মুলকুল কাহির উপাধি ধারণ করে তখতে আরোহণ করে। মুযাফফর তার শাসনামলে যে অত্যাচার করেছে সে তার অবসান ঘটায়। সে যীনুল মিল্লত ওয়াদ্দীন ইবনে যুবাইরকে উযীর মনোনীত করে। সুযোগ বুঝে একদিন উযীর বিবরসকে বলল, আল-কাহির উপাধি ধারণকারী কোন বাদশাহ সফলকাম হয়নি। অতএব এ উপাধি পরিবর্তন করাই শ্রেয়। দেখুন আলকাহির বিন আল-মুতাযদ এ উপাধি ধারণ করেছিল। কিছুদিন দিন পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার চোক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয়। মওসূলের শাসনকর্তাও আল-কাহির উপাধি ধারণ করেছিল। তাকেও বিষ খাওয়ানো হয়। এ কথা শুনে সে কাহির উপাধির পরিবর্তে যাহির উপাধি ধারণ করে।

বর্ষপরিক্রমায় ৬৫৯ হিজরী আসে। পৃথিবীতে তখনও কোনো খলীফা ছিল না। রযব মাস পর্যন্ত দুনিয়ায় খলীফার শাসন মুক্ত ছিল। অবশেষে সাড়ে তিন বছর পর খিলাফত ব্যবস্থা শূন্য থাকার পর মিসরে মুসতানসিরের খিলাফত কায়েম হয়। এর বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব।

খলীফা মুসতাসিমের শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন– হাফেজ তকিউদ্দীন সরিফীনী, হাফেজ আবুল কাসিম বিন আল-তায়লিসান, হানাফী মাযহাবের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব শামসুল আইম্মা আল-কুর্দী, শায়েখ তকিউদ্দীন বিন সালাহ, ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক হাফেজ মুহিবুদ্দীন বিন বুখার, মুনতাখিবুদ্দীন, নাহুবিদ ইবনে ইআইশ, দানশীল আবুল হুজ্জাজ আল-আকসারী, নাহুবিদ আবু আলী সারবিনী, ইবনে বায়তার, ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন আল-হাজিব, আবুল হাসান বিন

দিবাহ, তারিখুল নুহাত গ্রন্থকার কাফীতী, আফযালুদ্দীন, হাফেজ ইউসুফ বিন খলিল, বাহার বিনতুল হুমায়রী, জামাল বিন উমরাওয়ান, গ্রন্থকার রেজ্জা, মাআনী, বয়ান, ইযাযুল কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কামাল আব্দুল ওহেদ যিমলেকারী, মজ্জদ বিন তাইমিয়া, মারাতুস যামান বই-এর লেখক ইউসুফ সবত ইবনে জাওযী ইবনে বাতিশ শাফী, সাহেবে তফসীর আবুল ফজল আল-মরসী প্রমুখ।

খিলাফত শূন্য সময়ের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন– যাকী আব্দুল আযীম আল-মুনসারী, শায়েখ আবুল হাসান শাযলী, শায়েখ তয়েফা, শুবাতুল মাকরী, আশ্-শাতিবা গ্রন্থের ব্যাখাকার ফাসী, কবি সাদুদ্দীন, কবি সরসরী, স্পেনের ঐতিহাসিক ইবনুল আবার প্রমুখ।

আল-মুসতানসির বিল্লাহ আহমদ

আল-মুসতানসির বিল্লাহ আহমদ আবুল কাসিম বিন যাহির বিন বি আমরিল্লাহ আবূ নসর মুহাম্মাদ বিন নসর লিদ্দীনিল্লাহ আহমদ। শায়খ কুতুবুদ্দীন বলেন, আল-মুসতানসির বিল্লাহ বাগদাদে বন্দী ছিলেন। তাতারীদের ফিতনার সময় জিন্দানখানা থেকে পালিয়ে পশ্চিম ইরাকে চলে যান। বিবরস সুলতান হওয়ার পর তিনি বনূ মিহারিশ গোত্রের দশজন প্রতিনিধি নিয়ে সুলতানের কাছে আসেন। সুলতান বিচারক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে কায়রোতে নিয়ে আসে। প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন বিন বিনতুল ইআয তার বংশ পরম্পরা ছাবেত করেন। ৬৫৯ হিজরীর রযব মাসের তেরো তারিখে সর্বপ্রথম সুলতান তার হাতে খিলাফতের বাইআত করে। অতঃপর প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন, তারপর শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, তারপর রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তারপর একে একে সকলেই তার হাতে বাইআত করে। তার নামে খোদিত মুদ্রা চালু হয় এবং তার নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়। তিনি তার ভাইয়ের উপাধি আল-মুসতানসির ধারণ করেন। জনগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। তিনি জুমআর দিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে অশ্বারোহণে জামে মসজিদে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতেন। তিনি খুতবার মধ্যে সর্বপ্রথম বনূ আব্বাসের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দানে সুলতান এবং সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করতেন। অতঃপর নামায পড়াতেন, নামাযের পর পুরাতন রীতি অনুযায়ী সুলতানকে খিলআত প্রদান করতেন। তিনি কায়রোর বাইরে একটি শিবির স্থাপন করেন। ৬৫৯ হিজরীর শাবান মাসের চার তারিখ সোমবারে তিনি সুলতানকে নিয়ে অশ্বারোহণে সেখানে

যান। উযীর, উমারা এবং বিচারপতিগণ সেখানে উপস্থিত ছিল। খলীফা নিজ হাতে সুলতানকে খিলআত এবং মাল্য পরিয়ে দেন। ফখরুদ্দীন বিন লুকমান মিম্বরে আরোহণপূর্বক খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনান। খিলআত গ্রহণ করে সুলতান তার উপদেষ্টাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে চলে যেত। আর তার সাথে পদব্রজে চলত আমীরদের একটি বড় জামাত। তিনি কায়রোকে অলংকৃত করেন। সুলতান খলীফার জন্য একজন উপদেষ্টা, দূত, বাবুর্চি, প্রহরী, কোষাধ্যক্ষ, পত্র লেখক নিয়োগ করে। গোটা রাজ্য তার হস্তে অর্পণ করে। তাকে দেয়া হয় এক'শটি ঘোড়া, ত্রিশটি খচ্চর, দশ কাতার উট ইত্যাদি।

যাহাবী বলেন, খলীফা মুসতানসিরের ভাতিজা মুস্তাকীর তার খিলাফত আর কারো হস্তগত হয়নি। তবে হলবের শাসনকর্তা আমীর শামসুদ্দীন আফরাশ আল-হাকিম বি আসরিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খিলাফতের দাবী করেন এবং হলবে খিলাফত কায়েম করায় তার নামে মুদ্রা ও খুতবা পাঠ শুরু হয়।

কিছু দিন পর খলীফা আল-মুসতানসির ইরাক যাবার ইচ্ছা করেন। সুলতান তাকে দামেশক পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য দামেশক পর্যন্ত যায়। দামেশকে গিয়ে সুলতান খলীফা এবং মওসুলের শাসনকর্তার আওলাদদের এক লাখ দিনার এবং ৬৬ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। অতঃপর খলীফা শরক, ওলীয়ান, মওসুল, বুকারা এবং জাযীরার বাদশাহদের নিয়ে হলবে যান। হলবের শাসনকর্তা স্বীয় খিলাফত পরিত্যাগ করে খলীফার আনুগত্যে চলে আসেন এবং নম্রতা প্রদর্শন করেন। অতঃপর খলীফা সামনে অগ্রসর হয়ে হাদীসা দখল করে নেন। তাতারীরা এসে তাদের উপর হামলা চালায়। এতে অনেক মুসলমান শহীদ হল এবং খলীফা নিরুদ্দেশ হন। কেউ কেউ বলেন, তিনিও শহীদ হন। এটাই মনে হয় বিশুদ্ধ অভিমত। কেউ কেউ বলেন, তিনি পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এটা ৬৬০ হিজরীর মুহাররম মাসের তিন তারিখের ঘটনা। এ হিসাব অনুযায়ী তিনি মাত্র ছয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেছেন। তার পর আল-হাকিম যিনি হলবে খিলাফতের দাবী করেছিলেন তিনি আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি ধারণ করে খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন।

আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস

আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবু আলী হোসেন আবকী বিন আলী বিন আবু বকর বিন খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ বিন মুসতাযহার

বিল্লাহ। বাগদাদে হত্যাযজ্ঞের সময় আত্মগোপনের কারণে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। তিনি এক দল লোক নিয়ে বাগদাদ থেকে বনূ খিফাজা গোত্রের আমীর হুসাইন বিন ফালাহ-এর কাছে চলে যান। তার কাছে কিছু দিন থেকে আরবীদের সাথে দামেশকে আমীর ঈসা বিন মাহনার নিকট গমন করেন। দামেশকের শাসনকর্তা আন-নাসর তাকে ডেকে পাঠায়। তিনি তখনও যাননি। ইতোমধ্যে তাতাররা আক্রমণ করে। আল-মুলকুল মুযাফফর দামেশকে তাতারীদের সাথে লড়াই শেষে আমীর ফালাজ বাগদাদীর হাতে আবার তাকে দামেশকে ডেকে পাঠায়। জনসাধারণ তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। আরবের একদল উমারা তাকে সমর্থন জানায়। তিনি তাদের সহচরত্বে ঘানা, হাদীসা, হাইবত, আনবার প্রভৃতি শহর দখল করেন। অতঃপর তাতারীদের সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। তারপর মুলকুয যাহিরের আহ্বান সম্বলিত দামেশকের নায়েব আলাউদ্দীন তোবায়রিসের পত্র তার কাছে পৌঁছে। অবশেষে সফর মাসে তিনি দামেশকে পৌঁছুলে দামেশকের নায়েব আলাউদ্দীন তাকে সুলতান আল-মুলকুয যাহিরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি কায়রোতে পৌঁছার তিনদিন পূর্বেই সেখানে মুসতানসিরের বাইআত সম্পন্ন হয়। এজন্য তিনি বন্দী হওয়ার আশঙ্কায় হলবে ফিরে যান। হলবে সেখানকার শাসনকর্তা এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। বাইআতকারীদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল হালীম বিন তাইমিয়া। বাইআতকারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তিনি ঘানায় যান। মুসতানসির ঘানায় গেলে তিনি তার আনুগত্য গ্রহণ করেন। মুসতানসির তাতারীদের সাথে যুদ্ধে নিখোঁজ হওয়ায় রুহবার প্রশাসক ঈসা বিন মাহনার নিকট যান। সেখান থেকে আল-মুলকুয যাহির বিবরস তাকে ডেকে পাঠায়। তিনি নিজ সন্তানদের সাথে একদলসহ কায়রোতে পৌঁছেন। যাহির তাকে অত্যন্ত সমাদর করে এবং তার নিকট খিলাফতের বাইআত করে। যাহির দুর্গের শিখরে আরোহণ করে। তিনি সেখানে কয়েক বার খুতবা প্রদান করেন।

শায়খ কুতুবুদ্দীন বলেন, ৬৬১ হিজরীর মুহাররম মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবারে সুলতান একটি আম মজলিশের ইন্তেজাম করে। হাকিম বি আমরিল্লাহ কিলআতুল জাবালের বড় প্রাসাদে গিয়ে সুলতানের সাথে উপবেশন করেন। সুলতান তার সম্মানে যমীন চুম্বন করে এবং বাইআত করে। খলীফা সুলতানকে খিলআত প্রদান করায় তার লোকেরা একের পর এক বাইআত করতে থাকে। পর দিন জুমআয় তিনি খুতবা পাঠ করেন। হামদ এবং সালাতের পর জি হাদ ও ইমামতের গুরুত্ব তুলে ধরে খিলাফতের বেইজ্জতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি খুতবায় এভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন– সেই প্রতিপালকের

প্রশংসা যিনি বনূ আব্বাসের সাহায্যকারী। খুতবা শেষে তার বাইআতের ঘোষণা দেয়া হয়।

৬৬১ হিজরীতে এ ঘটনার পর তাতারীরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আশ্রয়কারী হয়ে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যে নীরবতার সাথে বসবাস করতে লাগে। তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। এভাবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে থাকে।

৬৬২ হিজরীতে কাসরিয়ীন শহরে মাদরাসা যাহিরিয়া নির্মিত হয়। শাফী মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা দানের জন্য তাকী বিন যারীর এবং হাদীসের শিক্ষক হিসেবে শরফ দিময়াতীকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছর মিসরে শক্ত ভূমিকম্প হয়।

৬৬৩ হিজরীতে স্পেনের বাদশাহ সুলতানুল মুসলিমীন আবু আব্দুল্লাহ বিন আল-আহমর ফিরিঙ্গীদের পরাজিত করে বাতীস শহর ছিনিয়ে নেন। এ বছর কায়রো শহরের বিভিন্ন ভবনে অগ্নিসংযোগ হয়। এ বছর সুলতান উমারাদের সাথে নিয়ে আশমুন সাগর খনন কার্যে সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর তাতারীদের সরদার হালাকু খান মারা যায়। তদস্থলে তার ছেলে আবগা বাদশাহ হয়। এ বছর সুলতান তার চার বছরের পুত্র সন্তান মুলক আল-সাঈদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে। এ বছর মিসরে প্রত্যেক মাযহাবের চার বিচারক নিয়োগ করা হয়। এ বছর রমযান মাসে সুলতান খলীফাকে পর্দার আড়ালে রাখে

৬৬৫ হিজরীতে সুলতান হাসিনাহ শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়। ৬৬৭ হিজরীতে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এ মসজিদে হানাফী মাযহাবের খতীব নিয়োগ পান।

৬৭৪ হিজরীতে সুলতান নূবা এবং দানকিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নূবার বাদশাহকে যাহিরের সামনে হাযির করা হয় এবং দানকিলার অধিবাসীদের উপর যিজিয়া কর আরোপ করা হয়।

যাহাবী বলেন, ৩৩ হিজরীতে সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন আবু সুরাহ পাঁচ হাজার ঘোড় সওয়ার নিয়ে নূবা আক্রমণ করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে না পেয়ে সন্ধি করেন। অতঃপর হিশামের যুগেও হামলা চালানো হয়। কিন্তু বিজয় আসেনি। এরপর যথাক্রমে মানসুর, নাসিরুদ্দৌলা বিন হামদান এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর ভাই তুরান শাহ ৫৬৮ হিজরীতে লড়াই করেও বিজয়মাল্য পরতে পারেনি। আর তা এ বছর বিজিত হয়। এ বিজয়কে নিয়ে ইবনে আব্দুয যাহির একটি কবিতা লিখেছেন যায় অর্থ হল– "এটা এমন এক বিজয় যা কখন শুনিনি, দেখিনি এবং লোকেরাও এর বিবরণ দেয়নি।"

৬৭৬ হিজরীর মুহাররম মাসে সুলতান মুলকুয যাহির ইন্তেকাল করে। তদস্থলে ১৮ বছর বয়সে তার ছেলে সাঈদ মুহাম্মাদ উপবেশন করে। এ বছর তাকী বিন রাযী মিসর এবং কায়রো উভয় শহরের বিচারপতি মনোনীত হন। ইতিপূর্বে শহরদ্বয়ে পৃথক পৃথক বিচারপতি ছিলেন।

৬৭৮ হিজরীতে সাঈদ মুহাম্মাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং সে এ বছর বজ্রপাতে মারা যায়। তার স্থলে স্বীয় ভাই বদরুদ্দীন শালামাশ সুলতান হয়ে মিসরে সাত বছর দায়িত্ব পালন করে। তার উপাধি ছিল মুলকুল আদেল। আমীর সাইফুদ্দীন কালাদুন (কালদুয) তার অভিভাবকত্বের দায়ভার গ্রহণ করে। দু'দিকে দু'জনের নাম খোদিত মুদ্রা চালু হয়। খুতবায় দু'জনের নাম পাঠ করা হয়। রযব মাসে শালামাশকে সরিয়ে কালাদুন আর-মুলকুন মানসুর উপাধি নিয়ে একচ্ছত্র বাদশাহ হয়ে যায়।

৬৭৯ হিজরীতে আরাফার দিন শিলা এবং বজ্রপাত হয়। ৬৮০ হিজরীতে তাতারীরা সিরিয়ায় এসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলে সুলতান তাদের সাথে যুদ্ধ করলে মুসলমানরা বিজিত হয়।

হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তারাবালাস শহর বিজিত হয়। ৫০৩ হিজরীতে খৃষ্টানরা তা ছিনিয়ে নেয়। ৬৮৮ হিজরীতে তা আবার পুনঃদখল হয়।

৬৮৯ হিজরীর যিলকদ মাসে সুলতান কালাদুনের ইন্তেকাল হয়। তদস্থলে তার ছেলে আল-মুলকুল আশরাফ সালাহুদ্দীন খলীল সুলতান হয়।

৬৯১ হিজরীতে সুলতান রোমের দুর্গ অবরোধ করে। ৬৯৩ হিজরীতে সুলতান নিহত হয়। তার ভাই মুহাম্মদ বিন মানসুর নয় বছর বয়সে আল-মুলকুন নাসর উপাধি নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে। ৬৯৪ হিজরীর মুহাররম মাসে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কিতবাগা আল-মানসুর মুলকুল আদেল লকব ধারণ করে তখতে উপবেশন করে। এ বছর তাতারীদের বাদশাহ ফাযান বিন আওগুন বিন আব-না বিন হালাকু খান ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানরা খুশি হয় এবং তার সৈন্যদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।

৬৯২ হিজরীতে সুলতান মুলকুল আদেল দামেশক গেলে সফর মাসে লাজীন জবরদস্তীমূলক আমীর-উমারাদের থেকে আনুগত্যের শপথ আদায় করে। খলীফা তাকে খিলআত প্রদান করেন। মুলকুন আদেল সরহদে পালিয়ে যায়। অবশেষে ৬৯৮ হিজরীতে লাজীন নিহত হয়। অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত মুলকুন নাসর মুহাম্মাদ বিন মানসুর কালাদুন আবার সুলতান হয়। খলীফা তাকেও খিলআত প্রদান করেন।

আর আল-মুলকুল আদেল নায়েবে সালতানাত হয়ে হামাত শহরে গমন করে। সে মৃত্যু অবধি ৭০২ হিজরী পর্যন্ত সেখানেই ছিল।

৭০১ হিজরীর জামাদিউল আওয়াল মাসের ১৮ তারিখ জুমআর রাতে খলীফা হাকিম বি আমরিল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করুন। আসরের সময় দুর্গের নিচে সওকে খায়েল-এ তার জানাযার নামায পড়ানো হয়। খলীফার আত্মীয়-স্বজন এবং সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ রক্ষী-প্রহরীসহ জানাযার নামাযে শরীক হন। তাকে সাইয়্যেদাহ নাফীসার নিকটে সমাহিত করা হয়। তিনি প্রথম খলীফা যাকে সর্বপ্রথম এখানে দাফন করা হয়েছিল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তার বংশধরকে এখানেই দাফন করা হয়।

খলীফা হাকিম তার শাসনামলে স্বীয় পুত্র আবু রাবীআ সুলায়মানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। তার যুগে নিম্নবর্ণিত ওলামাগণ ইন্তেকাল করেন– শায়খ আযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, দানশীল আবুল কাসিম কুবারী, যীন খালিদ নাবলুসী, হাফেজ আবু বকর বিন সুদ্দী, ইমাম আবু শামা, তাজ বিন বিনতুল আ-আয, আবুল হাসান বিন আদলান, মজদ্দীন বিন দাকীকুল ঈদ, নাহুবিদ আবুল হাসান বিন আসফুর, আব্দুর রহীম বিন ইউনুস, বিখ্যাত মুফাসসীর (সাহেবে তাফসীর) আল্লামা কুরতুবী, শায়খ জালালুদ্দীন বিন মালিক, তার ছেলে বদরুদ্দীন, দর্শন জগতের সম্রাট তাসীর তুসী, শায়খ মহিউদ্দীন নূরী, হানাফী ইমাম সুলায়মান, বুরহান বিন জামাআত, ঐতিহাসিক তাজ বিন মায়াসসার, মুফাসসীর কাওয়াশী, নাহুবিদ ইবনে ইয়াদ আব্দুল হালিম বিন তাইমিয়া, ইবনে জাওয়ান, নাসিরুদ্দীন বিন মুনির, ইলমুল কালাম (অলংকার শাস্ত্রের) রূপকার নজম বিন বারযী বুরহানুল নসফী, রেযা শাতবী, জামাল ওয়াইশী, কবি আফীফ, তাজ বিন ফুরকাহ, যায়েদ বিন মুরহিল, মুহিব তবরী, রেযা কাসতানতিনী প্রমুখ।

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবু রাবীআ

আল-মুকতাফী বিল্লাহ আবু রাবীআ সুলায়মান বিন হাকিম বি আমরিল্লাহ ৬৮৪ হিজরীর মুহাররম মাসের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার খিলাফত কালে তিনি উত্তরাধিকার মনোনীত হওয়ায় পরবর্তীতে খলীফা হন। ৭০১ হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাসে মিসর এবং সিরিয়ার মিম্বারগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এর সুসংবাদ মুসলিম সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। খিলাফতের খান্দানরা আস্তাবলে থাকতেন। সুলতান তাদের দুর্গে ডেকে এনে তাদের পৃথক পৃথক ঘর দেয়।

৭০২ হিজরীতে তাতাররা সিরিয়ার উপর হামলা চালায়, খলীফা এবং সুলতান যৌথভাবে মোকাবিলা করলে তারা পরাজিত হয়। এযুদ্ধে অনেক তাতার সৈন্য নিহত হয়। এ বছর মিসর এবং শামে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। ফলে বিধ্বস্ত বাড়ির নিচে অনেক মানুষ চাপা পড়ে মারা যায়।

৭০৪ হিজরীতে আমীর বিবরস জামে মসজিদে হাকিম-এ দরস তদরীস (শিক্ষা-দীক্ষা) শুরু করেন। তিনি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চারজন কাযী নিয়োগ করেন। ফিকহের দু'জন শিক্ষক, সাঈদুদ্দীন হারেছী হাদীসের জন্য এবং আবু হায়ানকে আরবী ব্যাকরণের উস্তাদ পদে নিয়োগ দেন।

৭০৮ হিজরীর রমযান মাসে সুলতান আল-মুলকুন নসর মুহাম্মাদ বিন কারাদুন হজ্বব্রত পালনের জন্য মিসর থেকে এক জামাত আমীর-উমারাসহ যাত্রা করে। পথিমধ্যে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সে মিসরে ক্ষমতা থেকে সরে যাবার সংবাদ পাঠালে ৭০৮ হিজরীর শাওয়াল মাসের ২৩ তারিখে রুকুনদ্দৌলা বিবরস তদস্থলে অধিষ্ঠিত হয়। সে মুলকুল মুযাফফর উপাধি ধারণ করে। খলীফা তাকে খিলআত এবং পাগড়ি প্রদান করেন। অতঃপর খলীফার একখানা ফরমান নিয়ে সে সিরিয়া গমন করে। শাহী ফরমানে লিখা ছিল–

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭০৯ হিজরীতে আল-মুলকুন নাসর আবার সালতানাতের দাবী করলে আমীর-উমারাদের একটি জামাত তাকে সমর্থন জানায়। শাবান মাসে দামেশকে আসে এবং ঈদুল ফিতরের দিন সে মিসরের দুর্গে প্রবেশ করে। মুলকুল মুযাফফর পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়।

এ বছর তাতারীদের বাদশাহ ফুবন্দ তার রাজ্যে রাফেযীদের অনুরূপ খতীবদের হযরত আলী (রা.), আহলে বাইত এবং তার আওলাদ ছাড়া খুতবায় কারো নাম উল্লেখ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ৭১৬ হিজরী পর্যন্ত এ নির্দেশ বহাল ছিল। তারপর তার ছেলে আবু সাঈদ ক্ষমতায় অরোহণ করলে চারিদিকে ইনসাফ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সুন্নতকে কায়েম করেন। খুতবায় যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গনী (রা.) এবং হযরত আলী মুর্তজা (রা.)-এর নাম জারী করেন। তার প্রশাসনিক নীতি সকল (তাতারী) বাদশাহদের নীতি অপেক্ষা শ্রেয়, বলিষ্ঠ ও উত্তম

ছিল। তিনি সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। মৃত্যু অবধি তিনি এই অভিন্ন তরিকার উপর অটুট ছিলেন। ৭৩৬ হিজরীতে তার মৃত্যুর পর তাতারীদের সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭১৭ এবং ৭২৭ হিজরীতে নীল নদের পানিতে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলো প্লাবিত হয়। ৭২৮ হিজরীতে পবিত্র মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম এবং তার দরজা নির্মাণ করা হয়। এবং দরজার একটি অংশ বাবে বনূ শায়বা পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। ৭৩০ হিজরীতে মাদরাসা সালিহিয়ায় জুমআর নামায কায়েম করা হয়। এ বছর কুসূন একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখান সুলতান এবং পদস্থ অফিসারগণ একত্রিত হয়ে প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দীনকে খতীব নিয়োগ করা হয়। এরপর ফখরুদ্দীন বিন শুকর স্থায়ী খতীব হিসেবে নিয়োগ পান। ৭৩৩ হিজরীতে সুলতান আবনুস বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা কাবা শরীফের দরজা তৈরি করে। এর উপর একটি রৌপ্য খণ্ড লাগানো হয়, যার ওজন পঁয়ত্রিশ হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ মিছকাল। পুরাতন দরজায় ইয়ামনের শাসনকর্তার খোদিত নামটি তুলে ফেলা হয় এবং এর কাঠগুলো বনূ শায়বার লোকেরা চেয়ে নেয়।

৭৩৬ হিজরীতে সুলতান খলীফাকে কেল্লার এক শীর্ষ প্রকোষ্ঠে নজরবন্দী করে। লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দেয়া হয়। ৭৩৭ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে আত্মীয়-স্বজনসহ খলীফাকে কুসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাকে নিয়মিত ভাতা দেয়া হত। অবশেষে খলীফা ৫০ বছর বয়সে ৭৪০ হিজরীর শাবান মাসে ইন্তেকাল করেন। তাকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

ইবনে হাজার 'আদ-দর' গ্রন্থে লিখেছেন, খলীফা মুসতাকফী জ্ঞানী, উদার এবং বীর-বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তার হস্তাক্ষর ছিল অপূর্ব। বন্দুকের গুলি ছোঁড়া এবং পোলো খেলার ক্ষেত্রে তাকে উস্তাদ মনে করা হত। তিনি ওলামা এবং সাহিত্যিকদের সহচরত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সমাদর করতেন। তার শাসনামলে, নজরবন্দী থাকাকালীন এমনকি কুসে অবস্থান করার সময় সর্বদা তার নামে খুতবা পাঠ করা হত। প্রথমে খলীফার সাথে সুলতানের মধুর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তারা একসাথে ভ্রমণে বের হতেন, পোলো খেলতেন এবং উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একদিন খলীফার একটি পত্র পড়ে সুলতান তার উপর অসম্ভব রাগ করে। এ পত্রটি খলীফা জনৈক লোকের কাছে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল– মজলিশের প্রারম্ভে আমি সুলতানকে অমুক লেনদেনের কারণে পেশ করতে চাই। অতঃপর সুলতান তাকে কুসে পাঠিয়ে দেয় এবং তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। খলীফার সম্মান মিসরের চেয়েও কুসে

বেশি ছিল।

ইবনে ফাযলুল্লাহ 'আল-মাসলিক' গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, খলীফা মুসতাকফী অত্যন্ত নম্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তার যুগে নিম্নবর্ণিত ওলামা ইন্তেকাল করেন– কাযী-উল কুযযাত তাকীউদ্দীন বিন দাকীকুল ঈদ, শায়খ যীনুদ্দীন আল-ফারুকী, হাফেজ শরফুদ্দীন, যিয়াউত তুসী, হানাফী ইমাম, হিদায়ার ব্যাখ্যাকার শামসুস সুরুজী, শাফী ইমাম নজমুদ্দীন বিন রিফা, মক্কার মুহাদ্দিস ফখরুছ ছুরী, শাইখুল হাদীস সদরুদ্দীন বিন ওকীল, মক্কার ইমাম রেযা আবারী, শায়খ তকীউদ্দীন বিন তাইমিয়া প্রমুখ।

আল-ওয়াছিক বিল্লাহ ইবরাহীম

আল-ওয়াছিক বিল্লাহ ইবরাহীম বিন ওলীয়ে আহাদ আল-মুসতামসিক বিল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাকিম বি আমারিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদের দাদা হাকিম পুত্র মুহাম্মাদকে আল-মুসতামসিক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তবে তিনি পিতার সামনে ইন্তেকাল করায় হাকিম তার নাতি ইবরাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হাকিমের ধারণা ছিল ইবরাহীমের মধ্যে খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, ইবরাহীম এ কাজের যোগ্য নন। কারণ তিনি খেলাধুলা প্রিয় এবং চরিত্রহীন লোকদের সহচর ছিলেন। হাকিম তার সংশোধনে অপারগ হয়ে তাকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারণ করে ইবরাহীমের চাচা মুস্তাকফীকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ফলে ইবরাহীম খলীফা এবং সুলতানের মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ বপন করেন। যে ইতিহাস দুনিয়াবাসীর অজানা নয়।

মুসতাকফী মৃত্যুর সময় পুত্র আহমদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। কিন্তু সুলতান এ ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করায় জনগণ ইবরাহীমের নিকট বাইআত করে এবং তাকে আল-ওয়াছিক বিল্লাহ উপাধি দেয়। মৃত্যুর সময় সুলতান এ কাজে দারুণ অনুতপ্ত হয় এবং ৭৪২ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষে ইবরাহীমকে অপসারণ করে আহমদকে হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি দিয়ে খলীফা নির্ধারণ করে দেয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, লোকেরা ইবরাহীমের অনৈতিক কাজসমূহের অভিযোগ জানালেও সুলতান তাদের কথায় কোনো প্রকার কান দেয়নি। উপরন্তু তারই হাতে বাইআত হয়।

ইবনে ফাজলুল্লাহ 'আল-মাসালিক' গ্রন্থে লিখেছেন, খিলাফতের যোগ্যতা এসে যাবে ভেবেই হাকিম ইবরাহীমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি সৎলোকের সহচরে না গিয়ে মন্দ মানুষের সংস্পর্শে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মুসতাকফীর মৃত্যুর সময় তার ছেলের প্রতি করুণা করার প্রেক্ষিতে খলীফার সাথে সুলতানের সম্পর্কে ভাটা পড়ে– যার বিবরণ আমরা আগেই পেশ করেছি। এর সূত্র ধরে সুলতান ইবরাহীমকেই মনোনীত করে। যেহেতু ইবরাহীমের দাদা হাকিম তাকে উত্তরাধিকার বানিয়েছেন মুসতাকফী তার ছেলে আহমদকে মনোনীত করার আগেই। প্রধান বিচারপতি আবু উমর বিন জামাত সুলতানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তার অভিমতটিই প্রাধান্য পেয়ে যায়। খুতবায় তার পরিবর্তে সুলতানের নাম উল্লেখ হয়। মুসতাকফীর মৃত্যুর পর থেকে খুতবায়, মিম্বরে এবং দু'আর মজলিসে খলীফাদের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সুলতানদের নাম বাকী থেকে যায়। সুলতানের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর কড়াঘাতে শঙ্কিত সুলতানের তখন দৃষ্টি খুলে যায়। খলীফা মুসতাকফীর ওসীয়ত মোতাবিক খিলাফত বুঝিয়ে দেবার জন্য সুলতান এবার উঠে পড়ে লাগে। সে তার পূর্বের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ইবরাহীমকে অপসারণ করে।

আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস

আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আল-মুসতাকফী। কুস শহরে ইন্তেকালের সময় মুসতাকফী হাকিমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সুলতান আল-মুলকুন নাসর হাকিমের চাচাত ভাই ইবরাহীমকে নির্বাচন করে। ইবরাহীমের চরিত্র ভাল না হওয়ার কারণে কাযী আযুদ্দীন বিন জামাত সুলতানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তা কোনোই কাজে আসেনি। সুলতান ইবরাহীমের কাছেই বাইআত করে। অবশেষে মৃত্যুর সময় সুলতানের বোধোদয় হয়। সে ইবরাহীমকে অপসারণ করে আহমদের (হাকিমের) নিকট বাইআত গ্রহণের জন্য আমীর-উমারাদের ওসীয়ত করে। সুলতানের মৃত্যুর পর আল মানসুর আবু বকর বিন নসর সুলতান হয়। ৭৪১ হিজরীর যিলহজ মাসের এগারো তারিখ মঙ্গলবারে নতুন সুলতান একটি মজলিশের আয়োজন করে। এ মজলিশে ইবরাহীম এবং হাকিম উভয়কেই ডেকে আনা হয়। ভরা মজলিশে কাযীদের জিজ্ঞাসা করে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতের হকদার কে? কাযী আযুদ্দীন বিন জামাত বললেন, খলীফা মুসতাকফী মৃত্যুর সময় কুস শহরে পুত্র-আহমদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। এ কাজের সত্যতা প্রমাণের জন্য খলীফা কুস শহরের চল্লিশ জন

ইনসাফগার সাক্ষীও রেখে গেছেন। এরা আমার নায়েব কুস শহরের কাযীর নিকট সাক্ষীও দেখেছে। উপরন্তু আমি নিজেও এর সাক্ষী, এ কথা শুনে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে ইবরাহীমকে অপসারণ করে আহমদের নিকট বাইআত করে আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি দেয়।

ইবনে ফাযলুল্লাহ 'মাসালিক' গ্রন্থে লিখেছেন, হাকিম বি আমরিল্লাহ হলেন আমাদের যুগের ইমাম (মহান নেতা) এবং আমাদের দেশের জন্য রহমতের বারিধারায় সিক্ত বাদশাহ, তার পক্ষ থেকে শত্রুর প্রতি ক্রোধ এবং মিত্রের প্রতি প্রশান্তি পৌঁছে যেত। সারা জীবন মঙ্গলময় কাজ করার দরুন তার প্রতি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নত হয়ে যেত। তিনি খিলাফতের রীতিনীতিগুলোকে পুনঃজ্জীবন দান করেন। তার বিরুদ্ধবাদিদের কাউকে তিনি শাস্তি দেননি। তিনি বাপ-দাদার পদাঙ্ক অনুসরণে চলতেন। স্বীয় পরিজনের মধ্যে বিরাজিত হতাশা এবং মতভেদ দূর করে দেন। সকল মিম্বরগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, প্রথমে তার উপাধি আল-মুসতানসির নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আল-হাকিম লকব হয়ে যায়। শায়খ যায়নুদ্দীন ইরাকী বলেন, হাকিম মুতআখ্খিরীনদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। ৭৫৩ হিজরীর মধ্যবর্তীতে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

তার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে– সুলতান মানসুরের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা এবং মদ পানের দায়ে তাকে অপসারণ করা হয়। কথিত আছে যে, তার বাবার স্ত্রীদেরও ছাড়ত না। তাকে কুসে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং ওখানেই সে নিহত হয়। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে তার কৃত অপরাধের প্রতিদান– যা তার পিতা খলীফা মুসতাকফীর সাথে করেছিল। যারাই বনূ আব্বাসকে কষ্ট দিয়েছে তারাই সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেয়েছে– আল্লাহর এই আদত সর্বদা চালু ছিল।

মানসুর অপসারিত হবার পর তার ভাই আল-মুলকুল আশরাফ সুলতান হয়। তাকেও তখত থেকে নামিয়ে দেয়ার পর তার ভাই আহমদ নসর লকব ধারণপূর্বক মসনদে আরোহণ করে। ৭৪৩ হিজরীতে আহমদকেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তদস্থলে তার ভাই ইসমাঈল সলিহ উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। ৭৪৬ হিজরীতে ইসমাঈল সলিহের মৃত্যু হলে খলীফা তার ভাই শাবানকে আল-কামিল উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করেন। ৭৪৭ হিজরীতে কামিল নিহত হলে তার ভাই আমীর হাজ আল-মুযাফফর উপাধি নিয়ে তখত নসীন হয়। তাকেও ৭৪৮ হিজরীতে অপসারণের পর তার ভাই হোসেনকে নসর উপাধি দিয়ে সুলতান বানানো হয়।

৭৪৯ হিজরীতে ভয়াবহ প্লেগরোগ ছড়িয়ে পড়ে। ৭৫২ হিজরীতে হোসেন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালে তার ভাই সলিহ সুলতান মনোনীত হয়। আন-নসর মুহাম্মাদ বিন কালাদুনের আওলাদ থেকে আটজন সুলতান মনোনীত হয়।

তার যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- হাফেজ আবুল হাজ, তাজ আব্দুল বাকী ইয়াযনী, শামস আব্দুল হাদী, ইবনুল ওয়াদী, আবু হিয়ান, ইবনুল লুবান, ইবনে আদলান, ইবনে ফযলুল্লাহ, ইবনে কাইয়্যম জাওযী প্রমুখ।

আল-মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ

আল-মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ আবু বকর বিন আল-মুসতাকফী তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর ৭৫৩ হিজরীতে লোকেরা জ্ঞানীদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তার হাতে বাইআত হয়। তিনি ৭৬৩ হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে ইন্তেকাল করেন।

৭৫৫ হিজরীতে সুলতান সালিহ অপসারিত হলে আন-নসর হাসান সুলতান মনোনীত হয়। ৭৫৬ হিজরীতে নতুন পয়সা বাজারে ছাড়া হয়। ২৪টি পয়সা এক দিরহামের সমান ওজন হয়। আগে এক দিরহামে দেড় রিতিল পয়সা হত। ৭৬৬ হিজরীতে আন-নসর হাসান নিহত হওয়ায় তার ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন মুযাফফর 'আল-মানসুর' উপাধি নিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে।

আল-মুতাযদের যুগে যেসব ওলামা হযরাত ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- সিরিয়ার বিচারপতি শায়খ তকীউদ্দীন সবুকী, সামীন, বাহা বিন আকীল, সালাহুল আলাযী, জামাল বিন হিশাম, হাফেজ মোগলতাঈ (বিশিষ্ট সীরাত গবেষক), আবু উমামা বিন নাকাস প্রমুখ।

আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ

আল-মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আল- মুতাযদ সর্বশেষ খলীফাদের পিতা। তিনি প্রথমে উত্তরাধিকার মনোনীত হয়েছিলেন। তার পিতার মৃত্যুর পর ৭৬৩ হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। তিন পঁয়তাল্লিশ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে সেই সময়টুকুও অন্তর্ভুক্ত যে সময়ে তিনি অন্তরীণ ছিলেন। এর বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব।

তিনি অনেক আওলাদ রেখে যান। কথিত আছে, তিনি ছিলেন এক শত সন্তানের জনক। এদের মধ্যে কেউ গর্ভে, প্রসবের সময় এবং শৈশবে মারা গেছে। আর অধিকাংশরা পরিণত বয়সে পরলোক গমন করে। এদের থেকে পাঁচজন খিলাফত প্রাপ্ত হন– যার নজির অন্য খলীফাদের মধ্যে বিরল। তারা হলেন,

১। আল-মুসতাইন আল-আব্বাস।

২। আল- মুতাযদ দাউদ।

৩। আল- মুসতাকফী সুলায়মান।

৪। আল- কায়িম হামযা এবং

৫। আল- মুসতানজিদ ইউসুফ।

খলীফা মুতাওয়াককিলের জীবিত আওলাদের মধ্যে একমাত্র মূসাই বাকী থাকে– যে চারিত্রিক দিক থেকে ইবরাহীম বিন মুসতাকফীর অনুরূপ ছিল। সে সময় বনূ আব্বাসের যতগুলো লোক ছিল মুতাওয়াককিলের আওলাদই ছিল ততগুলো।

৭৬৪ হিজরীতে আল-মানসুর মুহাম্মাদ অপসারিত হলে শাবান বিন হুসাইন বিন নসর বিন মুহাম্মাদ বিনা কালাদুন 'আশরাফ' উপাধি নিয়ে সুলতান মনোনীত হয়।

৭৭৩ হিজরীতে অভিজাতবর্গকে সহজে নির্ণয়ের জন্য সুলতান তাদেরকে সবুজ পাগড়ি বাঁধার নির্দেশ দেয়। এটা ছিল একটি অভিনব কাজের আদেশ।

এ বছর উদ্ধত তাইমুর লঙ্গ আক্রমণ চালিয়ে শহরগুলো ধ্বংস করে ফেলে, অনেক বনী আদম হত্যা করে এবং খোদার যমীনে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এই অভিশপ্তকে ৮৭৩ হিজরীতে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন।

তাইমুর লঙ্গ দিহকানের বাসিন্দা ছিল। সে চুরি-রাহাজানীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর খায়ল শহরের সুলতানের কাছে চলে যায়। সুলতানের মৃত্যু হলে সে তার স্থানে বসে। আস্তে আস্তে সে এমন বেড়ে যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে তার নাম রয়ে যায়। জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাইমুর লঙ্গ সর্বপ্রথম কত সালে হামলা করে? সে জবাব দেয়, শাস্তির বছর। কারণ আরবী বর্ণমালার মান-নির্ণয় অক্ষরের বিন্যাস প্রণালীর দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্তি (عَذَابٌ) এর সংখ্যাগত মান হয় ৭৭৩।

৭৭৫ হিজরীর রমযান মাসে সুলতানের সামনে কেল্লার মধ্যে বুখারী শরীফের ক্লাস আরম্ভ হয়। প্রথমে হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী পরবর্তীতে শিহাবুদ্দীন ইরয়ানী কারী নিযুক্ত হন। ৭৭৮ হিজরীতে আশরাফ শাবান নিহত হলে তার ছেলে আলী

আলমানসুর উপাধি নিয়ে তখত নসীন হয়। এ বছর শাবান মাসের ১৪ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

৭৭৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৪ তারিখে আতাবেগ আল-আসাকির যাকারীয়া বিন ইবরাহীম বিন আল-মুসতামসিক বিন খলীফা হাকিমকে খিলআত প্রদান করে এবং খলীফা বানিয়ে দেয়। অথচ কেউ তার কাছে বাইআত করেনি এবং কেউ তার বিষয়ে ইজমাও করেনি। যাকারীয়া বিন ইবরাহীম আল-মুসতাযদ উপাধি ধারণপূর্বক খলীফা মুতাওয়াককিলকে কুস শহরে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। আশরাফ নিহত হবার সময় আতাবেগের অন্তরে খলীফার প্রতি জিঘাংসার সৃষ্টি হয়। মুতাওয়াককিল কুসে গমন করলে রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখে মুসতাযদ পনেরো দিনের জন্য খলীফা হয়ে সেও অপসারিত হয়।

৭৮২ হিজরীতে নামাযের সময় এক লোক চিল্লাচিল্লি করলে নামায শেষে তাকে শূকরের সুরতে দেখা গেল। ৭৮৫ হিজরীর সফর মাসে মানসুর নিহত হলে তার ভাই হাজী বিন আশরাফ সালিহ উপাধি নিয়ে সুলতান মনোনীত হয়। ৭৮৪ হিজরীর রমযান মাসে সালিহ অপসারিত হয় এবং যাহির উপাধি নিয়ে বরকুক বাদশাহ হয়।

৭৮৫ হিজরীর রযব মাসে বরকুক খলীফা মুতাওয়াককিলকে জাবাল দুর্গে বন্দী আল-ওয়াছিক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-মুসতামসিক বিন হাকিমের হাতে বাইআত করে নেয়। মুহাম্মাদ ৭৮৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করলে লোকেরা মুতাওয়াককিলকে পুনরায় খলীফা মনোনীত করার জন্য অনুরোধ জানালে বরকুক তা প্রত্যাখ্যান করে। সে তার ভাই মুহাম্মাদ যাকারীয়াকে ডেকে এনে খলীফা বানায়। সে ৭৯১ হিজরী পর্যন্ত খলীফা ছিল। অবশেষে বরকুক লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মুতাওয়াককিলকে মুক্তি দেয় এবং তাকে আবার খলীফা মনোনীত করে। আর যাকারীয়াকে অপসারণ করা হয়। সে স্বেচ্ছায় গৃহজীবন বেছে নেয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আর মুতাওয়াককিল মৃত্যু অবধি খলীফাই থাকেন।

এ বছর জামাদিউল আখির মাসে সালিহ হাজী স্বীয় উপাধি পরিবর্তন করে 'আল-মানসুর' উপাধি ধারণপূর্বক বরকুককে করগ শহরে বন্দী করে। এ বছর মুআযযিনরা আযানের মধ্যে একটি নতুন শব্দ اَلصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। শব্দটি) বৃদ্ধি করে- যা স্পষ্ট বিদআত।

৭৯২ হিজরীর সফর মাসে আল-মানসুর সুলতান হয়। মৃত্যু অবধি ৮০১ হিজরী পর্যন্ত সে এ পদেই বহাল থাকে। তার পর তার ছেলে ফরজ নাসর উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। ৮০৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ছয় তারিখে তাকে

অপসারণ করে তার ভাই আব্দুল আযীযকে আল-মানসুর উপাধি দিয়ে তখতে বসিয়ে দেয়া হয়। এ বছর জামাদিউল আখির মাসের ৪ তারিখে তাকে অপসারণ করা হয় এবং নাসর দ্বিতীয় বার সুলতান মনোনীত হয়।

৮০৮ হিজরীর রযব মাসের ১৮ তারিখ সোমবার রাতে খলীফা মুতাওয়াককিল ইন্তেকাল করেন।

তার যুগে যেসব ওলামা হযরত ইন্তেকাল করেছেন তাঁরা হলেন– শামস বিন মুফলী, সালাহুস সফদী, শিহাব বিন নাকীব, মুহিব নাযিরু জায়েশ, হাফেজ শরীফুল হুসাইনী, কুতব তাহতানী, বিচারপতি আযুদ্দীন বিন জামাত, তাজ বিন সুবকী, বাহাউদ্দীন বিন সুবকী, জামাল আসতুবী, ইবনে সানিহ হানাফী, জামাল বিন বানাত, আফীফ ইয়াফগী, জামাল শুরায়শী, শরফ বিন কাযী জাবাল, সিরাজ আল-হিন্দী, ইবনে আবী হাজালা, হাফেজ তকীউদ্দীন বিন রাফে, হাফেজ উমাদুদ্দীন বিন কাছীর, নাহুবিদ আতাবী, বাহা আবুল বাকা সুবকী, শামস বিন খতীব বৈরুত, উস্তাদ হিসবাতী, বদর বিন হাবীব, যিয়াউল কারমী, শায়খ আকমালুদ্দীন, শায়খ সাআদুদ্দীন, বদর, সিরাজ ইবনে মানকিন, সিরাজ বালকিনী, হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ।

আল-ওয়াছিক বিল্লাহ উমর

আল-ওয়াছিক বিল্লাহ উমর বিন ইবরাহীম বিন ওলীআহাদ আল-মুসতামসিক বিন হাকিম। মুতাওয়াককিলের অপসারণের পর ৭৮৫ হিজরীর রযব মাসে লোকেরা তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। ৭৮৮ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ বুধবারে খলীফা থাকা অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়।

আল-মুসতাসিম বিল্লাহ যাকারিয়া

আল-মুসতাসিম বিল্লাহ যাকারিয়া বিন ইবরাহীম বিন আল-মুসতামসিক। তার ভাই-এর মৃত্যুর পর তার বাইআত হয় এবং ৭৯১ হিজরীতে তাকে অপসারণ করা হয়। এর বিবরণ আমরা পেশ করেছি।

আল-মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল

আল-মুসতাইন বিল্লাহ আবুল ফজল আল-আব্বাস বিন মুতাওয়াককিল বাঈ খাতুন নামক তুর্কী বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৮ হিজরীতে মুতাওয়াককিলের মৃত্যুর পর তার বাইআত হয়। আল-মুলকুন নাসর ফারাজ সে সময় সুলতান।

নাসর শায়েখের সাথে লড়াইয়ে পরাজিত ও নিহত হলে ৮১৫ হিজরীর মুহাররম মাসে খিলাফত মুক্ত হয়ে সুলতানও খলীফার কাছে বাইআত করে। খলীফা বাগদাদে পরিপক্ব বাইআত গ্রহণের পর আমীর-উমারাদের নিয়ে মিসরে আসেন। পয়সায় তার নাম খোদাই করা হয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার তাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।

খলীফা মিসর এসে দুর্গে অবস্থান করেন। শায়খুল আসতাবলও সেই দুর্গে ছিল। মিসরের রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য শায়খকে মনোনীত করা হয়। তাকে নিযামুল মুলুক উপাধি দেয়া হয়। উমারাগণ খলীফার দরবারে কাজ শেষ করে শায়খের খিদমতে হাযির হত। সব কাজের দায়িত্ব তার উপর ছিল। তারা খলীফার নিকট থেকে কাজের লিখিত অনুমোদন নিত। আর শায়খ ফরমান জারি করত, আস্তে আস্তে কাজ তার হাতে চলে আসে। এমনকি খলীফার অজান্তেও অনেক ফরমান জারি হতে থাকে। ফলে খলীফা মর্মাহত হন। অবশেষে শায়খ তার উপর সালতানাত অর্পণের জন্য খলীফা সমীপে আবেদন করে। খলীফা এ শর্তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, তাকে কেল্লা ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে যেতে হবে। শায়খ এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করে মুঈদ উপাধি ধারণপূর্বক জবরদস্তিমূলক সুলতান হয়ে যায়। অতঃপর সে খলীফাকে অপসারণ করে তার ভাই দাউদের নিকট বাইআত করে নেয়। মুসতাইন কেল্লা ছেড়ে সপরিবারে আপন নিবাসে চলে আসেন। শায়খ মুসতাইনের সাথে দেখা সাক্ষাত এবং তার সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার নায়েব নওরুজ বিচারক এবং ওলামাদের সমবেত করে এ ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চায়। তারা মুঈদের কাজ অবৈধ হিসেবে ফতোয়া দেন। ফলে নওরুজ মুঈদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সংবাদ পেয়ে ৮১৭ হিজরীতে মুইদ সসৈন্যে যুদ্ধে গমন করে। মুসতাইন ইসকান্দারিয়া চলে গেলে সেখানে গিয়ে তাকে বন্দী করা হয়। ততর সুলতান হলে তাকে মুক্তি দিয়ে কায়রো যাবার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি ইসকান্দারিয়াকে নিজের স্বপ্নের নগরী মনে করে সেখানেই তার বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণ করেন এবং সেখানেই থেকে যান। অবশেষে ৮৩৩ হিজরীর জামাদিউল আখির মাসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে খলীফা ইন্তেকাল করেন।

৮১২ হিজরীতে প্রথম দিন নীল নদের পানি আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পায়। পর দিন আবার নীল নদের পানিতে শহর প্লাবিত হয়। ৮১৪ হিজরীতে ভারত সম্রাট গিয়াসউদ্দীন শাহ বিন ইসকান্দার শাহ খলীফার নিকট অনেক ধন-দৌলত ও উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে খিলাফতের দরবারে উপাধি প্রদানের আবেদন জানান।

তার শাসনামলে যেসব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন তাঁরা হলেন- ইয়ামনের কবি আল-মুফিক আন-নশরী, হাম্বলী আলেম নাসরুল্লাহ বাগদাদী, নাহুবিদ শামসুল মুঈদ মক্কী, শিহাবুল হিসবানী, ইয়ামনের মুফতী শিহাবুন নশরী 'ফারাইয এবং হিসাব' গ্রন্থের লেখক ইবনুল বাহায়েম, ইয়ামনের কবি ইবনুল আফীফ, কাযী আসাকিরের পিতা হানাফী আলেম মুহিব বিন শিহনা প্রমুখ।

আল-মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ

আল-মুতাযদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ দাউদ বিন আল-মুতাওয়াককিল কাজল নাম্নী এক তুর্কী বাঁদির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় ভাইয়ের অপসারণের পর ৮১৫ হিজরীতে তিনি খিলাফতে আরোহন করেন। সে সময় সালতানাত সুলতান মুঈদের দখলে ছিল। ৮২৪ হিজরীতে সুলতানের তিরোধানে তার ছেলে আহমদ মুযাফফর উপাধি নিয়ে তখত দখল করে। ততর তার সহকারী নিযুক্ত হয়। শাবান মাসে ততর তাকে বন্দী করলে খলীফা তাকে যাহির উপাধিসহ সালতানাত প্রদান করেন। ততর যিলহজ মাসে মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে মুহাম্মদ সালিহ উপাধি নিয়ে সুলতান নিয়োগ হয়। বরসিয়ায়ী আক্রমণ চালিয়ে সালিহকে তখত থেকে নামিয়ে দেয়। খলীফা ৮২৫ হিজরীর রবিউল আখির মাসে বরসিয়ায়ীকে সুলতান বানিয়ে দেন। সুলতান থাকাকালীন ৮৪১ হিজরীর যিলহজ মাসে তার মৃত্যু হলে তদস্থলে তার ছেলে আল-আযীয উপাধি নিয়ে বাদশাহ মনোনীত হয়। হিকমাক তার সহযোগী নিযুক্ত হয়। ৮৪২ হিজরীতে হিকমাক আযীযের নিকট থেকে সালতানাত কেড়ে নিলে খলীফা যাহির উপাধি দিয়ে তাকে সুলতান বানিয়ে দেয়। খলীফা এ সুলতানের যুগেই ইন্তেকাল করেন।

খলীফা মুতাযদ হলেন বুযর্গ খলীফাদের নেতা, মেধাবী, সচেতন, ওলামাদের সহচার্য গ্রহণকারী এবং দানশীল। সৃজনশীলতায় তার অবদান অপার। ৮৪৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের চার তারিখ রবিবারে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এটা ইবনে হাজার আসকালানীর গবেষণা। কিন্তু আমার (গ্রন্থকারের) নিকট খলীফার ভাতিজা বলেছেন, তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৮১৬ হিজরীতে সদরুদ্দীন বিন আদমীকে বিচার এবং হিসাব সংরক্ষণ উভয় দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একত্রে দুই দায়িত্ব পালন করেন।

৮১৯ হিজরীতে মুতাকাল্লীবাগার উপর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই প্রথম তুর্কী লোক যার উপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ বছর

এক লোক আকাশে গিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করার দাবী করে। লোকটি ছিল পাগল। অনেক আম জনসাধারণ তার কথা বিশ্বাস করেছিল। তাকে বন্দী করা হয়।

৮২১ হিজরীতে দু'টি গর্দান এবং ছয় পার্বিশিষ্ট একটি মহিষের জন্ম হয়। এ ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার এক অপূর্ব নিদর্শন। ৮২২ হিজরীর ভূমিকম্পে অধিকাংশ লোক নিহত হয়। এ বছর মাদরাসাতুল মুঈদাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ শামস বিন মুদিরীকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সুলতানের উপস্থিতিতে ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল। সুলতানের ছেলে ইবরাহীম শিক্ষকের জায়নামায নিয়মিত বিছিয়ে দিতেন।

৮২৩ হিজরীতে গাযা শহরে একটি উট যবেহ করা হলে তার গোশত প্রদীপের মত আলো ছড়াতে থাকে। ৮২৪ হিজরীতে নীল নদের পানিতে পার্শ্ববর্তী জনপদ প্লাবিত হয়। ৮২৫ হিজরীতে ফাতিমা বিনতে কাযী জালালুদ্দীন বালকীনী একটি বাচ্চা প্রসব করে যার পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়টা ছিল। গরুর মত মাথায় দু'টি শিং ফুঁড়ে উঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এ বছর কায়রো শহরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় এবং নীল নদের পানি ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

তার শাসনামলে নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেন- শাফী মাযহারের মুফতী শিহাব বিন হুজ্জাহ, আদীব বুরহান বিন রিফা, মদীনা শরীফের মুফতী ও মুহাদ্দিস আবু বকর আল-মুরাগী, মক্কা শরীফের হাফেজ জামাল বিন যহির, কামুসের লেখক মুজাদ সিরাজী, শামস বিন কাবানী হানাফী, আবু হুরায়রা বিন নিকাশ, দানুয়ী, উস্তাদ অযুদ্দীন বিন জামাত বিন হিশাম আজমী, জালাল বালকীতী, বুরহান বিজুরী, ইরাক শাসনকর্তা শামস বিন মুদিরী, আলা বিন মুআলা, বদর বিন দাযামেনী, তাকীউল হাসিনী, শারেহ ইবনে গুজা, হারবী, ইবনে জারজী, কবি তকী বিন হুজ্জা, মক্কার নাহুবিদ জালাল মুরশিদী, মুহাদ্দিস শিহাব বিন মুহমাররাহ, আলা আল-বুখারী, শামস আল- বাসাতী, জামাল বিন খাইয়্যাত, তয়্যব বাগদাদী প্রমুখ।

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী

আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী সুলায়মান স্বীয় ভ্রাতা মুতাযদের যুগে উত্তরাধিকার মনোনীত হন। তিনি হলেন মুতাযদের আপন ভাই। আমার (গ্রন্থকারের) সম্মানিত পিতা (র.) একটি দলিল লিখে গেছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

"এটি একটি অঙ্গিকার পত্র। যাতে আবু রাবি'র জীবনী উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'আলা একে সংরক্ষণ করুন। আমাদের মহান নেতা, বনূ আব্বাস, আমিরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচার আওলাদ, খুলাফায়ে রাশেদার ওয়ারেশ, মুসতাকফীর পদচারণা মুখরিত হয়ে উঠে দ্বীন-ইসলাম, উপকৃত হয় মুসলিম মিল্লাত। আল্লাহ তা'আলা তার খিলাফতের সাথে তার শান ও মর্যাদার শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং মুসলমানদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন। এটি সম্পাদিত হয়েছে যখন মুকতাফীর দ্বীন, নেকী, ন্যায় পরায়ণতা এবং অধিকার পরিপক্ব হয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার দ্বীনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"

মুকতাফী অত্যন্ত নেককার, দ্বীনদার, ইবাদতকারী, কুরআন তিলাওয়াতকারী, নীরব, লোকদের অপরাধ মার্জনাকারী এবং সচ্চরিত্রবান খলীফা ছিলেন। খলীফা মুকতাযদ অধিকাংশ সময় তার প্রশংসা করতেন।

আমার (গ্রন্থকারের) পিতা তার ইমাম ছিলেন। মুকতাফী তাকে দারুণ সমাদর করতেন। আমি তাদের ঘরেই লালিত পালিত হয়েছি। তার আওলাদেরা ছিলেন দ্বীনদার এবং ইবাদতকারী। আমার ধারণা হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র.)-এর আওলাদের পর কোন খলীফার আওলাদ এত ইবাদতকারী এবং দানশীল ছিল না।

৮৫৪ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষ জুমআর দিনে খলীফা মুসতাকফী ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আমার পিতা খলীফার মৃত্যুর পর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ৪০ দিন পর তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুলতান নিজেই জ নাযার সাথে কবর পর্যন্ত গমন করেন।

মুকতাফীর খিলাফতকালে যে সব ওলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করে তাঁরা হলেন– তকী আল-মাকরিরী, শায়খ উবাদা, কবি ইবনে কামীল, ওফায়ী, কাবানী, ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ।

আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা

আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ আবুল বাকা হামযা বিন মুতাওয়াককিল তার ভাইয়ের পর বাইআত গ্রহণ করেন। খলীফা মুসতাকফী কাউকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। কায়িমের স্বভাব ছিল তেজোদীপ্ত। তিনি ছিলেন বীর বাহাদুর ব্যক্তি। তিনি প্রতাপের সাথে কিছু দিন খলীফা ছিলেন। তবে তিনি তার ভাইয়ের মত ছিলেন না।

৮৫৭ হিজরীতে সুলতান মুলকুয যাহির চিকমাক ইন্তেকাল করলে তদস্থলে তার ছেলে উসমান আল-মানসুর উপাধি নিয়ে উপবেশন করে। দেড় মাস পর ইনাল হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে। খলীফা রবিউল আউয়াল মাসে ইনালকে আশরাফ উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করেন। কয়েকদিন পর রণাঙ্গনে সৈন্য বাহিনী প্রেরণকে কেন্দ্র করে সুলতানের সাথে খলীফার মনোমালিন্য হয়। এ কারণে ৮৫৯ হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান খলীফাকে অপসারণ করে ইসকান্দারিয়া পাঠিয়ে দেয়। খলীফা মৃত্যু অবধি ৮৬৩ হিজরী পর্যন্ত সেখানেই বন্দী ছিলেন। মৃত্যুর পর ভ্রাতা মুসতাইনের পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, দু'জনকেই ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়। উভয়কে ইসকান্দারিয়া শহরে বন্দী রাখা হয়। এবং তাদের কবর পাশাপাশি হয়।

তার শাসনামলে আমার পিতা ইন্তেকাল করেন।

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুহাসিন

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুহাসিন ইউসুফ বিন মুতাওয়াককিল তার ভাইয়ের অপসারণের পর তিনি খিলাফতের তখতে আরোহণ করেন। সে সময় সুলতান আশরাফ ইনাল সালতানাতের তখতে উপবিষ্ট ছিল।

৮৬৫ হিজরীতে সুলতানের মৃত্যু হলে তার ছেলে আহমদ মুঈদ উপাধি নিয়ে সুলতান হয়। এ বছর রমযান মাসে খোশকদম তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে বন্দী করে এবং যাহির উপাধি নিয়ে নিজেই সুলতান হয়ে যায়।

৮৭২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান মারা যায়। তার স্থানে বালবায়ী যাহির উপাধি নিয়ে নিযুক্ত হয়। দুই মাস পর তার সৈন্যরা হামলা চালিয়ে তাকে তখত থেকে নামিয়ে দেয় এবং তামরীগাকে যাহির উপাধি দিয়ে সুলতান মনোনীত করে। দুই মাস পর তার উপরও হামলা চালানো হয় এবং তদস্থলে সর্বশেষ সুলতান ফাতিয়ায়ী আশরাফ উপাধি নিয়ে সালতানাতের তখতে আরোহণ করে। সে প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শওকত, ক্ষিপ্রতা এবং কৌশলের মাধ্যমে সালতানাতের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়।

নাসর মুহাম্মাদ বিন কালাদুনের সালতানাত থেকে আজ পর্যন্ত এমন সুলতান আর কখনই পাওয়া যায়নি। সে সসৈন্যে মিসর থেকে ফোরাতের উপকূল পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছে। সে কাযী এবং শিক্ষককে বেতন দিয়ে পুষত না।

৮৮৪ হিজরীর মুহাররম মাসের ১৪ তারিখে দুই বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগে আক্রান্ত থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স ছিল নব্বই বছর অথবা এর চেয়ে কিছু বেশি। কেল্লায় তার নামাযের জানাযা পড়ানো হয় এবং সমাহিত খলীফাদের পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।

আল-মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ

আল-মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ আবুল আয আব্দুল আযীয বিন ইয়াকুব বিন মুতাওয়াককিল জিন্দীর মেয়ে হাজ মুলক–এর গর্ভে ৮১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। খিলাফত তার পিতার হস্তগত ছিল না। তিনি শৈশব থেকেই সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

তিনি জ্ঞান আহরণে মশগুল থাকতেন। তিনি আমার পিতার কাছেও ইলম অর্জন করেছেন। তার চাচা মুকতাফী তার মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দেন। তার ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে যিনি অত্যন্ত নেককার, হাশিমী এবং হাশিমীর আওলাদ। মুসতানজিদের অসুস্থতার সময় তাকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হয়। তার মৃত্যুর পর ৮৮৪ হিজরীর মুহাররম মাসের ১৬ তারিখ সোমবারে সুলতান, বিচারপতিগণ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে আম জনতা তার হাতে বাইআত করে।

বাইআতের পর কেল্লা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। সেদিন তার সাথে ছিল গোটা মন্ত্রী পরিষদ। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে আবার কেল্লায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মুসতানজিদের মত কেল্লায় বসবাস করতেন।

এ বছর সুলতান মুলকুল আশরাফ হজের জন্য হিজায গমন করেন। তার পূর্বে এক'শ বছর কোন সুলতান হজ করেননি। হজের পূর্বে তিনি মদীনা শরীফে যিয়ারত করেন এবং সেখানে ছয় হাজার দিনার খরচ করেন। অতঃপর মক্কায় এসে পাঁচ হাজার দিনার ব্যয় করেন। সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে একজন বড় মাপের উস্তাদকে নিয়োগ দেন। হজের আহকাম শেষ করে ফেরার সময় শহরে খুশির বন্যা বয়ে যায়।

৮৮৫ হিজরীতে দাওয়াদারের নেতৃত্বে মিসরের সৈন্যরা ইরাকের উপর হামলা চালায়। ইয়াকুব শাহ বিন হাসান রাহী অঞ্চলে তাদের সাথে লড়াই করে। এ যুদ্ধে মিসরীরা পরাজিত, অনেক মিসরী নিহত এবং দাওয়াদার কয়েদ হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধটি রমযানুল মোবারক মাসের শেষ দিকে সংঘটিত হয়।

৮৮৬ হিজরীর ১৭ই মুহাররম ভূমিকম্প হয়। এতে মাদরাসা সালিহার ছাদ

ধসে পড়ে বিচারপতি শরফুদ্দীন বিন আব্দ নিহত হন।

এ বছর রাবিউল আউয়াল মাসে খাকী নামক একজন ভারতীয় লোক এসে তার বয়স দেড়শ'বছর দাবী করে। আমিও (গ্রন্থকার) তাকে দেখেছি। তার দাড়ি কালো, সে বলেছে, আমি ১৮ বছর বয়সে হজ্ব করে ভারতে ফিরে যাই। সুলতান হাসানের যুগে তাতারীদের আক্রমণের সময় বাগদাদ হয়ে মিসর আসি। আমার মতে সে মিথ্যা বলেছে।

এ বছর শাওয়াল মাসে মদীনা শরীফ থেকে এ মর্মে পত্র আসে যে, রমযানুল মুবারকের ১৩ তারিখে বজ্রপাতের কারণে মসজিদে নববী (সা.)-এর ছাদ, খাযানা এবং গ্রন্থাদি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। মসজিদের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না- যা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

৯০৩ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষ বুধবারে খলীফা মুতাওয়াককিল আলাল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি পুত্র ইয়াকুবকে আলসাতমাসাক বিল্লাহ উপাধি দিয়ে ওলী আহাদ মনোনীত করে যান। এটাই হল সর্বশেষ অবস্থা যা আমি এই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমি এ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ইতিহাসগুলো থেকে তাত্ত্বিক সহায়তা গ্রহণ করেছি–

১। তারীখে যাহাবী। এতে ৭০০ হিজরী পর্যন্ত সংঘটিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

২। তারীখে ইবনে কাসীর। ৭৩৮ হিজরীর ইতিহাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩। মাসালিক, ৭৭৩ হিজরীর ইতিহাস সন্নিহিত।

৪। ইবনে হাজার আসকালীনী (র.) রচিত 'ইবনাউল উমার'। এতে তিনি ৮৫০ হিজরী পর্যন্ত ইতিহাস লিখেছেন।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ইতিহাসগুলো থেকে সংকলন ও উদ্ধৃতি দিয়েছি–

৫। তারীখে বাগদাদ, খতীব (১০ খণ্ড)।

৬। তারীখে দামিশক্, ইবনে আসাকির (৫৭ খণ্ড)

৭। আওরাক, সূলী (৭ খণ্ড)।

৮। তওরীয়াত (৩ খণ্ড)

৯। হিলয়াহ, আবু নাঈম (৭ খণ্ড)

১০। মাজালিসাহ, দিনূরী।

১১। কামিল, মুবাররদ (২ খণ্ড)

১২। আমালী, ছালাবা। এ ছাড়াও ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থাদি।

স্পেনের উমাইয়্যা রাজত্ব

স্পেনের প্রথম বাদশাহ আব্দুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। ১৪৮ হিজরীতে স্পেনে পালিয়ে গেলে তার নিকট খিলাফতের বাইআত করা হয়। তিনি আলেম এবং ন্যায়পরায়ণ। ১৭০ হিজরীর রবিউল আখের তার মৃত্যু হলে তদস্থলে তদীয় পুত্র হিশাম আবু ওয়ালীদ তখতে আরোহণ করেন। ১৮০ হিজরীর সফর মাসে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আল-হাকাম আবুল মুযাফফর মুর্তজা উপাধি নিয়ে মসনদে বসেন। ২০৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তিনি মারা যান। তার ছেলে আব্দুর রহমান পিতার শূন্য তখত অলংকৃত করেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পেনের মাটিতে উমাইয়্যাদের শাসন ব্যবস্থা পরিপক্ব ও মজবুত করেন। তিনি স্পেনে খিলাফতের মহত্ত্ব ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার যুগে পোশাক অলংকৃত করা হয় এবং দিরহাম তৈরি করা হয়। এর আগে এখানে মুদ্রা তৈরি হত না। পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা যে দিরহাম নিয়ে আসত তাই এখানে চলত। তিনি মুদ্রা তৈরির কারখানা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের মত এবং দর্শন শাস্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বনূ আব্বাসের খলীফা মামুনের অনুরূপ ছিলেন। তিনি স্পেনে সর্বপ্রথম দর্শন নিয়ে আসেন। ২৩৯ হিজরীতে তার ইন্তেকালের পর তার ছেলে মুহাম্মাদ তখত নসীন হন। ২৭৩ হিজরীর সফর মাসে তার অন্তর্ধানে তার ছেলে আল-মুনযির বাদশাহ হন। ২৭৫ হিজরীর সফর মাসে তার মৃত্যুর পর তার ভাই আব্দুল্লাহ মসনদে উপবেশন করেন। তিনি স্পেনের খলীফাদের মধ্যে ইলম ও শরীয়তের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। ৩০০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তার ইন্তেকালের পর তদস্থলে তার পৌত্র আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আননাসর উপাধি নিয়ে তখতে উপবেশন করেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পেনকে খিলাফতের উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সর্বপ্রথম তাকে আমিরুল মুমিনীন হিসেবে সম্বোধন করা হয়। খলীফা মুকতাদরের শাসনকালে বনূ আব্বাসের খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি স্পেনের মাটিতে খিলাফত দাবী করেন এবং আমিরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। তার পূর্বের সকল বাদশাহকে 'আমীর' হিসেবে স্মরণ করা হত।

৩৫০ হিজরীতে তার মৃত্যুতে তার ছেলে আল-হাকিম আল-মুসতানসির বাদশাহ হন, যিনি ৩৬৬ হিজরীর সফর মাসে পরলোক গমন করেন। তার পর তার

ছেলে হিশাম আল-মুঈদ তখতে আরোহণ করেন। ৩৯৯ হিজরীতে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে বন্দী করা হয়। তদস্থলে মুহাম্মদ হিশাম বিন আব্দুল জাববার বিন নাসের আব্দুর রহমান 'আল-মাহদী' উপাধি নিয়ে তখতে আসীন হন। ছয় মাস পর তার ভাতিজা হিশাম বিন সুলায়মান বিন নাসর আব্দুর রহমান হামলা চালিয়ে বাদশাহ হন। অতঃপর তার উপর তার চাচা হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে বাদশাহ হন। জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে অপসারণ করে। তিনি আত্মগোপন করেন। অবশেষে খুজে বের করে তাকে হত্যা করা হয়।

স্পেনের জনতা হিশামের হত্যাকারীর ভাতিজা সুলায়মান বিন হাকাম আল-মুসতানসিরকে 'আল-মুসতাইন' উপাধি দিয়ে তার কাছে বাইআত করে। অতঃপর প্রজাবৃন্দ তার সাথে লড়াই করে ৪০৬ হিজরীতে তাকে বন্দী করে এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল মালিক বিন নাসরকে মুর্তজা লকব দিয়ে তার নিকট বাইআত করে নেয়। বছরের শেষে তাকেও হত্যা করা হয়।

তার অন্তর্ধানে উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়। তদস্থলে গড়ে উঠে ফাতেমী শাসনের সৌধ। ৪০৭ হিজরীর মুহাররম মাসে আন-নাসর আলী বিন হামুদ ফাতেমী রাজত্বের তখতে সমাসীন হন। ৪০৮ হিজরীর যিলকদ মাসে তাকে হত্যা করে তদস্থলে তার ভাই আল-মামুন আল-কাসিম বাদশাহ হন। ৪১১ হিজরীতে তাকে অপসারণের পর তার ভাতিজা ইয়াহইয়া বিন নাসর আলী বিন হামুদ 'আল-মুসতা'আলা' উপাধি নিয়ে বাদশাহ হন। এক বছর সাত মাস পর তাকে হত্যার মাধ্যমে আবার উমাইয়্যা রাজত্ব ফিরে আসে। আল-মুসতাযহার আব্দুর রহমান বিন হিশাম বিন আব্দুল জাব্বার (উমাইয়্যা বংশীয়) বাদশাহ হন। পঞ্চাশ দিন পর তাকে হত্যা করা হলে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ বিন নাসর আব্দুর-রহমান আল-মুকতাফী উপাধি নিয়ে ক্ষমতারোহণ করেন। এক বছর চার মাস পর তাকে অপসারণ করা হয়। তদস্থলে হিশাম বিন বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বিন নাসর আব্দুর রহমান আল-মুতামাদ বাদশাহ হন। কিছু দিন পর তাকেও অপসারণ এবং বন্দী করা হয়। ৪০০ হিজরীর সফর মাসে অথবা এর চেয়ে কয়েক হিজরী পরে তিনি বন্দী অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুর সাথে সাথে স্পেনের মাটিতে উমাইয়্যা শাসনেরও মৃত্যু হয়।

পাশ্চাত্যের উবায়দিয়া রাজত্ব

পাশ্চাত্যে (তথা আরবের পশ্চিমাঞ্চলে- অনুবাদক) ২৯২ হিজরীতে আল-

মাহদী উবায়দুল্লাহ সর্বপ্রথম উবায়দিয়া শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি ৩২২ হিজরীতে মারা গেলে তার ছেলে আল-কায়িমবি আমরিল্লাহ মুহাম্মাদ তদস্থলে উপবেশন করেন। ৩৩৩ হিজরীতে তিনিও মারা যান। কায়িমের পর তার ছেলে আল-মানসুর ইসমাঈল তখতে সমাসীন হন। তিনি ৩৪১ হিজরীতে মারা যান। অতঃপর তার পুত্র আল-মুআয লিদ্দীনিল্লাহ সাদ বাদশাহ হন। যিনি ৩৬২ হিজরীতে কায়রো প্রবেশ করেন এবং ৩৬৫ হিজরীতে মারা যান। তার স্থানে তার ছেলে আল-আযীয বাযযার আসীন হন। তিনি ৩৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার পর তার ছেলে হাকিম বিন আমরিল্লাহ মানসুর তখতে আরোহণ করেন। ৪১১ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হলে পুত্র আয্-যাহির লা-আযাযুদ্দীনিল্লাহ সালতানাতে প্রতিষ্ঠা পান। তিনি ৪২৮ হিজরীতে মারা যাওয়ায় পুত্র আল-মুনতাসির মুহাম্মাদ সালতানাতের তখত অধিকার করেন। তিনি ৪৮৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি ষাট বছর চার মাস রাজত্ব করেন।

যাহাবী বলেন, আমার মতে মুসলিম জাহানের কোনো খলীফা বা বাদশাহ এত দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করেননি।

অতঃপর তার ছেলে আল-মুসতা'আলা বিল্লাহ আহমদ মসনদে আরোহণের পর ৪৯৫ হিজরীতে মারা যান। এরপর তার ছেলে আল-আমর বি আহকামিল্লাহ মানসুর পাঁচ বছর বয়সে বাদশাহ হন। ৫২৪ হিজরীতে তাকে সপরিবারে হত্যা করা হলে তার চাচাত ভাই আল-হাফিজ লিদ্দীনিল্লাহ আব্দুল মজিদ ইবন মুহাম্মাদ বিন আল-মুসতানসির তখত নসীন হন, যিনি ৫৪৪ হিজরীতে মারা যান। তদস্থলে পুত্র যাফর বিল্লাহ ইসমাঈল উপবেশনপূর্বক ৫৪৯ হিজরীতে নিহত হলে ফায়েয বি নাসরিল্লাহ ঈসা তখতে আসীন হন। যিনি ৫৫৫ হিজরীতে মারা যান। তারপর আল-আযদ লিদ্দীনিল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ বিন হাফিজ লিদ্দীনিল্লাহ তখত নসীন হন। তিনি ৫৬৭ হিজরীতে অপসারিত হন এবংএ বছরই মারা যান। বর্তমানে মিসরে আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং সেখানে উবায়দিয়া রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যাহাবী বলেন, উবায়দিয়া রাজত্বের চতুর্দশ বাদশাহ নিজেকে খলীফা দাবী করলেও কেউ তার খিলাফত মেনে নেয়নি।

বনূ তাবাতাবাদের শাসন ব্যবস্থা

১৯৯ হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে সর্বপ্রথম যিনি এ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তাবাতাবা। তার যুগে

আল-হাদী ইয়াহইয়া বিন আল-হুসাইন বিন কাসিম বিন তাবাতাবা ইয়ামনে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং আমিরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। ২০৮ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তার ইন্তেকালের পর পুত্র মুর্তজা মুহাম্মাদ তখতে আরোহণ করেন, যিনি ৩২০ হিজরীতে মারা যান। এরপর তার ভাই নাসর আহমদ তখত নসীন হন। তিনি ৩২৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার পর পুত্র আল-মুনতাখিব আল-হুসাইন ক্ষমতায় আসেন এবং ৩২৯ হিজরীতে মারা যান। অতঃপর তার ভাই মুখতার আল-কাসিম মসনদে বসেন। ৩৪৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি নিহত হন। এরপর তার ভাই হাদী মুহাম্মাদ, অতঃপর তার ছেলে রশীদ আব্বাস তখতে উপবেশন করেন। এরপর তাদের শাসন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবরিস্তানের রাজত্বের বিবরণ

ছয়জন পর্যন্ত এ রাজত্বের শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। এদের মধ্যে প্রথম তিন জন হযরত হাসান (রা.)-এর আওলাদ এবং পরের তিন জন হযরত হুসাইন (রা.)-এর বংশধর। ২৫০ হিজরীতে রায় এবং দিলম অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিশাম আল-দায়ী ইলাল্লাহ হাসান বিন সায়েদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন হুসাইন বিন যায়েদ বিন জাওয়াদ বিন হাসান বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালিব এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তার ভাই কায়িম বিলহক মুহাম্মাদ তখত নসীন হন এবং ২৮৮ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর তার পৌত্র আল-মাহদী আল-হাসান বিন যায়েদ আল-কায়িম বিলহক ক্ষমতায় আসেন। অতঃপর ---!! (গ্রন্থকার এরপর আর কিছুই লিখেননি– অনুবাদক)।

ফায়দা

ইবনে হাতিম সরচিত তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) রেওয়ায়েত করেন, আবহমান কাল থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছে।

আমার মতে হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে হাজ্জাজের ফিতনা প্রকাশ পায়। হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলীফা মামুনের ফিতনা দেখা দেয়। তিনি তার ভাইকে হত্যা এবং লোকদের খলকে কুরআনের প্রতি আহ্বান জানান। এটা ছিল এ উম্মতের জন্য বড় ফিতনা এবং সর্বপ্রথম বিদআত। এর পূর্বে কোনো খলীফা লোকদের বিদআতের প্রতি আহ্বান করেননি। তৃতীয় হিজরীতে কারমতীর পর

খলীফা মুকতাদারের ফিতনা প্রকাশ পায়। তাকে অপসারণ করে তার ভাইয়ের হাতে সকলে বাইআত হলে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় দিন খলীফা হন। বিচারপতিগণ এবং অনেক ওলামায়ে কেরাম নিহত হন। ইতোপূর্বে কোনো বিচারককে হত্যা করা হয়নি। চতুর্থ শতাব্দীতে হাকিমের ফিতনা যা শয়তানের ইশারায় সংঘটিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে সিরিয়া এবং বাইতুল মুকাদ্দিস ফিরিঙ্গীদের কাছে চলে যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইউসুফ (আ.)-এর যুগের পর থেকে এত তীব্র দুর্ভিক্ষ আর কখনই হয়নি। এ শতাব্দীতে তাতারীদের উত্থান হয়। সপ্তম শতাব্দীতে তাতারীদের উপমাহীন হত্যাযজ্ঞে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়। অষ্টম শতাব্দীতে তাইমুর লঙ্গের ফিতনা প্রকাশ পায় যার তুলনায় তাতারীদের ফিতনা কিছুই না।

আমি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নবম শতাব্দীর ফিতনা আমাদের না দেখান। আর হাবীবে খোদা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বদৌলতে রহমতের বারিধারায় আমাদের সিক্ত করুন। আমীন! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!